সাইন্স ফ্রম আল কোরআন

SCIENCE FROM AL QURAN

মুহাম্মাদ আবু তালেব

সাইন্স ফ্রম আল কোরআন

(কোরআন থেকে বিজ্ঞান)

মুহাম্মাদ আবু তালেব

র‍্যাক্‌স পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

সাইন্স ফ্রম আল কোরআন
(কোরআন থেকে বিজ্ঞান)

মুহাম্মাদ আবু তালেব

ISBN : 984-300-003065-0

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
প্রোপ্রাইটর
র‍্যাকস পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
খেয়া প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১১
সফর, ১৪৩৩
পৌষ, ১৪১৮

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও ছাপা
র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

বিনিময় : দুইশত আশি টাকা মাত্র

Science from Al-Qur'an written by Muhammad Abu Taleb Published by Muhammad Golam Kibria Proprietor RAQS Publications 230 New Elephent Road, Dhaka-1205, First Edition February, 2009, Second Edition December, 2011 Price Tk. 280.00 only.

RAQS Publications series : 12

প্রারম্ভিক কথা

সর্বময় শক্তিমান সর্বত্র বিরাজমান
মহান আল্লাহর প্রতি লাখো কোটি সজুদ
খাতামুন্নবী করুণার ছবি
মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি লক্ষ কোটি দরূদ ॥

প্রত্যেক মানুষের জন্য এটা সমীচীন যে, তিনি পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করে দেখবেন। যারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নয়নের জন্য গবেষণায় নিয়োজিত আছেন কোরআন অধ্যয়ন করা তাদের জন্যও অপরিহার্য। কেননা পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহে এমন সব তথ্য ও তত্ত্বের ইঙ্গিত রয়েছে যা গবেষণার কাজকে তরান্বিত করে এবং দিক নির্দেশনা দান করে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় Toronto বিশ্ববিদ্যালয়ের Anatomy Department-এর প্রফেসর K. L. Moore এর কথা। তিনি বলেন, 'আমি ১৪০০ বছর পূর্বের কোরআন অধ্যয়ন করে Human Embryology সম্পর্কিত যে তথ্য লাভ করেছি, সত্যি বলতে কি আমি অভিভূত হয়েছি। Human Embryology সংক্রান্ত তথ্যগুলো পবিত্র কোরআনে এতো নিখুঁত এবং সঠিকভাবে রয়েছে যা Medical Science-এ দেখা যায় না।"

এরপর তিনি সৌদি আরবে এসে ড. এ মজিদ আজীনদানীর সাথে সাক্ষাৎ করে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে জেনে নেন এবং যৌথভাবে 'The Developing Human' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন।

আল কোরআন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় এমন কোনো গ্রন্থ নয় যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে প্রায় প্রতীকি ভাবধারা উপস্থাপন করে এবং যেগুলো বড়জোর কতিপয় অতি সরল নৈতিক নির্দেশাবলী ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে এসব ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাসীরা জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে অন্যান্য উৎস থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

পক্ষান্তরে পবিত্র কোরআন আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, মৌল নীতিমালা এবং মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণ বিধি, নৈতিক শিক্ষা, পরিবার ও সমাজের নিয়ম পদ্ধতির সমস্ত মৌলনীতি সবিস্তারে বর্ণনা করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন আয়াতে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও বোধসম্পন্ন লোকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে যেন তারা পবিত্র কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। কারণ এ গ্রন্থে নিহিত রয়েছে একেবারে নির্ভরযোগ্য গবেষণার মূলনীতিসমূহ।

আমরা **'সাইন্স ফ্রম আল কোরআন'** গ্রন্থে বিজ্ঞানের ইঙ্গিতবাহী কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখেছি আমাদের জ্ঞান এতোই সীমিত যে প্রত্যেকটি ঐশী আয়াতে যেসব তথ্য ও তত্ত্বের ইঙ্গিত রয়েছে তার অর্থ হবে মহাসমুদ্রের মত বিশাল।

বস্তুত এ বিস্ময়কর গ্রন্থ যিনি অবতীর্ণ করেছেন তিনি মহা প্রজ্ঞাময় চিরঞ্জীব একক সত্তা। যারা সুবিশাল মহাবিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে এতটুকু চিন্তা গবেষণা করে তারা সর্বত্র সেই একক সত্তার অদৃশ্য ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে এবং তাঁর

একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে শুধু তাঁরই প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করে। আর এভাবে আল্লাহ পাকের সৃষ্টির মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। অবনতি ও অধঃপতনের চরম স্তর থেকে পবিত্র কোরআন সভ্যতা, আধুনিক শিক্ষা ও উন্নতির পথে মানুষকে ধাবিত করেছে। শিক্ষা তথা আধুনিক শিক্ষার প্রতি পবিত্র কোরআন উৎসাহিত করেছে সবচেয়ে বেশি। তাই দেখা যায় আল কোরআনের বিশেষ আয়াতসমূহে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, সাহিত্য, অর্থনীতি, জিওগ্রাফী, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, আইন ও অন্যান্য আরো অনেক বিষয়ের উপস্থাপনা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠকগণ যখন গভীর অন্ত র্দৃষ্টি দিয়ে পবিত্র কোরআন পাঠ করেন তখন সবাই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন।

কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম সমাজ, যারা বিজ্ঞান শিক্ষা, তথা আধুনিক শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেজন্য দেখা যায়, যখন তারা পবিত্র কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করেন তখন কোরআন ও হাদীসকে মানুষের সামনে আধুনিক ও সময়োপযোগীভাবে উপস্থাপন করতে পারেন না। তাই তাঁরা আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হননি। অথচ আমরা জানি ইসলাম একটি প্রগতিশীল আধুনিক জীবন ব্যবস্থা। আধুনিক শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন এসব আলেমগণ ইসলামকে বিভিন্ন ব্যাখ্যায় বিভক্ত করে মুসলমানদের মধ্যে এমন বিভক্তি সৃষ্টি করেছেন, একজন মুসলিম আর একজন মুসলিম ভাইকে কাফের বলতেও দ্বিধাবোধ করে না। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সা) তো একজনই এবং তিনি একটা জীবন বিধান এনেছিলেন। অথচ এখন আমরা হাজার হাজার মতভেদ দেখতে পাচ্ছি, যারা সবাই তাদের মতকে দাবী করছে ইসলাম বলে।

সুতরাং আমরা এই বইটিতে পবিত্র কোরআনের বিশেষ আয়াতসমূহে বিজ্ঞানের যেসব নির্দেশনা রয়েছে সেই নির্দেশনাগুলোকে অত্যন্ত সাবলীলভাবে সম্মানিত পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ বইটি রচনা করতে গিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'Scientific indications in the Holy Qur'an' গ্রন্থের ব্যাপক সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। আশা করি বইটি পাঠ করলে পাঠক সমাজের চেতনার ভিত্তিমূলে আলোড়ন সৃষ্টি হবে এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি তারা আরো বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়বেন। পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে নিতে প্রয়াসী হবেন। এমনিভাবে সূরা মু'মিনূনের ৭৮ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, "তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের শ্রবণের জন্য কান, দর্শনের জন্য চোখ এবং উপলব্ধির জন্য হৃদয় দান করেছেন। অথচ তোমরা খুবই কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"

অতএব, 'সাইন্স ফ্রম আল কোরআন' বইটির যাবতীয় কাজে যারা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ এবং সকলের জন্য মহান আল্লাহ পাকের রহমত কামনা করছি। আমীন।

খাদেমুল কোরআন

মুহাম্মাদ আবু তালেব

তোহ্ফা

শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে
দুঃখ কষ্ট সহ্য করে
আমাদের বড় করেছেন
সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা ও আম্মার
পবিত্র স্মৃতিতে নিবেদিত।
আল্লাহ্ পাক, আমার আব্বা ও আম্মাকে
জান্নাতের মেহমান করে নিক।
আমীন ॥

সূচিপত্র

ভূমিকা

মালেশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মুহাম্মদ তিনটি শিরোনামে 'The Daily Bangkok Post' পত্রিকায় একটি ফিচার লিখেন যা ৯ নভেম্বর ২০০৫ সনে প্রকাশিত হয়। পাঠকগণের উপলব্ধির জন্য তা হুবহু এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

"Is Islam being Left behind?
ইসলাম কি পেছনে পড়ে যাচ্ছে ?

Islam's forsaken Renaissance?
ইসলামের রেনেসাঁ পরিত্যক্ত?

Concentrating of religious study alone can result in intellectual regression.

শুধু ধর্মীয় শিক্ষাতে মনোনিবেশ করলে ফল হবে বুদ্ধির ক্ষেত্রে পশ্চাদপসারণ।"

শিশুরা প্রায়ই এমন একটি খেলা খেলে যেখানে তারা গোল হয়ে বসে। একজন তার পাশের জনকে কানে কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বলে। দ্বিতীয়জন সেই তথ্যটি তার পাশের জনকে কানে কানে ফিসফিস করে বলে। এভাবে তাদের কানাকানি চক্রাকারে চলতে থাকে। শেষ পর্যায়ে শেষ শিশুটি যা শোনে সেটা হয় প্রথম শিশুটি যা বলেছিল তার থেকে অনেক ভিন্ন কিছু।

দেখা যাচ্ছে সেরকম কিছু একটা ঘটেছে ইসলামে। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সা) একজনই এবং তিনি একটাই বিধান এনেছিলেন। অথচ এখন আমরা দেখছি হয়তো এক হাজার ধর্মীয় মতপার্থক্য, যারা সবাই তাদের মতকে দাবী করছে ইসলাম বলে। বিভিন্ন ব্যাখ্যায় বিভক্ত হয়ে যাবার ফলে অতীতে বিশ্বে যে ভূমিকা মুসলমানেরা পালন করেছিল সেটা আর এখন করছে না। তার বদলে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তারা নিগৃহীত হচ্ছে।

শিয়া-সুন্নি ভেদাভেদ এতোই গভীর যে এক পক্ষ অপর পক্ষকে কাফের বলে। এক পক্ষের বিশ্বাস যে, অপর পক্ষের অনুসারীরা মুসলিম নয়। সেটাই হয়েছে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মূল কারণ। ফলে লাখ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে আরো বিভক্তি রয়েছে। সুন্নিদের ইমাম চারজন, শিয়াদের ইমাম ১২ জন। তাদের সবাই যে শিক্ষা দিয়েছে সেসবই ভিন্ন ভিন্ন। এছাড়া

ইসলামে আরো বিভক্তি রয়েছে। যেমন রয়েছে দ্রুজ (Druze), আলাওয়াইট (Alawite) এবং ওয়াহাবী (Wahabi)।

আমাদের ধর্মীয় শিক্ষক বা উলামাগণ এ শিক্ষাও দিয়ে থাকেন, তারা যে শিক্ষা দেন সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। যুক্তি এবং কারণ এখানে ভূমিকা রাখতে পারবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, একই বিষয়ে যখন ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করা হয় এবং তারা নিজেরা দাবী করে যে তারাই সঠিক এবং অন্যরা সব বেঠিক, তখন কোনটাকে আমরা বিশ্বাস করবো। অথচ কোরআন তো একটাই ওহীর কিতাব, দু'টি, তিনটি বা হাজারটি নয়।

কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী, সেই ব্যক্তি একজন মুসলিম যিনি মানেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তার রাসূল (বাণী বাহক)। (এরপর মুসলিম জীবনে কিছু বাধ্যতামূলক ইবাদত আছে। যেমন নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত।) মুসলিম হওয়ার জন্য আর কোনো যোগ্যতা যদি যোগ করা না হয় তাহলে এই মতে যারা বিশ্বাসী তারা সবাই মুসলমান। যেহেতু আমরা মুসলমানেরা আরো যোগ্যতা যোগ করতে চাই যেসব যোগ্যতা প্রায়ই কোরআন বহির্ভূত সূত্র থেকে নেয়া, সেহেতু আমাদের ধর্মের একতা ভেঙ্গে গেছে। তবে সম্ভবত সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ইসলামী আলেম ব্যক্তিরা যারা আধুনিক শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাই মুসলিম সমাজের বেশির ভাগ অংশই আধুনিক বিশ্বের কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে গেছে এবং বাদবাকী বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আমরা এখন একটি বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি যেখানে মানুষ চারিদিকে প্রতিনিয়ত দেখতে পায়, শুনতে পায়, এমনকি মহাশূন্যে কি ঘটছে সেটাও দেখছে এবং প্রাণীদের ক্লোন (Clone) করে অবিকল প্রাণী বানানো হচ্ছে। এসবই মনে হয় কোরআনে আমাদের যে বিশ্বাস তার বিপরীত। এর কারণ হচ্ছে যারা কোরআনের ব্যাখ্যা দেন তারা শুধু ইসলামের আইন ও আচরণ বিষয়ে জানেন, সাধারণত তারা বুঝতে পারেন না বর্তমান যুগের অতি আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা মিরাকলগুলো কোরআনেরই জ্ঞানের অংশ। তাই তারা যেসব ফতোয়া দেন সেসব ফতোয়ায় দেখা যায় অসামঞ্জস্য এবং যাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে তারা সেগুলোকে মেনে নিতে পারেন না।

একজন জ্ঞানী ধর্মীয় ব্যক্তি বিশ্বাস করতে চাননি মানুষ চাঁদে নেমেছে। অন্য ধর্মীয় আলেমরা বলেন, এ পৃথিবী তৈরী হয়েছে দুই হাজার বছর আগে। মহাবিশ্ব সৃষ্টি, বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের জন্মের উৎস এবং এসবের পরিণতি সম্পর্কে এখন যে ব্যাপক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটা উলামারা– যারা শুধু ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত তারা কিছুই জানে না।

বর্তমান মুসলমানদের করুণ অবস্থার জন্য এ ব্যর্থতাই মূলত দায়ী। আজকে

মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চলছে, মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে এবং অপমান করা হচ্ছে, তার কারণ আমরা দুর্বল। আমরা অতীতের মুসলমানদের মতো সবল নই। আমরা বুঝতে পারি আমরা অত্যাচারিত হচ্ছি এবং আমরা নির্যাতনকারীদের সমালোচনা করি। কিন্তু তাদের থামাতে হলে আমাদের নিজেদের দিকে দেখতে হবে। আমাদের মঙ্গলের জন্য অবশ্যই আমাদের তৈরি হতে হবে। আমাদের যারা অত্যাচার করছে তারাতো মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য কিছুই করবে না।

তাহলে আমাদের কী করা দরকার?
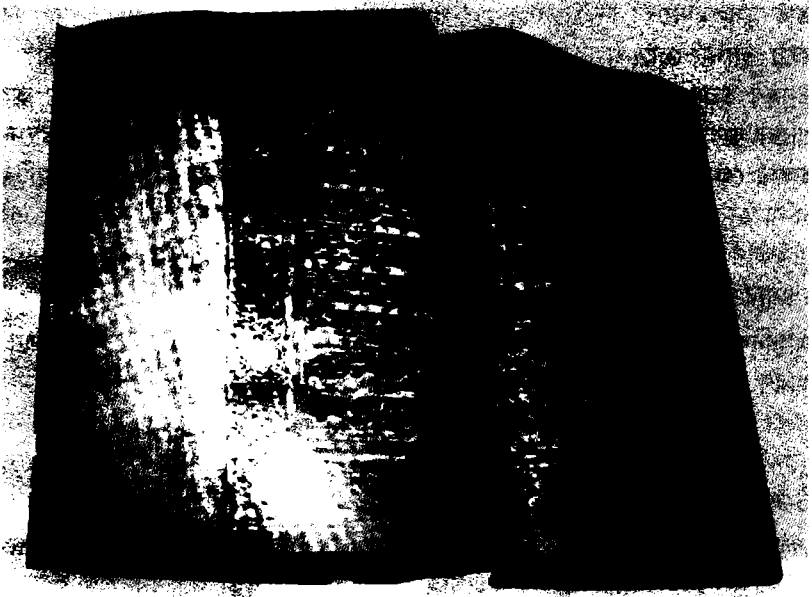
মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় আল কোরআন

অতীতে মুসলমানরা সবল ছিল। কারণ তারা ছিল শিক্ষিত। পবিত্র কোরআনের প্রথম নির্দেশ ছিল 'পড়' কিন্তু এটা বলেনি, কি পড়তে হবে। বস্তুত সেই সময়ে কোনো মুসলিম জ্ঞান ভাণ্ডার ছিল না। সুতরাং পড়া মানে যা কিছু জ্ঞানের ভাণ্ডার তাই পড়া। প্রথমদিকে মুসলমানেরা বিখ্যাত গ্রীক ম্যাথমেটিশিয়ান এবং ফিলোসোপারদের লেখা পড়েন। তারা ইরানী, ইন্ডিয়ান এবং চাইনিজদের লেখাও পড়েন। এর ফলে সাইন্স এবং ম্যাথমেটিক্সে মুসলমানরা ব্যাপক উন্নতি করেছিলেন। জ্ঞান ভাণ্ডারে মুসলিম স্কলারগণ নিজেদের অবদান যোগ করেছিলেন

এবং জ্ঞানের নতুন শাখা প্রশাখা গড়ে তুলেছিলেন। যেমন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল এবং গণিতের বিভিন্ন শাখা। তারা চালু করেন সংখ্যাতত্ত্ব। ফলে জটিল এবং সীমাহীন অঙ্ক সহজে করা সম্ভব হয়।

কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে ইসলামের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারা বৈজ্ঞানিক পড়াশোনা সীমাবদ্ধ করা শুরু করেন। তারা শুধু ধর্ম বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তারা জোরালোভাবে প্রচার করেন, যারা ধর্ম শিক্ষায় মন দেবে শুধু তারাই পরকালে লাভবান হবে। এর ফলে ইসলাম এমন একটি সময়ে বুদ্ধির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে, যখন ইউরোপ অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে এসে সায়েন্টিফিক ও ম্যাথমেটিক্যাল জ্ঞান আহরণ শুরু করে।

তাই মুসলমানদের ইনটেলেকচুয়াল পশ্চাদপসারণের সুযোগে ইউরোপিয়ানরা শুরু করে তাদের রেনেসাঁ বা নবজাগরণ। তাদের প্রয়োজন মেটাতে তারা আবিষ্কার ও উন্নয়ন তরান্বিত করে, যার অন্যতম হচ্ছে অস্ত্র উৎপাদন। শেষ পর্যায়ে এ অস্ত্র শক্তির দ্বারা তারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করে। এর বিপরীতে মুসলমানরা তাদের রক্ষার ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এর কারণ বিজ্ঞান ও ম্যাথমেটিক্স চর্চায় তারা শুধু অবহেলাই করেনি, সেটাকে নাকচও করে দেয়। মুসলমানদের এই দৃষ্টিক্ষীণতা বা মায়োপিয়া (Mayopia)-ই হচ্ছে আজকে তাদের নির্যাতিত হওয়ার আর একটি অন্যতম কারণ।

আধুনিক তুরস্কের স্থপতি মোস্তফা কামালকে এখনো বহু মুসলমান নিন্দা করেন। কারণ তিনি তার দেশকে আধুনিক করতে চেয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে কামাল পাশা ব্যতীত তুরস্ক কি আজ মুসলিম দেশ থাকতো? মোস্তফা কামালের দূরদর্শিতাই তুরস্কে ইসলামকে বাঁচিয়েছে এবং টার্কি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে এখনো টিকে আছে।

কোরআনের মৌলিক ও বিশেষ বাণীগুলো বুঝতে এবং সেসব ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হওয়া মুসলমানদের জন্য শুধু দুর্ভাগ্যই বয়ে এনেছে। পড়া শুধু ধর্ম শিক্ষার মধ্যে সীমিত রেখে এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে অবহেলা করে আমরা ইসলামী সভ্যতাকে ধ্বংস করেছি এবং পৃথিবীতে আমাদের পথ হারিয়ে ফেলেছি। কোরআন বলছে, আল্লাহ আমাদের দুরাবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন না যদি না আমরা নিজেরা পরিবর্তনের চেষ্টা করি। বহু মুসলিম একথাটি এখনো উপেক্ষা করে চলছে। তারা শুধু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন তাদের বাঁচানোর জন্য, আমাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু কোরআন কোনো পরশ পাথর নয় যে সেটা অমঙ্গলের বিরুদ্ধে রক্ষার জন্য গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

আল্লাহ তাদেরই সাহায্য করেন যারা নিজেদের মানসিক অবস্থার উন্নতি করেন। (Allah helps those who improve their minds).

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ পাকের "রহমত"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

In the name of Allah the Most
Beneficent and the Most Merciful.

পরম হিতৈষী পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের নামে শুরু।

এ আয়াতটি আল কোরআনের ১১৩টি সূরার প্রারম্ভে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা নামলের ৩০ নং আয়াতে আরো একবার এটি উল্লেখ আছে। সুমহান আল্লাহ তা'আলার দু'টি সিফাতী নাম (গুণবাচক নাম) পাশাপাশি যুক্ত হয়ে এ আয়াতে এসেছে। একটি হলো 'রহমান' অপরটি 'রহীম'। নাম দু'টির মূল শব্দ 'রহমত', যার সরল অর্থ দয়া, মেহেরবানী, করুণা, স্নেহ-প্রীতি, ভালোবাসা, অনুগ্রহ ইত্যাদি।

কোরআনে আল্লাহ্ পাকের যে সিফাতী নামটি সবচেয়ে বেশি উল্লিখিত হয়েছে তা হলো 'রব' এবং তারপরে 'রহমানুর রহীম'। পরম হিতৈষী আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের কাছে যে গুণটি সবচেয়ে বেশি এবং ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেছেন তা

হলো 'রহমত'। সুতরাং 'রহমত' শব্দটিকে ঘিরে এখন আমাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অগ্রসর হবে।

বিশাল মহাবিশ্বের অসীম অন্তরীক্ষে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের সমাহার ঘটেছে। এসব গ্রহ-নক্ষত্রের রয়েছে মহাকর্ষ শক্তি (Force of gravitation)। এ মহাকর্ষ শক্তির টানে এরা একে অপরের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করে। যদি আসতে পারে তাহলে একে অপরের সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। করুণাময় আল্লাহ্ পাক মহাকর্ষ শক্তির বিরুদ্ধে আর একটি বিপরীত শক্তির সুন্দর ব্যবস্থা সক্রিয় করে রেখেছেন। তা হলো সম্প্রসারণ গতি (Force of expansion)। মহাবিশ্ব সুষম হারে অবিরত সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে গ্রহ-নক্ষত্র তথা গ্যালাক্সিসমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। তাই সংঘর্ষ ঘটতে পারে না। সুতরাং মহাকর্ষ বলের বিপরীতে সম্প্রসারণ গতি হলো আল্লাহ্ পাকের রহমত।

পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস হলো সূর্য। সূর্য একটি জ্বলন্ত নক্ষত্র (Star)। এ নক্ষত্র থেকে অবিরাম বেরিয়ে আসে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বিকিরণ (Electromagnetic radiations), তেজস্ক্রিয় রশ্মি (Radioactive rays), অতি বেগুনী রশ্মি (Ultra-violet rays), এবং এক্স-রে (X-rays)। সূর্যের বাইরের পরিমণ্ডলে উত্থিত সৌরবায়ুর (Solar wind) মধ্যে থাকে আয়ন ও ইলেকট্রন কণা। এরা

প্রতি ঘণ্টায় ১৪,৫০,০০০ কি.মি. বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত হানে। এক ধরনের নিউট্রন তারকা আছে যাদেরকে পালসেটিং স্টার বলা হয়। এ নিউট্রন তারকাগুলোও জীবনঘাতী এক্স-রে উৎপন্ন করে। সুদূর মহাশূন্য থেকে আগত মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays) আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেই বাতাসের কণাকে আঘাত করে। ফলে অসংখ্য নিউট্রন, ইলেকট্রন, প্রোটন, আলফা কণা, মিউমেসন, ফোটন, এক্স-রে ইত্যাদি সৃষ্টি হয়।

বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বিকিরণ, অতিবেগুনী রশ্মি, তেজস্ক্রিয় রশ্মি, এক্স-রে, কসমিক-রে এবং সৌরবায়ুর তীব্রতা প্রমাণ করে যে, এরা পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের জীবন রক্ষার পক্ষে অতিশয় মারাত্মক। তাই এসব মারাত্মক ক্ষতিকর রশ্মি ও অণুকণা থেকে পৃথিবীর বাসিন্দাদের রক্ষা করার জন্য মেহেরবান আল্লাহ বায়ুমণ্ডলে কতগুলো প্রতিরক্ষামূলক স্তর সৃষ্টি করে দিয়েছেন। একটি স্তরের নাম ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere)-এ স্তর অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড চুষে নিয়ে green house effect থেকে পৃথিবীবাসীকে রক্ষা করে।

এর পরের স্তরের নাম স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere) যার মধ্যে রয়েছে ৩০ কি.মি. পুরু ওজন (O_3) স্তর। এ ওজন স্তরই অতি বেগুনী রশ্মি পরিশোষণ করে। আর একটি স্তরের নাম আইনোস্ফিয়ার (Inosphere)। সে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তেজস্কণাকে আয়ন কণায় রূপান্তরিত করে। আর একটি স্তরের নাম মেঘনেটোস্ফিয়ার (Magnetosphere), যা ইলেকট্রন ও প্রোটন কণা আটকে রাখে। পরম হিতৈষী আল্লাহ পাক দয়া করে ফিল্টারিং ব্যবস্থার মতো যদি বায়ুমণ্ডলে এসব স্তর তৈরি করে না দিতেন এবং যদি স্তরগুলোর সাহায্যে মারাত্মক বিকিরণ ও অণু কণাগুলো আটকানোর ব্যবস্থা না করতেন তাহলে সূর্য থেকে নির্গত ক্ষতিকর রশ্মি ও তেজস্কণাগুলো পৃথিবীতে পৌঁছে সবকিছুর ব্যাপক বিনাশ সাধন করতো। জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ এখানে কখনো সম্ভব হতো না।

মাতৃগর্ভে মানব শিশুর ভ্রূণ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে তার জীবন-ইতিহাসের সূচনা ঘটে। গর্ভের যে অংশে ভ্রূণটি বিকাশ লাভ করে তা একটি থলের মতো অঙ্গ যাকে Uterus বলা হয়। পবিত্র কোরআনে এটাকে বলা হয়েছে 'কারারীম মাকীন' বা সুরক্ষিত আধার। কারণ এ অঙ্গটি বিস্ময়কর কৌশলে তৈরি এবং খুবই সুরক্ষিত। এ থলি ভ্রূণকে এমনভাবে রক্ষা করে যাতে বাইরের কোনো আঘাত এবং ক্ষতিকারক জীবাণু তার ক্ষতি সাধন করতে না পারে। এখানে ভ্রূণটি কতগুলো পর্যায় অতিক্রম করে পূর্ণ মানব শিশুতে পরিণত হয়। প্রথমে এটি জোঁক সদৃশ

(Leech-like substance) রক্তপিণ্ডের মতো রূপ ধারণ করে। এরপর মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। এরপর অস্থি বা কঙ্কাল (Skeleton) কাঠামো গড়ে ওঠে। এরপর কঙ্কালের চারিদিকে মাংসপেশী আবৃত হয়। এ রূপান্তরগুলো ঘটে ব্যাপক জটিল ক্রিয়া কর্মের মধ্যে দিয়ে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় আল্লাহ পাকের সর্বোত্তম রহমতের উপস্থিতিতে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দয়াময় আল্লাহ পাক মাতৃস্তনে প্রবাহিত করেন পুষ্টিকর পানীয় দুধ। মাতৃদুগ্ধ পান করে শিশু তর তর করে বেড়ে ওঠে। আর কোনো খাদ্য প্রয়োজন হয় না। কারণ দুধের মধ্যে ৬ প্রকার খাদ্য-উপাদান থাকে। যথা- শর্করা (Carbohydrate), স্নেহ পদার্থ (Protein), চর্বি (Fat), ভিটামিন (Vitamin), খনিজ লবণ (Mineral salt) এবং পানি (Water)।

জন্মলাভ করেই শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনামূল্যে আলো, বাতাস, আদ্রতা, উষ্ণতা লাভ করে যা না হলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়তো। সাধারণত জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বায়ু ও পানি অপরিহার্য। বায়ুতে সুষম হারে মিশে আছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প। এসব বায়বীয় পদার্থ ব্যতীত জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ এক রকম অসম্ভব। পরম হিতৈষী আল্লাহ তা'আলার রহমতের প্রমাণ এখানে খুবই স্পষ্ট।

এরপর আল্লাহ তা'আলার রহমতে দৃষ্টান্ত হলো মানুষের কণ্ঠে কথা বলার শক্তি দান। মানুষের কথা বলার শক্তি না থাকলে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা স্তবির হয়ে যেত। মানুষ কখনো আবিষ্কার করতে পারতো না। একটা বাকশক্তিহীন-বোবা লোকের জীবন যেমন প্রাণহীন আড়ষ্টতায় পর্যবসিত হয়, তেমনিভাবে মানব জাতি পশু-পাখির মতোই বেঁচে থাকতো।

সূরা আর রহমানের শুরুতে আল্লাহ পাক বলেছেন : "পরম হিতৈষী আল্লাহ পাক পরম করুণাময় যিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলার কৌশলগত শিক্ষা দান করেছেন"।

কথা বলার সহায়ক দুটি পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য মহান আল্লাহ মানুষের কণ্ঠে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। একটি হলো Phonation পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে স্বর যন্ত্রের স্বর পর্দার (Vocal-cord) সাহায্যে শব্দ তরঙ্গ ও কম্পন সৃষ্টি হয়। অপরটি Articulation। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ঠোঁট, জিহ্বা, মুখবিবর, মাংসপেশী, তালু প্রভৃতি অঙ্গের সঞ্চারণ দ্বারা শব্দ তৈরী হয় এবং তা ডেলিভারী হয়। প্রয়োজনীয় কথা তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে স্নায়ু তন্তুর মাধ্যমে সংকেত প্রেরিত হয় মস্তিষ্কের একটি কেন্দ্রে, যার নাম 'Speech centre'। উপরন্তু মস্তিষ্কের 'ব্রোকার

জোন' কথা বলার সাথে জড়িত অঙ্গসমূহের নড়াচড়া (Movement) নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

দয়াময় আল্লাহ পাক মানবদেহে প্রতিরক্ষামূলক অসংখ্য কৌশলী গ্রন্থি (Gland) তৈরি করে দিয়েছেন, যা না হলে রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার হতো। চোখের অশ্রু গ্রন্থি (Lacrimal gland) থেকে যে অশ্রু নির্গত হয় তাতে আছে লাইসোজাইম (Lysozyme) যা চোখকে ধুয়ে দেয় এবং ভাইরাসের আক্রমণ থেকে চোখকে রক্ষা করে। লালা গ্রন্থি ও পাকস্থলী থেকে নির্গত হাইড্রোক্লোরিক এসিড খাদ্যের সঙ্গে রোগজীবাণু প্রবেশ করলে তা আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। রক্তের শ্বেত কণিকা (White blood corpuscle) জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করে তাদের মেরে ফেলে। এছাড়া যকৃত, প্লীহা, লসিকা গ্রন্থি, টনসিল, তাইমাস, অস্থিমজ্জা ইত্যাদি গ্রন্থিগুলো জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে।

মানব দেহের অভ্যন্তরে যেসব শাখা অঙ্গ আছে তাদের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের কাজ হলো রক্তকে সংকোচন ও প্রসারণ প্রক্রিয়ায় দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত করা। ফুসফুসের কাজ হলো নিঃশ্বাসের সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করা এবং প্রশ্বাসের সাহায্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করা। এভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে ফুসফুস রক্তকে পরিশোধিত করে। পরিপাক যন্ত্র হজমের কাজ সমাধা করে এবং পুষ্টিকর উপাদানগুলো ধারণ করে। লিভার রাসায়নিক বস্তুকে বিষমুক্ত করে। কিডনীদ্বয় রক্তকে পরিশ্রুত করে। মস্তিষ্ক দেহের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং দেহের সকল আভ্যন্তরীণ অঙ্গ ও গ্রন্থির জটিল কর্মকাণ্ডের উপর আল্লাহ্ পাকের রহমত অত্যন্ত সক্রিয়।

করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর রহমতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন আর একটি অপূর্ব সৃষ্টির মধ্যে, তা হলো পানি (H_2O)। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের জীবন রক্ষার জন্য এবং রাসায়নিক কর্মকাণ্ডের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা কতবেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন তা আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ পাক পানিকে তিনটি রূপ দান করেছেন– কঠিন, তরল ও বায়বীয়। পানিই একমাত্র বস্তু যা $0^{\circ}C$ তাপমাত্রায় জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়। কিন্তু জমাট বরফ পানির চেয়ে হালকা, বরফ যদি পানির চেয়ে হালকা না হতো তাহলে তা পানিতে ডুবে গিয়ে তলায় জমা হতো এবং ক্রমান্বয়ে তা স্তরে স্তরে উপরে ওঠে আসতো। এমন অবস্থা ঘটলে হিমেল আবহাওয়া অঞ্চলে হ্রদ, নদী ও সাগরের পানির নিম্নাঞ্চল জমে কঠিন বরফে পরিণত হতো। ফলে সকল জলজ প্রাণী জমাট বাধা বরফে আটকা পড়ে সমূলে

বিনাশ হয়ে যেত। এটা সুমহান আল্লাহ তা'আলার অসীম করুণার বহিঃপ্রকাশ, যিনি জমাট বাধা বরফকে পানির চেয়ে হালকা করেছেন এবং তাকে পানিতে ভেসে থাকার গুণ দান করেছেন। অপরপক্ষে ১০০°C তাপমাত্রায় পানি বাষ্পে পরিণত হয়। অতি উষ্ণ প্রদেশে জলীয় কণা যখন নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর থেকে বাষ্পাকারে উপরে ওঠে তখন সেটা চারপাশের বায়ুস্তরের চেয়ে হালকা হয়ে যায়। ফলে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়েই উপরের দিকে ওঠতে থাকে এবং মেঘের ঘন আস্তরণ সৃষ্টি করে। করুণাময় আল্লাহ্ পাক জলকণাসহ মেঘমালাকে শুষ্ক এলাকায় প্রবাহিত করেন এবং বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সেই এলাকাকে সিক্ত করেন। এভাবে ভূ-পৃষ্ঠ জীবনী-শক্তি লাভ করে এবং ক্ষেতের ফসল ও উদ্ভিদের জৈবিক বিকাশ তরান্বিত হয়।

করুণাময় আল্লাহ্ পাক মানব জাতি ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য বায়ুমণ্ডল ও মাটি সৃষ্টি করেছেন। জীবন রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী প্রদান করেছেন। জীব ও জড় জগতের সম্প্রসারণ ঘটাবার জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত সৃষ্টির উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর বিশাল সৃষ্টিজগৎ অবলোকন করার জন্য মানুষকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি জ্ঞান দান করেছেন। এভাবে আমাদের চতুর্দিকে আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য রহমত ছড়িয়ে আছে। পরম হিতৈষী আল্লাহ্ পাক পরম করুণাময়।

সৃষ্টিজগৎ অসংখ্য

সূরা ফাতিহা ১ : ১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"All the praises be to Allah, the cherisher and the sustainer of the worlds."

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক ও সংরক্ষক।'

(সূরা ফাতিহা-১ : ১)

এ আয়াতে ব্যবহৃত 'আলামীন' শব্দটি 'আলম' শব্দের বহুবচন। আবার আলম শব্দটি নির্গত হয়েছে 'ইলম' শব্দ থেকে। আরবি ইলম অর্থ জানা বা জ্ঞাত হওয়া। তাহলে আলম এমন একটি জগৎ যার মাধ্যমে অপরাপর জগৎ সম্পর্কে জানা যায়। পৃথিবী নামক অপূর্ব এ গ্রহে মানব জাতিকে অনুসন্ধানকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর অবস্থান সৌরজগতের এক অজানা সাগরে। সৌরজগতের সদস্যবৃন্দ পৃথিবীকে ব্যাপকভাবে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। কেবলমাত্র ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দিতে বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে বিশাল মহাবিশ্বের অসংখ্য সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে যা মহান আল্লাহ পাক সপ্তম শতাব্দিতে আলামীন শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্রথমত আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্ট জগতসমূহকে দু'পর্যায়ে বিবেচনা করতে পারি :

১. অদৃশ্য সৃষ্টিজগৎ (Unseen Worlds)

২. দৃশ্যমান সৃষ্টিজগৎ (Visible Worlds)

অদৃশ্য সৃষ্টিজগৎ : অদৃশ্য সৃষ্টিজগৎ বলতে সেসব জগতকে বুঝায় যা আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি দ্বারা দর্শনীয় নয়। যেমন আমরা এ্যাটম দেখতে পাই না। খুবই ক্ষুদ্র বস্তুকণা দেখা যায় না কেন তা অনুধাবন করতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে দর্শন কথাটার অর্থ কি? ।

আমরা যখন কোনো বস্তুকে দেখি তখন ঐ বস্তু থেকে আলোক তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে এবং তা আমাদের চোখের ভেতরে প্রবেশ করে। আলোক তরঙ্গের বিচ্ছুরণ ব্যতীত কোনো বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না। যদি কোন আলোক তরঙ্গ কোনো বস্তুর উপর পড়ে এবং যদি তা ঐ বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস (Engulfs) করে ফেলে তাহলে আলোক তরঙ্গ ঐ বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত হতে পারে না। কাজেই কোনো বস্তু থেকে আলোক তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে হলে ঐ বস্তুতে পতিত আলোর তরঙ্গ অপেক্ষা বিচ্ছুরিত আলোর তরঙ্গ বড় হতে হবে।

এ্যাটম দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক ছোট। সুতরাং আলোক তরঙ্গ যখন এ্যাটমের উপরে পড়ে তখন তা সম্পূর্ণ এ্যাটমকে ঢেকে ফেলে। সেজন্য এ্যাটম দেখা যায় না। এমনকি দশ লক্ষ এ্যাটম একত্র করলেও না।
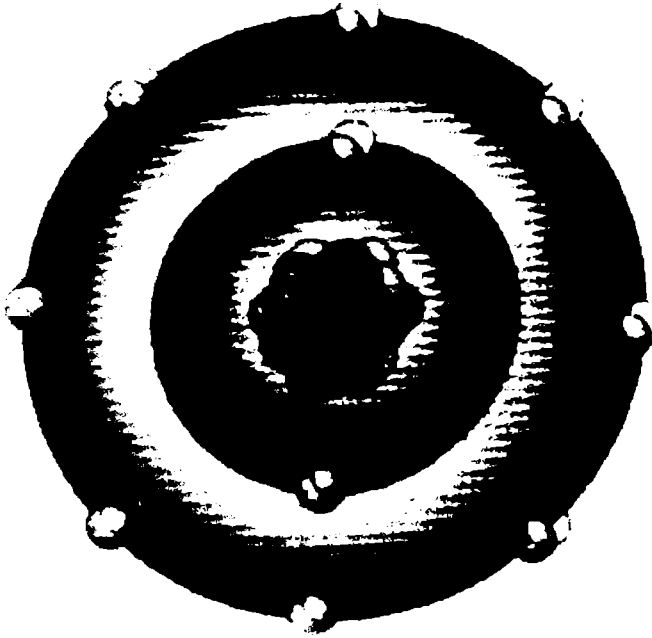
Atomitic Madel.

এরূপ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এ্যাটমকে ভাঙ্গলে পাওয়া যায় ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, নিউক্লী, কোয়ার্ক ইত্যাদি। ১৯৫৭ সালের মধ্যে অনেকগুলো নতুন মৌলিক কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমদিকে সুস্পষ্টভাবে যে ৩৪টি মৌলিক কণিকা চিহ্নিত করা হয়েছিল তা এখন ১০০ এর চেয়ে অধিক সংখ্যায় উন্নিত হয়েছে। উপাদানগত অণু কণাগুলোর অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কোয়ার্ক (Quark) এবং লেপটনের (Lepton) সন্ধান পেয়ে যান। এ কোয়ার্ক ও লেপটনই বিশ্বজগতে বস্তুর গঠন উপাদানের সর্বশেষ গঠন উপাদান হিসেবে বর্তমানে স্বীকৃত। তবে কোয়ার্ক বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে এখনো দেখা সম্ভব হয়নি। পরীক্ষার মাধ্যমে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে যেগুলো কেবলমাত্র তখনই ব্যাখ্যা করা যাবে যখন ধরে নেয়া হবে যে, হেডরন (Hadron) গঠিত হয়েছে আংশিক চার্জপ্রাপ্ত বিভিন্ন কোয়ার্কের সমন্বয়ে।

কোয়ার্ক আবার ছয় ধরনের হয়ে থাকে। আপ-কোয়ার্ক (Up-quark), ডাউন

কোয়ার্ক (Down quark), স্ট্রেঞ্জ-কোয়ার্ক (Strange-quark), চার্মড কোয়ার্ক (chaarmed quark), টপ-কোয়ার্ক (Top-quark) এবং বটম-কোয়ার্ক (Bottom-quark)।

কোয়ার্কের আঙ্গিকে হেডরনীয় (হেডরন হলো জোরালো মিথস্ক্রীয়াশীল কণিকা) বস্তুর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। কোয়ার্ক আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। তাকে কখনো দেখা যায় না। যদি মনে করা হয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তির অভিক্ষেপণ
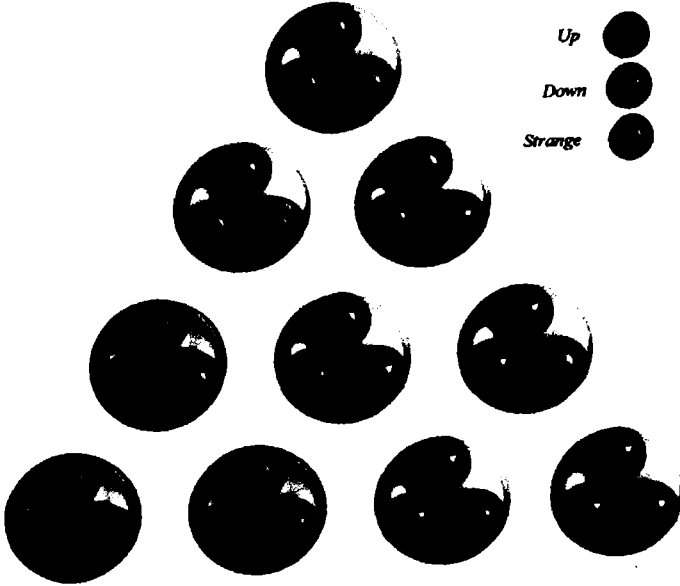
পদার্থের গঠন উপাদান

দ্বারা আঘাত করে হেডরনকে মুক্ত করা গেলে কোয়ার্ক গোচরীভূত হতে পারে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে এ প্রক্রিয়ায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি প্রয়োগ করার ফলে অসংখ্য নিউক্লিয়াসের ধ্বংস ঘটায় এবং পরিণামে কোয়ার্ক প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। তবুও কোয়ার্কের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন। সুতরাং এরূপ অসংখ্য কণিকা অদৃশ্য জগতে বিরাজমান যা স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি দ্বারা দর্শন করা অসাধ্য।

অদৃশ্য জগতে এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককোষী জীবন রয়েছে যেগুলো আমাদের পরিবেশকে ঘিরে রেখেছে, এদের মধ্যে অনেকগুলোর অভাব ঘটলে আমাদের জীবন বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে। কিছু কিছু ক্ষুদ্র জীবকোষ যেমন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি এতই ক্ষুদ্র আকারের যে, শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র

ছাড়া এদের খালি চোখে দেখা যায় না।

অতএব সুমহান আল্লাহ পাকের অদৃশ্য জগতের ব্যাপ্তি এবং ঐ জগতে অবস্থানকারী জীব ও জড়বস্তু সম্পর্কে এখনো অনেক তথ্য অজানা রয়ে গেছে। এ বিষয়ে বেশ কিছু উচ্চ পর্যায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তি গবেষণাকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করে রেখেছেন।
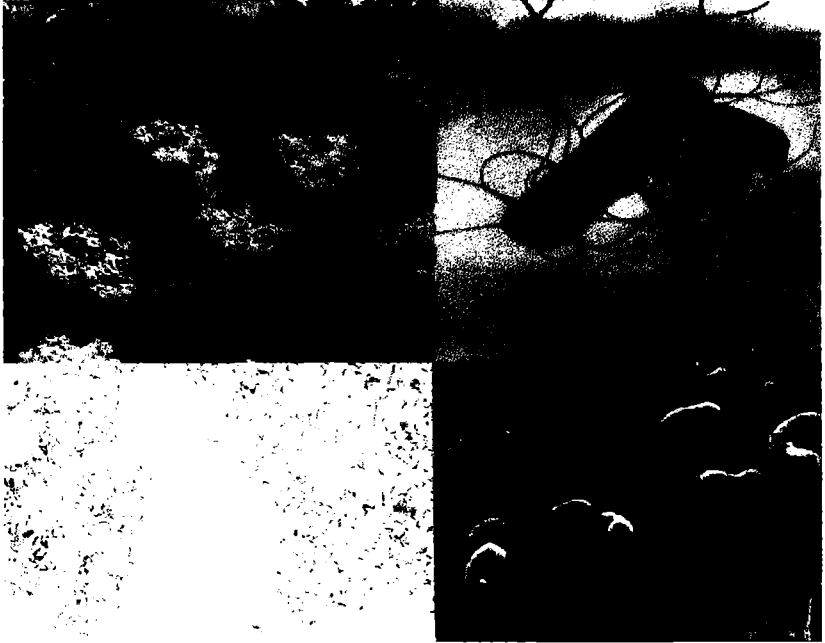
দৃশ্যমান সৃষ্টি জগৎ

দৃশ্যমান জগৎ হলো সেসব জগৎ যা স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে দর্শন করা যায়। যেহেতু বিশাল মহাবিশ্বের আকার কল্পনাতিতভাবে বৃহৎ সেহেতু এর সীমার মধ্যে বহুসংখ্যক জগৎ (আলম) স্থান লাভ করতে পারে। ব্যাপক দূরত্বের কারণে এসব জগৎ আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে হলেও দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও রেডিও সংকেতের মাধ্যমে এ জগতগুলোর ফটোগ্রাফ ও তথ্য পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে জীব ও জড় জগতসমূহ (Living and non-living worlds) তাদের বিস্ময়কর বৈচিত্রসহ মহাজগতের যেকোন এলাকায় অবস্থান করতে পারে। এ জগতগুলো আমাদের পৃথিবীর মতোও হতে পারে কিংবা ভিন্ন ধরনেরও হতে পারে। এসব জগতে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে। আর এ প্রাণীগুলোর জীবন পদ্ধতি অন্যরকমও হতে পারে। দূরত্ব পরিমাপের ভিত্তিতে বিভিন্ন জগতের অবস্থানের প্রেক্ষাপটে পৃথিবী গ্রহটি

আমাদের কাছাকাছি একটি অপূর্ব অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত। এর কারণ হলো আল্লাহর প্রতিনিধি মানুষসহ বহু প্রাণীর জীবন ও পারিপার্শ্বিকতাকে দয়াময় প্রভু বায়ুমণ্ডল, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Earth Gravity) এবং পৃথিবীর গতি প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন। পৃথিবী তার নিজ অক্ষ থেকে সূর্যের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে এবং স্থানীয় সময় মান (Standard time) পাওয়া যাচ্ছে। পৃথিবী পৃষ্ঠে যেসব প্রাণ আছে সেগুলোর উপর প্রভাব ফেলেছে পৃথিবীর অভিকর্ষ শক্তি। পৃথিবীর জল-স্থল-বায়ুর মধ্যকার পারস্পরিক নির্ভরশীল কার্য ব্যবস্থা পৃথিবীপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল প্রাণীর অস্তিত্বের পক্ষে পরিবেশগত ভারসাম্য নির্ধারণ করে চলেছে। এ গ্রহের প্রকৃতি ও আকারের সঙ্গে তুলনা করে মহাজগতের বিশাল বিস্তৃত আকার সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি।

মহাজগতের দৃশ্যমান গঠন-একক হলো গ্যালাক্সি। অসংখ্য নক্ষত্র সমষ্টি, আন্ত-নাক্ষত্রিক গ্যাসপুঞ্জ এবং ধূলিকণার বিপুল সমাবেশে সৃষ্টি হয়েছে গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ। আমাদের গ্যালাক্সির নাম Milky Way বা আকাশ গঙ্গা। আকাশকে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখা যে হালকা আলোক ব্যান্ড রাতের আকাশে দেখা যায় তার নাম ছায়াপথ। ছায়াপথ গঠিত হচ্ছে অসংখ্য নক্ষত্রের বিকিরিত আলোর সমাবেশ থেকে। মহাজগতে প্রধানত তিন আকৃতির গ্যালাক্সি রয়েছে। উপবৃত্তাকার
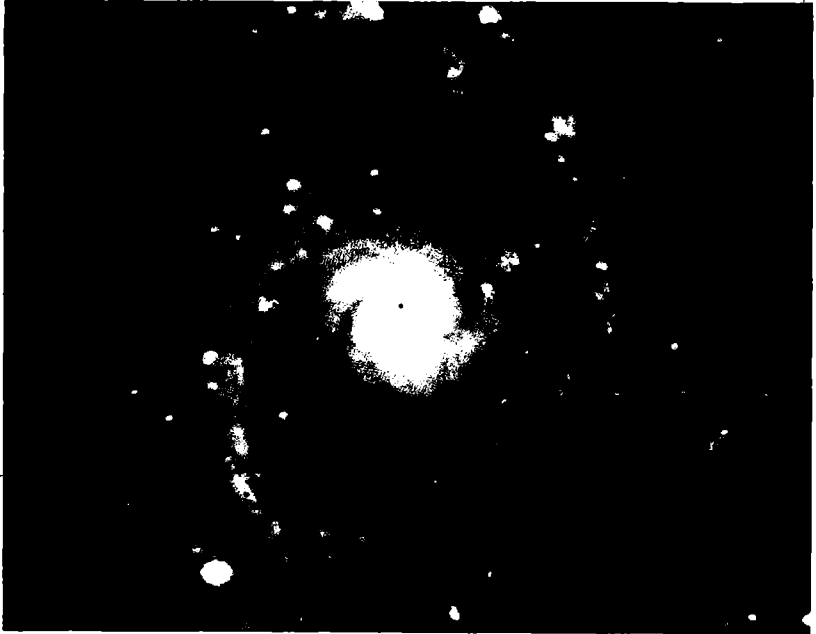
কুণ্ডলায়িত (Spiral) গ্যালাক্সির দৃশ্য

(Elliptical), কুণ্ডলায়িত (Spiral) এবং অনিয়মিত (Irregular)। গ্যালাক্সির বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা আকার আকৃতির তারকাসমূহ। সাধারণত দুই জাতের নাক্ষত্রিক তারকাসমষ্টি (Stellar population) মহাকাশে বিদ্যমান।

এন্ড্রোসিডা নেবুলা

তারকা সমষ্টি - ১ (Population-1)

তারকা সমষ্টি - ২ (Population-2)

তারকা সমষ্টি-১ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নবীনতম ও উজ্জ্বলতম তারকারাজী এবং তৎসহ আন্ত-নাক্ষত্রিক জড়বস্তু যা অতি সমতলীয় বণ্টনে বিন্যস্ত। এ সমতলীয় বণ্টন বিন্যাসকে বলা হয় গ্যালাকটিক চাকতি (Galactic disk)। অন্যদিকে সর্বপ্রাচীন তারকাসমূহ যাদেরকে তারকা সমষ্টি-২ নামে অভিহিত করা হয়, সেসব তারকা গ্যালাক্সির নিউক্লিয়াসের চারপাশে একটি বর্তুলাকার বণ্টন বিন্যাস রচনা করে বা একটি জ্যোতির্বলয় (Halo) সৃষ্টি করে। গ্যালাক্সিসমূহের অপূর্ব বণ্টন বিন্যাস ও তাদের ঘূর্ণন প্রকৃতি থেকে প্রমাণিত হয় আল্লাহ পাকের ক্ষমতা সীমাহীন।

আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির নিকটতম গ্যালাক্সিরা হলো বৃহৎ ও ক্ষুদ্র

ম্যাজেল্লানিক মেঘপুঞ্জ (Megellanic clouds) নামের দুটি ক্ষুদ্র ও অনিয়ত গ্যালাক্সি। যাদের দূরত্ব ৭৫০০০ আলোকবর্ষ। নিকটতম আর একটি উজ্জ্বল গ্যালাক্সির নাম এণ্ড্রোমিডা নেবুলা M31 (Andromeda Nebula M31) যা একই নামে কথিত নক্ষত্রপুঞ্জে খালি চোখে দৃশ্যমান। এটি 2×10^6 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

মহাবিশ্ব জুড়ে অসংখ্য গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ রয়েছে। আমাদের গ্যালাক্সিতে বসবাস করে ১০০ (১০,০০০ কোটি) বিলিয়ন নক্ষত্র। এ গ্যালাক্সিতে আরো রয়েছে গ্যাস, ধূলিকণা এবং সৌরজগৎ। সৌরজগতের কেন্দ্রে আছে সূর্য। সূর্যের চারপাশে আবর্তিত হয় গ্রহ, উপগ্রহ এবং গ্রহাণুপুঞ্জ। উল্কা, নেবুলা এবং কৃষ্ণ বিবর (Black hole) এরাও সৌরপরিবারের সদস্য। যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি তা সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ।

সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য থেকে এটা খুবই স্পষ্ট হয়েছে যে সুমহান আল্লাহ পাকের সৃষ্টিজগৎ (দৃশ্যমান ও অদৃশ্য) সংখ্যায় অসংখ্য ব্যাপক বিস্তৃত এবং অসীম পরিসরে বিন্যস্ত।

'রাব্বুল আলামীন' আয়াতাংশের সাধারণ অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতসমূহের প্রতিপালক ও সংরক্ষক (The Cherisher and the Sustainer)। আরবি 'রব' শব্দের অর্থ হলো সৃষ্টিকে প্রতিপালন করে ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারেন যে সত্তা, তাকে বলা হয় রব। কোরআনের প্রয়োগ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় এ গুণবাচক নামের আরো ব্যাপক বিস্তৃত অর্থ রয়েছে। যেমন, রব নামের অর্থ সৃষ্টির সূচনা করা, সৃষ্টিকে আনুপাতিক হারে গঠন করা, সৃষ্টিকে পূর্ণতা দান করা, পথ বাতলিয়ে দেয়া, পরিমাণ ও পরিণতি নির্ধারণ করা, নিয়ন্ত্রণ করা, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, জীবন-মৃত্যুর সীমা নিধারণ করা, আবেদনকারীর আবেদন মঞ্জুর করা এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হওয়া। এক সঙ্গে এসকল অর্থ 'রব' শব্দের মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। যে সত্তার মধ্যে এক সঙ্গে এতসব কাজ করার ক্ষমতা থাকে তাঁর নাম হলো রব। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা হলো যেখানে ব্যাপক অর্থে রব নামটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

"Glorify the name of your Lord, Most high, Who has created and further given order and proportion, who has ordained laws and granted guidance."

'আপনার রবের নামকে মহিমান্বিত করুন যিনি মহান উচ্চ। যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির যথার্থ অনুপাত ও পরিণতি বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন।' (সূরা আ'লা : ১-৩)

"Then Praise be to Allah, Lord of the heavens and the Sustainer of the earth and the cherisher of the Universe."

'অতএব সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি নভোমণ্ডলের মহান প্রভু, পৃথিবীর সংরক্ষক এবং মহাবিশ্বের প্রতিপালক।' (সূরা জাছিয়া : ৩৬)

আল্লাহ্ পাকের বিশিষ্ট নবী হযরত মূসা (আ)-কে ফেরাউন জিজ্ঞেস করলো, হে মূসা (আ), আপনি এবং আপনার ভাই যে রবের প্রচার শুরু করেছেন তিনি কে? কী তাঁর পরিচয়। তার শক্তি সামর্থ্য কতটুকু। হযরত মূসা (আ) যে তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে মহান আল্লাহ্‌র সমগ্র ক্ষমতার সমাবেশ পরিস্ফুটিত হয়েছে। সংজ্ঞাটি আল্লাহ্ পাক কোরআনে মজিদে উদ্ধৃত করেছেন।

"He said : Our Lord is He Who gave unto everything its form and nature, then guided it aright."

"মূসা (আ) বললেন, আমাদের রব তো তিনি, যিনি প্রত্যেক সৃষ্টিকে সুন্দর সৌষ্ঠব দান করেন। পরে তাকে সঠিক পথ বলে দেন।" (সূরা ত্বোয়াহা : ৫০)

ডঃ মরিস বুকাইলী 'The Origin of Man' গ্রন্থে আরবি 'খালাকা' শব্দের অর্থ করেছেন, খালাকা শব্দের সাধারণ অর্থ To Create। এর আরো যেসব অর্থ হবে তা হলো সম-অনুপাতে তৈরি করা, সৌষ্ঠব দান করা, পরিগঠন করা, সৃষ্টিকে কাঠামো দান করা ইত্যাদি।

জগতসমূহের প্রতিপালন

এ পর্যায়ে আমরা জগতসমূহের প্রতিপালন কৌশল নিয়ে আলোচনা করবো। জগৎ দৃশ্যমান হোক কিংবা অদৃশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। তবে আল্লাহ পাক সেসব জগতের বাসিন্দাদের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের পক্ষে সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। অদৃশ্য ক্ষুদ্র জীব ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি অভিনব কৌশলে নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। কিছু কিছু জীবকোষ খাদ্য সংগ্রহ করে মাটি থেকে, গাছ-পালা থেকে এবং বাকীরা সংগ্রহ করে প্রাণীদেহ থেকে। এরা সকলে খাদ্য মজুদ করে রাখে।

আল্লাহ পাক যে কেবল এ জীবকোষগুলোর জন্য খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করেছেন তা-ই নয়। তিনি এদের মাধ্যমে উচ্চতর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের জীবন রক্ষার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেছেন। এ জীবকোষগুলো মূলত সৈনিকের মতো। আল্লাহ তা'আলা এদের মধ্যে মারামারি করার এবং বংশ বৃদ্ধি করার ক্ষমতা দান করেছেন। এর বংশ বৃদ্ধি যদি অধিক হয় এবং জীবনের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে তাহলে মহান আল্লাহ প্রকৃতির মধ্যে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জীবকোষের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ভারসাম্যহীনতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করার জন্য জৈবিকতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছেন।

এবার দৃশ্যমান জগতের বাসিন্দাদের কথা উল্লেখ করবো। এরা হলো পোকা-মাকড়, পশুপাখি, বৃক্ষরাজি এবং সুবিশাল মানব জাতি। এসকল জীবের প্রতি লক্ষ্য করলে আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে উচ্চতর জীবনের বহুবিধ বৈচিত্র। প্রত্যেক জীবের নিজস্ব খাদ্য, নিজস্ব ভাব-বিনিময় সংকেত, নিজস্ব বাসস্থানের ধরন এবং প্রত্যেকের নিজস্ব জন্মদান পদ্ধতি রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, আল্লাহ পাক কাউকে খাদ্য, বাসস্থান ও নিরাপত্তা কৌশল থেকে বঞ্চিত করেননি। তারা দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য যে জগতেই বাস করুক না কেন তাদের জীবন ধারণের পক্ষে নানাবিধ উপায় উপকরণের সুন্দর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহ পাকই এ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তাই তিনি সবকিছুর প্রতিপালক।

'রাব্বুল আলামীন' আয়াতাংশ দ্বারা যদি আমরা বুঝি যে, আল্লাহ তা'আলা হলেন জীবজগতের প্রতিপালক, তাহলে তো প্রতিপালন তথ্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জগতসমূহের প্রতিপালন তথ্যটি প্রকৃতপক্ষে জীব ও জড়জগতের কথাই বলে। জীবজগতের প্রতিপালন বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু জড়জগতের প্রতিপালন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি রীতিমত বিস্ময়কর ব্যাপার। আল্লাহ পাক জড়জগতের স্থায়িত্বের ব্যবস্থা করেছেন কিছু চিরন্তন বিধি-বিধানের মাধ্যমে। যদি পরমাণুর উপাদানগুলো স্থায়ী বা স্থির না হতো তাহলে সৌর ব্যবস্থাও স্থায়ী হতো

না। বস্তুর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য মহান আল্লাহ চার রকম মৌলিক শক্তির ব্যবস্থা করেছেন, সবল নিউক্লিয়ার শক্তি (Strong Nuclear force), দুর্বল নিউক্লিয়ার শক্তি (Weak nuclear force), বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি (Electromagnetic force) এবং মহাকর্ষীয় শক্তি (Gravitation force)। এসব শক্তি পরমাণুর গঠন উপাদানকে সংরক্ষণ করে থাকে।

বিশাল সৌরজগতের মধ্যে সূর্য ও তার গ্রহগুলো অবস্থান করে। একইভাবে একটি পরমাণুর (Atom) মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সৌরজগৎ (Solar System) বিদ্যমান থাকে। পরমাণুর মধ্যে থাকে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এবং তাদের কেন্দ্র নিউক্লিয়াস। এগুলো সৌরজতের গ্রহসমূহের মতো তাদের নির্দিষ্ট কক্ষে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরে। সৌরজগতের গ্রহ ও উপগ্রহগুলো মহাকর্ষ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে নিজস্ব কক্ষে এবং সূর্যের চারপাশে ঘুরে। পরমাণুর গঠন উপাদান তথা সৌর সদস্যদের ঘূর্ণন ব্যবস্থা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জড়জগতের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন ব্যবস্থারই প্রকাশ।

অতএব এটা খুবই স্পষ্ট যে জড়জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু থেকে শুরু করে বিশাল সৌরজগৎ তথা সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী সর্বোত্তম সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিদ্যমান জীব ও জড়জগতসমূহ আল্লাহ পাকের নির্ধারিত বিধি মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত এবং প্রতিপালিত। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই সর্বোত্তম সংরক্ষক ও প্রতিপালক।

দু'টি বিন্দু একটি মাত্র সরল রেখায় যুক্ত হয়

সূরা ফাতিহা ১ : ৫

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

Guide us to the Straight Way

আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করো। (সূরা ফাতিহা : ৫)

এ আয়াতের মর্মার্থ দাবী করে যে, সরল পথে পরিচালিত করতে পারেন কেবল আল্লাহ পাক। সাধারণত সরল পথ বলতে ঐ ধরনের পথকে বুঝায় যে পথে এতটুকু বক্রতা নেই। একথা সকলেই উপলব্ধি করে থাকেন, সরল পথ ধরে চললে নির্দিষ্ট গন্তব্যে সহজে পৌছানো যায়। বক্র পথে চলতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

জ্যামিতি শাস্ত্রের সব ছাত্র এ নিয়মটি অবগত আছেন যে, পরস্পর দূরত্বে অবস্থিত দু'টি বিন্দুর মধ্যে সরল রেখা টানা যায় কেবল একটি। আর বক্ররেখা আঁকা যায় অসংখ্য। এ বক্ররেখাগুলো কখনো ত্রিভুজাকৃতির কখনো চতুর্ভুজাকৃতির কিংবা কখনো বর্তুলাকৃতির হতে পারে। সবাই একথা ভেবে বিব্রতবোধ করে যে, দুই বিন্দুর মধ্যে বক্ররেখা টানতে থাকলে কোথায় গিয়ে এর সমাপ্তি ঘটবে।

আমরা লক্ষ্য করি, পৃথিবীর বুকে অসংখ্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা কিংবা ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। এসব ধর্মের অনুগামীরা একাধিক স্রষ্টার উপাসনা করে। একাধিক স্রষ্টাকে তুষ্ট করার জন্য একাধিক রীতি-নীতি অনুসরণ করে। এসব রীতি-নীতি বাস্তবতার নিরিখে কিংবা বিজ্ঞানের আলোকে যাছাই না করে অনেকেই অন্ধ অনুকরণ করে থাকে। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী Albert Einstein বলেছেন, (Science Without religion is lame and religion without Science is blind. এ কথা খুবই সত্য যে ধর্মীয় কোন বিধান যদি বৈজ্ঞানিক যুক্তির সামনে না টিকে তাহলে তা গ্রহণ করা কারো পক্ষে সমীচীন নয়। অর্থাৎ ধর্মীয় বিধি-বিধান তখনই মানুষের জন্য কল্যাণকর হয় যখন সেটা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ইসলামই একমাত্র সরল জীবন ব্যবস্থা যার প্রত্যেকটি বিধানের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে। ওজু, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল-হারামের বিধান, পাক-পবিত্রতার বিধান, কথা ও কাজের বিধান, আইনের বিধান, দৈনন্দিন জীবন পদ্ধতিগত বিধান, এভাবে প্রত্যেকটি বিধানের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিজ্ঞানের কোনো না কোনো শাখার সাথে যুক্ত।

ছিরাতুল মুস্তাকীম এর সাধারণ অর্থ সরল পথ। আল্লাহ্ পাক কর্তৃক মানুষের জন্য মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে ছিরাতুল মুস্তাকীম বলা হয়। ছিরাতুল মুস্তাকীমে দু'টি বিন্দুর অবস্থান আছে। একটি বিন্দুতে অবস্থান করে বান্দা, অপর বিন্দুতে মহামহিম আল্লাহ পাক। এ দুই বিন্দুর মধ্যে একটি মাত্র সরল রেখার অস্তিত্ব চিরন্তন। তার নাম ছিরাতুল মুস্তাকীম, অর্থাৎ সরল পথটি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দিকে ধাবিত হয়েছে। ইসলামের অনুসারীরা এক এবং একক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করে থাকেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সর্বদা নিজেদের প্রস্তুত ও চেষ্টানুবর্তী করে রাখেন। এ সন্তুষ্টির পথে কোন প্রকার বক্রতা কিংবা বক্রপথের মিশ্রণ ঘটানো যায় না। যদি তা করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং ঐ মিশ্র প্রক্রিয়া তিনি কখনো গ্রহণ করেন না।

নিম্নে কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা হলো যেগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে সরল এবং বক্রপথের সুন্দর পার্থক্য।

The Code of life before Allah is Islam.

'আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা ইসলাম।' (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

Do they seek other than the *Deen* of Allah? While all creatures in the heavens and on the earth have submitted to His will willingly or unwillingly.

'তারা কি আল্লাহর দ্বীন ব্যতিত অন্য দ্বীন অনুসন্ধান করে? অথচ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ পাকের কাছে আত্মসমর্পণ করছে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়।' (সূরা আলে ইমরান : ৮৩)

And if anyone receives a *Deen* other than Islam, it will never be accepted from him and he will be a loser in the Hereafter.

'যদি কেউ ইসলাম ব্যতিত অন্য দ্বীন গ্রহণ করে তাহলে সেটা তার কাছ থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে হবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরা আলে ইমরান : ৮৫)

আরবি 'দ্বীন' শব্দের অর্থ হলো জীবনব্যবস্থা বা Code of life, মতবাদ, আদর্শনীতি, ইনসাফ, আনুগত্য ইত্যাদি। রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি, জাতীয় চেতনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আইন-কানুন প্রভৃতি বিষয়ে দিক নির্দেশনা সমৃদ্ধ জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম। ইসলাম যুগে যুগে চির আধুনিক প্রগতিশীল জীবনব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। এ জীবনব্যবস্থা পৃথিবীব্যাপি মানব সমাজে চিরকাল প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। ইসলামের মূল লক্ষ্য শান্তি, সন্ধি,

নিরাপত্তা, সহনশীলতা সহমর্মিতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা। দ্বীন-ইসলাম ব্যতিত অন্যসব মতবাদ যেমন, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, অংশীবাদ, খ্রিস্টবাদ, ইয়াহুদীবাদ ইত্যাদি বক্রপথের উদাহরণ। ছিরাতুল মুস্তাকীমের বিপরীত। পবিত্র কোরআনে এসব মতবাদের অনুসারীদের পথভ্রষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেজন্য প্রত্যেক মুসলমান নামাযের মধ্যে প্রতিনিয়ত আল্লাহ পাকের কাছে ছিরাতুল মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত হওয়ার প্রার্থনা করে থাকেন।
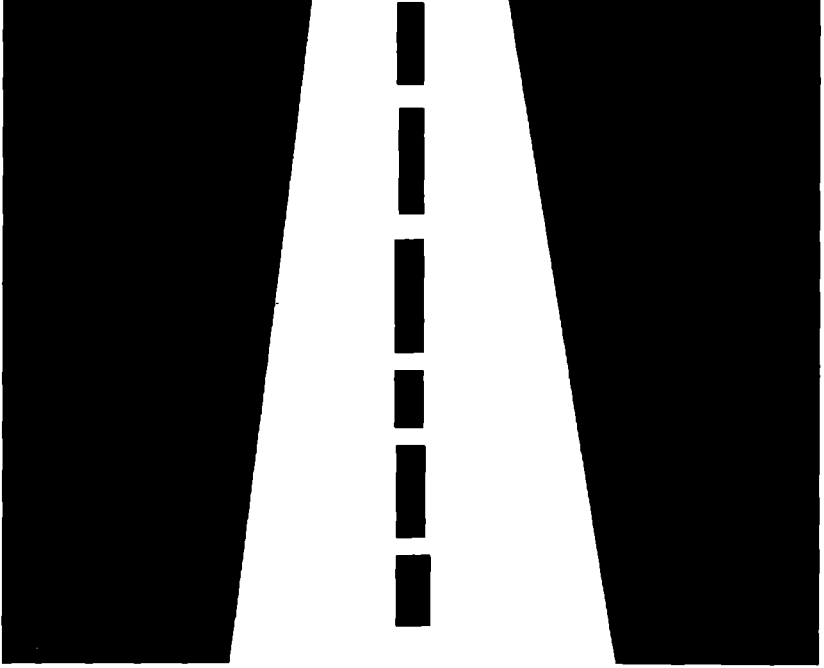
সরল পথ আল্লাহর পথের দিকে ধাবিত হয়।

অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বের প্রমাণ

সূরা বাকারা-২ : ৩

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. (سورة البقرة : ٣)

Who (those who fear Allah) believe in the unseen, are steadfast in salat and spend out of what we have bestowed upon them.

'যারা (আল্লাহকে ভয় করে) অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাযের প্রতি একনিষ্ঠ থাকে। আর আমরা যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।' (সূরা বাকারা : ৩)

অদৃশ্যে বিশ্বাস (Belief in the Unseen) : এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক অদেখা বা অদৃশ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। আরবি **'গায়েব'** শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন সব বস্তু যা মানুষের সাধারণ জ্ঞানের উর্ধ্বে। যা ইন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না। যেমন চক্ষু দ্বারা দেখতে পাওয়া যায় না, কান দ্বারা শুনতে পায় না, নাক দ্বারা ঘ্রাণ নেয়া যায় না। জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা যায় না। হাত দ্বারা স্পর্শ করাও সম্ভব নয়।

এ ধরনের অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করাকে অনেকেই অনুমান প্রসূত ধারণা বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা কি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যুক্তি বহির্ভূত? এটা কি সত্যের বিপরীত কাজ? এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী Albert Einstein বলেছেন, Imagination is more important than knowledge. তখন শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদগণ কিছুক্ষণের জন্য থমকে গিয়েছিলেন, কেন তিনি অনুমানকে জ্ঞানের উর্ধ্বে স্থান দিলেন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান দু'ভাবে আহরণ করা যায়। ব্যাপক পড়াশুনার মাধ্যমে এবং Imagination বা অনুমানের মাধ্যমে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে।

কোয়ান্টাম পদার্থ বিদ্যা ফোটন (Photon) নামের আশ্চর্যজনক অদৃশ্য কণার (Particle) ধারণা নিয়ে আরম্ভ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ফোটন পরীক্ষা করে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তা হলো ফোটন আলোক শক্তির বাহক। ফোটনের প্রতিকণা ফোটন নিজেই। এর কোনো মাত্রা বা চার্জ নেই। এর কোনো গঠন উপাদান দেহদারী বস্তুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর স্থির অংশ জিরো এবং গতিশীল অংশ অনির্ণেয়। বিজ্ঞানের যে শাখা এ ধারণার জন্ম দিয়েছে তাকে মানুষের প্রজ্ঞার বিরাট সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মহাজাগতিক তন্তু (Cosmic String) একটি অনুমান করা বস্তু যা দিয়ে বিশ্বের বৃহৎ পরিসরের গঠনের উৎস ব্যাখ্যা করা যায়। পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার একটি সক্রিয় অংশ হলো এ ধরনের তন্তু সম্বন্ধীয় তত্ত্ব। এটা বিশ্বাস করা হয় যে এ ধরনের তন্তু সংগঠন তৈরি হয়েছে অভিকর্ষ সংকোচনের ফলে যা বস্তুর ঘনত্বের প্রাথমিক ক্ষুদ্র বিক্ষোভের ফলে সৃষ্ট। এরা আবদ্ধ ফাঁস হিসেবে দেখা দেয়। অথবা অনন্তকাল ধরে চলে। এরা অত্যন্ত পাতলা, প্রায় $১০^{-১৫}$ সে.মি. যা প্রোটনের ব্যাসের মতো এবং অত্যন্ত ভারি। এ তন্তুর এক মিটারের ওজন প্রায় $১০^{-২০}$ কি.গ্রা.। সুতরাং মহাজাগতিক তন্তু পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ।

কণা পদার্থ বিজ্ঞানীরা (Particle Physicists) সাব-এ্যাটমিক কণার জগতে অদৃশ্য কণা কোয়ার্ক (Quark) এর ধারণা যুক্তি সঙ্গতভাবে তুলে ধরেছেন। উপাদানগত অণুকণাগুলোর অনুসন্ধান করতে গিয়ে কোয়ার্কের সন্ধান মিলে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন হেডরনীয় (হেডরন হলো জোরালো মিথস্ক্রীয়াশীল পার্টিকল্স, যথা- নিউট্রন, প্রোটন, পায়ন ইত্যাদি) বস্তুর শেষ গঠন উপাদান হলো কোয়ার্ক। কোয়ার্ক আবদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাকে কখনো দেখা যায় না। মনে করা যেতে পারে যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তির অতিক্ষেপণ (Projectile) দ্বারা আঘাত করে হেডরনকে মুক্ত করা গেলে তা গোচরীভূত হতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে এই প্রক্রিয়া অসংখ্য নিউক্লিয়াসের ধ্বংস ঘটায় এবং পরিণামে কোয়ার্ক দেখা সম্ভব হয় না। বস্তুত কোয়ার্ক কখনো দেখা সম্ভব হবে না। তবুও কোয়ার্ক আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। কারণ এ মনে করার পেছনে তথ্য-প্রমাণ বিদ্যমান।

ধোঁয়ার মেঘপুঞ্জ থেকে গ্যালাক্সি সৃষ্টি হচ্ছে।

উল্লিখিত অদৃশ্য কণা এবং তন্তুর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত এবং এসব আলোচনা জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রগতির জন্য বিশ্বাসের ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। আসল সত্য হলো যিনি অদৃশ্য বস্তুর মহান স্রষ্টা তিনি স্বয়ং অদৃশ্যে বিরাজ করেন। আলোচ্য আয়াতে **'গায়েব'** শব্দের মধ্যে এ কথার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের বিষয়টি যেমন স্পর্শকাতর তেমনি গভীর সমস্যা সঙ্কুল। কারণ সাধারণ জ্ঞান দ্বারা এর মর্মার্থ উপলব্ধি করা সহজ নয়। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নয়নের মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব কিছুটা হলেও পাওয়া যায়। যেমন কোয়ার্ক যদি হেডরনীয় বস্তুর গঠন-উপাদান হয় তাহলে হেডরনকে ভাঙ্গলে কেন কোয়ার্কের দেখা মেলে না। কোয়ার্কের এ অদৃশ্য অস্তিত্ব সাধারণ মানুষের যুক্তিকে এভাবে বিভ্রান্ত করে যে X যদি Y দ্বারা গঠিত হয় তাহলে X কে ভাঙ্গলে Y পাওয়া যাবে না কেন। আমাদের সাধারণ জগতে এ যুক্তি-তর্কের অর্থ আছে। কিন্তু সাব-এ্যাটমিক কণার (Sub-Atomic Porticles) জগতে এ যুক্তি-তর্ক অর্থহীন। তাই বস্তু জগতে বিজ্ঞানীরা অদৃশ্য মৌলিক কণার অস্তিত্ব আছে বলে মেনে নিতে প্রস্তুত। এ সময় বস্তু-কণার অদৃশ্য অস্তিত্ব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এ নিয়ে যখন মাথা ঘামায় না তখন কেন আমরা সর্বোত্তম আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব মেনে নেব না। স্রষ্টার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে কি করে সৃষ্টির অস্তিত্ব ভাবা সম্ভব! এ বিষয়ে আমাদের যা জানা প্রয়োজন তাহলো মহান আল্লাহর 'সিফাত'। তাঁর অদৃশ্য সিফাত (গুণ) কোয়ার্কের মধ্যে বিদ্যমান বলে বিশ্বাস করতে হবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নয়ন অত্যন্ত সীমিত। এ জ্ঞান অসীমের সন্ধান দিতে পারে না। তবে এ জ্ঞানের আধিক্য গায়েবের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে।

সুতরাং অদেখা বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে আল্লাহ পাক যা বলেছেন তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। সাধারণ সীমাবদ্ধতার জন্য অদৃশ্য বিষয় যা ইন্দ্রিয় অনুভূতির আওতায় আসে না সেই সম্পর্কে আমাদের ধারণা করা সম্ভব নয়। এখানে যা বলা প্রয়োজন তা হলো দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল সৃষ্টির অস্তিত্বই আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।

নামাযের প্রতি একনিষ্ঠতা (Steadfastness in Salat)

এ আয়াতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামায, আল্লাহ পাককে অনুভব করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা পাওয়ার জন্য সালাত অন্যতম বিধান। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এটা বাধ্যতামূলক ফরয ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা চান মুসলমানদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে রাখতে। তাই দৈনিক পাঁচবার কল্যাণকর নামাযের কর্মসূচী দিয়েছেন। নামাযের বহুবিধ কল্যাণকর দিক ও

বিভাগ রয়েছে। এখানে কেবল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কিত আলোচনা পেশ করা হলো।

মানুষের শারীরিক গঠন শৈলী ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ করার ক্ষমতা আশ্চর্যজনকভাবে জটিল। গোটা মানব দেহ ৩৬০টি জোড়া (Joint) সন্ধিতে সংযুক্ত এবং প্রতিটি জোড়াসন্ধির নিয়মিত নড়াছড়া অপরিহার্য। দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ করার ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য রীতিবদ্ধ (Systematic) শরীর চর্চা মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক বিষয়। স্বাস্থ্য রক্ষার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কার উপলব্ধি করার যায় যে, নিয়মিত শরীর চর্চা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। রোগজীবাণু থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ পাক মানুষের দেহের অভ্যন্তরে কতগুলো কৌশলী গ্রন্থি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যেমন অশ্রুগ্রন্থি, লালা গ্রন্থি, শ্বেত রক্ত কণিকা, যকৃৎ, প্লীহা, টনসিল, তাইমাস, অস্থিমজ্জা প্রভৃতি গ্রন্থি (Gland) জীবাণু প্রতিরোধের কাজে সদা প্রস্তুত থাকে। এসব গ্রন্থির কার্যকারিতা সক্রিয় রাখার জন্য নিয়মিত শরীর চর্চা অপরিহার্য। মুসলিম বিজ্ঞানীরা এ মর্মে তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে মুসলমানেরা যে দৈনিক পাঁচবার নামায আদায় করেন তা এক অসাধারণ বিজ্ঞানভিত্তিক শরীর অনুশীলন প্রক্রিয়া। এর ফলে একটি সক্ষম দেহ বজায় থাকে। সক্ষম দেহ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন দেহের সুষ্ঠ রক্ত সঞ্চালন, অক্সিজেন প্রবাহ এবং বিপাক (Metabolism) সক্রিয়করণ। শরীরের আভ্যন্তরীণ এ তিনটি ক্রিয়া একজন খাঁটি নামাযির মধ্যে প্রায় কার্যকর থাকে।

নামাযের স্তরসমূহ বিশ্লেষণ

কিয়াম : সক্ষম দেহের অধিকারী নামাযিকে অনড় দাড়িয়ে নামায আদায় করতে হয়। এর নাম কিয়াম, কিয়াম অবস্থায় ভূমির উপর পা দু'টি অন্তত চার ইঞ্চি ফাঁক রেখে সমান্তরাল রেখায় রাখতে হয়। এসময় কোরআনের আয়াত পাঠ করা হয় বলেই মস্তিষ্কের Speech Centre ক্রিয়াশীল থাকে। মাথা আকাশের দিকে, চোখ দু'টি সেজদার স্থান বরাবর এবং হৃদয়-মন আল্লাহ্ পাকের দিকে নিবদ্ধ থাকে। কিয়াম অবস্থায় অভিকর্ষ শক্তির টানে বেশিরভাগ রক্ত পায়ের দিকে নেমে যায়। ফলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত ফেরৎ যাওয়া বা Venus Return বিলম্বিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষণিকের জন্য হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায় এবং শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন বিপাক ক্রিয়া দ্রুত ঘটে এবং কোষের ভেতরে অক্সিজেন প্রবাহ ত্বরান্বিত হয়।

রুকু : কিয়াম থেকে সামনের দিকে বাঁকা হয়ে অবনত হওয়ার নাম রুকু। রুকু করার জন্য হাত দু'টি হাঁটু সন্ধির (knee joint) উপর এমনভাবে রাখতে হয় যেন হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়ানো থাকে। পিঠ আর মাথা ভূমির সাথে সমান্তরাল এবং চোখ দু'টি দুই পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলী বরাবর নিবদ্ধ রাখতে হয়। এ অবস্থায় মেরুদণ্ডের ৩৩টি কশেরুকা (Vertebra) প্রভাবিত হয়। এদের মধ্যে ঘাড়ের কাছে ৭টি সার্ভাইকাল (Cervical), বুকের কাছে ১২টি থোরাসিক (Thorasic), কোমরের কাছে ৫টি লাম্বার (Lumbar) ও ৫টি সেক্রাল (Sacral) এবং একেবারে শেষে ৪টি হাড় মিলে একটি ককসিজিয়াল (Coccygeal)। নিয়মিত রুকু করার দরুন এসব হাড়ে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও দেহের ভারসাম্য অটুট থাকে।

সিজদা : দুই পা, দুই হাঁটু, দুই হাত এবং নাক আর কপাল ভূমিতে ঠেকিয়ে সুমহান আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের নাম সিজদা। তখন ভূমির উপর ৭টি অঙ্গ ক্রমান্বয়ে রাখতে হয়। প্রথমে দুই পা, এরপর দুই হাঁটু, এরপর দুই হাত এবং সবশেষে নাক আর কপালসহ মাথা। সিজদাবনত অবস্থায় ভূমিতে দুই হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর সংযুক্ত থাকে এবং দৃষ্টি থাকে নাকের আগার দিকে। এ সময় শরীরের ৩৬০টি জয়েন্ট এবং ২০৬টি হাঁড় সমানে প্রভাবিত হয় এবং মস্তিষ্কের অতি সূক্ষ্ম কৌশিক জালিকায় রক্ত প্রবাহিত হয়। এমনি করে নিয়মিত আল্লাহ্ পাকে সিজদা করার দরুন মস্তিষ্কের সমগ্র অঞ্চলব্যাপি রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে।

বৈঠক : নামায শেষ করার জন্য ডান পা খাড়া রেখে এবং বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসে নির্দিষ্ট দোয়া দরূদ পাঠ করতে হয়। এর নাম শেষ বৈঠক। এমতাবস্থায় ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো পশ্চিম দিকে বক্র অবস্থায় থাকে। হাত দু'টি দুই উরুর উপর সমান্তরাল রেখায় থাকে। দৃষ্টি থাকে কোলের দিকে। এতক্ষণ কিয়াম থেকে সিজদা করা পর্যন্ত দেহের যে অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় হয়েছে, শেষ বৈঠকে তা তৈরি হয়। এ সময় অক্সিজেনের সাহায্যে বেশি গ্লুকোজ দহন করে শক্তি উৎপাদন হয়ে থাকে।

তখন বাড়তি অক্সিজেন যোগানোর জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের হার কিছুটা বেড়ে যায়। রক্তে শ্বাস কণিকা হিমোগ্লোবিন কোষের ভেতর অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যায়। যতক্ষণ অক্সিজেনের সঙ্গে খাদ্য দহন করে শক্তি তৈরীর কাজ চলে ততক্ষণ এ পদ্ধতিকে বলা হয় সবাত শ্বসন (Aerobic respiration)। সবাত শ্বাস নেয়ার সময় গ্লাইকোলাইসিস পদ্ধতিতে গ্লুকোজ ভেঙ্গে পাইরুভিক এসিড তৈরি হয়।

অক্সিজেনের সাহায্যে এ পাইরুবিক এসিড বিপাক পদ্ধতির মাধ্যমে পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে। সেই সঙ্গে তৈরি হয় শক্তি।

সুতরাং এটা খুবই সত্য যে, যারা নিয়মিত নামায আদায় করেন এবং এর প্রতি একনিষ্ঠ থাকেন তারা আল্লাহ্ পাককে সিজদা করতে গিয়ে বিরাট দৈহিক কল্যাণ লাভ করে থাকেন। এটা অনেকেই অনুধাবন করতে পারেন না। তবে নামায আদায় করতে হবে আল্লাহ পাকের আদেশ বিনা শর্তে মেনে নিয়ে তার প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে। যদি কেউ শারীরিক কল্যাণ সাধিত হয় এ নিয়ত নিয়ে নামায আদায় করেন তাহলে তার নামায গ্রহণযোগ্য হবে না। নামায আদায়ের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সিজদা করতে গিয়ে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে যাকে বলা হয় একের ভেতর অনেক।

And establish regular *Salat* and give Glad Tidings To those who beleive.

'আর নামায কায়েম করো এবং তাদেরকে শুভসংবাদ জানিয়ে দাও, যারা বিশ্বাস করে।' (সূরা ইউনুস : ৮৭)

Truly those who beleive and do deeds of righteousness and perform the regular *Salat* and give *Zakat*, they will have their reward with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve.

'সত্যিকারভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কাজ করে, নিয়মিত নামায আদায় করে, যাকাত দেয়, তাদের প্রভুর নিকট আছে তাদের জন্য পুরস্কার আর তাদের জন্য কোনো ভয় নেই কোনো চিন্তাও নেই।' (সূরা বাকারা : ২৭৭)

Verily, those who rehearse the Book of Allah and perform the salat and spend out of what we have provided for them secretly and openly, they hope for a commerce that will never fail.

'যারা আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং সালাত আদায় করে ও আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে খরচ করে, তাহলে তাদের এ বিনিয়োগ কখনো ব্যর্থ হবে না।'

আকাশে জলভরা মেঘ, বিদ্যুৎ চমক-বজ্র নিনাদ

সূরা বাকারা-২ : ১৯

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ.

Or another similitude is that of a rain-laden cloud from the sky, Wherein is darkness, thunder and lightning. They press their fingers in their ears to keep out the stunning thunder-clap for fear of death. But Allah encompasses the disbelievers.

'আর একটি সাদৃশ্য হলো আকাশের পানিভরা মেঘের মতো যার মধ্যে থাকে গাঢ় অন্ধকার, বজ্র এবং বিদ্যুৎ-চমক। প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি থেকে তারা রক্ষা পেতে চায় কানে আঙ্গুল চাপা দিয়ে। তখন তারা মৃত্যুর ভয় করে। কিন্তু আল্লাহ্ এসময় অবিশ্বাসীদের ঘেরাও করে রাখেন।' (সূরা বাকারা : ১৯)

এ আয়াতে পথভ্রষ্ট লোকদের উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের অবহিত করেছেন, যা আধুনিক মৌসমী (Meteorology) বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

১. মেঘের অন্ধকার স্তরসমূহ

২. বিদ্যুৎ-চমক (Lightning)

৩. বজ্র-নিনাদ (Thunder-clap)

১. মেঘের অন্ধকার স্তরসমূহ

মেঘ হলো বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র আকারের পানি। মূলত মেঘ বাতাসে ভাসমান জলীয় বাষ্প জমাট বেধে তৈরি হয়। এর আর এক নাম জলভরা মেঘ। আরও কয়েক ধরনের মেঘ আকাশে দেখা যায়। যেমন– পুঞ্জ মেঘ (Cumulus), স্তর মেঘ (Stratus) ঊর্ণা-মেঘ (Cirrrus)। এসব মেঘের সমষ্টিকে বলা হয় নিম্বাস (Nimbus) অর্থাৎ নিম্বাস মেঘ হলো সব রকম মেঘের সমাহার। যখন স্তর মেঘ প্রচুর জল কণা সঞ্চয় করে অত্যন্ত ঘন হয় তখন ভারি হয়ে সেটা অন্তত ২০০০ মিটার উচ্চতায় নেমে আসে। এ মেঘের উপরের দিকের উচ্চতা প্রায় ৪ থেকে ৫ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দেখলে এ মেঘকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ

দেখায়। এর বুনিয়াদ এলাকা খুবই তিমিরাচ্ছন্ন থাকে। এর কারণ তাদের গভীরতা। সে গভীরতার ব্যাপ্তি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ৪ থেকে ৫ কি.মি.।

আকাশে মেঘের স্তরসমূহে বিদ্যুৎ চমক

"নীল নভ ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাইরে।" কবিতার এ ছন্দ এরূপ মেঘকে উদ্দেশ্যে করে লেখা। যদি আকাশে অন্ধকার নিশ্বাস মেঘ থাকে, আর ঘুমন্ত কাউকে হঠাৎ জাগিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'বলতো এখন ক'টা বাজে?' তখন তার পক্ষে সঠিক সময় বলা কঠিন হবে। এ মেঘ সকাল আর দুপুরকে সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকার করে দেয়। এ বিশেষ ধরনের মেঘের নাম নিম্বোস্ট্র্যাটাস (Nimbostratus)। সুতরাং মেঘের অন্ধকারের বিভিন্ন স্তর আছে বলে আমরা ধরতে পারি। আলোচ্য আয়াতে 'জুলমাত' শব্দ দ্বারা এর ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. বিদ্যুৎ-চমক : জলভরা মেঘের আর একটি দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা হলো বিদ্যুৎ-চমক (Lightning)। উচ্চ শক্তির উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-ক্ষরণ যা কোনো চার্জযুক্ত মেঘ এবং ভূ-পৃষ্ঠের কোনো অবস্থান বিন্দুর মধ্যে দু'টি চার্জযুক্ত মেঘের মধ্যে অথবা একই মেঘের বিপরীত চার্জযুক্ত স্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সাধারণত মেঘের উপরের অংশ পজেটিভ চার্জযুক্ত এবং নিচের অংশ নেগেটিভ চার্জযুক্ত হয়। এ পার্থক্য সৃষ্টি হয় একটি জটিল প্রক্রিয়ায়। যখন মেঘকণা ও বৃষ্টিবিন্দু বায়ুর

তীব্রতায় তাড়িত হয়ে মেঘের বরফ জমা তাপবলয়ে পৌঁছে যায় তখন বৃষ্টিকণা জমে গিয়ে বরফের ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয়। জমে যাওয়ার মুহূর্তে টুকরাগুলো ফেটে গিয়ে বরফের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁচিগুলোকে নিক্ষেপ করে দেয়। এসব বরফ কুঁচি পজেটিভ চার্জ বয়ে নিয়ে যায় এবং রেখে যায় নেগেটিভ চার্জ। পজেটিভ চার্জযুক্ত কণাগুলো বাতাসের তীব্র ঊর্ধ্বটানে মেঘের শীর্ষদেশে গিয়ে পৌঁছে। নেগেটিভ চার্জ নিয়ে ভারি কণাগুলো মেঘের নিম্নদেশে অবস্থান করে এবং মেঘের মধ্যে চার্জ পৃথকীকরণের কাজ সম্পন্ন করে। যখন বৈদ্যুতিক চার্জের গঠন খুব বেশি বড় হয়ে পড়ে তখন মধ্যবর্তী বাতাস তাদের পৃথক করে রাখতে পারে না। তাই একটি বিরাট স্ফুলিঙ্গ ঢেউ পজেটিভ অবস্থান থেকে নেগেটিভ অবস্থানের দিকে ধাবিত হয়।

একটি মেঘের সমগ্র অভ্যন্তর্দেশ জুড়ে এ ধরনের স্ফুলিঙ্গ ঘটতে পারে। কিংবা একটা মেঘের বুক থেকে অন্য একটা মেঘের বুকে লাফিয়ে পড়তে পারে। এসব স্ফুলিঙ্গ থেকে চোখ ধাঁধাঁলো উজ্জ্বল আভা বিচ্ছুরিত হয়।

বজ্র-নিনাদ : জলভরা মেঘের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বজ্রধ্বনি। বিদ্যুৎ চ্যানেলে তড়িৎ-চার্জের বিরাট স্ফীতি অত্যধিক তাপ সৃষ্টি করে বাতাসের মধ্যে হঠাৎ ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটায় এবং আমরা যে বজ্রধ্বনি শুনতে পাই সেই বজ্রধ্বনি প্রেরণ করে শব্দ তরঙ্গ (Sound Wave)। এ শব্দ তরঙ্গ বিস্ফোরণের শব্দের মতো প্রতিধ্বনিময় প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি করে। বজ্রপাতের সময় প্রধান আঘাতের ফলে একটি আয়নিত পথের সৃষ্টি হয় এবং এ আয়নিত পথে প্রধান বিদ্যুৎ-ক্ষরণ ঘটে। এ প্রক্রিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় ৩০,০০০° সেলসিয়াসের মতো উঁচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি হতে পারে। প্রায় ৫০ মিটার ধাপে ধাপে এবং এক ধাপ থেকে পরবর্তী ধাপের মধ্যে প্রায় ৫০ মাইক্রোসেকেণ্ড বিরতিতে ইলেকট্রনের একটা উত্তাল ঢেউ নেমে আসে। প্রধান আঘাত ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছালে সেখান থেকে আধানের ঢেউ আগের পথ ধরে ফিরে আসে। বজ্রপাত প্রক্রিয়ায় গড় বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রায় ১০,০০০ অ্যাম্পিয়ারের মতো হয়। তবে ফিরতি আঘাতে (Return stroke) সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহ ২০,০০০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত উঠতে পারে।

অতএব, জলভরা মেঘের (Rain-lader cloud) তিনটি দৃশ্য অন্ধকার স্তর, বিদ্যুৎ-চমক ও বজ্রধ্বনি এ আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। আধুনিক আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বৃষ্টি ভরা মেঘের বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ ও বজ্রের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে উপরোক্ত তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা করেছেন।

তীব্র আলোর ঝলকে বিচ্যুত হয় দৃষ্টিশক্তি

সূরা বাকারা-২ : ২০

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا اضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

The lightning almost snatches away Their sight, whenever it flashes for them, they walk therein and when darkness covers them, they stand still. And if Allah willed, He could have taken away Their hearing and their sight. Certainly Allah has power over all things.

'বিদ্যুৎ-চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়। এটা যতখানি আলোকিত করে তার মধ্যে দিয়ে তারা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায় তখন থমকে দাঁড়িয়ে যায়, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টি শক্তি দুই-ই ছিনিয়ে নিতে পারেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতাবান।' (সূরা বাকারা : ২০)

এ আয়াতের মর্মার্থ দাবী করে যে, মানুষ আলোর উপস্থিতিতে সবকিছু দেখতে পায়, অন্ধকারে কিছুই দেখে না। কিন্তু আলোর ঝলক তীব্র হলে চোখের আলোগ্রাহী (Photoreceptor) কোষগুলো অসংবেদনশীল হয়ে পড়ে।

এটা সবাই অবগত আছেন যে, মানুষের চোখ আলোর মধ্য দিয়ে দৃষ্টি সঞ্চার করে। অর্থাৎ আলোর প্রতি মানুষের দৃষ্টি খুবই সংবেদনশীল। চোখের আলোক সংবেদীস্তর রেটিনা নামে পরিচিত। রেটিনা আলোক উদ্দীপনাবাহী জটিল সুসংবাদ স্নায়ুকোষ এবং আলোক সংবেদী গ্রাহক কোষ সমন্বয়ে গঠিত। আলোক সংবেদী গ্রাহক কোষ দুই ধরনের– কোন্ (Cones) এবং বড় (Rods)। Cone সাধারণত দিনের আলোতে দেখতে সাহায্য করে এবং রঙ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করে।

আলোর ঝলক তীব্র হলে আলোগ্রাহী কোষগুলো সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলে।

আর Rod রাতের অন্ধকারে এবং ক্ষীণ আলোতে দেখার জন্য অভিযোজিত। কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোক তরঙ্গ (Light waves) এসে cone এবং Rod কোষকে উদ্দীপিত করলে তবেই মানুষ দেখতে পায়। কিন্তু সব ধরনের আলোক তরঙ্গ আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। যেসব তরঙ্গ ধরা পড়ে তাদের বলা হয় দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ (Visible light waves)। যার ব্যাপ্তি 3800A° থেকে 7200A° তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে (1 Angstrom = 10^{-8}cm)। আলোক তরঙ্গ চোখে এসে পড়লে Cone এবং Rod এর যে রাসায়নিক পদার্থ আছে তা আলো শোষণ করে নেয়। Cone-এর রাসায়নিক পদার্থের নাম আয়োডোপসীন

(Iodopsin) এবং Rod এর রাসায়নিক পদার্থের নাম রোডপসীন (Rodopsin)। আলোর ছোঁয়ায় এ রাসায়নিক বস্তু দুইটির মধ্যে ফটোক্যামিকেল বিক্রিয়ার মাধ্যমে আবেগ সৃষ্টি হলে তা স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে (Visual centre)। পৌছে যায়। তখনই মানুষ দেখতে পায়। অন্ধকারে Cone এবং Rod আলো গ্রহণ করতে পারে না বলেই কিছুই দর্শন করা সম্ভব হয় না।

আবার আলোর তীব্রতার প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি শক্তি নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় Cone এবং Rod খুব তীব্র আলোতে অসংবেদী হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ-চমক হঠাৎ জোরালো আলো উৎপন্ন করে ক্ষীপ্রগতিতে ছড়িয়ে দেয়। এ সময় Cone এবং Rod এর দিক থেকে কোনো সাড়া না আসার দরুন মানুষের দৃষ্টি সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

আকাশের বিদ্যুৎ ঝলকের ফলে চলার পথে মানুষের দৃষ্টি শক্তির যে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয় আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক 'ইয়াখতাফ' শব্দ দ্বারা তা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

Who is it has power over hearing and sight?

কে আছে এমন যে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির উপর ক্ষমতা রাখে? (সূরা ইউনুস : ৩১)

শয্যার মতো জমি চাঁদোয়ার মতো আকাশ

সূরা বাকারা-২ : ২২

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

Who has made for you the earth as a bed and the sky as a canopy and sent down rain from the sky and brought forth therewith sustenance for you from Fruits, then do not set up rivals to Allah When you know.

যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে শয্যার মতো করে তৈরি করেছেন। চাঁদোয়ার মতো আকাশ বানিয়েছেন। আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন এবং তা দিয়ে উৎপন্ন ফলমূল থেকে তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। এসব তথ্য জানার পর তোমরা আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিপক্ষ দাঁড় করিও না। (সূরা বাকারা : ২২)

শয্যার মতো ভূ-পৃষ্ঠ

এ বিষয়টি সবার কাছে পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, ভূ-পৃষ্ঠের বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে কে যেন সবুজ শয্যা কিংবা সবুজ গালিচা পেতে রেখেছেন। যেখানে কোমল সবুজ ঘাসের উপর পথ চলতে কতই না ভালো লাগে। ক্লান্ত পথিক বিশ্রামের জন্য সবুজ ঘাসে শুয়ে থাকে। মানুষ পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর চাষাবাদ করে। ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। সড়ক মহাসড়ক তৈরি করে। আরো অনেক কাজ সম্পন্ন করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, ভূ-পৃষ্ঠ বিছানার মতো নমনীয়।

মহাশূন্য থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে পৃথিবী একটি গোলাকার বস্তুর মতো। তাই বিজ্ঞান বলে থাকে পৃথিবী গোলাকার। জ্যামিতি শাস্ত্রের আলোকে এ কথার একটি ব্যাখ্যা দেয়া যায়। যেমন কোনো গোলাকার বস্তু যতো বড় হবে তার উপরিভাগের বক্রতা ততো কম হবে। পৃথিবী একটি বিরাট আকারের গোলক। তবে এটি সুষম গোলক নয়। দুই মেরু অঞ্চল ঈষৎ চাপা এবং বিষুবীয় অঞ্চল ঈষৎ

স্ফীত। বিষুবীয় অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬৩৭৮.১৬০ কি.মি. এবং মেরু অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ৬৩৫৭.৭৭৫ কি.মি.। পৃথিবীর যে অংশের উপর আমরা বাস করি তা আমাদের দৃষ্টিতে শয্যার মতো সমতল মনে হয়। এ অংশের বিস্তৃত বক্রতা সম্পর্কে ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি উপরিভাগে ২ কি.মি. দীর্ঘ দূরত্ব পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে সে কোণটির পরিমাণ অতি সামান্য, এক ডিগ্রীর সত্তরভাগের এক ভাগ।

সুতরাং একটি সমতল ভূমির উপরিভাগকে একটি গোলকের উপরিভাগ হিসেবে ধরে নেয়া যায় যে গোলকের ব্যাসার্ধ অসীমের দিকে যেতে চায়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ গোলাকার পৃথিবীর সমতল ভূমিকে 'ফরাশ' বলা হয়েছে। আল কোরআনের আরও দু'টি আয়াতে একই ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

He Who has made for you The earth like a carpet spread out; has enabled you to go about therein by roads (and by channels).

তিনি আল্লাহ্ যিনি ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানো কার্পেটের মতো করে তৈরি করেছেন; তোমাকে সামর্থ্য দিয়েছেন তার উপর যাতায়াত করার স্থলপথে (কিংবা জলপথে)। (ত্বোয়াহা : ৫৩)

He has made for you the earth like a carpet spread out and has made for you roads therein in order that you may find guidance on the way.

তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবী পৃষ্ঠকে কার্পেটের মতো পেতে রেখেছেন এবং এর উপর তৈরি করে রেখেছেন রাস্তাঘাট যাতে করে তোমরা চলার পথে পথ নির্দেশনা পাও। (সূরা যুখরুফ : ১০)

চাঁদোয়ার মতো আকাশ (The Heavens as a Canopy) :

কোনো স্থানে মাথার উপর চাঁদোয়া বা সামিয়ানা টানানো হলে সে স্থানের সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি বায়ুমণ্ডলীয় ক্ষতিকর অণু কণা ও সূর্যের তেজদীপ্ত রৌদ্র-রশ্মি থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করা যায়। এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মর্মার্থ উপলব্ধি করার জন্য মহানুভব আল্লাহ্ পাক এ আয়াতাংশে ইঙ্গিত করেছেন মহাশূন্য ও সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর রশ্মি ও অণু কণা থেকে তোমাদের রক্ষা করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক কতগুলো বায়ুমণ্ডলীয় স্তর তোমাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে।

বায়ুমণ্ডলকে Sky Acts নামে অভিহিত করা হয়। বায়ুমণ্ডলে বেশ কয়েকটি স্তর

রয়েছে যেগুলো চাঁদোয়াস্বরূপ কাজ করে। প্রথম স্তরের নাম ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere)। রাত্রিবেলা পৃথিবী যে তাপ পুনঃবিকিরণ (Re-radiation) করে সে তাপের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে এ স্তর রোধ করে। এ প্রক্রিয়াকে গ্রীন হাউস ইফেক্ট (Green House effect) বলা হয়। অর্থাৎ ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের তীব্রতা এ স্তর প্রতিরোধ করে।

এরপরের স্তরের নাম স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere)। এখানে রয়েছে ৩০ কি.মি. পুরু ওজন স্তর। সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মি ও এক্স-রে যদি পৃথিবী পৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো তাহলে সমস্ত প্রাণী জগৎ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। ওজন স্তর অতি বেগুনী রশ্মি ও এক্স-রে প্রতিরোধ করে জীবজগতকে রক্ষা করে।

বায়ুমণ্ডলের উপরে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর রয়েছে, যার নাম ম্যাগনেটোস্ফিয়ার (Megnetosphere)। এর কাজ হলো চৌম্বক শক্তির প্রভাব বিস্তার করে সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা। যেমন সূর্য থেকে নির্গত ইলেকট্রন ও প্রোটন এ স্তর বন্দী করে রাখে। এ ম্যাগনেটোস্ফিয়ার ব্যতিত আমাদের পৃথিবীর উপর পতিত পটভূমি বিকিরণ (Background radiation) বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রাণীজগতসহ সবকিছুর ব্যাপক বিনাশ সাধন করতো।

সুতরাং বায়ুমণ্ডলের উপরে যে কয়েকটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হলো তা সূর্য এবং তার বাইরের পরিমণ্ডল থেকে আগত মারাত্মক বিকিরণ ও ক্ষতিকর অণু কণা থেকে পৃথিবীর বাসিন্দাদের রক্ষা করার ফিল্টারিং ব্যবস্থা যা করুণাময় আল্লাহ পাক চাঁদোয়ার মতো করে আমাদের মাথার উপর বিস্তার করে রেখেছেন। এসব কল্যাণকর স্তর মহামহিম আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির প্রতি তাঁর সীমাহীন মহত্ত্বের কথা ঘোষণা করে।

আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন (Send down rain from the Sky) :

আকাশ থেকে যে বৃষ্টি ধারা নামে তা দিয়ে উৎপন্ন হয় ফলমূল, যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে জীবন রক্ষা করে মানব জাতি ও বহুসংখ্যক পশু-পাখি। এটা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, পৃথিবীর বুকে জীবনের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো উদ্ভিদজগৎ। তখন থেকেই সকল উদ্ভিদ তাদের পুষ্টি, বৃদ্ধি, প্রজনন এবং অস্তিত্বের জন্য পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। উদ্ভিদ কোষে পুষ্টিজনিত বিপাক (Metabolism) ক্রিয়া সংগঠিত হয় পানির মাধ্যমে এবং পানির সাহায্যে মাটি থেকে গাছপালা বহুরকম পুষ্টিকর উপাদান চুষে নেয়।

মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য এবং শরীরে পুষ্টিজনিত ঘাটতি পূরণের জন্য শাক-শবজি ও ফলমূলের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। এ আয়াতে আরবি **'ছামারাত'** শব্দ প্রয়োগ করে আল্লাহ্ পাক সেসব খাদ্যদ্রব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ছামারাত বা ফলমূল পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত যে প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে তা কয়েকটি বিস্ময়কর জটিল পর্বের মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হয়। মাটির নিচে পানির যে বিশাল মওজুদ রয়েছে তার সাথে মিলিত হয় বৃষ্টির পানির একটি অংশ। পানির এ অংশ মাটির ছিদ্রপথ ধরে নিচে চলে যায়। বৃক্ষরাজির শিকড়গুলো তাদের নিচের অংশে যেখানে পানি সঞ্চিত থাকে সেখান পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। নিচের পানির সাথে মিশে থাকে সোডিয়াম, আয়রণ, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, সালফার, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি উপাদান। অসমোসিস পদ্ধতির সাহায্যে গাছপালা ঐসব উপাদান ও পানি মূল-রোমের মাধ্যমে চুষে নেয়। এভাবে চুষিত পানি ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ সূক্ষ্ম শিরা উপশিরার জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উদ্ভিদের সকল অংশে সঞ্চালিত হয়,
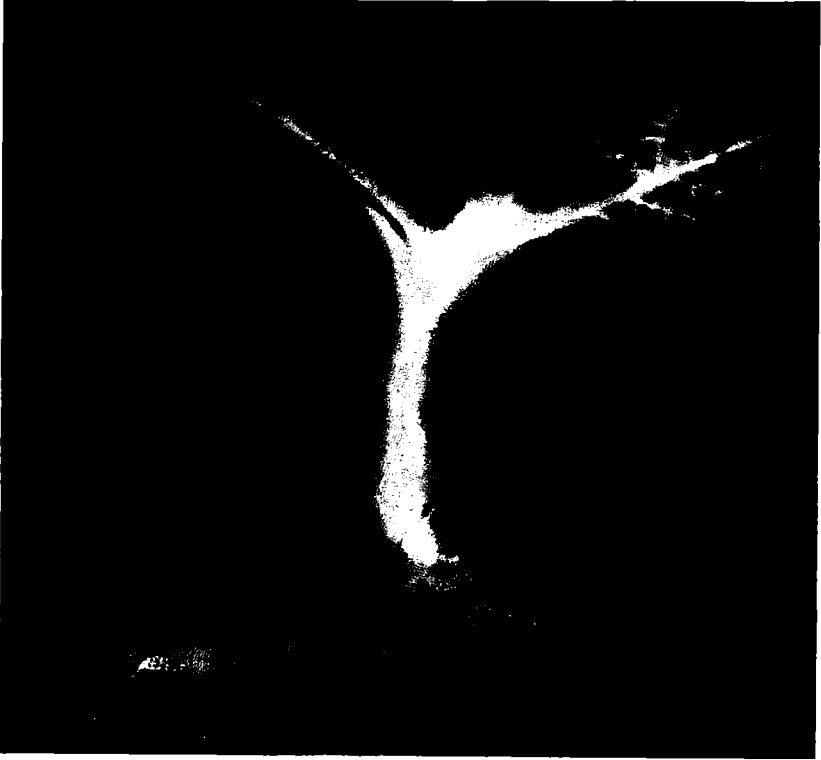
সালোক সংশ্লেষণ এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়া।

মাটি থেকে চুষে নেয়া পানির কিছু অংশ তারা শর্করা (Carbohydrate) উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে। শর্করা উৎপাদনের এ পদ্ধতিকে বলা হয় সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া (Photosyntesis process)। এটি একটি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার জন্য পানির সাথে প্রয়োজন হয় কার্বন ডাই অক্সাইড, আলোক শক্তি বহনকারী ফোটন কণা। উদ্ভিদের সবুজ পাতায় যে ক্লোরোফিল অণু থাকে তা সূর্যের আলো থেকে ফোটন কণা ধারণ করে উত্তেজিত হয়। ফলে একটি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শর্করা প্রস্তুত হয়। এ বিক্রিয়ার ফলে পাতার ছিদ্র পথে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন নির্গত হয়ে বাতাসে মিশে যায়। করুণাময় আল্লাহ পাক গাছপালার মাধ্যমে এভাবে আমাদের জন্য অক্সিজেন প্রস্তুত করেন।

চাষাবাদ (Agronomy) অনুযায়ী ফলের সাধারণ সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে সকল ভোজ্য খাদ্যদ্রব্য, চাল, গম, যব, খেজুর, আম, কাঁঠাল, আপেল, আনারস এমনকি বাদাম, ডাল, সীম, মটরশুটি ইত্যাদি। এসব খাদ্য-দ্রব্য আমাদের জীবন ধারণ ও দৈহিক বৃদ্ধির জন্য একান্ত অপরিহার্য।

সুতরাং আলোচ্য আয়াতে মহামহিম আল্লাহ তা'আলা শয্যার মতো ভূ-মণ্ডল, চাঁদোয়ার মতো নভোমণ্ডল এবং বৃষ্টিপাতের ফলে ফলমূল উৎপাদনের যে তথ্যাবলী আমাদের অবহিত করেছেন তা থেকে এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ পাক সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত রহমশীল এবং সৃষ্টিকে পরিপক্কতা দানে খুবই সুদক্ষ। এরূপ শক্তিধর আল্লাহ পাকের প্রতি অংশী স্থাপন করা কিংবা তাঁর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করা কতই না মূর্খতা।

আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব ও মানুষের জীবন চক্র

সূরা বাকারা-২ : ২৮

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

How can you reject The faith in Allah? Seeing that you were without life and He gave you life, Then will He cause you to die and will again bring you to life and again you will return to Him.

তোমরা কিভাবে আল্লাহ-তে বিশ্বাস বর্জন করবে? ইতোপূর্বে তোমরা জীবনবিহীন ছিলে। আর তিনি তোমাদের জীবন দিয়েছেন। এরপর তিনি-ই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় জীবন দান করবেন। তারপর তোমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (সূরা বাকারা : ২৮)

আল্লাহ-তে বিশ্বাস (Faith in Allah)

এই আয়াতের প্রথম অংশ দাবি করে যে আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব অস্বীকার করার পক্ষে কোনো তথ্য-প্রমাণ কারো হাতে নেই। যদি থাকত তাহলে সেই তথ্য-প্রমাণ এতোদিনে তারা ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেই ছাড়তো।

যুগে যুগে গুটিকয়েক ব্যক্তি এই প্রশ্নটি করেছে যে, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের কোন্ স্থানে আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান? এ প্রশ্নের জবাব যেভাবে দেয়া হোক না কেন তাদেরকে কখনো সন্তুষ্ট করা যাবে না যতক্ষণ না তারা চেষ্টানুবর্তী হয়ে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি লাভ করবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব নিহিত রয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নয়নের মধ্যে মহাবিশ্বের সুষম সম্প্রসারণ একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। Big Bang সংঘটিত হওয়ার পর মহাবিশ্বের বয়স যখন ১ সেকেণ্ড মাত্র তখন এর তাপমাত্রা ছিলো 10^{24o}K এবং ঘনত্ব ছিলো 1gm/cc। যদি ঐ মূহূর্তে সম্প্রসারণ মাত্রা হাজার বিলিয়নের এক ভাগও কম হতো তাহলে সমগ্র মহাজগত কয়েক মিলিয়ন বছরের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতো। আর যদি সম্প্রসারণ গতি প্রান্তিক মাত্রায় বৃহত্তর হতো তাহলে এ মহাবশ্বি এতো বিপুল আকারে বৃদ্ধি পেতো যে সেখানে মহাকর্ষ শক্তি (Force of gravitation) কোনভাবেই কাজ করতে পারতো না।

কোনো মহাসত্তার নিয়ন্ত্রণ ব্যতিত এরূপ সুষম সম্প্রসারণ ও কার্যকর মহাকর্ষ শক্তি আদৌ কি সম্ভব। যেখানে নিউটন তার প্রথম গতি সূত্রে বলেছেন, 'বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল চলমান থাকে।' তাই সম্প্রসারণ তত্ত্বে দেখা যাচ্ছে সম্প্রসারণের মাত্রাকে রোধ করার জন্য এর বিপরীত মহাকর্ষ শক্তিকে কে যেন সুপরিকল্পিতভাবে সক্রিয় করে রেখেছেন।

সৌরজগৎ সম্পর্কে আমরা জেনেছি যে, এর কেন্দ্রে অবস্থান করে সূর্য। সূর্যের চারপাশে সুনির্দিষ্ট সূত্রের ভিত্তিতে গ্রহ-উপগ্রহসমূহ পাক খায়, এ সূত্রগুলো সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী Kepler আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন বলেই এগুলোকে Kepler's law নামে অভিহিত করা হয়।

র ১ম সূত্র হলো, 'গ্রহসমূহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার এবং সূর্য এর উপবৃত্তের দু'টি উপকেন্দ্রের যে কোনো একটিতে অবস্থান করে।'

২য় সূত্র, 'উপবৃত্তের ব্যাসার্ধ সদিক রাশি সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।'

৩য় সূত্র, "গ্রহসমূহের পর্যায়কালের বর্গ সূর্য থেকে তাদের গড় দূরত্বের ঘনফলের সমানুপাতিক।

এ যাবৎ কাল গ্রহ-উপগ্রহগুলো এসব সূত্র ভেঙ্গে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে মর্মে কোনো তথ্য প্রকাশিত হয়নি। পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ আছে আকাশি বস্তুগুলো (Heavenly bodies) নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে আবর্তিত হয়। এটা গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয় যে কোনো প্রজ্ঞাময় সত্তার ব্যবস্থাপনা ব্যতিত গ্রহ-উপগ্রহসমূহ কিভাবে এরূপ নির্ভুল আইন কানুন লাভ করছে?

সোলার সিস্টেম এ্যাটমিক মডেলে (Solar System Alomic model) আমরা দেখেছি, সেখানে সৌরজগতের গ্রহগুলোর মতো নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন ঘুর-পাক খায়। এসব পারমানবিক গঠন উপাদানের উপর চারটি মৌলিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ। খুবই আশ্চর্যজনক। এ শক্তিগুলো হলো, মহাকর্ষ শক্তি (Gravitational force), বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি (Electromagnetic force), সবল নিউক্লিয় শক্তি (Strong nuclear force) এবং দুর্বল নিউক্লিয় শক্তি (Weak nuclear force) সবল নিউক্লিয় শক্তি দু'টি প্রোটনকে এক সঙ্গে আকর্ষণ করে কিন্তু বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি ঐ দু'টি গ্রহ করে না। যদি সবল নিউক্লিয় শক্তি সামান্যতম দুর্বল হতো তাহলে সাব-এ্যাটমিক কণাগুলো (Sub-Atomic

particles) এক সঙ্গে সংযোজিত হয়ে পরমাণু নিউক্লিয় গঠন করতে পারতো না। অপরপক্ষে সবল নিউক্লিয় শক্তি যদি আরো বেশি সবল হতো তাহলে মহাবিশ্বের সকল হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতো। বিশ্বজগতে হাইড্রোজেন আর খুঁজে পাওয়া যেতো না। কিন্তু হাইড্রোজেন আমাদের কাছে দু'ভাবে প্রয়োজন। যেসব রাসায়নিক গঠন উপাদান জীবকোষ গঠন করে তার জন্য হাইড্রোজেন একান্ত অপরিহার্য। সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কিরণ দিয়ে যাচ্ছে তাও এ হাইড্রোজেন জ্বালানির বদৌলতেই।

সুতরাং উপরোক্ত তথ্য-প্রমাণ থেকে এ সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, প্রতিটি সৃষ্টির মূলে যে নির্ভুল অনুপাত ও সঠিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা কোনো এক মহাপরাক্রমশালী সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়। অবশ্যই সেই সত্তা এক আল্লাহ পাক যিনি পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টির মূলে প্রকৃতির নিয়মের বিধানকে যোজনা করেছেন। তাই আমাদের সকলের উচিত এক আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের প্রতি পোষণযোগ্য ঈমান আরো বেশি শক্তিশালী করা।

মানুষ জীবনবিহীন ছিলো (Men were without life) :

Allah's will - Energy - Nucleons + Electrons - Atoms -Molicules + Elements- Physical body + Soul + Qalb + Divine Soul = Man.

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে জন্মের পূর্বে মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না, সেই অস্তিত্ববিহীন অবস্থা থেকে তাকে অস্তিত্ব দান করা হয়। এরপর তার মৃত্যু ঘটানো হবে। অবশেষে আবার তাকে জীবন ফিরিয়ে দেয়া হবে।

এসব তথ্যের মর্মার্থ বুঝার জন্য আমাদেরকে মলিকুলার বাইওলজীর (Molecular Biology) সাহায্য নিতে হবে।

বর্তমান মলিকুলার জীববিজ্ঞানীরা জীবনের উৎপত্তি ও জীবনচক্র সম্পর্কে প্রায় সঠিকভাবে কিছু তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। সেসব তত্ত্ব থেকে জানা যায় মলিকুলার পর্যায়ে খুব জটিল মলিকুলের সমন্বিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবন শুরু হয়। এ জটিল মলিকুলকে বলা হয় DNA (Deoxyribonucleic acid) এবং একটি এনজাইম। DNA হলো মুখ্য বিধান বা Blue Pront for life. এটা প্রতিকৃতি তৈরি বা অপত্য কোষে পরিবৃত্তি বা প্রকারণের উদ্ভব ঘটায়। বংশগতির সকল বৈশিষ্ট্য বহন করার ক্ষমতা এর আছে। আর এনজাইম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। যখন কেউ DNA নিয়ে গভীর গবেষণাকর্মে মনোনিবেশ করে তখন তার কাছে জীবনের উৎস মূল স্পষ্ট হয়ে যায়।
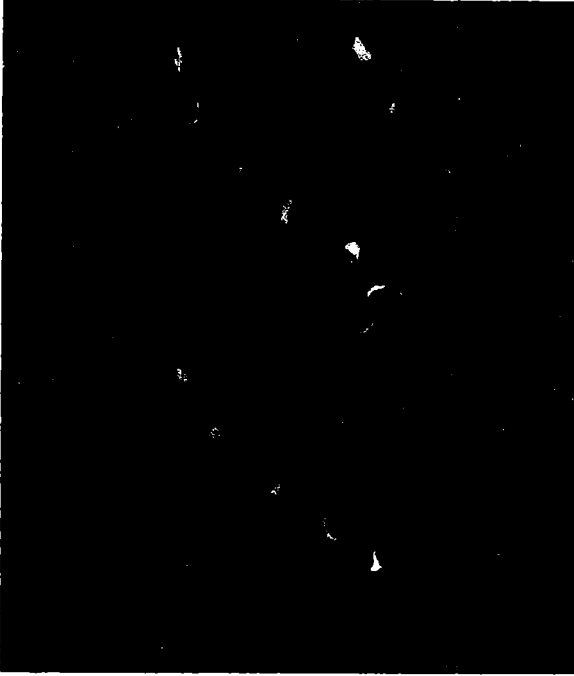
আসল কথা হলো জন্মের পূর্বে মানুষের কোনো দৈহিক অস্তিত্ব ছিলো না। মানুষের প্রাথমিক অস্তিত্ব সূচিত হয় নিষিক্ত ডিম্বকোষে (Fertilized Ovum) যা পিতা মাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত DNA- ধারণ করে রাখে। পিতা মাতার Sperm ও ovum অণু-পরমাণু হলো পুষ্টি। উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগৎ থেকে মানুষ সকল খাদ্য পুষ্টি লাভ করে থাকে। পানি, প্রোটিন, ফেট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন প্রভৃতি খাদ্য উপাদান হলো জৈব ইলিমেন্ট (Organic Element)। এগুলো পৃথিবী ও তার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যেসব মলিকুল ও অজৈব ইলিমেন্ট রয়েছে সেখান থেকে আহরিত হয়। বৃক্ষরাজি প্রাণী জগতের প্রয়োজনে কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, আয়রণ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি অজৈব উপাদানকে যে কৌশলে জৈব পদার্থে রূপান্তরিত করে তা খুবই জটিল পদ্ধতি এবং এতে

দয়াময় আল্লাহ্ পাকের অসীম রহমত প্রতিয়মান হয়। সুতরাং মানব সত্তা গঠনে এ্যাটম ও মলিকুলগুলো অজৈব পদার্থের মতো পৃথিবীময় ছড়িয়ে রয়েছে। উদ্ভিদ যেমন অজৈব উপাদানগুলোকে ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জৈব আকার দান করে তেমনি পিতা মাতা নিয়মিত যে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে সেই খাদ্য দ্রব্য থেকে Sperm ও Ovum নিষিক্ত হলে একটি মানব ভ্রূণ (Human Embryo) সৃষ্টি হয়। ভ্রূণটি মাতৃগর্ভে কতগুলো জটিল রাসায়নিক স্তর অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে রূপ লাভ করে।

এটা উপলব্ধি করা মোটেও কঠিন নয় যে, প্রজননের পূর্বে মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। তবে জীবনবিহীন অণু-পরমাণুগুলো ছিলো। একইভাবে মানুষের যখন মৃত্যু ঘটে তখন তার দেহ মূল উপাদানে ফিরে যায়। অর্থাৎ অণু-পরমাণুতে প্রবর্তিত হয়। যদি তার দেহকে পুড়িয়েও ফেলা হয়, কিংবা টুকরা টুকরা করে কবরে রাখা হয়, অথবা বন্যপ্রাণী, সমুদ্রের মাছ কিংবা বনের বিহঙ্গ তার দেহ খেয়েও ফেলে, মৌলিক অণু কণায় ফিরে যাওয়া বস্তুগুলো পুনরায় ঘুরে ফিরে অন্যান্য প্রাণী ও মানুষের জন্ম দেয়।

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান ও মলিকুলার জীববিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ থেকে এটা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, জীব ও জড়জগতের সকল বস্তুর গঠন উপাদান হলো এ্যাটম ও মলিকুল। কিন্তু একটা জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে এ্যাটম ও মলিকুলের একত্রায়ন কিভাবে জীবন রচনা করে তা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। মানব জীবন কেবলমাত্র কেমিক্যালস্ এর সমষ্টি নয়। একজন মানুষের মধ্যে যতো রকমের এ্যাটম ও মলিকুল রয়েছে সেগুলোকে যদি কেউ এক সাথে ধরে একটি জারের (Jar) মধ্যে রাখে তাতে কখনো প্রাণের সাড়া আসবে না। কোথা থেকে প্রাণের ঝলক আসে তার কোনো জোরালো ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু কোরআন পাঠক মাত্রই জানেন রূহ বা প্রাণের ঝলক আসে সর্বময় আল্লাহ্ পাকের কাছ থেকে। আর মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহ অণু-পরমাণুতে মিশে যাবে। এ অণু-পরমাণু থেকে তাকে আবার সৃষ্টি করে প্রাণ দেয়া হবে। এটা খুবই সত্য।

মানুষের কল্যাণে সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে

সূরা বাকারা-২ : ২৯

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

He it is Who has created for you all things that are on earth. then He turned Himself to the heaven and gave order and perfection To the seven heavens. And He is knower of all things.

তিনি সে সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আকাশ সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দেন এবং সপ্ত আকাশকে পূর্ণতা দান করেন। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা : ২৯)

এ আয়াতের প্রথম অংশে বলা হয়েছে আল্লাহ পাক মানুষের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

এ বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাদেরকে প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

মহাবিশ্বের অসংখ্য জগতের মধ্যে পৃথিবী নামক গ্রহটিকে আল্লাহ পাক মানুষের বাস উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন এবং এর প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর সমস্ত আয়োজন মানুষের কল্যাণে অবারিত করে দিয়েছেন। মানুষকে যদি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে হয় তাহলে সকল জিনিস তার খেদমতে হাজির থাকতে হবে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে মানুষের জীবন ও পারিপার্শ্বিকতাকে আল্লাহ পাক বায়ুমণ্ডল, অভিকর্ষ শক্তি এবং পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন। পৃথিবী তার নিজ অক্ষে অবস্থিত থেকে সূর্যের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে। এর ফলে আদর্শ সময় মান (Standard time) নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রাণী জগৎ, বস্তুজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের উপর প্রভাব ফেলেছে পৃথিবীর অভিকর্ষ শক্তি। এ অভিকর্ষ বল না হলে এ গ্রহে অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠের সবকিছু শূন্যে ভেসে বেড়াতো।

পৃথিবীর বাসিন্দাদের নিরাপত্তার জন্য বায়ুমণ্ডলকে আল্লাহ পাক বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করে রেখেছেন যাতে করে মহাশূন্য থেকে আগত ক্ষতিকর অণু কণা ও কসমিক-রে ঐসব বায়ুমণ্ডলীয় স্তরে আটকে যায়। আল্লাহ পাক মানুষের জন্য বায়ু সৃষ্টি করে

তাতে সুষম হারে মিশিয়ে দিয়েছেন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থ, এসব গ্যাসের এতটুকু অভাব ঘটলে মানব জীবন বিপন্ন হতে বাধ্য।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির জন্য পানি সৃষ্টি করেছেন। পানি ব্যতিত মানুষের জীবন সম্পূর্ণ অচল এ কথা এখন আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। পানির তিনটি রূপ আছে। কঠিন (বরফ), তরল ও বায়বীয়। এরূপগুলোতে পানিকে রূপান্তর করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য দিন-রাত্রি অর্থাৎ আলো-আঁধার সৃষ্টি করেছেন। দিন থাকে সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল। আলোর উপস্থিতিতে মানুষ সবকিছু দেখে। আল্লাহ তা'আলা আলোকে বিভিন্নভাবে গুণান্বিত করেছেন। আলোর কৌশলী ধর্ম হলো এটি খুব সরল রৈখিক পথে চলে। কোনো প্রতিবন্ধক অতিক্রম করার সময় আলো সামান্য ছড়িয়ে পড়ে। এ ব্যাপারটিকে বলা হয় আলোর অপরিবর্তন (Diffraction)। আলোর আর একটি সুপরিচিত ধর্ম হলো প্রতিফলন। আলোর প্রতিফলন অনিয়মিত ও বিক্ষিপ্তভাবে হলে সেই ব্যাপারটিকে বলা হয় আলোর বিক্ষেপণ (Scattering)। বায়ুমণ্ডলে গ্যাস কণাসমূহের দ্বারা আলোর বিক্ষেপণ ঘটার কারণে আকাশের রঙ নীল দেখায়।

আধুনিক তত্ত্ব থেকে জানা যায় আলো দ্বৈত প্রকৃতি প্রদর্শন করে। এর কারণে আলো কখনো তরঙ্গ প্রকৃতি (Wave nature) প্রদর্শন করে আবার কখনো কণা প্রকৃতি (Particle nature) প্রদর্শন করে। আলোর এ ধরনের দ্বৈত প্রকৃতি কিভাবে সহঅবস্থান করে তা উপলব্ধি করা কঠিন ব্যাপার। গতি সম্পন্ন বস্তুসমূহের মধ্যে আলোর গতি সর্বাপেক্ষা জোরালো। এ গতিবেগ অন্য কোনো বস্তু অতিক্রম করতে পারে না। মহামহিম আল্লাহ তা'আলা আলো সৃষ্টি করে একে মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ছাত্ররা এটা জানে যে, গাছে গাছে যখন ফুল ও ফল ধরে তখন একটা নির্দিষ্ট সময়ে তারা আলোক শক্তি গ্রহণ করে। প্রাণী বিজ্ঞানের ছাত্ররা লক্ষ্য করেছেন যে, কিছু পাখি আছে যারা ঠিক দুপুরে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয়। আলোর আভ্যন্তরীণ প্রতিবিশ্ব জলজ প্রাণীদের সাহায্য করে। এ সাহায্য পেয়ে ঐসব প্রাণী দূরের বস্তুকে দেখতে পায়। এর ফলে এরা সাঁতার কাটার সুবিধা লাভ করে। জোনাকিরা যে আলোর বিচ্ছুরণ করে তার দ্বারা তারা জৈবিক সুবিধা প্রাপ্ত হয়। কারণ এ আলো প্রদর্শনের ফলে বিপরীত লিঙ্গের জোনাকিরা পরস্পরকে খুঁজে পায় এবং দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয়। লেসার এক ধরনের তীব্র ও খুব সূক্ষ্ম আলোক রশ্মি যা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক প্রতিকৃতির দর্শনযোগ্য অংশে দেখা যায়। এ রশ্মিকে

শৈল চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। যেমন চোখের ছানি কাটা। এ ছাড়াও এ রশ্মি দ্বারা যে কোনো ধাতুকে সঠিকভাবে কেটে ফেলা যায়, তথ্য যোগাযোগের কাজ সম্পন্ন করা যায় এবং বর্তমান যোগে যুদ্ধের মারণাস্ত্র তৈরী করা হয়। সৌর বিজ্ঞানীরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন কিভাবে সৌরশক্তি দ্বারা উন্মুক্ত স্থানকে উত্তপ্ত করা যায়, কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, কিভাবে হিমায়িত করা যায়, কিভাবে রান্নার কাজ সম্পন্ন করা যায় এবং সূর্যের আলোতে পানি গরম করে শীত প্রধান দেশে সরবরাহ করা যায়।

সূর্যসহ তারকারাজি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আলো দিয়ে যাচ্ছে এবং একটি বিরাট আকারের আলোক শক্তি সর্বত্র প্রেরণ করছে। সূর্য যেহেতু আমাদের পৃথিবীর নিকটতম তারকা, তাই দিনের বেলা এর বিপুল আলো ব্যাপক আকারে প্রতিভাত হয়। দূরবর্তী তারকাদের কাছ থেকে বিচ্ছুরিত আলো রাতের বেলা দৃষ্টিগোচর হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্ধকার রাত সৃষ্টি করে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। অন্ধকারকে সাধারণত কম গুরুত্বের বিষয় বলে মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবন ধারায় এর সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে। পৃথিবী নিজ অক্ষে আবর্তনের ফলে পৃথিবীর সকল অংশে ২৪ ঘণ্টায় দিন রাত সংঘটিত হয়। যদি পৃথিবীর আবর্তন না হতো তাহলে পৃথিবীর একদিক সূর্যের সামনে উন্মুক্ত থাকতো। আর অপর দিকটা থাকতো অন্ধকারে নিমজ্জিত।

অন্ধকারের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায় ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায়। ১২ ঘণ্টা অন্ধকারের পরে ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় বিরতি ঘটে। এ বিরতির ফলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘাটতি পড়ে না। তখন বায়ুমণ্ডলে বাড়তি অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এ বাড়তি অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলের সমতা রক্ষা করে যা আমাদের জীবনের জন্য সহায়ক। রাতের অন্ধকার মানুষকে কর্মবিরতি দান করে। মানুষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য ঘুমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আল্লাহ পাক মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন বিশাল উদ্ভিদ জগৎ। বৃক্ষিরাজি, তৃণ লতা এবং ক্ষেতের ফসল থেকে মানুষ তাদের খাদ্য, পানীয়, আসবাবপত্র ও বস্ত্রাদি লাভ করে। মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে ফলমূল ও খাদ্য শস্যের প্রয়োজন তা উদ্ভিদ জগৎ থেকে আহরিত হয়।

আমাদের চারপাশে যে গাছপালা দেখি তা সোজাভাবে খাড়া হয়ে দণ্ডায়মান থাকে। এ পদ্ধতিটি খুবই জটিল ও সূক্ষ্ম, গাছপালার শিকড়গুলো মাটির গভীরে বিস্তৃতি লাভ করে। সেখান থেকে অসমোসিস (Osmosis) পদ্ধতির সাহায্যে উদ্ভিদ অতি

প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান সূক্ষ্ম শিকড়ের মাধ্যমে আত্মিকরণ (Absorb) করে। যে পদ্ধতিতে উদ্ভিদ শর্করা উৎপাদন করে তা আজ পর্যন্ত কোনো গবেষণাগারে উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি। এ কৌশলী পদ্ধতিকে বলা হয় ফটোসিনথেসিস বা সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং বাতাসে মিশে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান। অক্সিজেন ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। এছাড়াও জ্বালানি দহনসহ অন্যান্য প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন অপরিহার্য উপাদান। জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এ অক্সিজেন বৃক্ষরাজি প্রতিনিয়ত তৈরি করেই চলছে। অধিকন্তু উদ্ভিদ ঘরবাড়ি নির্মাণের কাঠ ও ঘরবাড়ি সাজাবার আসবাবপত্র দান করে থাকে।

আল্লাহ পাক মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন গবাদি পশু। গবাদি পশুর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি। এসব পশুর কাছ থেকে মানুষ যেসব উপকার লাভ করে থাকে আমরা তা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। একভাগ তাদের চামড়া থেকে জাত। অপরভাগ তাদের গোশত ও দুধ থেকে জাত। চামড়া থেকে তৈরি হয় গরম কাপড়, কম্বল প্রভৃতি। গৃহপালিত ভেড়া ও অন্যান্য প্রাণী থেকে পশম সংগ্রহ করা হয়। এ পশম প্রধানত পাকানো সুতা নির্মাণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ পাকানো সুতাকে বলা হয় উল। উল দিয়ে বহুবিধ পশমি পোশাক তৈরী করা হয়। পোশাকগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো পুলওভার, জাম্পার, মোজা, মাফলার, গ্লোবস ও অন্যান্য পশমি সামগ্রী। এছাড়া পশুর চামড়া থেকে তৈরি করা হয় বইয়ের কভার এবং গান বাজনার যন্ত্রপাতি। শীত প্রধান দেশে চামড়ার পোশাক খুবই উপকারী। পশুর গোশত ও দুধ থেকে মানুষ উচ্চমানের পুষ্টি লাভ করে। গরু, ছাগল, ভেড়া ও উটের গোশতের মধ্যে উচ্চগুণ সম্পন্ন প্রোটিন বিদ্যমান। দুধ ও গোশত দিয়ে আরো নানা জাতির খাদ্য তৈরী করা হয় এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়।

গবাদি পশুর মধ্যে ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় তাদের ভার বহন করার ক্ষমতার জন্য। কিছু সংখ্যক ঘোড়া আছে যাদের সৌন্দর্য, সৌম্যতা ও গতিশক্তির বিচারে অসাধারণ। এসব ঘোড়া বিশেষভাবে সৌন্দর্য প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। মানুষ যেসময় পশুদেরকে যানবাহনের কাজে ব্যবহার করেছে সেই সময় থেকেই যাতায়াতের ক্ষেত্রে কিছু যান্ত্রিক যান বিশেষ চিন্তার মাধ্যমে তৈরি করেছে স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথের ভ্রমণের জন্য।

আল্লাহ পাক মাটি সৃষ্টি করে তাতে উর্বরতা দান করেছেন। মাটিতে থাকা ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, সালফার,

আয়রণ ফসল তাদের পুষ্টি সাধনের জন্য গ্রহণ করে। আবার মাটির বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আছে। একেক মাটিতে একেক রকম উদ্ভিদ জন্মায়। এ কারণে ফুল ও ফলের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ্ পাক মাটিকে নমনীয় করে সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ বিভিন্নভাবে উপকার লাভ করতে পারে। মাটির নমনীয়তার কারণে একে খনন করা যায়। চাষাবাদ করা যায়। যথাযথভাবে ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করা যায়। এছাড়া আরও বহুবিদ কাজে মাটির ব্যবহার সর্বাধিক জনপ্রিয়।

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। একথার অন্তর্নিহিত মর্মার্থ এই যে, মাটির মধ্যে যেসব উপাদান থাকে সেসব উপাদান দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ উপাদানগুলোর মধ্যে যেগুলো মৌলিক উপাদান সেগুলো মানব দেহে বিদ্যমান। এসব উপাদান মানুষ খাদ্য থেকে গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং মানুষ মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে এটা মৌলিক তত্ত্ব হিসেবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

উপরের আলোচনায় প্রধান প্রধান সৃষ্টি কর্মের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে যেগুলো মানুষের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাক কর্তৃক সৃষ্ট নেয়ামতের সংখ্যা অগণিত অসংখ্য। এর আলোকে বর্তমান পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এ মর্মে আমাদের তথ্য যোগাচ্ছেন যে, আমাদের চারপাশে যা কিছু বিদ্যমান সেসবই আমাদের উপকারে লাগে এবং সেগুলোর সাথে আমরা একই ধারায় মিলেমিশে বাস করি। অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে সেগুলো সবই মানুষের উপকার সাধনে নিয়োজিত আছে। এমনকি কীট, পতঙ্গ, টিকটিকি, পিঁপড়া, স্তন্যপায়ী ও সাপ প্রভৃতি বহু প্রজাতিকে আমরা অপ্রয়োজনীয় কিংবা অনেকগুলোকে ক্ষতিকর বলে মনে করি। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতির ফলে দেখা যাচ্ছে যে, ঐগুলোর বহু প্রজাতি আমাদের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায় যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তু মানুষের কোনো না কোনো কাজে লাগে। আল্লাহ্ পাক কর্তৃক সৃষ্ট কোনো কিছুই অপ্রয়োজনীয় নয় এমনকি মানুষের কাছে তা লাভজনক। প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও বস্তুজগতের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ প্রত্যেকটি জিনিস থেকে মানুষ পুরোমাত্রায় উপকার লাভ করতে পারবে।

এরপর আল্লাহ পাক নিজেকে আকাশ সৃষ্টির দিকে পরিচালিত করেন এবং সপ্ত আকাশকে পূর্ণতা দান করেন। আয়াতের এ অংশে বলা হয়েছে আকাশ সৃষ্টির দিকে আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

আকাশ বলতে সাধারণত মানুষ মনে করে এটি একটি জমানো ছাদের মতো যার গায়ে এঁটে আছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ এবং নক্ষত্রসমূহ। আবার যখন চন্দ্র আড়াল হয়ে যায়, সূর্য ঢাকা পড়ে যায় এবং নক্ষত্রসমূহ দিগন্তে হারিয়ে যায় তখন অনেক রকম ধারণার অবতারণা করা হয়। সেসব ধারণার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত কোনো যুক্তি নেই। গ্রহ নক্ষত্রগুলো কোনো জমাট বাধা ছাদের গায়ে আটকানো নেই। আকাশ শব্দের অর্থ শূন্য স্পেস, গোলাকার মহাশূন্য যার মধ্যে কোনো সুষম ঘনত্ব নেই এবং গ্রহ, নক্ষত্রগুলো এ অসম ঘনত্বের মধ্যে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রয়েছে। আকাশ সৃষ্টির অর্থ এই দাঁড়ায় যে, একটি সুপরিকল্পিত গোলাকার মহাশূন্য যার সীমা পরিসীমা নির্ণয় করা অসাধ্য এবং এ অসীম পরিসরে স্থান লাভ করেছে অসংখ্য গ্যালাক্সি, কোয়াসার এবং পালসার।

জ্যোতিবিজ্ঞানীরা এ বিরাট স্পেস (Space) যে সাতটি স্বআবেষ্টনীযুক্ত অঞ্চলে ভাগ করেছে। এগুলো নিম্নরূপ :

১ম আকাশ (1st region) : আমাদের সৌরজগতের চারটি গ্রহ বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth) এবং মঙ্গল (Mars) প্রথম বলয়ে স্থান লাভ করেছে। সূর্য থেকে এ অঞ্চলের দূরত্ব ১৩ আলোক মিনিট।

২য় আকাশ (2nd region) : দ্বিতীয় বলয়ে আছে দূরবর্তী গ্রহসহ সৌরজগৎ, বৃহস্পতি (Jupitar), শনি (Saturn), ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। এ বলয়ের ৫ ব্যাসার্ধ আলোক ঘণ্টা।

৩য় আকাশ (3rd region) : তৃতীয় বলয়ে আছে আঞ্চলিক নক্ষত্ররাজি, যথা Alpha centauri, Tau, Ceti, Sirius, Sun, Barnard Star, Procyon, 61 cygni ইত্যাদি। এ বলয়ের ব্যাসার্ধ ২০ আলোকবর্ষ।

৪র্থ আকাশ (4th region) : এ বলয়ে আছে Milky way galaxy বা ছায়াপথ। পূর্বে এটাকে সমগ্র বিশ্বজগৎ বলে ধারণা করা হতো। এখন এরকম অসংখ্য গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের মিল্কী ওয়ে গ্যালাক্সী মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে ১০,০০০ কোটি নক্ষত্র সাথে নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে। এই বলয়ের ব্যাসার্ধ ৫০,০০০ আলোকবর্ষ।
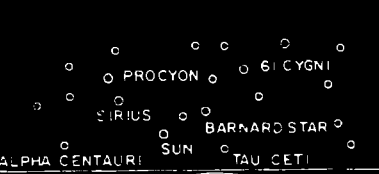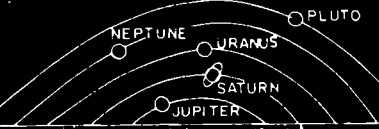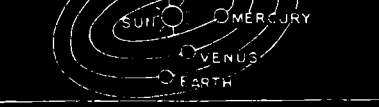
VII UNIVERSE	PHL 957, INDUS, A665, HERCULES, COMA, A2232	20,000,000,000 LIGHT YEARS
VI LOCAL SUPER-CLUSTER OF GALAXIES	SCULPTOR, VIRGO, NGC 5128, URSA MAJOR, M96, NGC 3245	75,000,000 LIGHT YEARS
V LOCAL GROUP OF GALAXIES	ARGO, LEO I, SMALL MAGELLANIC CLOUD, URSA MINOR, LEO II, LARGE MAGELLANIC CLOUD, ANDROMEDA, NGC 205, MILKYWAY	2,000,000 LIGHT YEARS
IV MILKY WAY	MILKY WAY	50,000 LIGHT YEARS
III LOCAL GROUP OF STARS	PROCYON, 61 CYGNI, SIRIUS, BARNARD STAR, SUN, ALPHA CENTAURI, TAU CETI	20 LIGHT YEARS
II SOLAR SYSTEM	PLUTO, NEPTUNE, URANUS, SATURN, JUPITER	5 LIGHT HOURS
MINOR PLANETS		
I INTERIOR PLANETS	MARS, SUN, MERCURY, VENUS, EARTH	13 LIGHT MINUTES

PLATE : SEVEN FIRMANENTS

সপ্ত আকাশের ছবি

৫ম আকাশ (5th region) : আঞ্চলিক গ্যালাক্সিমণ্ডলী এ বলয়ে অবস্থিত। এগুলো হলো ARGO, URSA, MINOR, ANDROMEDA, Leo-1, Leo-11, Small Magellanic Clouds, Large Megellanic Clouds, Milky-way, এ আকাশের ব্যাসার্ধ প্রায় ২ মিলিয়ন (২০,০০,০০০) আলোকবর্ষ।

৬ষ্ঠ আকাশ (6th region) : এখানে অবস্থান নিয়েছে আঞ্চলিক সুপার গ্যালাক্সি গুচ্ছ। এগুলো হলো- Sculptor, NGC 5128, M96, VIRGO, URSAMINOR, NGC 3245 ইত্যাদি। এগুলো মহাশূন্যের সবচেয়ে বিশাল-বৃহৎ আকাশিবস্তু। এসব আকাশিবস্তুর মধ্যকার আকার তুলনামূলকভাবে বিশাল। এ বলয়ের ব্যাসার্ধ ৭৫ মিলিয়ন (750,00,000) আলোকবর্ষ।

৭ম আকাশ (7th region) : আদি অন্তহীন বিশাল মহাবিশ্ব। যার সীমা পরিসীমা কারো জানা নেই। এ বলয়ে আছে সুপার গ্যালাক্সিগুচ্ছ। আর আছে কোয়াসার। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে কোয়াসার এক অভিনব আকাশিবস্তু (Heavenly bodies)। এরা রহস্যময় আবেগদীপ্ত জ্যোতিষ্ক। কোয়াসার দেখতে তারা মতো মনে হয়। অথচ তারা নয়। এগুলো সবদিকে সমভাবে প্রশস্ত এবং তাদের প্রশস্ততার পরিমাণ ২০ বিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরত্বের সমান কিংবা তার চেয়েও অধিক।

সুতরাং সপ্ত আকাশের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা থেকে এ সত্য প্রতীয়মান হয় যে, 'Almighty Allah and Allah alone knows the boundary of the Universe.' আমাদের কাছে এটি অসীম। কারণ আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি খুবই সীমিত। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নয়ন থেকেও এ অসীমতা নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা বিজ্ঞান অসীমের সন্ধান দিতে পারে না।

নিম্নে আরো কয়েকটি আয়াতাংশ উদ্ধৃত করা হলো যেখানে আল্লাহ পাক সপ্ত আকাশের তথ্য পেশ করেছেন।

Allah is he Who created Senen Firmaments and of the earth a similar number.

তিনি সেই মহান সত্তা যিনি সপ্ত আকাশ ও সমসংখ্যক পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। [সূরা তালাক : ১২]

He who Created Seven Firmaments one abnove another; No want of proportion will you see in the Creation of Rahman (the most merciful). So turn your vision again; do you see any thow?

তিনি সেই সত্তা যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। দয়াময় আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নৈপুণ্যতায় তোমরা কোথাও অসামঞ্জস্যতা দেখবে না। তোমরা আর

একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখো। তাঁর সৃষ্টি কর্মে কোথাও কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কী? (সূরা মুলক : ৩)

See you not How Allah has created the seven skies one above another.

তোমরা কি দেখো না কিভাবে আল্লাহ্ পাক সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। (সূরা নূহ : ১৫)

Say : Who is the Lord of Seven heavens and Lord of the *Arsh-E-Azeem*?

বলুন, সপ্ত আকাশ এবং মহান আরশের মালিক কে? (সূরা মু'মিনুন : ৮৬)

মহাবিশ্বের সৃষ্টি নৈপুণ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে আল কোরআনে 'সাবআ' সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়েছে মোট ২৪ বার, যার কারণে সৃষ্টি নৈপুণ্যতায় বিস্ময়কর মাত্রা যোগ হয়েছে। আমরা জেনেছি মহাকাশ সাতটি বলয়ে বিভক্ত। বায়ুমণ্ডলে রয়েছে সাত স্তর যা সূরা মু'মিনুনের ১৭ নং আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পৃথিবীও সাত স্তরে বিভক্ত। সূর্যের আলোতে আছে সাত প্রকারের রঙ যাদের এক সাথে VIBGYOR বলা হয়। আবার মহাবিশ্বে সাত ধরনের আকাশিবস্তু বিদ্যমান। এগুলো হলো (১) তারা (Star), (২) গ্রহ (Planet), (৩) উপগ্রহ (Satellite), (৪) ধূমকেতু (Comet), (৫) নীহারিকা (Nebula), (৬) ছায়াপথ (Galaxy), (৭) কোয়াসার (Quasar)

এছাড়া সাত ধরনের নক্ষত্র আছে। যথা- (১) Brown dwanf Stars (২) Main Sequence Stars (৩) Red giant stars (৪) Pulsating stars (৫) White dwarf stars (৬) Neutron Stars (৭) Black holes ইত্যাদি।

ডঃ মরিস বুকাইলী সপ্ত আকাশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন ৭ সংখ্যাটি শুধু সাত আকাশ বুঝাতে ব্যবহার করা হয়নি। বরং বহু সাত বিশিষ্ট সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করে আরবিতে **"সাবআ"** সংখ্যাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এটা চিন্তা করার বিষয় যে, সম্ভবত মহাজগতে আমাদের পৃথিবীর মতো বহু পৃথিবী আছে, ঐসব পৃথিবীর উপর সপ্ত আকাশ আছে। সাত স্তর বিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল আছে। সাত ধরনের নক্ষত্র আছে। সাত রং সমৃদ্ধ আলোকিত সূর্য আছে। 'আলামীন' শব্দ দ্বারা যেমন বহুজগতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তেমনি ঐসব জগতে সাত সংখ্যা বিশিষ্ট সৃষ্টি কর্ম থাকতে পারে এটাই স্বাভাবিক। তাই আয়াতের উপসংহারে বলা হয়েছে আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ এবং অসীম জ্ঞানের অধিকারী। এরূপ প্রজ্ঞাময় কৌশলী মহামহিম আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই আমাদের জন্য কল্যাণকর।

মান্না ও সালওয়া পুষ্টিকর খাদ্য

সূরা বাকারা-২ : ৫৭

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

We caused the white clouds to overshadow you and sent down on you *Manna* and *Salwa* (quails), (Saying) : Eat of the good things We have provided for you. Tous they did no harm but the harmed their ownselves.

আমরা তোমাদের উপর শুভ্র-মেঘের ছায়াদান করেছি এবং *মান্না* ও *সালওয়া* পাঠিয়েছি। আমরা যে উত্তম খাদ্য-দ্রব্য তোমাদের জন্য সরবরাহ্ করছি তা থেকে ভক্ষণ করো। তারা আমাদের কোন ক্ষতি করেনি। বরং নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে। (সূরা বাকারা : ৫৭)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক সেই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যখন বনি ইসরাঈলীরা মিশর থেকে বিতারিত হয়ে হযরত মূসা (আ)-এর তত্ত্বাবধানে অনুর্বর মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি দুটি বিশেষ অনুগ্রহের উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন যেন তারা তাঁর প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। একটি হলো উত্তপ্ত মরুভূমিতে শুভ্র-মেঘের ছায়াদান। অপরটি পুষ্টিকর মান্না ও সালওয়া খাদ্যবস্তু প্রেরণ।

শুভ্র মেঘের ছায়া : উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে সূর্যের কিরণ প্রত্যক্ষভাবে বালুকণার উপর পড়ে। এর ফলে বালুকণা হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তপ্ত বালুকণা পরবর্তীতে তাপ বিকিরণ করে সংশ্লিষ্ট বাতাসকে উষ্ণ করে তোলে এবং এ উষ্ণ বাতাস উপরের দিকে ওঠে যায়। যখন কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ আদ্র বায়ু উত্তপ্ত হয়ে উপরের দিকে ওঠে তখন তা আয়তনে বৃদ্ধি পায়। (কারণ উপরে বায়ুর চাপ কম) এবং শীতল হয়, খুব বেশি শীতল হলে ঐ বায়ু সম্পৃক্ত হয় এবং জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়, তাই মেঘের ছায়া বরাবর নিচের বালিময় এলাকা তাপ হারিয়ে শীতল হয়ে যায়। তখন মেঘে ঢাকা মরুপ্রাণের আর যন্ত্রণা বোধ হয় না।

সুতরাং শুভ্র মেঘের ছায়া মরুবাসীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ বলা যায়। এ বিশেষ অনুগ্রহের কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়েছে উষ্ণ মরুপ্রান্তরে ভ্রাম্যমান বনী ইসরাঈলীদের প্রতি।

মানা : আবদুল্লাহ ইউসূফ আলী উল্লেখ করেছেন, মান্না এটি হিব্রু শব্দ যা হিব্রু ভাষার মানহু শব্দ থেকে গৃহিত হয়েছে। অথবা আরবি 'মানহুয়া' থেকে। মান হুয়া অর্থ What is this ? এটা কী? বনী ইসরাঈলীরা যখন অনুর্বর মরুভূমিতে খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল তখন করুণাময় আল্লাহ পাক তাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া নামের দুই প্রকার খাদ্য বস্তু সরবরাহ করেছিলেন। তারা এ খাদ্য বস্তু দু'টি অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ মাটির উপর দেখে হয়তো আশ্চর্য হয়ে আরবিতে "মান্না" এ প্রশ্নবোধক শব্দটি উচ্চারণ করেছিল। পবিত্র কোরআনের ভাষ্যকারগণ বলেছেন ঐ সময়ে সিনাই উপদ্বীপে প্রচুর পরিমাণ মান্না উৎপন্ন হয়েছিল এবং অত্যধিক পুষ্টিকর সমৃদ্ধ মান্না ব্যতিক্রমধর্মী একটি উদ্ভিদ গ্রপের নাম যাকে বলা হয় লাইকেন (Lichens), প্রতিটি লাইকেন গঠিত হয় একটি শৈবাল ও একটি ছত্রাক প্রজাতির একত্রে মিথোজীবিতা (Symbiosis) পদ্ধতিতে বৃদ্ধির ফলে। একে তাই দ্বৈত উদ্ভিদ সত্তা (dual organism) বলা হয় এবং তাদের এ দ্বৈত সত্তা খুবই অদ্ভুত ধরনের। শৈবাল-ছত্রাক যৌথভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ও আকৃতির অঙ্গ তৈরী করে মিলে মিশে সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে।

লাইকেনের আবাসিক অবস্থান ও বিস্তৃতির ধরন অত্যন্ত বৈচিত্রপূর্ণ। এরা পাথর ইটের দেয়াল, বৃক্ষের কাণ্ড, ডাল, পাতা, পাহাড়-পর্বত, মাটি ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুর উপর ধূসর বর্ণের শাখা প্রশাখা বিস্তার করে বেড়ে ওঠে। তবে এরা সরাসরি পানিতে জন্মায় না। কিছু প্রজাতি ভেজা স্যাঁত-সেতে স্থানে জন্মাতে পারে। উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার বহু অঞ্চলে, পাহাড় ও অনুর্বর মরুভূমির বিশাল এলাকা জুড়ে এগুলো উৎপন্ন হয়। রহস্যজনকভাবে ঐগুলো যখন বাতাসের তোড়ে উড়ে এসে হাহাকার মরুভূমিতে পড়ে তখন মরুভূমির যাযাবর গোষ্ঠী খুব বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে প্রকাশ করে 'এগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলমীনের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিশেষ রিযিক ব্যবস্থা।' ১৮৫৮ সনে ইরানে যখন দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তখন ঐ লাইকেন সেদেশে বৃষ্টির মতো বর্ষিত হয়েছিল। এর ফলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষেরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে মহান আল্লাহর প্রতি অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছিলেন। বর্তমানে ইরানের মরুভূমি অঞ্চলে এবং কিরগিজি স্থানের তৃণভূমি এলাকায়, মিশরে, আলজেরিয়া, মরক্কো এবং এ্যাটলাস পর্বতের ঢালু এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির লাইকেন উৎপন্ন হতে দেখা যায়। মান্না জাতীয় লাইকেন এখন আর সিনাই উপদ্বীপে পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু হযরত মূসা (আ)-এর আমলে ঐ উপদ্বীপে বিদ্যমান ছিলো যা সেই সময়ে বিতাড়িত বনী ইরাঈলীদের জন্য আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের নির্দশন বলেই প্রতীয়মান হয়।

সালওয়া : সালওয়া আরবি শব্দ। এ শব্দ দ্বারা কোয়েল (Quail) পাখিকে বুঝানো হয়। কোয়েল একটি পরিযায়ি পাখি (Migratory birds)। এটি ফায়েস্যান্ট

(Phaesant)। পারট্রিজ (Partridge) ও টার্কী (Turkey) পাখির গোত্রভুক্ত। এ পাখিরা একটি প্রজাতির নাম Coturnis vulgaris। এ প্রজাতির পাখি হাজার হাজার মাইল একটানা ভ্রমণ করতে পারে এবং এদের এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সর্বত্র দেখা যায়।

এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মাইগ্রেটরী পাখিরা দীর্ঘ উড়ন যাত্রায় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। সম্প্রতি তাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তাই তাদের নাম দেয়া হয়েছে গণিতবিদ পাখি (Mathematician birds)। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে স্বদেশ ত্যাগী পাখিরা হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করার সময় তাদের গন্তব্যস্থল খুঁজে পাবার জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে তার মধ্যে একটি হলো ভূতলস্থ দৃশ্যমান প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন, পর্বতমালা, উপকূলের অবস্থান ও আকৃতি, নদ-নদীর অবস্থান ও গতিপথ ইত্যাদির সাহায্য নেয়া।

অনেক পরিযায়ি পাখি দিক নির্ণয়ের জন্য সূর্যকে ব্যবহার করে। কিন্তু দিনটা যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে তারা দিক নির্ণয় কিভাবে করে। একজন পথিক যেমন দিক নির্ণয়ের জন্য যাত্রাপথে কম্পাস ব্যবহার করে। পরিযায়ি পাখিরাও কি যাত্রাপথে তেমন কিছু ব্যবহার করে! হ্যাঁ এটা প্রমাণিত হয়েছে যে পরিযায়ি পাখিদের মধ্যে কবুতর, কোয়েল অথবা পান পায়রা (Arctic turn) প্রভৃতি পাখিদের মাথার খুলির ভেতরে একটা ছোট্ট চৌম্বক দানা (Pod of magnetic grain) আছে। সেজন্য এরা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে নিজেদের সারিবদ্ধদভাবে সাজিয়ে উড়ে চলে যা দিক নির্ণেয়ক কম্পাসের কাজ করে। আবার রাতে ভ্রমণের সময় এরা আকাশের তারকারাজির মাধ্যমে দিক নির্ণয় করে। বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান দেখে কোনো নির্দিষ্ট তারাকে অনুসরণ করে এরা পরিভ্রমণ করে থাকে।

আরো একটি উপায় আছে তা হলো মাইগ্রেটরী পাখিরা সূর্যালোকের মেরুকরণ (Polarisation Pattern) প্রবণতা উপলব্ধি করতে পারে। সূর্যরশ্মি বায়ুস্তর ভেদ করার সময় ক্ষুদ্র বায়ু কণার মধ্য দিয়ে আলোক তরঙ্গকে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করে। সূর্যাস্তের সময় আকাশের দিকে তাকালে আলোর মেরুকরণ প্রবণতার ব্যাপারটি আমরা চিহ্নিত করতে পারি। কিছু কিছু মাইগ্রেটরী পাখি আলোর মেরু প্রবণতাকে আকাশে একটা বড় কম্পাস হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু যে কোনো নাবিক বলতে পারে যে, একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার জন্য যা জানা প্রয়োজন তা হলো উত্তর দিক কোন্টা জেনে নেয়া। এ ক্ষেত্রে মানুষের দরকার হয় ইলিমেন্টারী ত্রিকোণমিতি (Elementary Trigonometry) এবং উচ্চতর ত্রিকোণমিতির মাধ্যমে একটা ম্যাপ অঙ্কন করা। পাখিরা কি মানুষের মতো ত্রিকোণমিতি সমাধান করতে পারে? নিঃসন্দেহে না। তবে পাখিদের পরিমাণ

কৌশলকে যখন গণিতের ভাষায় রূপান্তর করা হয় তখনই কেবল হাজার হাজার মাইল ভ্রমণকারী পরিযায়ি পাখিদের গাণিতিক কার্যকলাপ আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়।

প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ পাক এরূপ পরিযায়ি পাখি সালওয়া, অসহায় বনী ইসরাঈলীদের কাছে অনুগ্রহপূর্বক পাঠিয়েছিলেন। পুষ্টিকর সালওয়ার গোশতের মান্নার অনুরূপ কার্বোহাইড্রেট থাকায় এর গোশত সুষম খাদ্য তৈরী করতে পারে। কঠিন মরুপ্রান্তরে খাদ্য সংকটের সময় বনী ইসরাঈলীদের নিকট আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দেন মান্না ও সালওয়া পবিত্র খাদ্যদ্বয় গ্রহণ করার জন্য। স্বাভাবিকভাবে তাদের উচিত ছিলো সুমহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে সেজদাবনত হয়ে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অথচ তারা তার বিপরীত প্রকাশ করেছে। এভাবে আল্লাহ্র করুণা লাভ করার পর যারা সারাজীবন তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের অবস্থান সেই ইসরাঈলীদের মতো হয়ে থাকে যাদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন লাঞ্ছনা, অপমান ও অপদস্ত করে পৃথিবীর বুকে যাযাবরের জীবন দান করেছেন।

আল কোরআনের আরো দু'টি আয়াতে মান্না ও সালওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো।

We shaded them with the clouds and sent down to them *Manna* and *Salwa*. (Saying), 'Eat of the good things which we have provided you'. The harmed us not but they used to harm them selves.

আমরা তাদেরকে মেঘমালা দিয়ে ছায়াদান করেছিলাম এবং তাদের কাছে *মান্না* ও *সালওয়া* পাঠিয়েছিলাম। (বলেছি), 'এসব পবিত্র খাদ্যবস্তু তোমরা আহার করো'। তারা আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি বরং নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেছে। (সূরা আরাফ : ১৬০)

O Children of Israel! We delivered you from your enemy and we made a covenant with you on the Holy mountain (Sinai)'s Side and sent down on you the *Manna* and *Salwa*.

হে ইসরাঈলের সন্তানেরা! আমরা তোমাদের শত্রুর কবল থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেছি এবং পবিত্র পর্বতের পাদদেশে চুক্তিনামা করেছি আর তোমাদের জন্য প্রেরণ করেছি *মান্না* ও *সালওয়া*। (সূরা ত্বোয়াহা : ৮০)

বনী ইসরাঈলীদের অকৃতজ্ঞতা : অন্যান্য সবজির পুষ্টিমান

সূরা বাকারা-২ : ৬১

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ.

And (remember) When you said : 'O Musa! we cannot endure one kind of food. So invoke your Lord for us to bring forth for us of what the earth grows, its Pot-herbs and cucumbers, its wheat, garlic, lentiles and onions.' He Said : 'Will you exchange the better for the worse? Go you down to any town and you shall find what you want!' They were covered with humiliation and misery; They drew on themselves the wrath of Allah.

আর স্মরণ করো যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা তো একই রকম খাদ্য খেয়ে আর থাকতে পারবো না। তাই আপনার প্রভুর নিকট আমাদের পক্ষে মিনতি পেশ করুন ভূ-পৃষ্ঠের যেসব খাদ্য জন্মে যেমন, সুগন্ধী সবজি, শশা, গম, মসুর ও পিয়াজ– সেগুলো দেয়ার জন্য।' প্রতিউত্তরে তিনি (মূসা আ.) বললেন, তোমরা কী উত্তম খাদ্যের বিনিময়ে নিম্নমানের খাদ্য চাও? তাহলে যে কোনো শহরে চলে যাও। তোমরা যা কামনা করছো সেখানে তা পাবে। আর তাদের উপর আরোপিত হলো লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে লাগল। (সূরা বাকারা : ৬১)

মান্না ও সালওয়া দুইটি সুষমভাবে একত্রিত হলে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া যায়। এ মিশ্রিত খাদ্যবস্তু সহজে হজম হয়ে প্রোটিন, ভিটামিন এবং অতি প্রয়োজনীয় এ্যামিনো এসিডের চাহিদা মিটায়। তাই অত্যধিক পুষ্টিমান সমৃদ্ধ মান্না ও সালওয়া আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে পাঠিয়েছিলেন বিতাড়িত বনী ইসরাঈলীদের প্রতি। তারা এ খাদ্যবস্তু দুইটির প্রতি সন্তুষ্ট না থেকে কিংবা আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে ঐসব খাদ্যদ্রব্য (শাক-সবজি, গম, ডাল, পিঁয়াজ দাবি করল যেগুলো পুষ্টির দিক থেকে মান্না ও সালওয়ার স্থান দখল করতে পারে না। আয়াতে বলা হয়েছে, 'Will you exchange the better for the worse?'

আলোচ্য আয়াতে উদ্ভিদ গোত্রভুক্ত পাঁচ প্রকার খাদ্য বৃক্ষের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এসব খাদ্যবৃক্ষ সেই সময়ে মিশরে বিদ্যমান ছিলো যখন হযরত মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলীরা মিশর ত্যাগ করেছিল। খাদ্য বস্তুগুলোর পুষ্টিমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলো যাতে করে মান্না ও সালওয়ার পুষ্টিমূলের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

সুগন্ধি সবজি (Pot-herbs) : ইউসুফ আলী আরবি **'বাক্‌লুন'** শব্দের অনুবাদ করেছে 'Pot-herb' শব্দ দ্বারা। যার অর্থ- খাদ্যাদি সুগন্ধ ও সুস্বাদু করাণার্থ সুগন্ধি লতাপাতা। যেমন, ধনেপাতা, পিয়াজ ও রসুনের সবুজপাতা ইত্যাদি। এ শব্দ দ্বারা ব্যাপক অর্থে শাক-সবজি জাতীয় খাদ্যকেও বুঝানো হয়। যেগুলো রান্না করে তৃপ্তি সহকারে আহার করা যায়। যেমন, বাঁধাকপি, শালগম, সরিষা, লাল শাক ও পালং শাক। এসব সবজির পাতা রসালু ও সুস্বাদু। ধনেপাতা কিংবা অন্য কোনো সুগন্ধিযুক্ত লতাপাতা উল্লিখিত শাক-সবজির সাথে মিশ্রিত করা হলে সেসবের স্বাদ আরো বেশি বৃদ্ধি পায়। বিতাড়িত বনী ইসরাঈলীরা হয়তোবা এ ধরনের খাদ্যসামগ্রীর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু এ জাতীয় সবজির পুষ্টিমান কখনো মান্নার সমকক্ষ হবে না।

শশা (Cucumbers) : আরবি শব্দ **'কিস্‌সাআ'** অর্থ শশা। শশা গ্রীষ্মকালীন এক বর্ষজীবি Cucumis sativus সবজি এবং উদ্ভিদবর্গ ক্যামপেনিওলেলিস (Campanulales) এর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর প্রায় সবদেশে শশা জন্মায়। এমনকি শীত প্রধান দেশে কাচ ঘরের নিয়ন্ত্রণ তাপ ও আদ্রতায় এর চাষ করা হয়। মিশরে শশার চাষ শুরু হয়েছিল দ্বাদশ রাজবংশের আমলে। এর খাদ্যমান প্রধানত শর্করা ও ভিটামিনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এতে পানির পরিমাণ ৯৫%, প্রোটিন ০৭%, চর্বি ০.১% শর্করা ৩.৪% এবং চিলকা ০.৪%। কচি অবস্থায় শশাকে সালাদ হিসেবে এবং রান্না করে তরকারী হিসেবে খাওয়া হয়। এটি বাংলাদেশের একটি প্রধান সবজি।

রসুন (Garlic) : আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী আরবি **'ফুম'** শব্দের অনুবাদ করেছেন Garlic বা রসুন। কোরআনের অভিধানে এ শব্দের আরও দু'টি অর্থের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো গম অপরটি মটরশুঁটি। রসুনের বৈজ্ঞানিক নাম Allium Sativum এটি বহু হাজার বছর ধরে একমাত্র আবাদি শস্য হিসেবেই পরিচিত। রসুনের উৎপত্তিস্থল মধ্য এশিয়ায় বলে মনে করা হয় এবং অতি প্রাচীনকালে সেখান থেকে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় বিস্তার লাভ করে। মিশরে আজ থেকে ৫০০০ বছর পূর্বে (ফেরাউনের রাজত্বকালে) খাদ্যরূপে এটি পরিচিতি লাভ করে।

প্রাচীনকাল থেকে নানা অসুখে রসুনকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। যেমন রসুনকে সব ধরনের বিষাক্ত দ্রব্যের প্রতিষেধক ঔষধ মনে করা হতো। রসুনের Allicin দ্রব্যে ব্যাকটেরিয়া-নাশক গুণ বিদ্যমান। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে রসুনকে সর্দি কাশিসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমাতে এবং হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা বাড়াতে রসুন বেশ কার্যকর বলে মনে করা হয়। রসুনে ৬৩% পানি, ৭% প্রোটিন, ২৮% শর্করা, সামান্য পরিমাণ ফেট ও ১% ছাই থাকে। এর মধ্যে Allionin নামের এ্যামিনো এসিড ভেঙ্গে allicin তৈরি হয় যার প্রধান উপাদান হচ্ছে Diallyl disulphide যা রসুনের তীব্র গন্ধের জন্য দায়ী।

গম (Wheat) : গমের বৈজ্ঞানিক নাম Triticum decoccum। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে গমের চাষ চলে আসছে। গমের আছে ১২টি প্রজাতি। এদের মধ্যে এমার (Emmer) প্রজাতির গম প্রাচীনতম। জানা গেছে প্রাচীন মিশরে এমার গমের চাষ প্রথম শুরু হয়েছিল। গমের দানা থেকে আজকাল নানা ধরনের খাদ্য তৈরি হয়। শিশু খাদ্য, গমের রুটি, পিঠা এবং গম থেকে বিভিন্ন ধরনের বিস্কুট প্রস্তুত করা হয়। গমের পুষ্টিমান থাকার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটাকে প্রধান খাদ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটি গমের দানায় পানির পরিমাণ ১৩%, প্রোটিন ১২%, ফেট ২% শর্করা ৭০% এবং ফাইভার ২%। বর্তমানে থাকে। গম বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য।

মটরশুঁটি (Pea) : মটরশুঁটি দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজি উদ্ভিদের Pisum Sativum প্রজাতির গাছ। প্রাচীনতম কৃষিজ ফসলের মধ্যে এটি অন্যতম। মটর একবর্ষজীবি বীরুৎ জাতীয় গাছ। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে হিমালয় পর্বতমালার অঞ্চল পর্যন্ত এটি স্থানীয় উদ্ভিদ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের হ্রদ অঞ্চলের অধিবাসীরা একে ইউরোপে নিয়ে যায়। মটরশুঁটি দ্বারা নানা রকম খাদ্য প্রস্তুত করা

হয়। শুকনো মটরদানা ডাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং শুকনো মটরদানাকে পিষে স্যুপসহ নানা ধরনের খাবার তৈরি করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সবুজ মটরশুঁটি তরকারিতে, ভাতের সাথে, মাছ গোশতের সাথে বা অন্যান্য সবজির সাথে মিশিয়ে পাক করে খাওয়া হয়। বাংলাদেশে সাধারণত শীত মৌসুমে এর উৎপাদন ভালো হয়। এ গাছের কচি পাতা শাক হিসেবেও খাওয়া হয়। মটরদানায় প্রোটিনের পরিমাণ যথেষ্ট।

মসুর (Lentile) : আরবি **'আদাস'** শব্দের অর্থ মসুর ডাল। মসুর ছোট্ট দানাদার শিমজাতীয় খাদ্য। এর বৈজ্ঞানিক নাম lens culinaris Medik, ধারণা করা হয় যে, মসুরের উৎপত্তি তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে। পরে এটি গ্রিস, মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপ, মিশর, ইথিওপিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এটি শীত প্রধান অঞ্চলের শস্য হলেও প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে শীতকালে এবং গ্রীষ্মমণ্ডলে অধিক উচ্চতায় ঠাণ্ডা ঋতুতে জন্মে। মসুর ডালের দানাতে পানি ১১.২%, প্রোটিন ২৫%, চর্বি ১%, শর্করা ৫৬% এবং ফাইবার ৩% বিদ্যমান।

পিঁয়াজ (Onion) : আরবি **'বাসাল'** অর্থ পিঁয়াজ, পিঁয়াজের বৈজ্ঞানিক নাম Allium Cepa, এটা বিশ্বাস করা হয় যে, পিঁয়াজের উৎপত্তি ইরান, পাকিস্তান এবং ঐদেশগুলোর উত্তরবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলে। অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে এবং মধ্যপ্রাচ্যে পিঁয়াজের চাষ হয়ে আসছে। প্রাচীন মিশরে পিঁয়াজ ছিলো একটি জনপ্রিয় খাদ্য। একটি পরিপক্ক পিয়াজে পানি থাকে ৮৬%, প্রোটিন ১.৪০%, চর্বি ০.২%, শর্করা শস্য যা মাছ, গোশত শাক-সবজি এবং সালাদ তৈরি করে খাওয়া যায়। পিঁয়াজের সবুজ পাতা খাদ্যের স্বাদ ও সুগন্ধি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং উল্লিখিত শাক-সবজি ও শস্যদানা বিশ্বময় জনপ্রিয় ও অপরিহার্য খাদ্যবস্তু হিসেবে সমাদৃত। প্রজ্ঞাময় আল্লাহ পাক মাটিতে উর্বরা শক্তি দান করার দরুন খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয়। মিশর থেকে বিতাড়িত বনী ইসরাঈলীরা পূর্বে এসব খাদ্য-দ্রব্যের স্বাদ উপভোগ করেছিল। তাই উন্মুক্ত মরুভূমির যাযাবর জীবনে পতিত হয়ে এসবের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিল মান্না ও সালওয়ার পরিবর্তে, কিন্তু অধিক পুষ্টির জন্য মানুষের কিছু বিশেষ ধরনের খাদ্য প্রাণের প্রয়োজন হয়। এ্যামিনো-এসিড একটি বিশেষ জৈব উপাদান যা শাক-সবজিজাত প্রোটিনের মধ্যে পাওয়া যায় না। মান্না শর্করা জাতীয় খাদ্য যার মধ্যে আছে সুক্রোজ (Sucros), লেভুলোজ (Levulose), গ্লুকোজ (Glucose) এবং ডেক্সট্রিন (Dextrin)। এগুলো খাওয়ার সাথে সাথে মানুষের শরীরে শক্তি সঞ্চায়িত হয়। কিন্তু গম তা

পারে না। কারণ গমে যে স্ট্রার্চ থাকে, খাওয়ার পর প্রথমে সেটা গ্লুকোজে পরিণত হয়। তাই সে সরাসরি শক্তির যোগান দিতে পারে না। ডাল জাতীয় প্রোটিনের পুষ্টিমান কিছুটা বেশি (২৫%)। তবে যে প্রোটিন সালওয়ার গোশত থেকে পাওয়া যায় তার মান আরও অধিক এবং তা সহজে হজম হয়ে শরীরে আত্মিকরণ হয়ে যায়। করুণাময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের পরিবর্তে নিম্নপুষ্টির খাদ্য চাও? তাহলে যে কোনো শহরে প্রবেশ করো। ঐসব খাদ্য সর্বত্র সহজে পাওয়া যায়।

মহাবিশ্বের সূচনা এবং বিগ-ব্যাংগ

সূরা বাকারা-২ : ১১৭

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

The originator of the Heavens and the earth! when He decrees a thing, He only says to it, 'Be'! and it is.

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক আল্লাহ্ পাক। যিনি কোনো জিনিসের প্রতি যখন আদেশ করেন তখন শুধু বলেন 'হয়ে যাও' আর অমনি তা হয়ে যায়। (সূরা বাকারা : ১১৭)

মহাবিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? কখন এর যাত্রা শুরু হয়েছে? সৃষ্টির মুহূর্তে কী ঘটেছে? এ প্রশ্নগুলো বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের আলোড়িত করেছে। এ আলোড়ন ক্রমান্বয়ে তাদেরকে অনুসন্ধানের দিকে ধাবিত করছে। বর্তমান পর্যায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তি গবেষণা-কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করে রেখেছেন। এর ধারাবাহিকতায় কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীতে এসে সফলতার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান গবেষণায় Big Bang Theory আবিষ্কার হওয়ার পর মহাজগৎ সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। এ তত্ত্বটি প্রায় সার্বিকভাবে কিছু ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছে। যে ঘটনাগুলো প্রায় ১৫ বিলিয়ন বছর আগে ঘটেছে।

BIG BANG THEORY (মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব)

এ তত্ত্বে বলা হয়েছে মহাজগৎ একটি অসীম ঘনত্বের সংকুচিত অবস্থা থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং সেই বিশেষ সময় থেকে তা প্রসারিত হয়েছে এবং সেই সময়কে বলা হয় বিশ্ব সৃষ্টির মূহূর্ত, Big Bang তত্ত্ব হলো সাধারণভাবে সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত মহাজগৎ সৃষ্টি তত্ত্ব। Big Bang, সৃষ্টি তত্ত্বের ভিত্তি ভূমিতে দু'টি পরীক্ষা লব্ধ প্রমাণ রয়েছে।

প্রথমত বিশ্ব সুষমভাবে প্রসারণশীল। দ্বিতীয় পৃথিবী সবদিক সমান বিকিরণ দ্বারা স্নাত যে বিকিরণের বৈশিষ্ট্য একটি উষ্ণ প্রাথমিক অগ্নিবলের (Primeval Fireball) অবশিষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাবিশ্বের প্রসার সময়ের দিকে পিছিয়ে নিলে দেখা যায় প্রায় ১৫ বিলিয়ন বছর আগে মহাজগৎ অসীম ঘনত্বের

সংকুচিত ছিলো। ঐ সময়ে একটি মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনা হয়।
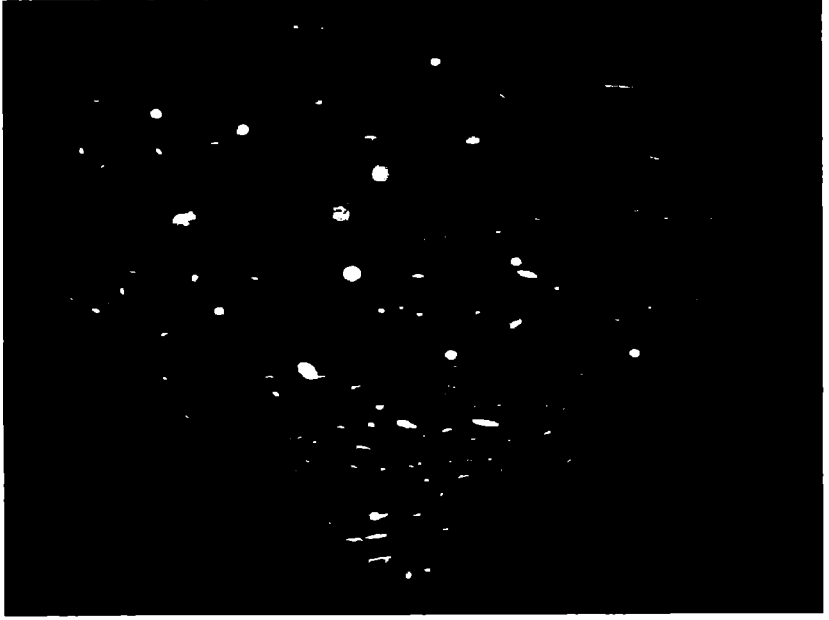
১৯২৫ সালে আইনস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে তার নিজস্ব সমীকরণের সমাধান নির্ধারণ করেন যা দিয়ে বিশ্বের প্রকৃতি নির্ধারণ করা যায়। তার বিশ্ব অস্থিতিশীল ছিলো যা প্রসারিত এবং সংকুচিত হতে পারে। ১৯২২ সনে রাশিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী এ অফ্রিডম্যান যে সমাধান নির্ধারণ করেন তা-ই সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য মহাবিশ্ব সৃষ্টির নকশার ভিত্তি ভূমি। ফ্রিডম্যান আইনস্টাইন সমীকরণের সমাধানরূপে দুইটি অস্থিতিশীল মডেল খুঁজে পান। এ দু'টি মডেলের একটিতে অঙ্কিত হয়েছে সময়সহ বিশ্বজগতের প্রসারণ। অন্যটিতে চিত্রিত হয়েছে বিশ্বজগতের সংকোচন। ১৯২৭ সালে বেলজিয়াম জ্যোতিবিজ্ঞানী G. Lemaitre স্বতন্ত্রভাবে একই ধরনের সমাধান পেয়েছিলেন। Lemaitrer-এর সমাধান থেকে বুঝা যায় যে বিশ্বজগৎ আরম্ভ হয়েছে একটি সংকুচিত এবং অতি উত্তপ্ত অবস্থা থেকে।

Creation started with the expansion of the Ultra-hot, ultra-dense, ultra small clump of 'Primeval atom' Caused by a violent explosion -The Big Bang. এটাই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বর্তমান প্রচলিত ধারণা যে বিশ্বজগৎ একটি উষ্ণ মহাবিস্ফোরক থেকে শুরু হয়েছে।

আধুনিক তাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তিতে মহাবিস্ফোরণের কয়েক মুহূর্ত পরে মহাবিশ্বের ঘটনা বুঝা সম্ভব হয়েছে। একেবারে প্রাথমিক মুহূর্তে মহাজগৎ অপ্রচলিত অণু কণা দিয়ে ভর্তি ছিলো। হয়তো কোয়ার্কেরও উপস্থিতি ছিলো। মহাবিস্ফোরণের এক মাইক্রোসেকেণ্ড পরে অপ্রচলিত অণু কণা ও কোয়ার্কগুলো অন্যান্য মৌলিক বস্তুকণায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এটা সঠিকভাবে জানা যায় না যে, প্রতিকণার চেয়ে কণার আপাত আধিক্য কেন ছিলো। কণাপদার্থ বিজ্ঞানে (Particles and anti Particles) প্রতিসাম্যহীনতার উৎস ব্যাখ্যা করা হয়েছে। Big Bang সংঘটিত হওয়ার পর প্রথম কয়েক মিলি সেকেণ্ডের মধ্যে এ প্রতিসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছিল।

মহাবিস্ফোরণের ৫ সেকেণ্ড পরে তাপমাত্রা 10^9K এ কমে যায়। তখন শুধু ইলেক্ট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো, এন্টি নিউট্রিনো এবং ফোটন এরাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিছু ফোটন ও নিউট্রন মিশ্রিতভাবে ছিলো এবং তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরাও আপেক্ষিকভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। মহাবিশ্ব এতো ঘন ছিলো যে ৪ মিনিট পার হওয়ার আগেই মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হওয়া শুরু হয়ে গেলো।

দশ লক্ষ বছর পরে যখন মহাবিশ্ব 3000k তাপমাত্রায় শীতল হয়ে যায় এবং যখন ঘনত্ব কমে যায় তখন ফোটন এবং ইলেকট্রন একত্রিত হয়ে হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টি করতে থাকে যে প্রক্রিয়াকে বলা হয় পুনঃসংযোগ (Recombination)। যেহেতু হাইড্রোজেনের বর্ণালীতে বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য শোষিত হয় কিন্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে শোষিত হয় না এবং যেহেতু মুক্ত ইলেকট্রনেরও আর উপস্থিতি ছিলো যা ফোটনের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে, তাই ঐ সময়ে বিশ্বজগৎ স্বচ্ছ হয়ে যায়। একটি ফোটনের গড় ভ্রমণপথ, গড় মুক্তপথ অত্যন্ত বড় হয়ে যায়। পুনঃসংযোজনের সময় গ্যাসের কৃষ্ণ বস্তুর বর্ণালী এভাবে নিঃসৃত হয় এবং তখন থেকে তা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বজগৎ প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণালী যদিও তার কৃষ্ণ বস্তুর (Black body) বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে তবুও তার বিশেষ তাপমাত্রা কমে যায়।

প্রাথমিক বিশ্ব যতো শীতল হতে থাকে ততই তাপমাত্রা মৌলিক পদার্থ গঠনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। প্রায় ১০০ সেকেণ্ড পরে ডিউটেরিয়াম (১টি প্রোটন+১টি

নিউট্রন) সৃষ্টি হয়। আর একটি নিউট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা ট্রিটিয়াম সৃষ্টি করে এবং যুগ্ম পদার্থটি ভেঙ্গে গিয়ে হিলিয়ামের আইসোটোপ তৈরি করে। আর একটি নিউট্রন সংগ্রহ করে সাধারণ হিলিয়ামেও সৃষ্টি হয়। নিউক্লিয় সংশ্লেষণ যদিও করার একটি পদ্ধতি তবুও ৫ এবং ৮ এই ভর সংখ্যার ভারি মৌলিক পদার্থ তৈরি করতে ব্যর্থ।

সুতরাং সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থগুলো মহাবিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু ভারি ও হালকা মৌলিক পদার্থগুলো পরবর্তীকালে তারকা ও সুপার নোভায় পরিণত হয়।

গ্যালাক্সি, তারকাপুঞ্জ এবং গ্রহ-উপগ্রহ

গ্যালাক্সি, তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে Big Bang তত্ত্বের উদ্ভব। মহাবিস্ফোরণের সময় যেসব বস্তু ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল সেসব বস্তু এখন সুগঠিত হয়ে একটি সুষ্ট ধারায় পর্যবসিত হয়েছে।

বর্তমানে এটা চিন্তা করা হয় যে, সূর্য ও গ্রহসমূহ অতি ক্ষুদ্র গ্যাস-মেঘ ও ধূলিকণা থেকে ঘনীভূত হয়ে গড়ে ওঠেছে। প্রায় ৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে গ্যালাক্সিগুলো গড়ে উঠতে শুরু করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্যাস-মেঘ ও ধূলিকণা শুরু থেকেই ঘুর পাক খাওয়ার অবস্থা ততো বেশি বেগে আবর্তন করে চলেছে। এরূপ আবর্তনের মূলে রয়েছে কৌণিক গতিবেগের সঞ্চয়ন (Conservation of angular momentum)। সম্ভবত ভারি পদার্থের উদগীরণে সৌর নেবুলা কর্তৃক পশ্চাতে পরিত্যাক্ত হয়েছে। সেই সময় ঐ বস্তু তার কেন্দ্রের দিকে সংকুচিত হয়েছে। ঘূর্ণায়মান সৌর নেবুলার কেন্দ্রীয় অংশ সংকুচিত হয়ে প্রোটোসান (Protosun) গঠন করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ঐ সৌর নেবুলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সরাসরি সূর্যের রূপ ধারণ করেছে। এর বাইরের চক্রবেরী আরো বেশি মহাকর্ষ শক্তির টানে ভেঙ্গে গিয়ে গ্রহ-উপগ্রহসমূহের জন্মদান করেছে। সূর্য তার মাধ্যাকর্ষণ সংকোচনের মাধ্যমে যে তাপ শক্তি লাভ করে তদ্বারা সূর্য যথেষ্ট ভর অর্জন করে নিজের কেন্দ্রকে উত্তপ্ত করতে সক্ষম হয় এবং বর্তমানে সূর্য থেকে যে তাপ ও আলো আমরা পাই সেই তাপ ও আলো সূর্যের মধ্যে পারমাণবিক সংযোজন (Nuclear fusion) বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। গ্রহগুলো বিরাট ভর বিশিষ্ট নয় বলে পারমাণবিক সংযোজন প্রক্রিয়ায় আলো ও তাপ সৃষ্টি করতে পারে না।

সূর্য সৃষ্টির সাথে সাথে পৃথিবী সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়। বহু ঘটনার মধ্যদিয়ে পৃথিবী আজকের অবস্থায় উপণিত হয়েছে। সৌরজগতের সদস্য আমাদের পৃথিবী অন্তত

৪৬০ কোটি বছর পূর্বে যাত্রা শুরু করে। তাপমাত্রা পাওয়ার পর তাকে একটি তরল অবস্থা অতিক্রম করতে হয়। পরবর্তী ১০০০ মিলিয়ন বছর পর এর অনেক স্থানে শক্ত আবরণের সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ ও আগ্নেয়গিরির ক্রিয়া-কলাপ ভীষণ আধিক্য লাভ করে এবং একটি বাষ্পীয় আবরণ একে ঘিরে ফেলে। যখন পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয় তখন জলীয় বাষ্প জমে ঘনীভূত হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত শুরু করে। এ বৃষ্টির পানিতে সৃষ্টি হয় লেক, নদী, সাগর ও মহাসাগর। এ সময় পর্যন্ত প্রাণ সৃষ্টি হয়নি এবং পৃথিবীর কোথাও প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে শুধু গড়ে ওঠেছিল পাহাড়-পর্বত ও ধূসর মরুভূমি।

পৃথিবীর ভূত্বক জমাট বাঁধার পর যে ৩০০০ মিলিয়ন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তবে পরে উষ্ণ সাগরে প্রাণের উৎপত্তি ঘটে। প্রথমে যে প্রাণ সৃষ্টি হয় তা ছিলো এক কোষ বিশিষ্ট (Uni-cellular)।

পরে এলো সামুদ্রিক অ্যালজে (Algae) এবং সামুদ্রিক মেরুদণ্ডহীন প্রাণী। মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং আদিম কালের মাছের মতো প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটে, আরো ১০০ মিলিয়ন বছর পরে।

যখন মাটির উপর উদ্ভিদ জন্মাতে আরম্ভ করলো তখন অমেরুদণ্ডী তারা বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ সময় পৃথিবীর উপরিভাগে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত ছিলো। এ খণ্ডগুলো ছিলো শীতল, অনড় এবং ১০০ কি:মি: বিস্তৃত প্লেট-সদৃশ। এগুলো উত্তপ্ত ও টলটলে গলিত অঞ্চলের উপর ভেসে বেড়াত। এ টলটলে এলাকাকে বলা হয় এস্থেনোস্ফিয়ার (Aesthenosphere)। অভিকর্ষ শক্তির প্রভাবে এ প্লেটগুলো গতিশীল হয়ে ওঠে। প্লেটগুলো পরস্পরের সাথে ধাক্কা খাওয়ার ফলে বিশাল সংকুচিত পাবর্ত্য এলাকা মাথাচাড়া গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এভাবে কালক্রমে সামুদ্রিক জীবনের আধিপত্য শেষ হয়ে যায়। আর ইউরোপ ও এশিয়ায় জেগে ওঠে সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী।

পরবর্তী ১৪০ মিলিয়ন বছরকে বলা হয় সরীসৃপের (Reptiles) যুগ। এ সময় সরীসৃপেরা আকারে এবং সংখ্যায় খুব বেশি বৃদ্ধি পায়। তারপর দেখা দেয় পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী। তবে এরা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারেনি। সবচেয়ে বৃহদাকার সরীসৃপ ডাইনোসর স্থলভাগে অধিককাল তার কর্তৃত্ব জোরদার করে রেখেছিল। এরপর ৬৫ মিলিয়ন বছরে পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী প্রাণী বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তী শেষ এক লক্ষ বছর ধরে মানুষ (Home sapiens) প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে।

মহাবিশ্বে এখনো নতুন নতুন গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্র সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে যা প্রতিনিয়ত আবিষ্কার হচ্ছে। নক্ষত্রসমূহ মহাকর্ষ বলের টানে গ্যালাক্সি ও গুচ্ছ গ্যালাক্সি গঠন করে চলছে। বর্তমানে এরূপ অসংখ্য গ্যালাক্সি আবিষ্কৃত হচ্ছে।

উপরোক্ত তথ্য-প্রমাণ অবতারণার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও তার অস্তিত্ব ধরে রাখার যে মহাপরিকল্পনা তা মানব জাতির জন্য বিস্ময়কর। বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত কর্মকাণ্ড আকাশ ও পৃথিবী তথা বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বোধ লাভ করার পক্ষে সহায়ক। তবে সুমহান আল্লাহ পাকই বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্যের সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি নিদর্শন এবং জ্ঞানী লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

সূরা বাকারা-২ : ১৬৪

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

Verily, In the creation of the Heavens and the earth; and in the difference between Night and Day; in the ships that ply on the sea with that which benefits mankind and the water which Allah sends down from the *Sky* and makes the earth alive therewith after its death and the moving creacures of all kinds that He has scattered therein and in the change of the winds and in the clouds obedient between the sky and the earth; indeed there are signs for a people that are wise.

নিশ্চয়ই তাদের জন্য অগণিত নিদর্শন রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের বিবর্তনে। মানব জাতির উপকারী জিনিস নিয়ে যে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে সেই জাহাজের মধ্যে; আর আল্লাহ্ পাক আকাশ থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করে তদ্বারা মৃত জমিন সজীব করে তোলেন এবং তাতে ছড়িয়ে দেন সব রকম জীবজন্তু এসবের মধ্যে; বায়ু পরিবর্তনের মধ্যে; আকাশ ও যমিনের মধ্যকার অনুগত মেঘের মধ্যে অবশ্যই জ্ঞানী লোকদের জন্য রয়েছে নিদর্শনসমূহ। (সূরা বাকারা-২ : ১৬৪)

এই আয়াতে বেশ কয়েকটি নিদর্শনের প্রতি আল্লাহ্ পাক জ্ঞানী লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১. আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি

২. দিন ও রাতের আবর্তন

৩. সমুদ্র বক্ষে জাহাজ চলাচল

৪. নির্জীব ভূমি বৃষ্টির পানিতে সজীব করে তোলা এবং তথায় সকল প্রাণীকে ছড়িয়ে দেন।

৫. আকাশ ও জমির মধ্যবর্তী মেঘকে অনুগত করে রাখা।

১. আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি

আকাশ ও পৃথিবী তথা মহাজগৎ সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে ২ : ১১৭ আয়াতে। আল্লাহ্ পাক বিশেষ উদ্দেশ্যে আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির মধ্যে তাঁর মহানতা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিভিন্ন নিদর্শন (Signs) খচিত করে জ্ঞানী লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সৃষ্টির শুরুতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতো অতি ক্ষুদ্র বস্তু কণিকায় সমৃদ্ধ আদি অগ্নিগোলক (Primeval fireball) বিদ্যমান ছিলো। এ অগ্নিগোলকে বিশ্বজগতের সকল অংশ সন্নিবেশিত ছিলো। প্রকৃতপক্ষে এরা একটি অতি ক্ষুদ্র অতি ঘন, অতি তপ্তগুচ্ছের মধ্যে আঁটিবদ্ধ অবস্থায় ছিলো। Big Bang তত্ত্ব অনুযায়ী আদি অগ্নিগোলকের বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টির সূচনা হয় এবং স্থান-কাল বস্তু ও শক্তি যথা, মহাকর্ষ শক্তি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শক্তি, সবল নিউক্লিয় শক্তি এবং দুর্বল নিউক্লিয় শক্তি একত্রিত অবস্থায় ছিলো। ফলে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এবং অন্যান্য অণু কণা বস্তুপিণ্ড বা ঝড়ি (Clumps) বাধতে শুরু করল। এ বস্তু-ঝাড়গুলো বিকিরণ শক্তির কারণে ভেসে বেড়াতে লাগল কিন্তু নিজস্ব মহাকর্ষ শক্তির কারণে এরা পরস্পর সংকুচিত হয়ে এবং গ্যাসীয় মেঘমালা জোরালোভাবে ঘোরাফেরা শুরু করেছিল। এদের জোরালো আবর্তন গতিও ছিলো। এ গতিবেগের প্রভাবে গ্যাসীয় মেঘমালা বিভিন্ন আকার ধারণ করল। যেমন, মোচাকৃতি, গোলাকার এবং অন্যান্য আকার। গ্যালাক্সি হলো বিশ্বজগতের গঠন একক। একেকটি গ্যালাক্সি একেকটি বিশ্ব। এভাবে অসংখ্য কোটি গ্যালাক্সি নিয়ে মহাবিশ্ব। আমাদের গ্যালাক্সির নাম ছায়াপথ বা মিলকী-ওয়ে গ্যালাক্সি। এর আকার হলো পেঁচানো গোলাকার। এখানে রয়েছে ১০০ বিলিয়ন তারকা। সুষম গতিতে গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের কাছ থেকে পশ্চাদগামী হয়ে সরে যাচ্ছে।

সুতরাং মহাবিশ্ব সৃষ্টির মহাবিস্ফোরণ বিনা উদ্দেশ্যে এবং বিশৃঙ্খলভাবে সংঘটিত হয়নি। মহান আল্লাহ পাকের নির্ধারিত আইন-কানুন অনুযায়ী এবং তাঁর মহান সৃষ্টি নক্শা অনুসারে সংঘটিত হয়েছে।

২. দিন ও রাতের আবর্তন

এই অংশে আল্লাহ পাক দিন ও রাতের পার্থক্যসূচক বিবর্তনের প্রতি নির্দেশ করেছেন। দিনের বেলা সূর্য দিগন্তের ঊর্ধ্বে থাকে। আর রাত্রিকালে সূর্য থাকে দিগন্তের নিচে। দিনের বেলা সবকিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রাত্রিবেলা সমগ্র প্রকৃতি তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে যায়। দিন ও রাত্রির মূল পার্থক্য হলো সূর্যের কাজ-কর্মের পদ্ধতি পরিবর্তন হয়ে যায়, দিনের কাজে যে গতি সেটা আর থাকে না এবং রাত্রিকালীন কাজ কর্মের জন্য বিভিন্ন ধরনের আলোর ব্যবস্থা করতে হয়। সূর্য বিদায় নিলে বিভিন্ন প্রকার নক্ষত্র আকাশে ফুটে ওঠে। দিনের প্রাণীরা খাদ্য সন্ধান বন্ধ করে নিজস্ব বাসস্থানে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। নিশাচর প্রাণীরা বেরিয়ে যায় খাদ্যের সন্ধানে। দিনের পাখিরা ফিরে যায় তাদের নীড়ে। রাতের পাখিরা বের হয়ে ভ্রমণে। সবুজ উদ্ভিদ সারোক সংশ্লেষণ ক্রিয়া বন্ধ করে, তাদের মধ্যে শুরু হয় নতুন ক্রিয়াকলাপ। সমুদ্র-সমীরণ দিক পরিবর্তন করে। অতএব, দেখা যাচ্ছে, দিন যখন রাতে আবর্তিত হয় তখন সমগ্র কাজ-কর্মের ধরন বদলে যায়।

পৃথিবীর দুইটি গতি আছে, আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি। আহ্নিক গতির দরুন পৃথিবী তার নিজ অক্ষে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তিত হয়। আর বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবী বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এ বার্ষিক গতির কারণে বছরের বিভিন্ন দিনে পৃথিবী আকাশের বিভিন্ন অংশের সম্মুখীন হয়। পৃথিবীর এ পথ পরিক্রমা কিংবা সূর্যের বার্ষিক পথ-পরিক্রমা একটি বিরাট বৃত্তের সৃষ্টি করে থাকে বলা হয় বার্ষিক আয়নবৃত্ত (Ecliptic)। আবার পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে সূর্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তে ঘুরছে বলে মনে হয়। এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তগুলো আকাশি বিষুব রেখার সমান্তরাল।

আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবী তার অক্ষে আবর্তন করে। এর ফলে সময়কাল ভিত্তিক পরিবর্তনে দিবা রাত্রি সংঘটিত হয়। সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণনের সময় পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে এবং দিগন্তরেখার নিচে থাকে। অর্থাৎ দিন ও রাত্রি ঘটতেই থাকে বাহ্যত সূর্যের ঘূর্ণনের ফলে।

পৃথিবী সূর্যকে যে স্থিরভাবে ধরে রাখে সেদিক থেকেও দিন-রাত্রির বিবর্তনের ব্যাখ্যা করা যায়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে এর প্রতিটি অংশ কিছুক্ষণের জন্য সূর্যের দিকে উন্মুক্ত থাকে এবং পৃথিবীর বক্রতার কারণে পৃথিবীর ঐ অংশ সূর্য থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ ঐ অবস্থাতেই থাকে। যে সময়ের জন্য পৃথিবীর কোনো অংশ সূর্যের দিকে উন্মুক্ত থাকে তখন সেই অংশে দিন এবং সে সময়ের জন্য সূর্য থেকে ঐ স্থান আড়ালে থাকে তখন সেই স্থানে রাত নামে।

সুতরাং পৃথিবীর আবর্তন যতদিন চলতে থাকবে ততদিন রাত্রি থেকে দিন এবং দিন থেকে রাত্রির পরিবর্তন চলতেই থাকবে।

আর একটি পরিবর্তন আছে। এ পরিবর্তন হলো সময়ের সাথে সম্পর্কিত। যে কোনো জায়গায় হোক না কেন দিন রাত্রিকে এবং রাত্রি দিনকে অনুসরণ করবেই। এ অনুসরণ প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ও চিরন্তন। যদিও সূর্যের গতি আছে তবুও সূর্য পৃথিবীর কোনো স্থানে দিন ও রাতকে প্রভাবিত করে না। কারণ সূর্য যেখানেই থাকে সে একইভাবে আলো ও তাপ বিকিরণ করে।

আমরা সাধারণভাবে মনে করি দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিনের আগমন অত্যন্ত সহজ ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে, সুমহান আল্লাহ পাক রাত ও দিন সংঘটিত হওয়ার জন্য সূর্য ও পৃথিবীতে জ্ঞানী লোকেরা বিস্ময়বোধ করে থাকেন।

৩. সমুদ্র বক্ষে জাহাজ চলাচল :

আয়াতের এ অংশে সাগর বক্ষে জাহাজ ও নৌকা চলাচলের কৌশল সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক আমাদের অবহিত করেছেন। সমুদ্র জাহাজ চলাচলের সাথে সেসব বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কযুক্ত তা হলো, পানিতে জাহাজ কিভাবে ভেসে থাকে। কিভাবে পানির উপর জাহাজ চলাচল করে এবং জাহাজ থেকে কিভাবে দিক নির্ণয় করা যায়।

এটা সবাই জানেন যে, নদী বা সমুদ্রে নৌকা বা জাহাজ চলাচল সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাদের পানিতে ভেসে থাকার ক্ষমতার উপর। কোনো বস্তুর পানিতে ভেসে থাকার ক্ষমতা তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যে বৈশিষ্ট্যের কারণে কঠিন পদার্থ অন্য আকার ধারণ করলে তা প্রবাহী হালকা মাধ্যমে ভাসতে পারে। যেমন এক খণ্ড লোহা পানিতে ডুবে যায় কিন্তু লৌহ দ্বারা নির্মিত একটি পাত্র সহজে পানিতে ভাসতে পারে। পদার্থের এ বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় প্লাবতা (bccoyance)। কোনো প্রবাহী পদার্থে (যেমন তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ) কোনো কঠিন পদার্থ নিমজ্জিত করলে কঠিন পদার্থের উপর খাড়া যে বল ঊর্ধ্বমুখে ক্রিয়া করে তাকে প্লবতা বলা হয়। গ্রীক দার্শনিক আর্কিমিডিস প্রবাহী বা তরল পদার্থের প্লবতা তত্ত্বযে আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, পানিতে কোনো বস্তু ভাসলে তার ভারে যতটুকু পানি অপসারিত হয় সেই অপসারিত পানির ওজন ভাসমান বস্তুর নিমজ্জিত অংশের ওজনের সমান। এটা আর্কিমিডিসের সূত্র নামে পরিচিতি।

বিজ্ঞানীদের মতে, প্লবতা শক্তি পদার্থের নিমজ্জিত অংশের উপর সমকোণে ক্রিয়া করে এবং পদার্থকে উপরের দিকে তুলে ধরতে চায়। এই প্লবতা শক্তি একটি
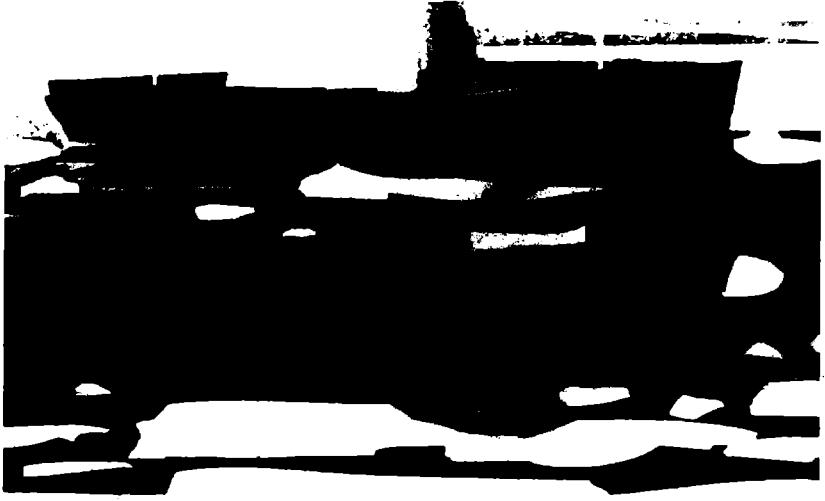
ঊর্ধ্বমুখী শক্তিরূপে অপসারিত পানির ভারকেন্দ্র দিয়ে ক্রিয়া করে। এ ভারকেন্দ্রকে প্লবতার কেন্দ্র বলা হয়। জাহাজের দেহ-অবয়বের উপর কয়েকটি শক্তি কাজ করে। এসব শক্তির কোন কোনটি স্থিতিশীল আবার কোনো কোনোটি গতিশীল। স্থিতিশীল শক্তির উদ্ভব ঘটে যখন ওজন ও ঊর্ধ্বমুখী বলের মধ্যে পার্থক্য থাকে। ওজন ও ঊর্ধ্বমুখী বলের পার্থক্য সমগ্র জাহাজে বিদ্যমান থাকে। জাহাজের উপর পানির আঘাতের দ্বারা গতিশীল শক্তি সৃষ্টি হয়। যখন একটা জাহাজ ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তখন ঢেউয়ের ওঠা-নামার কারণে প্লবতা শক্তিতে যে রদবদল হয় তা জাহাজের গতিতে প্রবাব ফেলে। সবচেয়ে বড় পার্থক্য দেখা দেয় তখন যখন জাহাজ বরাবর ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে চলে।

জাহাজ তরল বস্তুতে ভেসে থাকার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর দেহসত্তার স্থিরতা। যদি প্লবতা শক্তি মাধ্যাকর্ষণ-কেন্দ্রের (Centre of Gravity) মধ্য দিকে কাজ করে তাহলে জাহাজের দেহসত্তা স্থিতিবস্থার মধ্যে থাকবে। কিন্তু তরল পদার্থে নিমজ্জিত কোনো নিরেট বস্তু সরাসরি স্থিতিবস্থার মধ্যে আসতে পারে না। এর কারণ হলো তরল পদার্থকে দাবিয়ে রাখা যায় না। জাহাজের কেন্দ্রের ঊর্ধ্বে একটি স্থানবিন্দু থাকে। এ স্থানবিন্দু অপসারিত পানির কেন্দ্র বরাবর কাজ করে। স্থানবিন্দুটি যদি মাধ্যাকর্ষণ বল থেকে উচ্চতর শক্তির হয় তাহলে জাহাজটি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারবে। আর যদি স্থানবিন্দু নিম্নতর শক্তির হয় তাহলে জাহাজ সুস্থির অবস্থায় থাকতে পারবে না। অমনি উল্টে যাবে।

এটা সবাই অবগত আছে যে, নৌকা ও জাহাজ নদী ও সমুদ্রে চলাচলের ব্যবস্থা ছিলো বিভিন্ন পদ্ধতির। কয়েক শতাব্দি ধরে জাহাজ বা নৌকা চলাচল করেছে দাঁড়ের সাহায্যে কিংবা পাল তুলে, পালে বাতাস লাগিয়ে অথবা লগি-বাশ ও টানা-হালের সাহায্যে। ডিজেল ইঞ্জিন চালুর পূর্ব পর্যন্ত উভয় পদ্ধতি অনেক বছর ধরে বহু উৎকর্ষতা অর্জনের পথ ধরে এগিয়ে গেছে। ১৯৭০ পর্যন্ত পারমাণবিক শক্তি নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের সময় নাবিকদের কাছে বড় সমস্যা ছিলো গন্তব্যে পৌছার জন্য দিক নির্ণয় করা। প্রাচীনকালে নাবিকরা জাহাজ চালাতেন সূর্য ও নক্ষত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে। আরব নাবিকরা সূর্য ও নক্ষত্রের অবস্থান দেখে মহাসাগরে দিক নির্ণয় করতেন। এ পদ্ধতি আরবরা বহু শতাব্দী ধরে মরুভূমি যাত্রাকালেও ব্যবহার করতেন। এটা স্বল্প দূরত্বের যাত্রাপথে একটি সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত ছিলো। চালাতে হলে পৃথিবীর আকার ও গঠন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকতে হয়। এ জ্ঞানের অভাব নাবিকদের বিশেষভাবে কষ্ট দিতো। এ কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নাবিকরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের (Astronomy) উন্নতি সাধন করেছিল। এর ফলে সমুদ্র যাত্রার পূর্বে নাবিকরা ভ্রমণ-টেবিল তৈরী করতেন নৈপুণ্যতার সাথে। এ কাজে সহায়ক উপকরণ ছিলো চার্ট ও নকশা যা দিক নির্ণয়ের হিসাবকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়। এরপর কালের ধারায় এ বাস্তব প্রয়োজনে নাবিকরা নৌ-বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত হয়ে পড়েন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ৫০ বছরে নৌ-বিজ্ঞান পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন জাহাজ কম্পাস দেখে ম্যাপ পড়ে এবং দীর্ঘযাত্রায় রেডিও সাথে রেখে দিক নির্ণয় করতো। রাডার আবিষ্কারের ফলে নাবিকরা দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেন। এর ফলে কুয়াশা ও অন্ধকারের মধ্যেও দূরের জায়গা স্পষ্টরূপে দেখতে পান যেমনটি দেখা যায় দিনের আলোতে, বর্তমানে পৃথিবীর কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে কম্পিউটারের সাহায্যে জাহাজের অবস্থান হিসাব করা হয়।

৪. নির্জীব ভূমি বৃষ্টির পানিতে সজীব করে তোলা এবং তথায় সকল প্রাণীকে ছড়িয়ে দেয়া

আয়াতের এ অংশে বলা হয়েছে আল্লাহ পাক তোলেন এবং তথায় সকল প্রাণী-সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাষ্পাকারে জলবিন্দু উরে ওঠে এবং আকাশে কোলে ভেসে বেড়ায়। এরূপ ভেসে বেড়ানো অতি ক্ষুদ্র জলবিন্দু দ্বারা জমে-ওঠা স্তরকে মেঘ

বলা হয়। বাতাসের গতিবেগ বৃদ্ধি পেলে জলবিন্দুগুলো মেঘের উপরে ওঠে আবার নিচে নেমে পড়ে। বাতাসের নিম্নগতির সময় বড় বড় ফোটাগুলো দ্রুতবেগে ঝরে পড়ে এবং পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি কণার সঙ্গে মিশে যায়। এভাবে তাদের আকার ওজন বেড়ে যায়। ফলে বাতাসের ঊর্ধ্বগামী গতির সময় ঐ বাতাস ভারি বৃষ্টিকণাকে ধরে রাখতে পারে না বিধায় বৃষ্টিকণাগুলো পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে।

বৃষ্টিপাতের আরও কয়েক রকম পদ্ধতি রয়েছে।

যথা– সাইক্লোনজাত ও পর্বতজাত। ক্রমান্বয়ে যখন উষ্ণবায়ু ও শীতল, বায়ু পরস্পর সংস্পর্শে আসে এবং সমধর্মী পর্যায়ে উপনীত হয় তখন ঝড়ের মুখে ঠাণ্ডা হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটনায়। আর পর্বতগাত্রে বাধা পেয়ে বাতাস অধিক ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ে।

আকাশ থেকে আল্লাহ পাক যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাতে কিছু প্রাকৃতিক ঘটনার উদ্ভব হয়। যেমন– মৃতপ্রায় শুষ্ক পৃথিবী সজীব হয়ে ওঠে এবং সকল প্রাণী প্রাণচঞ্চল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

একটানা বৃষ্টি না হওয়ার কারণে যে খরার সৃষ্টি হয় সে খরার ফলে ভূমি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি রুক্ষ-শুষ্ক রূপ ধারণ করে। চতুর্দিকে যেন পানি শূন্য মরুভূমি ভাব। এরূপ অবস্থানে বলা হয় মৃতপ্রায় পৃথিবী।

আর যখন বৃষ্টিধারা নামে তখন শুষ্ক ভূমি সজীব হয়ে ওঠে। বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু হয়। মাটিতে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। বীজের অঙ্কুরোদমের ফলে নতুন গাছপালা জন্মায়। গাছপালা ফুলে-ফলে সবুজ পাতায় সুশোভিত হয়ে ওঠে। আর একে বলা হয় পৃথিবীর নবজীবন লাভ।

পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান স্কেল থেকে দেখা যায় ক্রান্তীয় আদ্র অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এ অঞ্চলে গভীর সবুজ বনাঞ্চল গড়ে ওঠে। অপরদিকে মরু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বিক্ষিপ্ত এবং এমনকি কয়েক বছর ধরে বৃষ্টিপাত মোটেও হয় না। তাই দীর্ঘ খরা দেখা দেয়। এখানে যখন হাল্কা বৃষ্টিপাত দেখা দেয় তখন ধূসর মরুভূমির বুকে জীবন জেগে ওঠে। কেননা এ সময় দীর্ঘ ঘুমে ঘুমন্ত বীজগুলো অঙ্কুরিত হয় এবং শাখা প্রশাখা বিস্তার করে বেড়ে ওঠে। আবার শুষ্ক মরুভূমিতে নতুন বীজের জন্ম হয় এবং বীজগুলো মাটির বুকে নেতিয়ে থাকে। আর গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করে কখন বৃষ্টিধারা নামবে। ঐ বীজগুলো তাদের শক্ত কঠিন আবরণের সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে যতদিন না

বাইরের আবহাওয়া তাদের হওয়ার পর বীজ পানি পান করে। পানি পান করার পর বীজের প্রোটোপ্লাজম সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বীজের মধ্যে যে খাদ্য উপাদান থাকে সেগুলো ভেঙ্গে গিয়ে শক্তি নির্গত হয়ে যায় এবং ভ্রূণের মধ্যকার কোষগুলো বড় হতে থাকে এবং বিভক্ত হয়ে পড়ে। চারাগাছের প্রধান অংশ হলো মূল। মূল মাটির মধ্যে নিজেকে দৃঢ়ভাবে আঁটকে রাখে এবং মাটির নিচে পানির সন্ধান করে। মাটিতে পানির অভাব ঘটলে অঙ্কুরোদগম ক্রিয়া মন্থর হয়ে যায় কিংবা বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টিপাত এ অভাব দূর করে। বীজ ছাড়া অন্য উপায়ে সেসব উদ্ভিদ বংশ বৃদ্ধি করে তাদের বেলায় ভূমিতে প্রবেশকারী অঙ্গসমূহ বীজের কাজ করে এবং বীজের মতো একইভাবে তারা বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। ভূমিতে পতিত বৃষ্টিধারার সঙ্গে মাটির দৈহিক বিক্রিয়া বড় ধরনের উলট-পালট ঘটায় যার দরুন কিছু বীজ নিচ থেকে উপরের স্তরে ওঠে আসে এবং প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করে। এর ফলে অল্প সময়ে অঙ্কুরোদগম ঘটে। এভাবে আল্লাহ্ পাক কর্তৃক বৃষ্টি বর্ষণ ঐ বীজগুলোকে জাগিয়ে তোলে যেগুলো শুষ্ক সময়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে।

পৃথিবীর বুকে বৃষ্টিপাত ও এর ফলে বৃক্ষরাজির সজীবভাব বিভিন্ন প্রাণীর জৈবিক কার্যকলাপের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। বৃষ্টিপাতের সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ কীট পতঙ্গের ডিম ও গুটিপোকা ফেটে উন্মুক্ত হয়ে যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে আসে সবল গোবরে পোকা, বোলতা, পিঁপড়া, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ও পঙ্গপাল। এরা কখনো সারিবদ্ধভাবে কখনো বিক্ষিপ্তভাবে মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে শিকার ধরার উদ্দেশ্যে। বৃষ্টির পানির বন্যাতে সৃষ্টি হয় ক্ষণস্থায়ী নালা-ডোবা। এসব নালা-ডোবায় জন্ম নেয় ব্যাঙাচি, সাপ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী। এরাও ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। ইতোমধ্যে জন্মলাভ করা বৃক্ষরাজি যখন বনভূমিতে পরিণত হয় তখন দেখা যায় ঐ বনভূমি প্রাণী জগতকে সহযোগিতা দান করে। গাছপালার শীর্ষে বাসা বাঁধে শিকারী পাখিরা। গাছের ডালে ডালে বাস করে বানর ও অন্যান্য পাখি। টিকটিকি, সরীসৃপ প্রভৃতি বৃক্ষডালে ও লতাপাতায় বিচরণ করে। বনভূমিতে বসবাস করে অধিকাংশ স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ প্রাণী। মাংসভোজী প্রাণী ও অন্যান্য ধরনের প্রাণী। এসব প্রাণীর বাসস্থান তাদের নিজস্ব জীবন যাপনের সঙ্গে এবং শিকার পাওয়ার সম্ভাবনার সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বৃষ্টিপাতের পর পাহাড়ের কোলে, উপত্যাকায় ও খোলা মাঠে সবুজ-সতেজ ঘাসের চারণভূমির উদ্ভব ঘটে। এ চারণভূমিগুলো বন্য গরু, ছাগল, মহিষ ও হরিণদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। এর ফলে তারা খাদ্যের সন্ধান করে দল বেঁধে। অন্যান্য

তৃণভোজী প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এ অবস্থা ঘটে। আর একটি বিষয় দেখা যায়, বৃষ্টির ঝর্ণাধারা পাহাড়ের বুক বেয়ে নদীতে নেমে এসে সাগরে মিলিত হয়। এ সময় মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণী তাদের বংশ বৃদ্ধির জন্য নতুন জায়গার সন্ধানে অভিযাত্রা শুরু করে। কারণ পাহাড়ী ঝর্ণাধারা নদীতে মিশলে নদীর পানিতে পরিবর্তন দেখা দেয়।

অতএব, এটা খুবই সত্য যে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির দৃশ্যপটের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। মৃতপ্রায় পৃথিবী সবুজ-শ্যামলীময় মূর্ত হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় আল্লাহ পাক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাণীকূলকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেন। যদি আমাদের বোধশক্তি সক্রিয় থাকে তাহলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে এসব কর্মকাণ্ডে সুমহান আল্লাহ পাকের অসীম জ্ঞানের নিদর্শন বিদ্যমান।

৫. বায়ু পরিবর্তন

তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে বায়ুতে বিভিন্ন চাপের সৃষ্টি হয়। শীতল বায়ু ভারি তাই ভূ-পৃষ্ঠের সাথে লেপটে থাকে। উষ্ণবায়ু হালকা বলেই উপরে ওঠে য়ায় এবং শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য শীতল বায়ু সেদিকে ধাবিত হয়। এভাবে বায়ুর মধ্যে একটি গতি সঞ্চার হয়। আবার স্থানীয়ভাবেও বাতাসের পরিবর্তন হয়ে থাকে। এ ধরনের বাতাস স্থলবায়ু ও সমুদ্র বায়ু নামে পরিচিত।

দিনের বেলা পৃথিবী সূর্যের তাপ শোষণ করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাতের বেলা তাপ বিকিরণ করে। যখন পৃথিবীর তাপমাত্রা সমুদ্রের তাপমাত্রার চেয়ে কম হয় তখন স্থলভাগের শীতল বায়ু সমুদ্রের উচ্চতাপ মাত্রার হালকা বায়ুর স্থান দখল করে নেয়। অর্থাৎ স্থলভাগের শীতল বাতাস সমুদ্রের দিকে বইতে থাকে। এরূপ বাতাসকে স্থলবায়ু (Land breeze) নামে অভিহিত করা হয়।

আগেই বলা হয়েছে, দিনের বেলা পৃথিবী সূর্যের তাপ শোষণ করে। এর ফলে সন্ধ্যাকালে পৃথিবীর উপরিভাগের বায়ু খুব বেশি উত্তপ্ত থাকে এবং হালকা হয়ে উপরে ওঠে যায়। এ সময় যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পূরণ করার জন্য সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস ভূমির দিকে ছুটে আসে। এরূপ বায়ুকে বলা হয় সমুদ্র বায়ু (Sea breeze)।

বায়ু পরিবর্তনের ফলে যে সকল উপকার সাধিত হয় তা হলো :

১. বাতাস মেঘ বয়ে নিয়ে আসে যার ফলে ব্যাপক এলাকা জুড়ে বৃষ্টিপাত ঘটে।

২. দূষিত বায়ু দূরে সরিয়ে দেয়। নিয়ে আসে বিশুদ্ধ বাতাস।

৩. বায়ু প্রবাহের ফলে ফুলের পুংকেশরের সাথে স্ত্রী কেশরের মিলন ঘটে। এ কারণে গাছের ডালে প্রচুর ফলের সমাহার ঘটে। এ পদ্ধতিকে বলা হয় পরাগায়ণ।

৪. বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার সমতা রক্ষা করে।

৫. পরিবেশগত ভারসাম্য সৃষ্টি হয়।

বায়ু পরিবর্তনের আর একটি ঘটনা হলো বাতাসের মৌসুমী পরিবর্তন। এ কারণে শীতকালে সাইবেরিয়ার বাতাসে উচ্চ চাপ থাকে। এ অঞ্চলে শুষ্ক বাতাসে উত্তর-পূর্বদিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বয়ে যায়। এর নাম শীতকালীন মৌসুমী বায়ু।

গ্রীষ্মকালে সূর্য উত্তরদিকে অগ্রসর হলে দক্ষিণ এশিয়ার স্থলভাগে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ সময় সিক্ত বায়ু ভারত মহাসাগর থেকে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে ছুটে আসে, যখন এ বাতাস হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হয় তখন সেটা ঠাণ্ডা হয়ে বিস্তৃতি লাভ করে এবং মেঘে রূপান্তরিত হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। একে বলা হয় মৌসুমী বায়ু।

আবার মৌসুমী জলবায়ু বলতে অবশ্য উপযুক্ত দুটি বিষয়কে বোঝানো হয়। অর্থাৎ সে অঞ্চলে বায়ুর দিক পরিবর্তন এবং শুষ্ক শীতের পর আর্দ্র বর্ষার আগমন ঘটে। গ্রীষ্মকালে শীতল সমুদ্র বায়ু উত্তপ্ত স্থলভাগের দিকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু বয়ে আনে। ফলে মহাদেশের বায়ু হয় শুষ্ক মৌসুমী শীতকাল। পূর্ব গোলার্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অংশ পৃথিবীর ভূ-ভাগের প্রায় ২০% মৌসুমী জলবায়ুর অংশ। নিরক্ষরেখা বরাবর বা এর কাছাকাছি উভয়দিকে সর্বোচ্চ ঋতু পরিবর্তন বুঝানো যায়। পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৃষ্টিবহুল এলাকা দু'টি মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত। এগুলো হলো কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চল মৌসুমী অঞ্চলে তিনটি মূল ঋতুর স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। প্রায় বৃষ্টিহীন শীতকাল, রুক্ষ গ্রীষ্মকাল ও বৃষ্টিবহুল বর্ষাকাল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বায়ুর দৈনন্দিন ও ঋতুকেন্দ্রিয় পরিবর্তনগুলো প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার অসীম জ্ঞানের নিদর্শন যা জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করতে পারেন। আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে তার হিকমাতের চিহ্নগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

৬. আকাশ ও জমির মধ্যবর্তী মেঘকে অনুগত করে রাখা

বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র আকারের পানি যা মূলত বাতাসে ভাসমান জলীয় বাষ্প জমাট বেঁধে তৈরি হয়। এর নাম সাধারণ মেঘ। তবে ধোঁয়া ও ধূকিণার দ্বারাও মেঘ বৃষ্টি হতে পারে। সূর্যের উত্তাপে মহাসাগর, সাগর হ্রদ, নদী, খাল, বিল প্রভৃতি থেকে প্রতিনিয়ত প্রচুর পানি বাষ্পীভূত হয়। জলীয় বাষ্প বায়ু অপেক্ষা লঘু বলেই প্রচুর জলীয় বাষ্প উপরে উঠে। উপরের বায়ুস্তর শীতল হওয়ার কারণে জলীয়

বাষ্প উপরে ওঠে শীতল হয়। আবার উপরের বায়ুস্তরের চাপ কম বলে এই বায়ু সহজে প্রসারিত ও অধিক শীতল হতে থাকে। বায়ুর উষ্ণতা হ্রাস পেলে সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সম্পৃক্ততার চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র হালকা জলকণায় পরিণত হয়। বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে ভাসমান ধূলিকণাকে আশ্রয় করে এই সূক্ষ্ম জলকণাগুলো 'মেঘ' আকারে ভাসতে থাকে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) মেঘকে তিনভাগে ভাগ করেছে।

১. পুঞ্জ মেঘ (Cumulus Clouds)

২. স্তর মেঘ (Stratus Clouds)

৩. ঊর্ণা মেঘ (Cirrus Clouds)

১. পুঞ্জ মেঘ : গ্রীষ্মকালে আকাশের বুকে আড়াআড়িভাবে জমাট বাঁধা শুভ্র মেঘরাশি এক দিক থেকে আর একদিক ভেসে বেড়ায়। এগুলোকে বলে পুঞ্জ মেঘ। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে এক মাইল উপরে এরা ঘুরে বেড়ায়। সূর্য যখন মধ্য-বৈকালে খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখন পুঞ্জ মেঘের আকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সময় তাদের শীর্ষদেশ কয়েক মাইল উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। সন্ধ্যাকালে তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। কারণ এ সময় স্তরমেঘের ব্যাপ্তি পুঞ্জমেঘকে গ্রাস করে ফেলে।

২. স্তর মেঘ : ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কয়েক মাইল ঊর্ধ্বে এ মেঘের অবস্থান। খুব সকালে কিংবা সন্ধ্যায় এ মেঘ হালকা কুয়াশার ন্যায় দেখা যায়। এ সময় বাতাস থাকে স্থির ও গতিহীন।

৩. ঊর্ণা মেঘ : এ মেঘ বরফের মতো সাদা কুঞ্চিত। দেখতে মাকড়সার পাতলা জাল বা ঘোড়ার লেজের মতো। সকল মেঘ স্তরের উপরে এরা গঠিত হয়। এ মেঘ তৈরি হয় প্রায় ৭৫০০ মিটার থেকে ৮০০০ মিটারের মধ্যে।

আর এক প্রকার মেঘের কথা উল্লেখ আছে। তার নাম নিম্বাস মেঘ (Nimbus Clouds)। এ মেঘকে বলা হয় সব রকম মেঘের সমাহার। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দেখলে এ মেঘকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। সকাল কিংবা দুপুরে নিম্বাস মেঘের কারণে সন্ধ্যাকালীন অন্ধকার নেমে আসে। এ মেঘের নিচের অংশে থাকে জলভরা আর্দ্রতা। থেকে বৃষ্টিকণা ঝরে পড়ে।

সুতরাং সব ধরনের মেঘ নিজস্ব গতিবিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ আল্লাহ পাকের বেধে দেয়া জাগতিক আইনের বাইরে তারা যেতে পারে না। বাতাস তাদের যতদূর টেনে নিয়ে যায় তারা ততদূরেই যেতে পারে। কিন্তু লম্বভাবে তারা পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে ঊর্ধ্বে দশ মাইল পর্যন্ত উঠতে পারে।

মৃত পশু, রক্ত ও শূকরের গোশত খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত নয়

সূরা বাকারা-২ : ১৭৩

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

He has forbidden you only the Dead animals and blood and swineflesh and that which is slaughtered as a sacrifice for others than Allah. But if one is forced by necessity without wilful disobedience nor transgressing due limits– Then there is no sin on him, truly Allah is Forgiving, Most Merciful.

তিনি (আল্লাহ পাক) তোমাদের মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যে বস্তুগুলো আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে সেসব বস্তু খেতে বারণ করেছেন। কিন্তু যদি কেউ একান্ত প্রয়োজনে নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে ঐসব খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে তার উপর কোনো পাপ বিবেচিত হবে না। সত্যিকারভাবে, আল্লাহ পাক বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।' (সূরা বাকারা : ১৭৩)

আল্লাহ পাকের সৃষ্টি জগতে অসংখ্য হালাল খাদ্য-দ্রব্য রয়েছে। সেসব খাদ্য বস্তুর উপর কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। কারণ হালাল খাদ্যবস্তুগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর উপাদান থাকে না। এ আয়াতে যে খাদ্যগুলো আল্লাহ পাক নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করা হলো।

মৃত পশু : মৃত পশু-পাখির গোশতকে খাদ্য হিসেবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ নিষেধ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত। একটি প্রাণী যখন আপনা থেকেই মারা যায় তখন কি কারণে মারা গেছে তা অনেক সময় কারো জানা থাকে না। ঐ প্রাণীটি বিষপানে, Anthrax কিংবা যক্ষ্মা রোগে মারা যেতে পারে। তাই মৃত-পশুর গোশত ভক্ষণ করা খুবই বিপদজনক। পশুর এনথ্রাক্স, যক্ষ্মা প্রভৃতি ছোঁয়াছে রোগ এবং এসব রোগে মৃত পশুর গোশত হাতে নিয়ে নাড়াচড়া করাও বিপদজনক। কেননা এভাবে নাড়াচড়া করার ফলে মানব- দেহে এসব রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।

রক্ত (Blood) : সকল প্রাণীর রক্ত পান করা হারাম। পশু-পাখি জবাই করার পরমুহূর্তে যে রক্ত ছুটে বের হয় সেই রক্ত পান করা সিদ্ধ নয়। কারণ রক্তের মধ্যে থাকে বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও টক্সিন (Toxin)। রক্তে এসব পদার্থ থাকলে তা অবশ্যই ক্ষতিকারক। পশু-পাখি জবাই করার যুক্তিসঙ্গত কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ হলো প্রবাহমান রক্তের সাথে উপরোক্ত বিষাক্ত পদার্থগুলো বের করে দেয়া। ফলে জবাই করা পশুর গোশত স্বাস্থ্যপ্রদ হয়ে ওঠে। আর যে রক্ত পেশী ও অন্যান্য অরগানে থেকে যায় তা কখনো ক্ষতিকর নয়।

শূকরের গোশত (Swine Flesh) : এ আয়াতে শূকরের গোশত খাওয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ এটা প্রমাণিত হয়েছে যে শূকরের গোশত নানা রকম জীবাণু দ্বারা দূষিত।

শূকরের গোশত ভক্ষণ করার ফলে এ যাবৎ যেসব রোগ-ব্যাধির কথা জানা গেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ট্রাইকিনেলা স্পাইরালিস (Trichinella spiralis) শূকরের গোশত থেকে মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এ প্যারাসাইট দ্বারা আক্রান্ত হলে যে ব্যাধি সৃষ্টি হয় তার নাম ট্রাইকিনিয়াসিস (Trichiniasis)। এ রোগে আক্রান্ত মানুষের শরীরের প্রধান অঙ্গগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষ মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। কাচা কিংবা ভালোভাবে সিদ্ধ না হওয়া শূকরের গোশত খেলে মানুষের এনসিসটেড কীটাণু (Encysted larvae) দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা ঐ ধরনের শূকরের গোশতে উল্লিখিত কীটাণু থাকে।

এ কীটগুলো বৃহদন্ত্রের পথে বড় হতে থাকে এবং বংশ বৃদ্ধি করে। এ কীট এক সপ্তাহ পাকস্থলীতে থাকার পর রক্তের সাথে মানুষের পেশীতে প্রবেশ করে এবং সেখানে প্রদাহ কেন্দ্র তৈরি করে। এ রোগ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। আমেরিকায় ২০% লোক এ রোগে আক্রান্ত। তবে অধিকাংশ লোকের রোগের লক্ষণ চিহ্নিত করা যায় না। একবার ট্রাইকিনা প্যারাসাইট পেশী শিরায় সংক্রমিত হয়ে গেলে সেখানে থেকে। তাকে আর দূর করা সম্ভব হয় না।

শূকরের গোশতে আর এক ধরনের প্যারাসাইট থাকে। এর নাম টিনিয়া সোলিয়াম (Taenia solium ফিতা কৃমিজাত)। এ জীবাণু হৃৎপেশী আক্রমণ করে সেখানে মিয়োকারডিটিস রোগ ঘটায় এবং এর ফলে একদিন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে। এছাড়া মস্তিষ্ক, চোখ, স্নায়ুতন্ত্র প্রভৃতি এ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারাত্মক উপসর্গ সৃষ্টি করে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় 'সাটক্সিন' নামক এক ধরনের নতুন প্রোটিন শূকরের গোশত থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। চামড়ার বিভিন্ন ধরনের এ্যালার্জি, হাঁপানী, এ্যাকজিমা ইত্যাদি রোগ সংক্রমিত হওয়ার জন্য এ প্রোটিন দায়ী। এমনকি অল্প মাত্রার সাটক্সিন সেবন করলেও দৈহিক অসারতা এবং গ্রন্থিতে ব্যথার সৃষ্টি করতে পারে।

গ্রোথ হরমোন শূকরের মাংসে অতি মাত্রায় বিদ্যমান। এর কারণ হিসেবে শূকরের গোশত ভক্ষণকারী। লোকের দৈহিক বৃদ্ধি ও আকৃতিতে প্রভাব পড়ে এবং তাদের পেটে এবং নিতম্বে অস্বাভাবিক চর্বি জমাট বাধে। যার দরুন শরীর ধীরে ধীরে 'স্টোভ'-এর আকার ধারণ করে।

শূকরের গোশতে অতি উচ্চ মাত্রায় চর্বি থাকে বিধায় নিয়মিত এ গোশত খেলে শরীরে ভিটামিন E-এর অভাব ঘটে, যার ফলে যৌন-গ্রন্থিসমূহের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এ কারণে মানুষের যৌন দুর্বলতাসহ যৌন অক্ষমতা দেখা দিতে পারে।

সুতরাং ইউরোপ আমেরিকায় ব্যাপক উন্নতমানের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেই দেশগুলোর সরকার শূকরের গোশতজাত মারাত্মক ব্যাধিগুলো নিবারণ করতে পারছে না। এ রোগসমূহ নিবারণ করার একমাত্র উপায় হলো শূকরের গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকা।

সিয়াম সাধনায় দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সুফল নিহিত

সূরা বাকারা-২ : ১৮৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

You who believe! Fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you That you may Self-restraint.

হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের জন্য রোজার বিধান দেয়া হলো যেমনটি দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণকেও– যেনো তোমরা আত্মসংযমের নীতি অবলম্বন করতে পারো। (সূরা বাকারা : ১৮৩)

রমজান মাস এটি একটি চন্দ্রমাস, এ মাসে ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে রোজাব্রত পালন করতে হয়। রোজা ফারসি শব্দ। আরবিতে বলা হয় সাওম, বহুবচনে সিয়াম। এর অর্থ হলো বিরত থাকা, কঠোর সাধনা করা, অবিরাম চেষ্টা করা। পরিভাষাগতভাবে বলা যায় ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার ও স্ত্রীমিলন থেকে বিরত থাকার নাম রোজা।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, রোজা প্রত্যেক ঈমানদার লোকদের উপর ফরজ এবং পূর্ববর্তী লোকদের উপরও ফরজ ছিলো। বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, রোজা পালনের মধ্যে সুস্পষ্ট দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সুফল নিহিত আছে। তবে আধ্যাত্মিক বিষয়টি প্রত্যেকের একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধি।

এটা সবাই উপলব্ধি করতে পারে যে, রমজান মাসে রোজাব্রত পালন করলে শরীরের অতিরিক্ত ওজন আস্তে আস্তে হ্রাস পায়। এভাবে শরীরের ওজন হ্রাস পাওয়া খুবই উপকারী। দেহের অধিক ওজন কমানোর জন্য এটা এক প্রকার থেরাপিউটিক (Therapeutic) ব্যবস্থা বলা যায়। এর ফলে ডায়াবেটিস রোগ থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাবনা থাকে।

অস্বাভাবিক গ্যাসট্রিক, এসিডিটি রোজা পালনের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে সাধারণ গ্যাসট্রিকে রূপান্তরিত হয় বলে গবেষকরা মত প্রকাশ করে থাকেন। কারণ লক্ষ্য করা গেছে যে, রোজা রাখার ফলে গ্যাসট্রিক এসিডিটি স্বাভাবিকভাবে কমে যায়

এবং Hyper Acidity হ্রাস পেয়ে থাকে। Hyper Acidity থেকে পেপটিক আলসারের সৃষ্টি হয়। মুসলিম দেশসমূহে পেপটিক আলসারের নজীর খুবই কম। মিশ্র ধর্মের দেশগুলোতেও মুসলমানদের মধ্যে পেপটিক আলসার তেমন পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং রমজান মাসের রোজা পেপটিক আলসার প্রতিরোধে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। পূর্ণ একমাস রোজা পালনের ফলে জিহ্বা ও লালাগ্রন্থিসমূহ বিশ্রাম পায়। যারা ধূমপান করেন তাদের জিহ্বায় ক্যানসারসহ বিভিন্ন জটিল রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। রোজার সময় দিনের বেলা অন্তত ১৬ ঘণ্টা ধূমপায়ীরা ধূমপান করতে পারে না। যার ধরুন অনেকেই ধূমপানের অভ্যাস পরিহার করতে সক্ষম হন। আহারের সময় যখন খাদ্যদ্রব্য নির্গত হয়। এ লালা খাদ্যদ্রব্য চিবাতে, গলাধঃকরণ ও হজম করতে সাহায্য করে। তাই গ্রন্থিসমূহ সবল ও সতেজ থাকা প্রয়োজন। দীর্ঘ একমাস রোজা পালনের দরুন লালাগ্রন্থিসমূহ বিশ্রাম পায় বলে তা সতেজ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পাকস্থলী একটি বৃহদাকার পেশী বিশেষ। শরীরের অন্যান্য পেশীর মতো এরও বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। একমাস সিয়াম সাধনার সময় দিনের বেলা পাকস্থলী পূর্ণমাত্রায় বিরতি পায় এবং লুপ্ত শক্তি পুনরুদ্ধারের সময় পায়। এটা সত্য যে, অতিভোজনের ফলে পাকস্থলী বড় হয়ে যায়। একমাস রোজাব্রত পালন করার কারণে বড় পাকস্থলী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, রোজার সময় পাকস্থলী খাদ্যমুক্ত থাকার কারণে এর ক্ষতস্থান বা আলসার নিরাময়ের কাজ শুরু হয়। কারণ তখন রুগ্ন ও জীর্ণ জীবকোষগুলো স্থলে চারপাশে সুস্থ-সবল জীবকোষের উদ্ভব হয়। এভাবে পেপটিক আলসার নিবারণে রোজা সাহায্য করে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

পুরো একমাস রোজা রাখার ফলে শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের যেমন, লিভার প্লীহা, কিডনী ও মূত্রথলির উপকার সাধিত হয়। বড় লিভার স্বাভাবিকভাবে কমে ছোট হয়ে যায়। কিডনী ও মূত্রথলির নানা প্রকার উপসর্গ নিরাময় হয়ে শরীরে বাড়তি মেদ বা চর্বি থাকলে রক্তে কোলেস্টরেল এর পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রা থেকে বেড়ে যায়। এর ফলে হৃৎপিণ্ড, ধমনী, ও দেহের অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গে রোগ দেখা দেয়। একমাস সিয়াম পালনের ফলে শরীরে বাড়তি চর্বি জমতে পারে না এবং ও রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

সিয়াম সাধনার ফলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র প্রভাবিত হয়। এর ফলে ধ্যান-ধারণা পরিষ্কার ও সহজ হয়। স্নায়ুবিক দুর্বলতা, এবং মস্তিষ্কের অবসাদ গ্রস্থতা বিদূরিত হয়। রমজান মাসের রোজা মস্তিষ্কে মুক্ত রক্ত প্রবাহ এবং সূক্ষ্ম অণু কোষগুলোকে

জীবাণুমুক্ত ও সবল করে। মস্তিষ্ক অধিক শক্তি ও স্নায়ুশক্তি অর্জন করে থাকে। রোজা দ্বারা ঈমানদার লোকদের মানসিক শক্তি এবং বিশেষ অনুভূতি শক্তি উপকৃত হয়। স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। মনোসংযোগ ও যুক্তিশক্তি বর্ধিত হয়। প্রেমশক্তি, সহানুভূতি, অতীন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটে। ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি পায়। খাদ্য গ্রহণে অরুচি ও অনিচ্ছা দূর হয়। রোজা রক্তের পরিশোধক। দেহে রক্তের পরিশোধন ও বিশুদ্ধি সাধন দ্বারা আমাদের শরীর প্রকৃতপক্ষে জীবনী শক্তি লাভ করে।

সুতরাং পরম হিতৈষী আল্লাহ্ পাক পরম করুণাময় যিনি আমাদের জন্য রোজার বিধান দিয়েছেন। এ বিধান মেনে চলার মধ্যে আমাদের অশেষ কল্যাণ নিহিত।

রমজানে অসুস্থ ও মুসাফিরদের জন্য বিশেষ ছাড়

সূরা বাকারা-২ : ১৮৫

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

The month of *Ramadan* in which was revealed The Quran, a guidance for mankind and a clear proofs for the guidance and the criterion (between right and wrong). And whosoever of you is present, let him fast the month and whosoever is ill or on a journey (let him past the same) number of other days. Allah intends for you easy and He does not want to make things difficult for you. (He wants) that you must complete The Prescribed period and that you must magnify Allah for having guided you so that you may be grateful to Him.

'রমজান মাস, যে মাসে অবতীর্ণ হয়েছে আল কোরআন, যা মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক এবং পথ প্রদর্শনের স্পষ্ট প্রমাণ এতে আছে। আর আছে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী বিধান। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসটি পাবে সে যেনো অবশ্যই পুরো মাস রোজা পালন করবে। আর যে কেউ অসুস্থ কিংবা ভ্রমণ কার্যে ব্যস্ত থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে। আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য আরাম চান। কোনো জিনিস জটিল করতে চান না। তিনি চান তোমরা অবশ্যই রোজার সংখ্যা পূরণ করবে। আর তোমাদের সুপথে পরিচালিত করার জন্য তার মহিমা ঘোষণা করবে যাতে তোমরা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।' (সূরা বাকারা-২ : ১৮৫)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন যে, পবিত্র কোরআন রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে আমরা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট

আলোচনা করবো না। এ আয়াতে আমরা দেখবো রমজান মাসে যারা অসুস্থ কিংবা ভ্রমণ কার্যে ব্যস্ত থাকে তাদেরকে ছাড় দেয়া হলো কেন।

প্রত্যেক সাবালক মুসলিম নারী-পুরুষকে বাধ্যতামূলকভাবে রমজান মাসে রোজা রাখতে হয়। রোজার অর্থ হলো রমজান মাসে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীমিলন থেকে বিরত থাকা। তবে অসুস্থ এবং ভ্রমণে বহির্গত নারী পুরুষের জন্য ঐ সময়ে রোজা পালন বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ অসুস্থ কিংবা ভ্রমণরত অবস্থায় রোজা রাখতে হবে না। সুস্থ হয়ে উঠলে বা ভ্রমণ থেকে ফিরে এলে যে কয়দিন রোজা রাখা হয়নি সে কয়দিন রোজা পূরণ করে দিতে হবে। রোজা না রাখার পক্ষে এ ছাড়-মঞ্জুরী আল্লাহ্ পাকের অশেষ অনুগ্রহ। তিনি এতোই মেহেরবান, বান্দার উপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন না। বরং বান্দার জন্য শান্তি , স্বস্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

অসুস্থ ব্যক্তিকে রোজা রাখা থেকে বিরত রাখা হয়েছে এজন্য যে, সারাদিন যদি রোগী পানাহার করতে না পারে তাহলে তার শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। এমন কতগুলো রোগ আছে যেগুলো দ্বারা আক্রান্ত হলে কয়েক ঘণ্টা পরপর রোগীকে খাদ্য, পানীয় ও ঔষধ গ্রহণ করতে হয়। এ রোগগুলোর মধ্যে ডাইরিয়া, আমাশয়, ব্রংকোনিমুনিয়া, এ্যাপেনডিসাইটিস, তীব্র প্রদাহ, মাইগ্রেন, মেনিনজাইটিস, টাইফয়েড জ্বর, ইনসুলিন ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

কলেরা ও আমাশয়ে আক্রান্ত অবস্থায় রোজা রাখলে শরীরে পানি শূন্যতা বাড়বে এবং তাপমাত্রায় অসমতা দেখা দেবে। ডায়াবেটিসে দারুণভাবে আক্রান্ত রোগীকে ঘনঘন ইনসুলিন ইনজেকশান নিতে হয়। এমতাবস্থায় রোজা রাখলে তার সংজ্ঞাহীনতা ঘটতে পারে, মাংসপেশী ফেটে যেতে পারে। অথবা চোখের কর্নিয়া আক্রান্ত হতে পারে। তীব্র টাইফয়েড জ্বরে যখন বমি হয়ে যায় তখন পানি পান করা ছাড়া উপায় থাকে না। মাইগ্রেন রোগের প্রচণ্ড ব্যথায় অনেক সময় বমি হয়ে যায়। সুতরাং অসুস্থ অবস্থায় রোজা রাখা থেকে বিরত থাকা খুবই বাস্তবসম্মত এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত।

ডায়াবেটিস কম থাকলে রোজা রাখা যায়। আমাদের দেশে সাধারণ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীরা রোজা পালন করে থাকেন এর ফলে তাদের শারীরিক অসুবিধা হয় না। সাধারণ জ্বর, ঠাণ্ডা লাগা, মাথা ধরা, মানসিক অবসাদ, নিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ, ফোসকা পড়া, ফুলে যাওয়া ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে রোজা পালন করা যায়। অর্থাৎ যে রোগগুলো ভয়ঙ্কর আকারের নয়, সারাদিন খাদ্য-পানীয় গ্রহণ না করলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না সেসব রোগী রমজান মাসে রোজা না এড়িয়ে ঐ মাসেই

রাখা সমীচীন। কারণ উল্লিখিত অসুখগুলোর জন্য রাত্রিকালীন সময়েও ঔষধ গ্রহণ করা যায়। মূলকথা হলো রোগীর উপরই নির্ভর করছে রোজা রাখা না রাখার ব্যাপারটি। প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ পাক মহান অন্তর্যামী। মানুষের অন্তর সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন।

বাড়ি নেমে ৪৮ মাইল দূরে যারা ভ্রমণে বের হয়ে থাকেন তাদেরকে মুসাফির বা ভ্রমণকারী বলা হয়। এরূপ ভ্রমণকারীদের করুণাময় আল্লাহ্ পাক রোজা এড়িয়ে যাওয়ার অধিকার দিয়েছেন। কারণ ভ্রমণকালে মুসাফির নিয়মিত সেহরী পাওয়ার সুযোগ নাও পেতে পারেন। সেহরী পাওয়ার জন্য হয়ত তাকে কষ্ট করতে হতে পারে। এছাড়া ভ্রমণকালে বিশ্রাম ও ঘুমের অভাবে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে। ফলে তার ভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। তবে কম কষ্টকর রোগের মতো যে ভ্রমণে বা সফরে তেমন কোনো কষ্ট নেই সে ক্ষেত্রে রোজা এড়িয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। অর্থাৎ যে ভ্রমণে সেহরী, ইফতারী ইত্যাদি সহজলভ্য হয়, বিশ্রাম নেয়ার সুব্যবস্থা থাকে সে ক্ষেত্রে ভ্রমণকারী রোজা না রাখার সুবিধা ভোগ করার পক্ষে কোনো অজুহাতেই জোরালো বলে বিবেচনা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সব রকম সফরে রোজা রাখা না রাখার বিষয়টি সফলকারীর উপরই নির্ভর করে।

সুতরাং যারা আল্লাহ্ পাকের দেয়া বিধানের প্রতি অনুগত থাকেন তারাই কেবল ঐসব বিধানের সুন্দর কার্যকারিতা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান লাভ করেন। আর মহামহিম আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তারিখ নির্ধারণের জন্য চাঁদ

সূরা বাকারা-২ : ১৮৯

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

They Ask you about the new Moons, Say : These are signs to mark fixed periods of time for mankind and for the Pilgrimage.

'তারা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে– আপনি বলে দিন, এটা মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ ও হজ্জের সময় ঠিক করার নিদর্শন।' (সূরা বাকারা : ১৮৯)

পৃথিবীতে মানব জাতির আগমন ঘটার পর সময় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দিন, মাস, বছর, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি এককগুলো কিভাবে নির্ধারণ করা যায় মানুষ তা চিন্তা করতে লাগল। সর্বপ্রথম তারা দৃশ্যমান সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাহায্যে সময়-কাল নির্ধারণ করার প্রয়াসে নিয়োজিত হলেন। কিন্তু তাতে দীর্ঘ সময়ের মান পরিমাপ করা বা মনে রাখার কোনো ব্যবস্থা দিলো না। এরপর রাত্রিকালে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন বাঁকা চাঁদ নির্ধারিত নিয়মে উদিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণতা লাভ করে। চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি অবলোকন করে দেখা গেলো, ২৯/৩০ দিনে চাঁদের ক্রমহ্রাস ও ক্রমবৃদ্ধি সংঘটিত হয়। আর এভাবে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধিকে হিসাবে নিয়ে চান্দ্রমাসের তারিখ গণনার সূচনা হয়।

পরবর্তীকালে ক্যালেন্ডার তৈরির কাজে চাঁদকে প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নির্ভুলভাবে সময়ের ব্যবধান নির্ণয় করতে হলে অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সময় সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে ক্যালেন্ডারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে প্রথমে সময়ের একক ঠিক করা বাধ্যতামূলক যা সহজেই মানুষের বোধগম্য হয়। ক্যালেন্ডার প্রণয়নের কাজে তিন ধরনের একক ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো সৌরদিন (Solar day). চান্দ্রমাস (Lunar month) এবং ক্রান্তীয়-বর্ষ (Trofical year)। এই তিন ধরনের একক সৌর জগতের তিন ধরনের পৃথক ক্রিয়া-কর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সৌরদিন হলো পৃথিবী সূর্যের সম্মুখভাগ থেকে নিজ অক্ষে আবর্তন করে পুনরায় যখন সূর্যের সামনে আসে এ সময়কে সৌরদিন বলা হয়।

চান্দ্রমাসের সম্পর্ক চাঁদের সাথে। চাঁদ যখন সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীকে একবার আবর্তন করে সেই আবর্তনকালকে বলা হয় চান্দ্রমাস। এক নতুন চাঁদ থেকে আর এক নতুন চাঁদের সময়কালকে যদি চান্দ্রমাস ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এই সময়কারের ব্যাপ্তি ২৯ দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে তারতম্য ঘটে। চান্দ্রমাসের গড় দৈর্ঘ্য ঠিক ২৯.৫৩০৬ দিন। সুতরাং এ অবস্থায় দিনকে মাসে মিল খাওয়ানো খুবই কষ্টকর।

সময়ের তৃতীয় একক হলো ক্রান্তীয় বছর। পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে যে সময় লাগে সে সময়কে বলা হয় এক বছর। এই এক বছরে দিনের সংখ্যা ধরা হয় ৩৬৫। দিন যে গড়িয়ে যাচ্ছে তা বুঝা যায় ঋতু পরিবর্তনের ফলে। ঋতু পরিবর্তনের ঘটনাটি রাত্রে দৃষ্টিগোচর হয় নক্ষত্রের পরিবর্তনের মাধ্যমে। আর দিনের বেলা পরিলক্ষিত হয় সূর্যের গতিপথের পরিবর্তনের মাধ্যমে।

এ আয়াতে বলা হয়েছে নতুন চাঁদের ক্রমবৃদ্ধি ও ক্রমহ্রাসের ভিত্তিতে ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা সহজ। চান্দ্রমাসভিত্তিক ক্যালেন্ডারে যে এককগুলো ধরা হয় সেগুলো হলো সৌরদিন। চান্দ্রমাস এবং চান্দ্র বছর। ১২ মাসে এক চন্দ্রবছর হিসাব করা হয় এরূপ ক্যালেন্ডারকে 'হিজরী ক্যালেন্ডার' বলা হয় এবং এই ক্যালেন্ডার সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত আছে। চান্দ্রমাসের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয় ২৯ অথবা ৩০ দিনে। নতুন চাঁদ দেখে চান্দ্রমাস শুরু হয়। চান্দ্রমাসের গড় দৈর্ঘ্য ২৯.৫৩ দিন। কিন্তু হিজরী মাসের গড় দৈর্ঘ্য ২৯.৫০ দিন। সুতরাং এক বছরে চান্দ্রমাসভিত্তিক ক্যালেন্ডার ০.৩৬ (৮ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট) দিন অগ্রগামী থাকে। এর ফলে প্রতীয়মান হয় যে, নতুন চাঁদের সাথে মাস শুরু হয়নি। এ অসুবিধা দূর করার জন্য হিজরী ক্যালেন্ডারে ৩০ বছরকে কেন্দ্র করে ১৯ বছরে যে বলয়গুলো তৈরী করা হয়েছে সেই বলয়ে দিনের সংখ্যা ২৯ দিন। কিন্তু পরবর্তী ১১ বছরের বলয়গুলোর দিনের সংখ্যা ৩০ দিন। এর ফলে মাসের গড় দৈর্ঘ্য ২৯.৫০ দিন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯.৫৩০ ৫৬৬ দিনে উন্নীত হয়। এটা প্রায় এক চান্দ্রমাস থেকে ৩ সেকেণ্ডে কম। এই ক্যালেন্ডার চাঁদের সঙ্গে অতিশয় সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ক্যালেন্ডারে ২৫০০ বছরে মাত্র ১ দিনের গড়মিল হয়।

সৌর ক্যালেন্ডার মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। এ ক্যালেন্ডার সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই হিসাবকরণ সাধারণ মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। তবে নতুন চাঁদ উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পর্বের মাধ্যমে শুরু থেকে চান্দ্রমাসের যাত্রা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক যেন প্রকৃতির মধ্যে একটি সহজে দৃশ্যমান ক্যালেন্ডার ঝুলিয়ে রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে চান্দ্রমাস

তথা চান্দ্রবর্ষ ক্যালেন্ডার সবলতার দিক থেকে সার্বজনীন ও আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

চান্দ্রমাস কেন্দ্রিক ক্যালেন্ডারে ঋতুসমূহের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ক্যালেন্ডারের তারিখ পরিবর্তনের সাথে সাথে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে। হিজরী বছরের গড় দৈর্ঘ্য সৌরবছরের দৈর্ঘ্যের চেয়ে ১১ দিন কম হয়। এ কারণে ৩৩ বছরের মধ্যে ঋতুগুলো চান্দ্রমাসের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে থাকে। বর্তমান জীবন যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে চান্দ্রমাসের হিসাব সম্পর্কে সবার উদাসীনতার পরিচয় দিলেও ধর্মীয় জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ রোজা পালন ও হজ্জব্রত পালন এবং কোনো কোনো নামায চান্দ্রমাসের হিসাবেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। একই সঙ্গে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সময়ে রোজা পালন করে থাকে।

মানুষ একটি জাতের বলয়ভুক্ত

সূরা বাকারা-২ : ২১৩

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً.

Mankind was one single nation.....

'মানব জাতি একক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত'। (সূরা বাকারা : ২১৩)

এই আয়াতাংশে বলা হয়েছে সমগ্র মানব জাতি আদিম মানুষের গোত্রভুক্ত। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদি পিতা আদম (আ)। মূলত তাঁরই বংশ থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে বিশাল মানব জাতি।

মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম 'Homo Sapiens'। বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক Linnaeus মানব প্রজাতির এ নামকরণ করেছেন। আদি যুগে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলো। এ জনগোষ্ঠী থেকে পরিবারসমূহের উৎপত্তি ঘটে। কালক্রমে মানুষ ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বময় বিভিন্ন গোত্র, ধর্ম ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নতুন নতুন এলাকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। এ উপনিবেশ স্থাপনের ফলে এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের লোকের সাথে মিশে সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি করে। ফলে তাদের সগোত্রীয় সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে। এ বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জনসমষ্টির সমন্বয়ে নতুন জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব মানুষের বেঁচে থাকার জাগতিক সুযোগ-সুবিধা আল্লাহ পাক দান করেন এবং তার ফলে তাদের টিকে থাকা নিশ্চিত হয়।

এভাবে পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠী পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে যেসব জনগোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে তাদের নারী-পুরুষদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করে। এতদসত্ত্বেও মানব প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে কিছু দৈহিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এসব পার্থক্য ভৌগলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক ভিন্নতা ও পরিবেশের প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। বড় রকমের পার্থক্য দেখা যায় দেহের গঠন ও গায়ের রঙের মধ্যে এবং আরও বড় ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় চেহারার গঠন, ঠোঁট ও নাকের গঠনের মধ্যে। এ পার্থক্যগুলোর উপর ভিত্তি করে নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা (Antropologists) মানুষের শ্রেণী বিভাগ করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। একই ধরনের মানুষদের নিয়ে এক

একটি জাতি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান প্রধান জাতি সমষ্টিকে Caucasoid, Negroid, Mangoloid এবং Australoid-এ চার নামে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন, ককেশিয় (Caucasoid) জাতির লোকদের মাথার চুল ঢেউ খেলানো, নাসিকা সরু ও তীক্ষ্ম এবং গায়ের রঙ সাদা। নিগ্রো (Negroid) জাতির লোকদের মাথার চুল ঘন কোঁকড়ানো, নাসিকা চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ মিশিকালো। মঙ্গলীয় (Mongoloid) গোত্রের লোকদের মাথার চুল খাড়া নাসিকা মাঝামাঝি ধরনের চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ পীত বর্ণ এবং অস্ট্রেলীয় (Australoid) গোত্রের লোকদের মাথার চুল কোঁকড়ানো, নাসিকা মাঝামাঝি রকমের চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ বাদামী। এসব জাতি গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে এবং এরা পৃথিবীর ভৌগলিক সীমার বৈচিত্রের মধ্যে বসবাস করে থাকে।

উপরোক্ত পার্থক্যগুলো প্রত্যক্ষ করে মিঃ ডারউইন মানব বিবর্তনবাদ তত্ত্বে বলেছে, "প্রতিটি জীব বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বলে বর্তমান আধুনিক মানব প্রজাতির সদস্যরা বিবর্তনের আওতাভুক্ত এবং আদি Primate-এর একটি শাখার উন্নত সংস্করণই বর্তমান সুন্দর মানব। বহুকোষী কর্ডাটা পর্বের মেরুদণ্ডী ও স্তন্যপায়ী চার পাবিশিষ্ট বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষ প্রাইমেটের অন্তর্ভুক্ত। আদি প্রাইমেটের বিবর্তনের বিভিন্ন শাখায় কেউ হয়েছে বানর, কেউ হয়েছে গরিলা, কেউ শিম্পাঞ্জি এবং সর্বাধিক বিবর্তনের সহায়ক প্রজাতির একটি শাখা মানুষে পরিণত হয়েছে।" এই তত্ত্বের পক্ষে জোরালো কোনো ব্যাখ্যা ডারউইন দিতে পারেনি এবং পরবর্তী পর্যায়ে তার অনুসারীরা যেসব ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে তা মানুষ সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং সাংঘর্ষিক।

মানব জাতির বিবর্তন অন্য কোনো প্রাণীর সহায়ক প্রজাতি থেকে ঘটেনি। এ বিবর্তন ঘটেছে পরিবর্তন, নির্বাচন, দেশত্যাগ ও ভৌগোলিক দূরত্বের মাধ্যমে। উল্লিখিত দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রে বিভিন্ন ভৌগলিক এলাকার একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যের জন্য দায়ী।

বিগত ৫০০ বছর কিংবা তারও অধিক সময়ে ব্যাপক হারে মানুষ দেশ ত্যাগ করছে এবং ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের লোকদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। ফলে বংশের বৈশিষ্ট্য বহনকারী জিন (Gene) ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করেছে। অবশ্য উল্লিখিত সময়ের আগে বিভিন্ন ভৌগলিক এলাকা এবং মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি মোটামুটি সমতা বিদ্যমান ছিলো। বর্তমানে মানব সদস্যগণ ব্যাপক দূরত্বের দ্বারা একে অপরের কাছ থেকে আর বিচ্ছিন্ন নয়। এখন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে দূরত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে।

আমেরিকার শরীর বিজ্ঞানী (Physiologist) W.C. Boyd ১৯০৩ সনে মানুষের শ্রেণী বিভাগের প্রস্তাব করেছিলেন। তার প্রস্তাবের ভিত্তি ছিলো জিন নির্ধারক রক্তের ধরন। রক্ত চার ধরনের যথা- A, B, AB এবং O। ১৯০১ সালে Landsteiner এ চার ধরনের রক্ত আবিষ্কার করেন। এসব রক্তের গ্রুপ নির্ধারিত হয়েছে বিশেষ তিন ধরনের এ্যালেলিক (Allelic) জিনের সমন্বয়ের মাধ্যমে। মানুষের রক্তের গ্রুপগুলো বিশ্লেষণ করে বর্তমান বিজ্ঞানীরা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন। এভাবে রক্তের গ্রুপ বিশ্লেষণের সহায়তায় নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা যেসব মানুষ বহু আগে দেশ ত্যাগ করে ইউরোপ ও এশিয়ায় এবং পরবর্তীতে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে তাদের সন্ধান লাভে সক্ষম হয়েছে।

বংশগত বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের ভিত্তিতে যদিও Homo Sapience কে আনুপাতিক হারে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে তা সত্ত্বেও মানব প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে মিলই বেশি পরিলক্ষিত হয়। সব মানুষের মধ্যে তুলনামূলক দেহ-অবয়ব ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং সকল মানুষের দেহ একই রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। মানুষের ক্রোমোজম সংখ্যা ২৩ জোড়া এবং রক্তের গ্রুপ সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। প্রাইমেট-এর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষের ক্রোমোজমের সংখ্যা ও DNA-এর গঠন সম্পূর্ণ আলাদা। এ আলাদা হওয়ার কারণ হলো ঐসব প্রাণী থেকে মানুষের মগজ বড় এবং উর্বর। সোজা হয়ে হাঁটতে পারার ক্ষমতা বেশি, বিবেক বুদ্ধি দ্বারা লিখতে ও পড়তে পারে, কথা বলার ক্ষমতা অসীম, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে দক্ষ এবং মুষ্টিবদ্ধ করার কৌশল জ্ঞাত। সমগোত্রীয় সন্তার মানুষের দৈহিক উর্বরতা মাঝামাঝি ধরনের কিন্তু মিশ্র গোত্রীয় বংশোদ্ভূত মানুষ পূর্ণমাত্রায় উর্বর। জৈবিক মাপকাঠির ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায় সব মানুষী একটি মাত্র জাতের বলয়ভুক্ত।

মদ্যপান ও জুয়ার ক্ষতিকর প্রভাব

সূরা বাকারা-২ : ২১৯

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا.

They ask you (O Mohammad!) about alcoholic drink and gambling. Say : In both is a great sin and some utility for men; But the sin of them is greater than their usefulness.

তারা আপনাকে (মুহাম্মাদ সা.) মদ্যপান ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলে দিন, এই উভয় বিষয়ের মধ্যে নিহিত আছে মহাপাপ। কিছু উপকারিতাও আছে। কিন্তু উপকারিতার চেয়ে পাপের পরিমাণ সর্বাধিক প্রবল। (সূরা বাকারা : ২১৯)

এই আয়াতাংশের আলোচ্য বিষয় দু'টির একটি হলো 'আল খামর' অপরটি 'আল মাইসির'।

আল খামর শব্দটি পবিত্র কোরআন ও হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি দ্বারা ঐ সমস্ত বস্তুকে বুঝানো হয় যে বস্তুগুলো নেশা সৃষ্টি করে। নবীজি (সা) হাদিস শরীফে বলেছেন, যেসব বস্তু দ্বারা নেশা সৃষ্টি হয় সেসব বস্তু আল খামর-এর অন্তর্ভুক্ত। নেশা উৎপাদনকারী অ্যালকোহল এবং অ্যালকোহল সম্বলিত তরলের সাথে অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু মিশিয়ে যে নেশা দ্রব্যগুলো তৈরি করা হয় যেমন, ব্র্যান্ডি, হুইস্কি, জিন, রাম (Rum), ভোদকা (Vodka), পালকোয়ে ও টেকিইলা (Pulque and tequila), লিকার (Liqueure) প্রভৃতি। এভাবে হেরোইন, কোকেন ও কোরেক্স মাদক দ্রব্যগুলোও খামর-এর আওতাভুক্ত। নেশা দ্রব্যগুলো সেবন করার সাথে সাথে মস্তিষ্কের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যায় এবং মত্ততা সৃষ্টি হয়। তাই নবীজি (সা) বলেছেন, "সকল নেশা দ্রব্যই হলো খামর এবং সকল প্রকার খামর মানুষের জন্য নিষিদ্ধ।"

অ্যালকোহল তথা মাদক দ্রব্য সেবন করার পর কোটি কোটি পরমাণু রক্তে প্রবেশ করে। এরপর মস্তিষ্কে পৌঁছে সেখানে জোরালোভাবে কাজ করে। মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের অবনতি ঘটায় এবং কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর নেতিবাচক

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এটা সকলে স্বীকার করেন যে, অ্যালকোহল পান করলে কাজ করার পক্ষে কিছু জোরালো উত্তেজনা ও উন্মাদনা প্রথমে সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা আসলে প্রতারণামূলক। এরূপ প্রতারণার শিকার হয়ে মাদকসেবীরা মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়ে।

মস্তিষ্কে অ্যালকোহল বিদ্যমান থাকলে পেশী সঠিকভাবে সাড়া দিতে পারে না এবং মস্তিষ্ক থেকে যে স্নায়ু সংকেত ভোলান্টারী পেশীতে সঞ্চারিত হয় তা ব্যাহত হয়। এর ফলে স্বয়ংক্রিয় পেশীতে পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে। পেশীর সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে যে অপারগতা তার কারণ হলো দীর্ঘকালীন পক্ষাঘাতের ফলশ্রুতি মস্তিষ্কে অ্যালকোহল থাকলে স্বয়ংক্রিয় পেশী স্নায়ু সংকেতকে মান্য করার আগে একটি দীর্ঘকালীন বিলম্ব সৃষ্টি করে।

অ্যালকোহল পান করলে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তা ব্যক্তির কোনো কল্যাণ সাধন করে না বরং ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করে। মেক্সিকোর ডা. Cauron বলেছেন, 'Alcohol the king of poison in Mexico is the direct cause of most of the criminal offences like aggression, homicide, theft, attacking women and property damage etc.'

A.A.M Forel লিখেছেন, 'Experience shows that in all countries where the alcoholic habit reigns, it accounts for one-half of three fourths of the crimes, a great share of suicides, of mental disorders, of deaths, of diseases generally, of proverty, of vulgar depravity, of sexual excesses, veneral diseases and of dissolution of families.'

এটা দেখা যায় যে, কম মাত্রায় অ্যালকোহল উত্তেজক এবং বেশি মাত্রায় নিস্তেজকরূপে কাজ করে। খুব কম মাত্রায়ও অ্যালকোহল স্বাদ ও ঘ্রাণ নেয়ার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। কম মাত্রার অ্যালকোহল স্নায়ু ক্রিয়ার সমন্বয় এবং স্থান ও সময়ের অনুভূতিকে বিকল করে দেয়। গাড়ি চালনার জন্য এ সকল অনুভূতি সক্রিয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। মাঝারি মাত্রার অ্যালকোহল ব্যথার অনুভূতি কমিয়ে দেয়। অ্যালকোহল সেবন অব্যাহত থাকলে শরীরের সাথে তা সমন্বয় (Adjust) হয়ে যায়। এর ফলে শুরুতে অল্প মাত্রায় পান করলে সেরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে না। তাই অধিক মাত্রায় পান করতে হয়।

হঠাৎ অ্যালকোহল পানে বিরতি দিলে জৈব ক্রিয়াকলাপে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয় যার ফলে ভীষণ দৈহিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলো

হলো অতি উত্তেজক অবস্থা, অলীক দর্শন (Hallucination), অনিদ্রা এবং হাত পায়ের কাঁপুনি যা অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে।

অ্যালকোহলের ক্যালরি মূল্য অত্যন্ত বেশি। কোনো ব্যক্তি ৭৫০ মিলি ১০০ প্রুফ পানীয় প্রতিদিন পান করলে প্রায় ২০০০ ক্যালরি বা তার মোট ক্যালরি চাহিদার ৭০-৮০% পেয়ে থাকে। কিন্তু এতে খাদ্যের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন, প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ লবণ না থাকায় অ্যালকোহল নির্ভর ব্যক্তি অপুষ্টির শিকার হয়। তাছাড়া অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবীদের ক্ষুদ্রান্ত থেকে ভিটামিন B_1, B_{12} এবং কিছু অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড কম পরিশোধিত হয় যা অপুষ্টির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়।

অ্যালকোহল নির্ভর ব্যক্তিদের বেরিবেরি, পেলাগ্রা, রক্তশূন্যতা, স্কার্ভি, এনসেফালোপ্যাথি ইত্যাদি রোগ বেশি দেখা যায়। আগে ধারণা করা হতো অ্যালকোহল সেবীদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজনের সিরোসিস (Cirrosis) হয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সিরোসিস হওয়া মূলত অ্যালকোহল পানের পরিমাণ এবং সময়কালের উপর নির্ভরশীল। কোনো ব্যক্তি ২০০ গ্রাম ইথানল ক্রমাগত ২০ বছর পান করলে তার সিরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা ৫০%।

ঘন ঘন অ্যালকোহল সেবন করার ফলে বমির ভাব দেখা দেয়। তাছাড়া অল্পমাত্রায় ঘন ঘন মদ্যপান করলেও তা থেকে হাইপার ক্লোরিড্রিয়া (Hyper Chlorhydria) (রোগ হয়। এই রোগ থেকেই পেপটিক আলসার হয়ে থাকে। যেসব দেশে মদ্যপান অনুমোদন লাভ করেছে সেসব দেশে পেপটিক আলসার খুবই সাধারণ ঘটনা।

অ্যালকোহল পানের উপকারিতার মধ্যে আমরা দেখি যে, এটা সহজে শোষিত হয় এবং ক্যালরি আকারে দেহে শক্তি যোগায়। কিন্তু খাদ্যের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে না বলে অ্যালকোহল পানকারী প্রায় অপুষ্টির শিকার হয় যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস জোরালো হয় এবং রক্ত সঞ্চালনের গতি বৃদ্ধি পায়। ইথাইল অ্যালকোহল আরো বহুভাবে ব্যবহৃত হয় যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক. পাতিত পানিতে (Distilled water) ৯০% অ্যালকোহল যোগ করে উত্তম এ্যান্টিসেপ্টিক তৈরি করা হয় যা ইনজেকশন দেয়ার কাজে, রক্ত নেয়ার সময়, অস্ত্রপচারের সময় এবং শল্য-চিকিৎসকদের হাত ধৌত করা কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

খ. আয়োডিন টিংচারের মতো অ্যালকোহল টিংচার এ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি অস্ত্রপচারের আগে চামড়া পরিষ্কার করার কাজেও লাগে।

গ. বহু ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নির্গত করার কাজে অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়। কারণ রাসায়নিক পদার্থ অ্যালকোহলের মধ্যে সহজে শোষিত হয়। এটা কিছু সুগন্ধি দ্রব্যের দ্রবণ হিসেবেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ঘ. প্রিজার্ভেটিক হিসেবে অ্যালকোহল খুবই ফলপ্রদ।

সুতরাং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর অ্যালকোহল যে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তা সব সময় ক্ষতিকর এবং এটা পানীয় হিসেবে কতো ক্ষতিকর উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী থেকে তা প্রতীয়মান হয়। উপরন্তু অন্যান্য মাদক দ্রব্য হেরোইন, কোকেন, কোরেক্স প্রভৃতি শুধু ক্ষতিকর নয় এগুলো মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষয় হলো 'আল মাইসির' বা জুয়াখেলা। প্রাচীনকাল থেকে এ পর্যন্ত আর্থিক আয়ের জন্য বিভিন্ন আকারে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে জুয়াখেলা চলে আসছে। এ জুয়াখেলাকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন দেশে সমাজ সচেতন নাগরিকরা খুব জোরালোভাবে বাধা দিয়েছে এবং একে প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালিয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশে জুয়া নিয়ন্ত্রণ আইন চালু আছে। একে নিয়ন্ত্রণ করার আইন চালু করা হয়েছে এজন্য যে, জুয়াখেলায় বড় ধরনের পরাজয় হয় এবং ঐ পরাজয়ের ফলে বির্তক দেখা দিলে তা থেকে শুরু হয় যুদ্ধ, হত্যা, আত্মহত্যা এবং প্রতারণা।

জুয়াখেলার ক্ষতিকারক দিকগুলো বিবেচনা করলে দেখা যায় একজন জুয়াড়ি কোন সময় একবার কিছু অর্থ জিততে পারলে প্রবলভাবে তার লোভ বেড়ে যায়। পরিশেষে তাকে সব হারাতে হয়। এটা সত্য যে, একজন জুয়াড়ি একবার জয়ী হয় মাত্র বাকী সবসময় হেরে যায়। মদ্যপানের মতো জুয়াখেলাও মনের মধ্যে তীব্র আবেদন যোগায় যার দরুন আর্থিক ক্ষতি বরণ করে নিয়েও জুয়াড়ি জুয়াখেলায় প্রবৃত্ত হয়। এমনিভাবে বহু সচ্ছল ও সম্পদশালী জুয়াড়ি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং তাদের পরিবার বর্গকে চরম দারিদ্র্যতার মধ্যে ঠেলে দেয়, আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হলে জুয়াড়ি ব্যক্তির পারিবারিক জীবন অসুখি হয়ে পড়ে। এমনকি এক পর্যায়ে তার সংসার ভেঙ্গে যায়। জুয়াখেলার অর্থ যোগার করার জন্য জুয়াড়ি ব্যক্তি অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করে কিংবা ছিনতাই করার পথে নামে। এছাড়া সে অন্যকে প্রবঞ্চিত করে কিংবা বিভিন্ন ধরনের অপরাধের মাধ্যমে জুয়াখেলার অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা চালায়।

পরিশ্রম, জ্ঞান, ও যোগ্যতা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র সুযোগের (Chance) বলে যদি জুয়াড়ি ব্যক্তি অগাধ অর্থের অধিকারী হয় তবে তা ঐসব মানুষের সামনে একটি খারাপ নজীর স্থাপন করবে যারা সমাজে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে হালাল রুজীর ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলোকে আর্থিক সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে রাষ্ট্র পরিচালিত যেসব লটারী চালু করা হয়। সেসব লটারীর দ্বারা মানুষের মধ্যে দানশীলতার বৃত্তি বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে না বরং এসব লটারীর ফলে মানুষের মনের মধ্যে অর্থ লাভের লালসা বেড়ে ওঠে। তাই এটা এক ধরনের আত্ম-প্রতারণার সামিল, আর লটারীর মাধ্যমে অর্থ প্রাপ্তি ঠিক যেন বহু লোকের নিকট থেকে সূক্ষ্ম পন্থায় অর্থ চুরি করে নেয়ার সামিল।

মদ্যপানের মতো জুয়াখেলা যে ক্ষুদ্র উপকারিতা লক্ষ্য করা যায় তা হলো কিছু অর্থ বিনিয়োগ করে একজন জুয়াড়ি বেশ একটা মোটা অঙ্কের অর্থ অর্জন করে নেয়। জুয়াড়ি ব্যক্তি প্রায় সুযোগ সন্ধানী হয়ে থাকে এবং সুযোগ পেলে কিছু অর্জন করতে পারে। সামান্য কিছু বাজী রেখে জুয়াখেলা দ্বারা জুয়াড়ির বিনোদন হয় বলে মনে করে।

সুতরাং এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বেশ কয়েকটি আয়াত আছে যেখানে বলা হয়েছে মদ্যপান, জুয়াখেলা, তীর লটারী ইত্যাদি শয়তানী কাজ। এগুলো দ্বারা মানুষের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয় অথচ উপকারিতার পরিমাণ অতি নগণ্য।

মহিলাদের ঋতুস্রাব দেহ তাত্ত্বিক ঘটনা

সূরা বাকারা-২ : ২২২

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

They ask you concerning menstruation, Say : It is discomfort and pollution so let women alone at such times and go not unto them till they are purified. And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah has ordained for you. Truly Allah loves those who turn unto him and loves those who care for cleanness.

লোকেরা আপনাকে (হে মুহাম্মাদ) জিজ্ঞেস করে মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে। আপনি বলে দিন– এটা এক ধরনের অসুস্থতা ও অপবিত্রতা। সুতরাং এ সময় মহিলাদের একা থাকতে দাও এবং যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হচ্ছে ততোক্ষণ তাদের সান্নিধ্যে যাবে না। আর যখন তারা নিজেরা পবিত্র হয়ে যাবে তখন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তাদের সান্নিধ্য উপভোগ করো। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পাক তাদের ভালোবাসে যারা তার আদেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদেরকে ভালোবাসে যারা পবিত্রতার প্রতি যত্নবান। (সূরা বাকারা : ২২২)

প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের জরায়ু থেকে মাসে ৫-৭ দিন ধরে যে রক্তক্ষরণ হয় তাকে ঋতুস্রাব বা মাসিক বলা হয়। গর্ভবতী না হওয়া পর্যন্ত মহিলাদের এ ধরনের ঋতুস্রাব হয়ে থাকে। এটা একটি দেহজাত ঘটনা কিন্তু বিপদ মুক্ত নয়। পবিত্র কোরআনে এটাকে অসুস্থতা ও অপবিত্রতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও সমর্থন রয়েছে।

ঋতুস্রাবকালে আল্লাহ পাক স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত।

ঋতুস্রাবের সময় জরায়ুর মুখ খুলে যায়। এরপর সেই খোলাপথে ঋতুস্রাব ঘটে।

ঋতুস্রাবের রক্ত দূষিত এবং তা বহির্গত হওয়ার কারণ দেহ তাত্ত্বিক ঘটনা। যদি জরায়ুর মধ্যে নিষিক্ত ডিম্বাণু কিংবা ভ্রূণ নিহিত না থাকে তাহলে তা থেকে আঁটালো রক্তরস ঋতুস্রাব হিসেবে বেরিয়ে আসে। গর্ভে সন্তান আসলে তখন আর মাসিক বা ঋতুস্রাব হয় না।

মাসিক চলাকালে জরায়ুর মুখ খোলা থাকে বিধায় বাইরে থেকে রোগ জীবাণু দ্বারা সংক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে যদি এ সময় যৌন মিলন ঘটে। তাছাড়া, যৌন-নালীতে যদি ইনফেকশান থাকে তবে সেই ইনফেকশান ভেতরের দিকে বিস্তৃত হতে থাকে। জরায়ুর দুই পাশে যে দু'টি ফিলোপিয়ন টিউব থাকে সেই দুটি টিউবের মাধ্যমে জরায়ু সরাসরি তলপেটের গহ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত। এ সংযুক্তির কারণে সংক্রমণ খুব সহজে বিস্তার লাভ করতে পারে। আর নারীর যৌন-নালীতে যদি গনোরিয়া ও সিফিলিস রোগের সংক্রমণ থাকে তবে ঐ সংক্রমণ দ্রুত ভেতরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে ঋতুস্রাবকালে যৌন-মিলন ঘটলে। এভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার দরুন স্ত্রীদেহে Endometritis salpingitis, Peritonitis এমনকি Pelvic Cellulitis রোগের সংক্রমণ হয়। যদি কোনো মহিলা লিউকোরিয়া (শ্বেতস্রাব) রোগে ভোগে তাহলে তার স্বামীর মূত্রনালীতে ট্রাইকোমোনাল (Trichomonal) রোগ সংক্রমিত হয়। এ রোগে আক্রান্ত স্বামী অতি সহজে তার স্ত্রীর শরীরে ঋতুস্রাবকালে যৌন রোগের উপস্থিতির পথ সুগম করে দেয়।

বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ Wilfrid Shaw লিখেছেন, স্বাভাবিক ঋতুস্রাবে মহিলারা অস্বস্তি বোধ করে। বিশেষ করে এ অস্বস্তি অনুভূত হয় তলপেটের নিম্নাংশে। কোনো কোনো বালিকা তাদের প্রথম ঋতুস্রাবকালে তীব্র ব্যথা অনুভব করে এবং কারো কারো ক্ষেত্রে এ ব্যথা সারাজীবন ধরে তাদের মাসিককালে অনুভূত হয়ে থাকে।

জন গ্রাহাম লিখেছেন, 'Since there is chance of spreading disease and getting infection during menstruation, It cannot be regarded as absolutely normal and physiolocigal'.

একজন বৃটিশ লেডী ডাক্তার ক্যাথেরিন ডালটন ১৯৫৯-১৯৬১ সন সময়কাল ধরে যুক্তরাজ্যে চাকরিজীবি মহিলাদের মাসিকের কার্যকারিতার উপর গবেষণা চালিয়ে দেখিয়েছেন যে, মাসিক শুরু হওয়ার ঠিক আগে কিংবা মাসিক চলাকালে মহিলাদের দক্ষতা এবং দৈহিক উপযুক্ততা অনেকখানি কমে যায়। ডাঃ ক্যাথারিন আরো উল্লেখ করেছেন বিষণ্নতা, অমনোযোগিতা এবং কাজের প্রতি অনীহা এসময়

২৬%-৩৬% বৃদ্ধি পায়। যেসব বালিকার অভ্যাস খারাপ তারা ঋতুস্রাবকালে অধিক মাত্রায় অপরাধ করে। তিনি তার গবেষণায় আরো দেখিয়েছেন ৬ষ্ঠ গ্রেডের ছাত্রীদের মধ্য থেকে ১১জনকে শ্রেণী ক্যাপ্টেন বানানো হয় যাদের বয়সসীমা ১৬-১৮ বছরের মধ্যে। এসব ক্যাপ্টেনকে ক্ষমতা দেয়া হয় ক্লাশে দুষ্ট ছাত্রীদের শাসন করার জন্য। এটা লক্ষণীয় ব্যাপার যে, ঐসব শ্রেণী ক্যাপ্টেনরা নিজেদের মাসিককালে অন্যান্যদের শাস্তি দেয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আবার মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে তারা স্বাভাবিক আচরণ করে। ডাঃ ক্যাথরিন প্রশ্ন করেছেন যে, যদি এরূপ আচরণ সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে সত্য হয় তাহলে শিক্ষিকা, মহিলা পুলিশ, মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রশাসনে নিযুক্ত অন্যান্য মহিলাদের ক্ষেত্রে এ সত্য প্রযোজ্য।

সুতরাং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, ঋতুস্রাবকে এক ধরনের অসুখ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা খুবই যুক্তিসঙ্গত। এ সময় সকল মহিলার উচিত ভারি কাজ পরিহার করা। কারণ তাতে রোগ সংক্রমণ সম্প্রসারিত হতে পারে।

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে আল্লাহ পাক স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞার পক্ষে সারযুক্তি বিদ্যমান। ডাঃ গ্রাহামের মতে, ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস না করার বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক নয় বরং স্বাস্থ্যগত। তাছাড়া ঋতুকালে স্ত্রী-মিলনের ব্যাপারটি একজন রুচিসম্পন্ন পুরুষের কাছে অসূচিমূলক ও অনাকাঙ্ক্ষিত। তাই এসময় স্বামী-স্ত্রী আলাদা আলাদা বিছানায় থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলাম ধর্মে এ সময় নারীদেরকে নামাজ ও রোজা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। কারণ ঋতু-রক্তকে অপবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে এবং এ সম্পর্কে যেসব নিয়ম-রীতি প্রচলিত আছে তা বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত।

স্ত্রীগণ আবাদী জমির মতো

সূরা বাকারা-২ : ২২৩

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Your wives are a tilth to you; So approach your tilth as you will and send (good deeds, or ask Allah to bestow upon you pious off spring) for your ownselves before hand.

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের নিকট আবাদী জমির মতো। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো। আর (আল্লাহর কাছে নেক সন্তান প্রার্থনা করো) নিজেরদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা করো। (সূরা বাকারা : ২২৩)

এই আয়াতে স্ত্রীগণকে স্বামীদের আবাদী জমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা খুবই প্রণিধানযোগ্য বিষয়।

আবাদী জমি কৃষকের নিকট তার মূল্যবান সম্পদ। কারণ আবাদী জমি তার জীবন ধারণের জন্য শস্যদান করে থাকে। চাষী নিজের জমি চাষ করার সময় সবদিক বিবেচনা করে। তাকে বিচার-বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে কাজ করতে হয়। নতুবা তার কপালে দুঃখ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বীজ বপনের আগে তাকে কতগুলো পূর্বশর্ত বিবেচনা করতে হয়। যেমন, ভালোভাবে জমিতে চাষ দেয়া, জমি থেকে আগাছা নিড়িয়ে নেয়া, সেচের ব্যবস্থা করা ও যথাযথভাবে সার দেয়া। এসব বিষয় বিবেচনা না করে বীজ বপন করলে ভালো ফসল আশা করা যায় না।

একজন ভালো চাষী জানে যে, শীতের ফসল গ্রীষ্মে জন্মে না। আর গ্রীষ্মের ফসল শীতে জন্মে না। তাই সে বীজ বপনের পূর্বে "সময়" সম্পর্কে সচেতন থাকে। অর্থাৎ সে ঐ সময়ে বীজ বপন করে যখন সেভাবে যে, তার জমি এখন প্রস্তুত।

একইভাবে একজন স্বামীকে ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তার স্ত্রী দৈহিক ও মানসিকভাবে সহবাসের উপযোগী কিনা। অথবা গর্ভধারণে আগ্রহী কিনা। যখন স্ত্রী ঋতুস্রাবের দরুন অপবিত্র থাকে তখন স্বামী তার কাছে যাবে না। স্ত্রী অসুস্থ থাকলেও তার কাছে যাবে না। সন্তান প্রসবের ৪০ দিনের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রী সহবাসে অংশ নেবে না। এমনকি স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে তার ইচ্ছার

বিরুদ্ধে দৈহিক মিলন থেকে স্বামীকে বিরত থাকতে হবে। অর্থাৎ বিধি-নিষেধের সীমারেখা অতিক্রম করে স্বামী স্ত্রীর যৌন সংসর্গ মোটেও জ্ঞানসম্মত নয়।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মিলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশধর পৃথিবীতে আগমন করে। তাই এটাকে হালকাভাবে দেখার কোনো জো নেই। স্ত্রীকে কৃষকের জমির সাথে তুলনা করার তাৎপর্যও ব্যাপকভিত্তিক। কৃষক বীজ বপন করে এ উদ্দেশ্যে যে, সে আগামীতে ভালো ফসল পাবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন ভালো কৃষক চাষের সময় ও চাষের ধরন নির্ধারণ করে অত্যন্ত বিবেচনার সাথে। সে অসময়ে বীজ বপণ করে না কিংবা এমনভাবে চাষ করে না যাতে জমির ক্ষতিসাধন হয়। এটাকে মানব জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হলে এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিবেচনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সর্বোপরি মনে রাখা প্রয়োজন যে, এটা কেবল বস্তুগত বিষয় নয়, আধ্যাত্মিক বিষয়ও বটে। আমরা আমাদের নাফস্-এর কাছে পরাজিত হলে সেটা হবে কল্যাণের বিপরীত কাজ এবং আমরা যে আল্লাহ পাকের কাছে দায়বদ্ধ সে কথাও মনে রাখতে হবে।

পূর্ণ দুই বছর মাতৃদুগ্ধ পান বিজ্ঞানসম্মত

সূরা বাকারা-২ : ২৩৩

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ.

And the mothers shall give suck to their children for two whole years, for those who desire to complete the term of suckling.

আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর স্তন দুগ্ধ পান করাবে যদি দুধ পান করাবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। (সূরা বাকারা : ২৩৩)

এ আয়াতে শিশু সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন দুগ্ধ পান করানোর উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ উপদেশ খুবই বিজ্ঞানসম্মত। টিনজাত কৃত্রিম দুধের পরিবর্তে স্তন দুগ্ধ পান করানোর মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে।

মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যে খাদ্য গ্রহণ করে তাকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- শর্করা (Carbohydrate), স্নেহ পদার্থ (Protein), চর্বি (Fat), ভিটামিন (Vitamin), খনিজ লবণ (Minaral Salt), এবং পানি স্তন দুগ্ধ এমন একটি পানীয় যার মধ্যে উক্ত ছয় প্রকার খাদ্যই বিদ্যমান, তাই স্তন দুগ্ধ পানকারী শিশুর জন্য প্রথম ছয়মাস আর কোনো খাদ্য প্রয়োজন হয় না। মাতৃদুগ্ধ পান করেই সে থর থর করে বেড়ে ওঠে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর-পরই দুগ্ধপান শুরু হয় এবং তা নিয়মানুযায়ী চলতে থাকে। এর ফলে মাতৃস্তন সবল ও সতেজ থাকে। স্তন দুগ্ধ পান করানোর ফলে শিশুর মধ্যে Groth Hormone বেশ জোরালো হয়ে উঠে এবং শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি লক্ষণীয় মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার দু'তিন দিন পর স্তন থেকে হরিদ্রাভ তরল দুগ্ধ নির্গত হয়।

এ হরিদ্রাভ তরল দুধে ২০% প্রোটিন থাকে। এরূপ দুধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মাত্রা খুব বেশি থাকে। তাছাড়া এ দুধ পান করার ফলে মা ও শিশুর মধ্যে স্নেহের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। মায়ের রক্তে জীবাণু প্রতিরোধক রক্ত কণিকা বিদ্যমান। সাধারণ দুধের চেয়ে মায়ের দুধে খনিজ পদার্থ থাকে বেশি, চর্বি থাকে কম, সুতরাং মায়ের দুধ নবজাত শিশুর জন্য খুবই উপকারী।

কিছুদিন পূর্বে বাজারের কৃত্রিম দুধ খাওয়ানোর উপরে সারা বিশ্বে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে ডাক্তার, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকজন বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। জোরালো বিজ্ঞাপন ও বাণিজ্যিক প্রচারণার মাধ্যমে বাজারের দুধ পান করানোর পক্ষে ব্যাপক প্রচার করা হয়।

এরূপ প্রচারণার ফলে বহুসংখ্যক লোক মনে করেছিল যে, টিনজাত দুগ্ধ পান করানোই অধিক সুবিধাজনক। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায়, যেসব শিশু মায়ের দুধের পরিবর্তে টিনজাত দুধ পান করে বড় হয়ে উঠল তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত হলো। আন্ত্রিক সংক্রমণ, পুষ্টিহীনতা ও মৃগজাতীয় (Hyper sensitivity) রোগের হাত থেকে এসব শিশু রক্ষা পায়নি। তাই বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করালে সে অধিক পুষ্টি লাভ করে এবং রোগ সংক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা পায়। এ কারণে আধুনিক বিজ্ঞান মাতৃদুগ্ধ পান করানোর ব্যাপারে জোরালো তাগিদ আরোপ করেছে। আর এ বিষয়টি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকেই পবিত্র কোরআন শরীফে নির্দেশিত হয়েছে।

মাতৃদুগ্ধ পান করানোর আরো অনেক সুফল রয়েছে। এ সুফলগুলো খুবই প্রণিধানযোগ্য। স্তন দুগ্ধ পান করানোর ফলে শিশু যতেষ্ট খাদ্যপুষ্টি লাভ করে। সেই সাথে স্তন দুগ্ধ পান করানোর সময় মা ও শিশু উভয়েই এক ধরনের সুখকর অনুভূতি উপভোগ করে থাকে। উপরন্তু এ প্রক্রিয়ায় মা ও শিশুর মধ্যে ভালোবাসার একটি ভিত্তি গড়ে উঠে এবং মা ও শিশুর মধ্যকার পারস্পরিক অনুরাগ বা আকর্ষণ নিশ্চিত হয়। এ কারণে মা শিশুর কাছ থেকে কখনো দূরে সরে থাকতে পারে না। শিশুর কাছে তার নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি শিশুকে নিরাপত্তা দান করে এবং শিশুর প্রাথমিক পর্যায়ের গঠন উন্নয়ন সম্পর্কে মায়ের যথার্থ উপলব্ধি থাকে।

শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে স্তন দুগ্ধ পান করানো খুবই উপকারী। মনোবিজ্ঞানী ও মানসিক ব্যাধি বিশেষজ্ঞগণ লক্ষ্য করেছেন যে, অনেক মানসিক রোগ ও অপরাধপ্রবণতার কারণ খুঁজলে পাওয়া যাবে শিশুকালে নিরাপত্তাহীনতা ও স্নেহ-মমতার অভাবের ফলে অনেক শিশু পরবর্তীকালে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ও চরম অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। মায়ের কোলের উষ্ণতা ও মাতৃস্নেহ দ্বারা শিশু নিরাপত্তাবোধ করে এবং মায়ের শরীরের আরামদায়ক কোমলতা অনুভব করে। এছাড়া মাতৃদুগ্ধের তাপমাত্রা শিশুর জন্য আদর্শ স্থানীয়।

সন্তান প্রসবের পরে ঋতুস্রাব বা মাসিক শুরু হয় ৪/৫ সপ্তাহের মধ্যে। প্রসবের পর প্রথম মাসিকে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৭৫-৮৫% মহিলার। কিন্তু পূর্ণ সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব হলে প্রসূতির পুনরায় গর্ভধারণ ও মাসিকের সময় নির্ভর করে শিশুকে স্তন দুগ্ধ সেবন করানোর সময়ের উপর। যেসব মহিলা সাধারণত তাদের শিশু সন্তানদেরকে স্তন দুগ্ধ পান করান না, প্রসবের পর পুনরায় তাদের মাসিক হয় ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে এবং ৯০% প্রসূতির নিয়মিত মাসিক চক্র আবর্তিত হয় তিন মাসের মধ্যে। কিন্তু যেসব মহিলা শিশুদের স্তন দুগ্ধ পান করান তাদের মাসিক শুরু হয় অনেক পরে। অর্থাৎ দুই বছরের আগে হয় না। অবশ্য এর

ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তবে অল্প সংখ্যক মহিলার ৩-৬ মাসের মধ্যে মাসিক শুরু হয়ে থাকে। স্তন দুগ্ধ দানকারী মহিলার মাসিক শুরু হলে সে মাসিক চক্র নিয়মিতভাবে চলে না। এ জাতীয় মহিলাদের ৬০% গর্ভধারণের ক্ষমতা কম থাকে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বাদ দিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা হয় যে, মহিলারা তাদের শিশু সন্তানদেরকে স্তন দুগ্ধ পান করান সেই সময় তাদের গর্ভধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। এটা স্বীকৃত, যে নারী তার শিশুকে স্তন দুগ্ধ পান করায় না সে নারী স্বল্প সময়ের মধ্যে গর্ভবতী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যদি গর্ভানিরোধক কোনো পদ্ধতি অবলম্বন না করা হয় তাহলে স্তন দুগ্ধ সেবন থেকে বিরত থাকা মহিলারা সন্তান প্রসরের ৬-৯ মাসের মধ্যে প্রায় ৭৫% পুনরায় গর্ভধারণ করে থাকেন। পক্ষান্তরে স্তন দুগ্ধ সেবনের ফলে গর্ভধারণ বিলম্বিত হয়।

পবিত্র কোরআনে যে দুই বছর পর্যন্ত শিশুকে স্তন দুগ্ধ পান করানোর পক্ষে উপদেশ দেয়া হয়েছে তা নিঃসন্দেহে একটি প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং এর দ্বারা মা ও শিশু উপকৃত হয়ে থাকে। অধিকন্তু সন্তান প্রসবের ধারায় কমপক্ষে তিন বছরের বিরতি না থাকলে মায়ের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। অর্থাৎ এক প্রসবকাল থেকে আর এক প্রসবকালের মধ্যে তিন বছরের ব্যবধান না থাকলে প্রসূতি স্বাস্থ্য-শক্তি ফিরে পায় না।

সাম্প্রতিককালে আধুনিক সমাজ শিশুদের মাতৃস্তন পান করানোর দিকে ফিরে এসেছে। 'মায়ের দুধের বিকল্প কিছু-ই নেই' এ শ্লোগানটি এখন জোরালো প্রচার লাভ করেছে। কারণ সবাই উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, স্তন দুগ্ধ নবজাত শিশুর একমাত্র আদর্শ খাদ্য।

ইসলাম-পূর্ব যুগের প্রথম দিকে আরব সমাজে আরবের ধনী পরিবারগুলো দুগ্ধবতী মহিলাদের মধ্য থেকে তাদের নবজাত শিশুদের জন্য ধাত্রীমাতা নির্বাচন করতেন। ধাত্রীমাতাগণ তাদের বুকের দুধ ধনাঢ্য পরিবারের শিশুদের পান করাতেন। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা) ও এরূপভাবে ধাত্রীমাতা বিবি হালিমার স্তন দুগ্ধ পান করেছিলেন। পবিত্র কোরআন এরূপ ব্যবস্থার পক্ষে অনুমোদন দান করেছে। দুই পক্ষের মাতা পিতা সম্মত হলে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কোনো বাধা নেই। ধাত্রীমাতার দুগ্ধপানের ফলে শিশুর কোনো প্রকার দৈহিক ক্ষতি হয় না। কারণ ধাত্রীমাতার দুধের গঠন উপাদান শিশুর নিজের মাতার দুধের গঠন উপাদানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

সুতরাং মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন মাতৃস্তনে নতুন দুধ সঞ্চারিত হয়। নবজাত শিশুকে এ দুধ পান করানোর পক্ষে আল্লাহ পাকের উপদেশ সবার জন্য অবারিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের উপদেশ মেনে নেয়ার মধ্যে কল্যাণ অবধারিত।

মাতৃগর্ভে মানব শিশুর নক্শা প্রণয়ন একটি বিস্ময়কর ঘটনা

সূরা আলে ইমরান-৩ : ৬

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

He it is Who fashions you in the wombs as He wills. There is no Allah except He, the exalted, The All-Wise.

তিনি সেই সত্তা যিনি মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান : ৬)

মহান আল্লাহ কোরআনের এ আয়াতে মানুষের দু'টি দৈহিক বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি হচ্ছে গর্ভে মানব শিশুর জীবন অপরটি জরায়ুর মধ্যে দেহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লাভ।

প্রত্যেক মানুষের জীবন শুরু হয় ঐ অবস্থা থেকে যখন পুরুষ পিতার শুক্রাণু (Sperm) মাতৃদেহের ডিম্বাণুতে (Ovum) প্রবেশ করে। হাজার হাজার শুক্রাণু একটি Ovum-এর দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু একটি মাত্র Sperm একটি Ovum-এর ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং নিষেক (Fertilization) ঘটায়। Sperm ও Ovum-এর মিলন মুহূর্তে শুধুমাত্র একটি মানুষের জীবনই যে অস্তিত্ব লাভ করে তা নয় সে সঙ্গে তার লিঙ্গ এবং নিজস্বতা বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নির্ধারিত হয়ে যায়। মানব জীবনের প্রথম মাসে নিষিক্ত Ovum অদ্ভুত ধরনের পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। প্রথমে এতে দু'টি ফাটল দেখা দেয়। তারপরে ঐ Ovum এর ভাগ ও উপভাগের পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি শিশু তার মাথা, দেহ, হৃৎপিণ্ড, বাহু, পা, কান, পাকস্থলী, ফুসফুস ও মস্তিষ্ক নিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, এ আয়াতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে সর্বোত্তম হাতের (আল্লাহ পাকের হাতের) মাষ্টার ডিজাইনের প্রতি গর্ভাবস্থায় জরায়ুর মধ্যে মানুষের জটিল আকার লাভের প্রতি, ভবিষ্যৎ দেহের গঠন-অবয়ব নির্ধারণের প্রতি, আমাদের আঙ্গুলীর নকশা গঠনের প্রতি এবং একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের ব্যবধান পার্থক্যের সূক্ষ্মতার প্রতি। মানুষে মানুষে ব্যবধান পার্থক্যের কারণে একজন

মানুষের স্বাতন্ত্র্য স্বকীয়তা এতোই বিস্ময়কর যে, ঐ মানুষের সাথে অন্য আর একটি মানুষের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। জীববিজ্ঞান এ বিষয়টিকে যে শুধু মেনে নিয়েছে তা নয় একই সঙ্গে এর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও দান করেছে। প্রথমেই একজন শিশু সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে তার লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে যায় ঐ মুহূর্তে যখন পিতার Sperm মায়ের Ovum এ প্রবেশ করে নিষেক ঘটায় এবং ভ্রূণ সৃষ্টি করে। প্রত্যেক সাধারণ মানুষের দেহ কোষের ৪৬টি ক্রোমোজোমের ২২ জোড়া এবং দু'টি লিঙ্গ ক্রোমোজোম মিলে গঠন করে আর এক জোড়া। সর্বমোট ২৩ জোড়া। পুরুষের দু'টি লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি x এবং অপরটি y।

কিন্তু স্ত্রীলোকের থাকে দু'টি y ক্রোমোজোম। যদি y ক্রোমোজোমবাহী Sperm. এর সাথে Ovum মিলিত হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি করে তখন শিশুটি হয় ছেলে (xy)। আর যদি x ক্রোমোজোমবাহী Sperm-এর সাথে Ovum-এর নিষেক ঘটে তখন শিশুটি হবে মেয়ে (xx)। এরূপ ক্রোমোজোমের মিলন খুবই বিস্ময়কর এবং মানুষের কর্তৃত্বের বাইরে। একমাত্র আল্লাহ পাকই ঠিক করেন সন্তানটি ছেলে হবে না মেয়ে হবে।

সন্তান সন্ততির উত্তরাধিকার বৈশিষ্ট্যের দৈহিক ভিত্তি নিহিত থাকে ক্রোমোজোমের ভেতরে থাকা ফ্যাকটরে। ১৯০৯ সনে জোহানসেন যার নাম দিয়েছেন জিন (Gene)। প্রতিটি ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট পরিমাণ জিন থাকে। যেহেতু ক্রোমোজোমগুলোর জোড়া আছে সেহেতু প্রত্যেক জিনেরও জোড়া আছে। মানব দেহে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। যখন দু'টি জিন দেখতে একই রকম হয় তখন দেহ বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করতে তারা সমপরিমাণ জোর ঘটায় এবং এর ফলে তারা মিশে এক হয়ে যায়। যে জিন শক্তিশালী সে জিন আপাত অক্ষম জিনের উপর প্রভুত্বকারী প্রভাব প্রদর্শন করে। একজন শিশু পিতা মাতার কাছ থেকে কি ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করবে সে ব্যাপারটি একটি দৈব ব্যাপার। জীব-বিজ্ঞানীরা একে বলেন Chance. একটি শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লাভ করবে তার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য পিতা মাতার সঙ্গে মিলে যেতে পারে। আবার মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যও মিলে যেতে পারে। আবার ভিন্ন বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। আবার কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না।

যারা সাধারণভাবে লক্ষ্য করে তাদের দৃষ্টিতে বংশগতির বৈশিষ্ট্য খুবই সাধারণভাবে ধরা পড়ে। কিন্তু মাতৃগর্ভে প্রত্যেক শিশুর অবস্থান ও বৃদ্ধির যে

অপূর্বতা তা সুমহান আল্লাহ পাকের পূর্বনির্ধারিত। এ কারণে প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যে এতোই স্বকীয় যে, একজনের সঙ্গে আর একজনের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এটা বেশ মজার ব্যাপার যে, বিভিন্ন ব্যক্তির হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপের মধ্যে এতোই বিভিন্নতা থাকে যে, বুড়ো আঙ্গুলের ছাপের দ্বারা ব্যক্তি পরিচয় নির্ণয়কে একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আবার বিপুল বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক জাতির কিছু সদস্যদের মধ্যে বেশ কিছু মিল প্রত্যক্ষ করা যায়। অমিলের মধ্যে মিলের উপস্থিতি আমাদের মনে এ মর্মে বিশ্বাস দান করেছে যে, এ অপূর্ব কাজের মহান রূপকার মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক যেভাবে খুশি সেভাবেই জিনের মিলন ঘটিয়ে মায়ের গর্ভে মানব শিশু গঠন করতে পারেন। মানব ভ্রূণের বৃদ্ধি ও তার সৃষ্টি জটিলতা এ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত জ্ঞাপন করে যে, মহান আল্লাহ পাকই একমাত্র সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী।

সুতরাং তিনি যা কিছু সৃষ্টি করে তা তার সীমাহীন জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। আমরা অনেকেই তা বুঝি অথবা অনেকেই তা বুঝতে পারি না।

দিন রাত্রির পরিবর্তন ও জীবন মৃত্যুর আবর্তন

সূরা আলে ইমরান-৩ : ২৭

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

You make the night to enter into the Day and you make the Day to enter into the Night, you bring the living out of the dead and you bring the Dead out of the living. And you give sustenance to whom you will, without limit.

তুমি রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনো আর মৃতকে জীবিতদের ভেতর থেকে বের করো। আর তুমি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করো। (সূরা আলে ইমরান : ২৭)

দিন রাত্রির পরিবর্তন (Alternatione of day and night):

এটা আমাদের সাধারণ পর্যবেক্ষণ যে, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যালগ্নে দিবাভাগ রাত্রির মধ্যে মিলে যায় এবং প্রাতঃকালে রাত্রি দিনের মধ্যে মিলে যায়। এ মিলে যাওয়ার প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। রাতের মধ্যে দিনের প্রবেশ এবং দিনের মধ্যে রাতের প্রবেশ প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত কারণে ঘটে থাকে।

১. পৃথিবীর নিজ অক্ষে দৈনন্দিন আবর্তন মহান আল্লাহ্ পাক কর্তৃক বিন্যস্তের কারণে।

২. পৃথিবীর আকার গোলাকার হওয়ার কারণে

৩. আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় তাপমাত্রা পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকার কারণে।

পৃথিবীর ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার কারণে দিন রাত্রির উদ্ভব এবং তাদের পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটায়। এই গোলাকার পৃথিবী এবং এর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে দিবারাত্রির মিলিত হওয়াকে নিশ্চিত করছে। এ সময়কে আমরা বলি ঊষাকাল (Dawn) এবং গোধূলী (Dusk)। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডোবার ঠিক পরে কিংবা পূর্ব দিগন্তে সূর্য

ওঠার পূর্বে এই দুই লগ্নে একটা কোমল মধুর অনুজ্জ্বল আলো কিছু সময় ধরে প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকে। এরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয় সূর্যরশ্মির সাহায্যে। এ সূর্যরশ্মিগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অনুকণার দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীতে নেমে আসে। গোধূলী ও ঊষাকালের অনুজ্জ্বল আলো ততোক্ষণ দেখা যায় যতোক্ষণ সূর্য দিগন্ত রেখার প্রায় ১৮ ডিগ্রী নিচে অবস্থান করে।

স্থানভেদে গোধূলীর (Twilight) অবস্থানকালও পরিবর্তনশীল। মেরু অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানে বছরের বিভিন্ন সময়ে গোধূলীর দৈর্ঘ্যের পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু নিরক্ষরেখায় গোধূলী সব সময় প্রায় সমান। নিরক্ষরেখার উত্তর-দক্ষিণে পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরে সূর্যের গমনপথ পরিবর্তিত হয়।

এর ফলে গোধূলী দৈর্ঘ্যেও পরিবর্তন সূচিত হয়। মেরু অঞ্চলে যখন গ্রীষ্মকাল চলে সে সময় সেখানে সূর্য কখনো দিগন্তরেখার নিচে নামে না। এর ফলে সেখানে গোধূলী সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বিরাজ করে।

এটা বেশ লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে বছরব্যাপী দিবসের একই সময়ে গোধূলী দেখা যায় না। এরূপ হওয়ার কারণ হলো এই যে, পৃথিবী বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী তার বাৎসরিক পরিক্রমা পথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। কারণ সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কের ধারায় পৃথিবী দিবা-রাত্রির ব্যাপ্তিকালে পার্থক্য সৃষ্টি করে। বছরে দুই সময় অর্থাৎ ২১ শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমরা দিবা রাত্রিকে সমান দেখি। কিন্তু ২২ শে জুন দিন হয় সবচেয়ে দীর্ঘ এবং রাত্রি হয় সবচেয়ে ক্ষুদ্র। এ অবস্থা ঘটে থাকে উত্তর গোলার্ধে। দক্ষিণ গোলার্ধে ২২শে ডিসেম্বর দিবাভাগ হয় ক্ষুদ্রতম আর রাত্রিকাল হয় দীর্ঘতম। এ অবস্থার ফলশ্রুতিতে সকাল সন্ধ্যার আগমনের সময়ে ঘটে পরিবর্তন।

জীবিত ও মৃত চক্র (The cycle of the living and the dead):

এই আয়াতাংশে ব্যবহৃত দুইটি শব্দ 'হাইয়া' ও 'মাইয়াত' এর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা সম্পর্কে আমাদের ধারণা রাখতে হবে। হাইয়া শব্দের অর্থ জীবিত এবং মাইয়াত শব্দের অর্থ মৃত। জীবিত শব্দটি ঐসব জীবকোষের প্রতীক যা প্রাণহীন অণু (Non living molecules) থেকে গঠিত কিন্তু তাদের জীবনের ঝলক টিসুতে (Tissues) নিবদ্ধ থাকে। এই জীবন-স্ফুলিঙ্গ তাদের জন্য যে শক্তি যোগায় সেই শক্তির জোরে তারা সকল প্রকার জীবন পদ্ধতি পরিচালনা করতে পারে। যাকে বলা হয় বিপাক ক্রিয়া (Metabolic activities)।

'মৃত' শব্দটি সেসব বস্তুকে বুঝায় যেসব বস্তু প্রাণহীন অণু দ্বারা গঠিত। এসব অণুর পুষ্টিদান ও বংশ বৃদ্ধি করার ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্ পাক একমাত্র সর্বশক্তিমান যিনি কতগুলো মৃত অণুর সমষ্টির মধ্যে যথাসময়ে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। এ বিষয়টি আমাদের বর্তমান জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত। কিভাবে প্রাণহীন বস্তুতে প্রাণ ফিরে আসে কিভাবে প্রাণসমৃদ্ধ বস্তু প্রাণহীন বস্তুতে ফিরে যায় এটাই এখানে আলোচনার বিষয়। এ বিশ্বজনীন ঘটনাটি 'Cycle of matter' কে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

পৃথিবীর যে অঞ্চল জীবমণ্ডল (Biosphere) বলে পরিচিত সেই জীবমণ্ডল জীবনকে সহায়তা দান করে। জীবমণ্ডলের মধ্যে থাকে সাগরসমূহ, একটি নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত মহাদেশগুলোর উপরিভাগ এবং বায়ুমণ্ডলের নিম্নভাগ। গাছপালা তাদের জীবিত বস্তুর গঠন উপাদানগুলোকে খনিজ পদার্থের আকারে আত্মস্থ করে এবং সেগুলোকে উদ্ভিদকলা বিভিন্ন জৈব উপাদানে রূপান্তরিত করে। রূপান্তরিত জৈব উপাদানগুলো তাদের পালা এলে উদ্ভিদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জীবন্ত জীবকোষের দেহে অরগানিক আকারে মিলিত উপাদান অবশ্যই একাধিকবার ইনঅরগানিক আকারে রূপান্তরিত হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় অরগানিক কমপাউণ্ডের খনিজকরণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি ঘটে থাকে দহনের মাধ্যমে। এসব দহনের মধ্যে বনে আগুন লাগা। মানুষ কর্তৃক জৈব জ্বালানী পোড়ানো। উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কর্ম। অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ভাবে প্রাণী ও উদ্ভিদ তাদের বাইপ্রোডাক্ট পচন থেকেও খনিজকরণ পদ্ধতি সংঘটিত হয়। এ পচনক্রিয়া সম্পন্ন হয় ক্ষুদ্র জীবকোষ দ্বারা। এ ক্ষুদ্র জীবকোষগুলো যৌগ উপাদানগুলোকে হজম করতে এবং অক্সিজেন পরিণত করতে সক্ষম। বস্তুর এই প্রবাহকে আরো বিশদভাবে দেখানো যায় মৌলিক রাসায়নিক উপাদানগুলোর উল্লেখের মাধ্যমে। এই মৌলিক রাসায়নিক উপাদাগুলো জীবন্ত অরগানিজমের মধ্যে যে বস্তু দেখতে পাওয়া যায় সেই বস্তুর ৯৮% পূর্ণ করে।

কার্বন (Carbon) : সালোক সংশ্লেষণ (Photosynthesis) পদ্ধতির মাধ্যমে সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। উদ্ভিদ যখনই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই শক্তি ব্যবহার করে তখন কার্বন ডাই অক্সাইড মুক্ত হয়ে উদ্ভিদে মিশে জমা হয়। প্রাণী উদ্ভিদ খেয়ে থাকে। তাই মৃত্যুর পর সকল জীবকোষের মধ্যে কার্বন যৌগের সঞ্চয় লক্ষ্য করা যায় যা তারা তাদের জীবনব্যাপী সংগৃহিত করেছে।

পানি (Water) : মানুষসহ সকল প্রাণী পানি পান করে থাকে। আর উদ্ভিদ মাটি

থেকে পানি শুষে নেয়। সকল বস্তু সত্তার মধ্যে জীবন্ত বস্তুতে কিছু পানির সঞ্চয় থাকে। পরবর্তীতে যখন ঐ জীবন্ত বস্তু ভেঙ্গে যায় তখন ঐ পানি তাপ পরিমণ্ডলে ফিরে আসে। উদ্ভিদ থেকে পানি ফিরে যায় পাতার সাহায্যে। প্রাণী থেকে বেরিয়ে যায় নিঃশ্বাসের সাহায্যে কিংবা ঘাম নির্গত হওয়ার সাহায্যে কিংবা মলমূত্র নির্গত হলে।

নাইট্রোজেন (Nitrogen) : নাইড্রোজেন যৌগের সংশ্লেষণ হয় উদ্ভিদের মাধ্যমে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ধরনের কীটের সাহয্যে উদ্ভিদ প্রকৃতি থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে কিংবা মাটিতে পাওয়া যায় এমন শোষণযোগ্য নাইট্রোজেন যৌগের সাহায্যে। সমগ্র প্রাণী রাজ্যের প্রয়োজন এগুলো নাইট্রোজেন সরবরাহের উৎস হিসেবে কাজ করে।

ক্যালসিয়াম (Calcium) : ভূ-পৃষ্ঠের শিলায় ক্যালসিয়াম কমপাউণ্ড থাকে। পানির মধ্যে যখন এ শিলা দ্রবীভূত হয়ে যায় তখন প্রাণীরা তা গ্রহণ করে। উদ্ভিদ মৃত্তিকা থেকে ক্যালসিয়াম কমপাউণ্ড গ্রহণ করে থাকে। হাড় ও কঙ্কাল গঠনের কাজে ক্যালসিয়াম কমপাউণ্ড প্রয়োজন হয়। কিন্তু উদ্ভিদ ক্যালসিয়াম ব্যবহার করে কোষ দেয়াল নির্মাণের কাজে। যখনই প্রাণী বা উদ্ভিদ মারা যায় তখন তাদের কঙ্কাল বা কোষ মৃত্তিকার মধ্যে কিংবা সাগরে, হ্রদে বা পুকুরের তলদেশে জমা হয়।

ফসফরাস (Phosphorus) : ফসফেট হিসেবে অজৈব আকারে জীব দেহ ফসফরাস আত্মস্থ করে। জীবন্ত কোষে ফসফরাস উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ফসফেট কমপাউণ্ড, নিউক্লীক এসিড প্রভৃতিতে স্থান লাভ করে। জীবন্ত কোষের মৃত্যু হলে অজৈব ফসফেট হিসেবে ঐ কোষ হাইড্রোলাইসিস পদ্ধতির মাধ্যমে পুনরায় মুক্ত হয়ে যায়।

সালফার (Sulphur) : অ্যামিনো এসিড, সিস্‌টাইন (Cystine), মেথিওনাইন (Metheonine) এবং কিছু কো-এনজাইম আকারে সালফার হলো জীবন্ত বস্তুর অতি প্রয়োজনীয় গঠন উপাদান। এই সালফার ভূ-ত্বকে প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং দ্রবণীয় সালফেটের আকারে জীবন্ত জীব কোষে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ দ্বারা সংশ্লেষিত হয়ে জৈব সালফার কমপাউণ্ড প্রাণীর জন্য পুষ্টির উপাদান হিসেবে কাজ করে। বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস অবমুক্ত করে ক্ষুদ্র জীব উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ পচিয়ে দিতে জৈব সালফার সাহায্য করে।

ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium) : ম্যাগনেসিয়াম সবুজ উদ্ভিদে ক্লোরোফিল অণুর

একটি অংশ। একে মাটি থেকে শুষে নেয়া যায়। পরে এটা তৃণভোজী প্রাণীরা যখন মাঠে চরে তখন তাদের জীবিত কোষে প্রবেশ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটলে পরবর্তীতে ম্যাগনেসিয়াম নিজের পথ পুনরায় খুঁজে নেয় মাটির মধ্যে।

সুতরাং পবিত্র কোরআনের আয়াতে এ মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে আনা হয়েছে। এ বাণী বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকে খুবই প্রণিধানযোগ্য।

কুমারী মায়ের গর্ভে ঈসা (আ)-এর ভ্রূণ সৃষ্টি

সূরা আলে ইমরান-৩ : ৪৭

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

She (Mariam) Said : 'My Lord! How shall I have a child when no man has touched me?' He (Angel) Said : So Allah creates what He wills. When He decrees a thing, He says unto it only 'Be'! and it is.

তিনি (মরিয়াম) বললেন, 'হে আমার প্রভু! কেমন করে আমার সন্তান হবে যখন কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। তিনি (ফেরেশতা) বললেন, আল্লাহ্ পাক যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন। যখন তিনি একটি জিনিসকে আদেশ করেন, তখন বলেন, হয়ে যাও অমনি তা হয়ে যায়।' (সূরা আলে ইমরান : ৪৭)

হযরত ঈসা (আ) তাঁর কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশার জননী মরিয়াম (আ) যখন ফেরেশতার নিকট থেকে ঐশী বাণী শুনলেন তখন তার গর্ভবতী হওয়ার বিষয়ে বিস্ময়বোধ করলেন। স্বাভাবিকভাবে যে মহিলাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি তার গর্ভে একটি শিশুর জন্মলাভ কি করে সম্ভব। ইহুদী এবং খ্রিস্টানেরা হযরত ঈসা (আ)-এর Virgin birth কখনো বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আ) কুমারী মাতা মরিয়ামের গর্ভ থেকে জন্মলাভ করেছেন তাঁরই আদেশে। কারণ এরূপ জন্ম তার ক্ষমতার আওতাভুক্ত এবং তিনি যা সৃষ্টি করতে চান তাই সৃষ্টি করতে পারেন। পবিত্র কোরআন অনুযায়ী মরিয়ামের গর্ভে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম আল্লাহ্ পাক যে সর্বময় শক্তিধর তারই একটি সংকেত চিহ্ন। মুসলমানেরা নির্দ্বিধায় হযরত ঈসা (আ)-এর বিস্ময়কর জন্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

একজন নারীর গর্ভে এরূপ কুমারী জন্ম (Virgin birth) খুবই বিস্ময়কর এবং আমাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বহর দ্বারা এ বিষয়টির যথাযথ ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জ্ঞান ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়ে চলছে এবং পুরুষ সহযোগীর স্পর্শ ব্যতিরেকে সন্তানের জন্ম-রহস্য সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করতে শুরু করেছি। অধিকন্তু, এ বাস্তব জগতে আল্লাহ্ পাক যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেগুলোকে তিনি একটি নিয়ম-নীতির অধীনে বেধে দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাকের সুবিশাল সৃষ্টির

মধ্যে আমরা যদি বিনা পিতায় সন্তানের জন্মের সাক্ষ্য প্রমাণ খুঁজি তাহলে আমরা এটা দেখতে পাব সাধারণ পারথেনোজেনেসিস (Parthenogenisis parthenos = Virgin, Genesis = Origin) পদ্ধতিতে। প্রাণী ও উদ্ভীদের রাজ্যে বংশ বৃদ্ধির স্বাভাবিক পদ্ধতি যৌন মিলনের মধ্যে নিহিত। এ পদ্ধতির মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর সেক্স কোষ পরস্পর মিলনে জড়িত হয়। একে বলা হয় বংশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় বাবা মার অংশগ্রহণ। কিন্তু কিছু কিছু উদ্ভীদ ও প্রাণীর মধ্যে একক অংশীদারের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের উৎপত্তি হয়। এক-কোষ বিশিষ্ট নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভীদ ও এ্যামিবা, প্লাসমোডিয়া এবং হাইড্রার মতো এক কোষী প্রাণীর মধ্যে এ পদ্ধতি খুবই সাধারণ। এ পদ্ধতিকে পারথেনোজেনেসিস বলা যায় না। এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, প্রাণীদের ক্ষেত্রে একটি নিষিক্ত ডিম্বাণুর মধ্যে সকল বস্তুগত শক্তি বিদ্যমান থাকে যার দ্বারা একটি নতুন প্রাণীর অবয়ব সৃষ্টি হয়। কিন্তু কখনো কখনো কিছু প্রাণীর মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু শর্তের অধীনে একটি ডিম্বাণু পরিপক্ক হয়ে, একটি নতুন প্রাণ সত্তায় পৌঁছে যায়। এক্ষেত্রে শুক্রাণুর প্রয়োজন পড়ে না। একে বলা হয় প্রকৃতিগত পারথেনোজেনেসিস। সুতরাং পারথেনোজেনেসিস হলো এক প্রকার পরিপূর্ণ লিঙ্গ কেন্দ্রিক প্রজননের ধরন। শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত নয় এমন ডিম্বাণুর বৃদ্ধির ফলে এ প্রজনন পদ্ধতি সম্ভব হয়ে থাকে ১৯০০ শতাব্দীতে গবেষণারত জীববিজ্ঞানীরা বহুধরনের মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর উপরে প্রথমে কৃত্রিম পারথেনোজেনেসিস পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা নতুন বংশধরের নজির সৃষ্টি করেছে। এসব মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে গৃহিত পারথেনোজেনেসিসের ঘটনা এ সত্যকে তুলে ধরে যে, সাধারণভাবে তার অপরিহার্য ক্রোমোজোম দ্বারা ভ্রূণ গঠনে শুক্র কোষের কোনো ভূমিকা থাকে না।

১৯৯৭ সালে বিজ্ঞানীরা ক্লোনিং (Cloning) পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রাণীর অনুরূপ প্রাণী বের করে বিস্ময়কর চমক সৃষ্টি করেছেন। স্কটল্যান্ডের রোজলিন ইন্সটিটিউটের ভ্রূণ বিজ্ঞানী ডঃ ইয়ান উইলমুট ভেড়ার দেহ কোষকে (Cell body) ক্লোনিং করে সাতটি মেষ শাবক বের করেন যাদের শারীরিক অবয়ব একই রকম এবং পিতা ছাড়া তাদের জন্ম।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পারথেনোজেনেসিস ও ক্লোনিং স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সম্ভব এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক স্তন্যপায়ী প্রাণীসহ অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে ক্লোনিং ও পারথেনোজেনেসিস নিয়ম সংঘটিত করেছেন। কারণ তিনিই তো হযরত ঈসা (আ)-এর Virgin birth সম্ভব করেছেন। তাই আমরা ভাবতে পারি যে, যদিও সাধারণত প্রকৃতিতে মানুষের Virgin birth ঘটে না তবে তার সম্ভাব্যতা জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারে নাকচ করে দেয়া যায় না।

এ বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে আরো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবে।

জীব ও জড় বস্তুর গঠন প্রকৃতির মধ্যে ঐশ্বরিক পরিকল্পনা

সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৯১

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Those who remember Allah standing sitting and lying down on their sides and think deeply about the creation of the Heaven and the earth and Say : 'Our Lord! You have not created this in vain! Glory to you and Save us from the penalty of Fire.'

যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা শায়িত অবস্থায় আল্লাহ পাককে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমিন সৃষ্টির সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে, তারা বলে 'হে আমাদের প্রভু! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল প্রশংসা তোমার। তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের রক্ষা করো।' (সূরা আলে ইমরান : ১৯১)

এই আয়াতে দু'টি আলোচনার বিষয় রয়েছে। একটি হলো আয়াতে উল্লিখিত উদ্ধৃতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য এবং অপরটি কোনো ধরনের লোকেরা উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রকৃতপক্ষে আকাশ ও জমিনে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে সবগুলোর সমন্বিত ক্রিয়াকর্ম আধুনিক পরিবেশগত অবস্থার বুনিয়াদ রচনা করে। এ রচিত বুনিয়াদ মানুষের জীবন ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্প্রসারণের ফলে মানুষ জানতে পেরেছেন যে, প্রকৃতির মধ্যে বস্তু ও জীবনের বহু রকমের মিথস্ক্রিয়ায় (Interaction) প্রেক্ষাপটে বাড়তি বা অপ্রয়োজনীয় বলে কিছু নেই। প্রথমত আল্লাহ পাকের সৃষ্টি বাস্তর প্রজ্ঞার নিরিখে গড়ে ওঠেছে। ভিন্ন ভিন্ন বহু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বস্তু ও জীবনের স্বাভাবিক ও সুন্দর গঠন অবয়ব সৃষ্টির বাস্তবতা তুলে ধরেছে। দ্বিতীয়ত জীব ও জড় বস্তুর গঠন প্রকৃতির মধ্যে ঐশ্বরিক পরিকল্পনার Master-design অঙ্কিত রয়েছে। সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনের নিমিত্তে এ নকশা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে। জীব ও জড় বস্তুর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র অণুজীব ব্যাকটেরিয়ার কথা ধরা

যাক। যখন আমরা কোনো ব্যাকটেরিয়া বাহিত রোগে আক্রান্ত হই তখন আমরা চিন্তা করে থাকি যে, ব্যাকটেরিয়া অতি নগণ্য জীবাণু। এর সংখ্যাধিক্য ব্যতিত এদের মাধ্যমে আমাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে না। নাইট্রোজেন ফিক্সেশনে এবং আমাদের খাদ্যবস্তু উৎপাদনে ব্যাকটেরিয়ার কি ভূমিকা তা সবার কাছে সুবিদিত। যে ভাইরাস ও প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার (Pathogenic bacteria) বিরুদ্ধে মানুষ ও অন্যান্য জীবজগৎ যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে সেই ভাইরাস ও প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার একটি সংখ্যা ছাড়াও প্রকৃতিতে সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ্ পাক যে অসংখ্য ক্ষুদ্র অণুজীব (Micro organism) সৃষ্টি করেছেন তার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম এবং ক্ষুদ্র অণুজীবগুলো একটি সমন্বিত বিজ্ঞানাগার হিসেবে প্রকৃতির অন্তরালে কাজ করে যাচ্ছে।

জীব ও জড় জগতের বিভিন্নতা খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জীবজগতে দেখা যায় যে, কিছু জীবনধারী প্রাণী-খুবই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক আর কিছু খুব কুৎসিত। এমন কিছু প্রাণী আছে যারা দিনের বেলা চলাফেরা করে আর কিছু আছে রাতে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়। কিছু প্রাণী আছে যাদের দেহ থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। কিন্তু কিছু আছে যারা সেবা কর্মে নিয়োজিত হয়। আর কিছু আছে যারা পরজীবি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, এদের সকলেরই কাজ আছে কর্মহীন কেউ নয়। আরো মজার ব্যাপার যে, এ সকল প্রাণীর দৈহিক ও জৈবিক কার্যকলাপ শুধুমাত্র জীবন ধারণ করা এবং মৃত্যুবরণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এরা পালাক্রমে অন্য সব জীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে থাকে।

অতএব আমরা যদি আমাদের বিচার বিবর্জিত কাজের মাধ্যমে, কিংবা জ্ঞানের অভাবে কোনো প্রজাতিকে ধ্বংস করে দিই তাহলে এর দরুন কিছু অন্যান্য প্রজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ দারুণভাবে বিঘ্নিত হবে। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যদি কোনো প্রাণী কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে তবে তাদের বংশ বৃদ্ধির গতিরোধ করা যেতে পারে। তাদের একেবারে ধ্বংস করে দেয়া যাবে না।

সম্প্রতি পৃথিবীতে যে শক্তির অভাব দেখা দিয়েছিল তার প্রেক্ষিতে মানুষ ভেবেছিল যে তারা খুব উপকৃত হবে যদি ক্ষুদ্র অণুজীব কিভাবে শক্তি উৎপাদন করে সঞ্চয় করে রাখে তা জানতে পারলে। অতিসম্প্রতি আমেরিকার বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন যে, তারা খাদ্য সংরক্ষণ সমস্যার সূত্র খুঁজে পাবেন, কারণ তারা ভালোভাবে লক্ষ্য করেছেন ক্যাঙ্গারু-ইঁদুর (Kangaroo rats) কিভাবে খাদ্য সংরক্ষণের পক্ষে ব্যবস্থাগ্রহণ করে তার উপর। এ ধরনের ইঁদুর কৃষকের সংগৃহীত

মটরশুঁটি সরিয়ে তাদের খননকৃত গর্তের বিভিন্ন এলাকায় লুকিয়ে রাখে এবং এর দ্বারা সেখানে বায়ু প্রবাহ ও তাপমাত্রায় ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। এ ভিন্নতা মটরশুঁটির গায়ে একটা প্রলেপ তৈরী করে এবং এ প্রলেপ মাইকোটক্সীন (Mycotoxin) জন্ম দেয় যা পোকামাকড়ের আক্রমণের বিপরীতে কীটনাশক হিসেবে কাজ করে। সুতরাং ক্যাঙ্গারু-ইঁদুরের খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিতে মানুষের জন্য দিক নির্দেশনা রয়েছে তাতে কোনো সংশয় নেই। তাই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি কর্মে উদ্দেশ্যবিহীন অনর্থক বলে কিছু নেই।

আয়াতে উচ্চারণ করা হয়েছে, 'হে প্রভু! তুমি কোনো জিনিস অনর্থক সৃষ্টি করোনি।'

এখন আমাদের দেখতে হবে কোনো ধরনের মানুষ এভাবে উচ্চারণ করে থাকে। বাহ্যত এ ধরনের উচ্চারণ কোনো অজ্ঞলোকের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে ঘোষণা করেছেন, শুধুমাত্র জ্ঞানী লোকেরা আল্লাহর ইঙ্গিত বুঝতে পারেন। অতএব আমরা তখনই এ ধরনের উচ্চারণ করতে সক্ষম হবো যখন ব্যাপক চেষ্টার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হবো। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে যে অবস্থায় থাকিনা কেন যখন আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ পাককে স্মরণ করবো কেবলমাত্র তখনই তাঁর মহিমা প্রচার করতে সমর্থ হবো। এরূপ চিন্তাধারা আসে সক্রিয় বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে, এ ধরনের বিজ্ঞান চর্চা একসময় মুসলমানরা করেছিল যখন তারা মানব-ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল শীর্ষদেশে আরোহন করতে পেরেছিল। অধিকন্তু অনেকদিন ধরে মুসলমানরা আর বিজ্ঞান-চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করেননি এবং তারা আল্লাহর সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কেও চিন্তা করা পরিত্যাগ করেছেন। তাই উপসংহারে এটাই বলা যায় যে, এ আয়াতের তাৎপর্য মুসলমানগণ তখনই ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবেন যখন তারা নিজেদেরকে বিজ্ঞান-চর্চার পরিসরে নিবিড়ভাবে নিয়োজিত রাখতে পারবেন। তা পারলে তারা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নৈপুণ্যতা উন্মুক্ত করতে সক্ষম হবেন। তখন কেবলমাত্র তাদের মস্তক অবনত হয়ে যাবে আল্লাহর মহান দরবারে তখন উচ্চারণ করে বলে উঠবেন হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করে। 'Our Lord, You have not created this without purpose.'

গোটা মানব জাতি এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি

সূরা আন নিসা-৪ : ১

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً.

O mankind! Be dutiful to your Lord Who Created you from a single person and from him he created his wife and from them both He created many men and Women.

হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুর প্রতি অনুগত হয়ে থাক যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত নারী পুরুষ। (সূরা আন নিসা : ১)

এক ব্যক্তি থেকে সমগ্র মানব জাতি সৃষ্টি হয়েছে– এ আয়াতে সে বিষয়টি আল্লাহ পাক আলোকপাত করেছেন। কোরআন মজিদে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আদম (আ)। আয়াতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর থেকে কিভাবে তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ দু'জনের মিলনে কিভাবে সারা পৃথিবীতে মানব জাতি বিস্তার লাভ করেছে।

'নাফস' শব্দের অর্থ আত্মা, সত্তা, ব্যক্তি এবং মন। এখানে এ শব্দটি দ্বারা হযরত আদমকে (আ) বোঝানো হয়েছে। হযরত আদম (আ)-এর স্ত্রী মা হাওয়া (Eve) ঐ একই নাফ্স থেকে তৈরি। যদি উভয়ে একই নাফস থেকে তৈরি হয় তাহলে এ বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ বর্তমান বিজ্ঞানের কাছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার মতো কোনো তত্ত্ব নেই। তবে এখানে ব্যাপার হলো হযরত আদম (আ) ও মা হওয়া (আ) একই উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। এ কারণে তাদের জৈবিক সম্পর্কে কোনো প্রকার অসামঞ্জস্য দেখা দেয়নি। তাই তাঁদের দ্বারা বংশবৃদ্ধি খুব সহজভাবেই সমাধান হয়েছে।

সকল মানব মানবী যে একই যুগল দম্পতির সন্তান তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মেনে নেয়া যায়। গোত্র ও বর্ণের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। এ প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম Homo-Sapiens। এমনকি আদিবাসী মানুষেরাও সভ্য মানুষের সঙ্গে এসব বিষয়ে অভিন্ন। যেমন– এ্যানাটমি, ফিজিওলজী, বায়োকেমিস্ট্রি, এমব্রোলজী, জেনেটিকস্ ইত্যাদি। অতএব প্রথম মানব মানবীর সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞানের কাছে রহস্যময় হয়ে থাকলেও একই যুগল দম্পতি থেকে যে মানব জাতীর বিস্তার ঘটেছে সে বিষয়ে বিজ্ঞানের কাছে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে।

মৃত পশুর গোশত, রক্ত ও শূকরের গোশত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

সূরা আল-মায়েদা-৫ : ৩

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ.

Forbidden to you are; the Dead animals, blood, the flesh of swine and that on which Allah's Name has not been mentioned while slaughtering and that which has been killed by strangling or by a violent blow or, by a headlong fall or by the goring of horns and that which has been eaten by a wild animals-unless you are able to slaughter it and that which is sacrificed on stone-altars.

তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে মৃত পশুর গোশত, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যাকে আল্লাহর নাম ব্যতিত জবাই করা হয়েছে, যাকে গলাটিপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে, যাকে সজোরে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে, যা উপর থেকে পড়ে মারা গেছে, যা শিংয়ের গুতোয় মারা গেছে, যাকে বন্য প্রাণী (আংশিকভাবে) ভক্ষণ করেছে এবং যা কোনো মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হয়েছে ইত্যাদি। (সূরা আল-মায়েদা : ৩)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক উল্লিখিত পশুর গোশত আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে, মৃত পশুর গোশত, রক্ত, ও শূকরের গোশত সম্পর্কে সূরা বাকারার ১৭৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এখানে অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা পশুর গোশত খাওয়া নিষেধ। যখন কোনো প্রাণীকে গলা টিপে ধরা হয় তখন সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। এর ফলে বাড়তি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস রক্তে জমে ওঠে এবং এর দ্বারা ক্ষতিকর যৌগিক উপাদান সৃষ্টি হয়। এছাড়া রক্ত বেরিয়ে যাওয়া কোনো সুযোগ না থাকায় টক্সিন উপাদান উৎপন্ন হয় এবং ব্যাকটেরিয়াও বের হয়ে যেতে পারে না। সুতরাং গলাটিপে হত্যা করা পশু পাখির গোশতে ব্যাকটেরিয়া ও টক্সিন থেকে যায় যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। যে গোশতে ব্যাকটেরিয়া ও টক্সিন পদার্থ

থাকে তাকে দীর্ঘদিন যাবৎ ভালো রাখা যায় না। ফলে পচে যায়। এভাবে একটি প্রাণী মারা গেলে তার শরীর থেকে রক্ত বের করা যায় না– এমনকি পরে যদি টুকরা টুকরাও করা হয়।

গুলি করে ইলেকট্রিক সক দিয়ে এবং সজোরে আঘাত করে পশু হত্যা করা একটি নিষ্ঠুর পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে পশুকে হত্যা করা হলে তার মধ্য থেকে চলমান রক্ত বের করা সম্ভব হয় না। কারণ রক্ত তখনই বেরিয়ে আসে যখন হৃৎপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণ ঘটতে থাকে। পশু চেতনা হারায় এবং মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। জবাই হওয়া অবস্থায় যখন পশু পড়ে থাকে তখন তার মধ্যে সংকোচন প্রসারণ সৃষ্টি হয়। যখন মস্তিষ্ক কোষে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয় তখন তার প্রতি উত্তরে পেশী সংকোচন শুরু হয় এবং পেশী সংকোচনের কারণে প্রাণীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ধমনীতে যে ব্লাড ভেসেল (Blood Vessels) রয়েছে তার উপর চাপ সৃষ্টি করে পেশী সংকোচনের মাধ্যমে রক্ত নির্গত করে দেয়। নির্গত রক্ত কেন্দ্রীয় পরিবহন ব্যবস্থায় মস্তিষ্কে যেতে চাইলেও যেতে পারে না। কারণ গলা তো তখন কর্তিত অবস্থায় থাকে। তবে যতোক্ষণ না পশুটি মারা যাচ্ছে ততোক্ষণ তার মস্তিষ্ক কোষ থেকে তার পেশীর কাছে এ মর্মে বার্তা যাচ্ছে যে, চাপ দিয়ে রক্ত সঞ্চারিত করো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রাণী যখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকে তখন তার মধ্যে সংকোচন-প্রসারণ দেখা দেয়। জবাই করার ফলে প্রচুর রক্ত ক্ষরণের দরুন পশু সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। এ সময় সে কোন ব্যথা অনুভব করে না, কাজেই মুসলমানদের জবাই করার পদ্ধতি খুবই প্রণিধানযোগ্য। যতোক্ষণ না জবাই করা প্রাণী মারা যায় তার আগে চামড়া ছিলার কাজ বন্ধ রাখার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা) খুব জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন।

কুড়াল বা অন্য কঠিন যন্ত্র দ্বারা আঘাত করে পশু হত্যা করার ফল একই দাঁড়ায় অর্থাৎ রক্ত নির্গত হতে পারে না। আধুনিককালে ইলেকট্রিক 'সক' দিয়ে পশুকে হতচেতন করা হয়। এ পদ্ধতি সম্পর্কে আমেরিকার কৃষি বিভাগের অধীনস্থ গোশত পরিদর্শন শাখা ১৯৫৩ সনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

কয়েক বছর আগে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেল গোশত পরিদর্শন শাখা ইলেকট্রিক 'সক'-এর সাহায্যে পশুকে নিস্তেজ করার পক্ষে অনুমতি দেয়া হয়নি। এ গবেষণায় যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল তাতে বলা হয়েছে শূকরের উপর ইলেকট্রিক 'সক' চার্জ করা হলে তার গোশত পেশীর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। সাধারণভাবে শূকর রোগাক্রান্ত হলে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার সাথে এ পরিবর্তনের পার্থক্য দেখানো সম্ভব হয় না।

১৯৫৫ সনে ড্যানিশ মিনিস্ট্রি অব জাসটিস একটি সার্কুলার জারি করেছিলেন। এ সার্কুলারের ভাষ্য হলো, ইলেকট্রিক 'সক'-এ মারার ফলে পশুর গোশত ফুলে ওঠে, অন্ত্র রক্তাভ হয়ে যায় এবং শির দাঁড়ার নিচের হাড় ও কাঁধের দু'দিকে হাড় ফেটে যায়। এ অবস্থায় মাংসের সাথে যে রক্ত থাকে তদ্বারা রক্তে পচন ধরে এবং এ মাংসের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

অধিকন্তু ইলেকট্রিক সকে হতচেতন পশুর গোশতের পচনকে ত্বরান্বিত করে। এর কারণ হলো রক্ত নির্গত হওয়ার পূর্বে ইলেকট্রিক 'সক'-এর কারণে ল্যাকটিক এসিডের উচ্চ লেভেলে উত্তরণ ঘটে। ল্যাকটিক এসিড উচ্চ পর্যায়ে উত্তরণের কারণে গোশতের ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা পরিবর্তন হয়ে যায়। ইলেকট্রিক 'সক' এর মতো জোরালো আঘাতে পশুর মৃত্যু ঘটলে নার্ভ যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যার ফলে হৃদস্পন্দন সঠিকভাবে হয় না এবং রক্ত ভালোভাবে নির্গত হতে পারে না যদি জোরালো আঘাতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে ভোলানটারী পেশীতে হঠাৎ করে সংকোচন ঘটে এবং ভোলানটারী পেশী প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর তরল পদার্থকে দেহ থেকে বের করে দেয় এবং ইলেকট্রি সক-এর মতো কিছু ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টি করে। এছাড়া হার্টবিট বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে অধিক পরিমাণে রক্ত ক্ষরণ হয় না। কিন্তু ভালো গোশতের জন্য রক্ত ক্ষরণ খুবই প্রয়োজন।

যদি কোনো পশু উপর থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়ে, ঘাড় ভেঙ্গে, দারুণ আতঙ্কে কিংবা ডুবে গিয়ে মারা যায় তাহলে এসব মৃত্যু অপঘাত মৃত্যুর সমতুল্য হবে। পানিতে ডুবে মৃত্যু শ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুর সমান। পশু নিজেদের মধ্যে মারামারি করে কিংবা মানুষ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মারামারি করে শিংয়ের গুতোয় মারা যায় তাহলে সে মৃত পশুর মাংস খাওয়াও নিষেধ। কারণ এ ধরনের পশুর মৃত্যু অপঘাত মৃত্যু বলে বিবেচিত হয়।

যদি কোনো পশু অন্য পশুর কামড়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার গোশত খাওয়াও নিষেধ। এ নিষেধ তিনটি কারণে যুক্তিসঙ্গত। (ক) আক্রমণকারী পশুর আংশিক কামড়ে বিষ থাকতে পারে। (খ) বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করার ফলে মৃত পশুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হতে পারে এবং (গ) দেহস্থ প্রবাহমান রক্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে নাও কমতে পারে।

যদি হিংস্র প্রাণীর কামড়ের পর কোনো পশু জীবিত থাকে এবং তাকে জবাই করার সময় তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তাহলে সে পশুর গোশত খেতে আল্লাহ পাকের নিষেধ নেই। এভাবে পশু যখন জীবিত থাকে তখন ঝুঝা যায় যে,

পশুর উপর আক্রমণ অল্প সময়ের জন্য ঘটেছে। আহত পশু কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে পারে অনুমিত হলে তাকে আল্লাহর নামে জবাই করে তার গোশত খাওয়া ন্যায়সঙ্গত। এখন দেখা যাক চিকিৎসা বিজ্ঞান মুসলমানদের জবাই পদ্ধতি সম্পর্কে কি বলছে :

ডক্টর অব মেডিসিন, লর্ড হোরডার বলেছেন, আমি মুসলমানদের জবাই পদ্ধতি খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি। এ পদ্ধতিতে পশুর ঘাড়ের সব রক্তনালী, শ্বাসনালী ও অন্ননালীসহ শিরদাঁড়ার উপর অংশের হাড়ের আগ পর্যন্ত সকল নরম গঠন কেটে যায়। এর ফলে পশু সহজেই চেতনা হারায়। এ পদ্ধতির চেয়ে সহজ ও তাৎক্ষণিক কোনো পদ্ধতি নেই। জবাইয়ের কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পশু আর নড়াচড়া করতে পারে না। এর শরীর তখন দাপা দাপি করতে থাকে। শরীরের এ দাপদাপি এক মিনিটের মধ্যে স্তিমিত হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে খুব ধারালো ছুরি দিয়ে জবাই করা এবং দক্ষতার সাথে চুরি চালানোর ফলে পশুর যে অবস্থা ঘটে তাকে মূর্ছা বলা হয়। এ ধরনের মূর্ছাগত অবস্থা রক্তনালী কাটার ফলে সংঘটিত হয়। রক্তনালী পৃথক করার ফলে দ্রুতবেগে রক্ত নির্গত হয় এবং চাপ কমে যায়। জবাই করার ৯০ সেকেণ্ডের মধ্যে পশুর তীব্র নড়াচড়া আরম্ভ হয় এবং তা ৯০ সেকেণ্ড বিদ্যমান থাকে। মূর্ছার প্রাথমিক অবস্থায় পশুর অনুভূতির বিলোপ ঘটে।

এ পর্যন্ত পশু নিধনের যতো প্রকার পদ্ধতি চালু আছে তার মধ্যে 'জবাই'-এর পদ্ধতি উৎকৃষ্টতম। এতে পশুর যন্ত্রণা কম হয়। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এর এপ্লাইড ফিজিওলজি বিভাগের পরিচালক ডাঃ লিওনার্ড হিল বলেছেন, "জবাই করা পশুর চেতনা হারাবার সঙ্গে সঙ্গে যে নড়াচড়া শুরু হয় তা থেকে দেখা গেছে যে, বিভ্রান্ত অবস্থায় ঐ প্রাণীর রক্ত বের করে নেয়া হয়েছে। অনেকেই মনে করে নড়াচড়ার বিষয়টি অনুভূতিজাত। তবে আমরা জানি, খণ্ডিত মস্তকের একটি প্রাণীর দেহও অনেকক্ষণ নড়াচড়া করে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে পশু জবাই ব্যতিত তার গোশত খাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাক যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন তা মানব জাতীয় উপকারের জন্যই করা হয়েছে। আর জবাইয়ের সময় আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করা খুবই প্রণিধানযোগ্য।

ওজুর চার ফরজ স্বাস্থ্যসম্মত

সূরা আল-মায়েদা-৫ : ৬

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

O you who believe! When you intend to offer *Salat*, wash your faces and your hands upto the elbows and rub your heads and (wash) your feet upto the ankles.

হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নামাজ পড়ার মনস্থ করো তখন মুখমণ্ডল এবং হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত করো। মাথা মাশায়েক করো এবং পদযুগল গিট পর্যন্ত ধৌত করো। (সূরা আল-মায়েদা : ৬)

পবিত্রতা অর্জন করা মুসলমানদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওজু কিংবা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। নামাজ পড়ার জন্য ওজু করা ফরজ। ওজুর জন্য পানি ব্যবহার করা হয়। এ পানি অবশ্যই বিশুদ্ধ এবং দুর্গন্ধমুক্ত হতে হবে। এর রঙ ও স্বাদ স্বাভাবিক থাকতে হবে। উল্লিখিত আয়াতে চার প্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এ চার প্রকার ধৌত-কর্ম ওজুর ফরজ হিসেবে বিবেচিত।

১. মুখমণ্ডল ধৌতকরণ (Washing Face) :

দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়কে অধিক সময় উন্মুক্ত রাখতে হয়। তাই ঐগুলো ধূলাবালি ও ক্ষতিকর রোগজীবাণুর মাধ্যমে সহজে আক্রান্ত হয়ে থাকে। মানুষের শরীরের চামড়ায় সবসময় বিভিন্ন রোগজীবাণু আশ্রয় নেয়।

আঙ্গুলের সাহায্যে এসব জীবাণু কানের বাহ্যদেশে, নাসারন্ধ্রে এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। অপরিষ্কার হাতের কারণে খাদ্য ও পানীয় দূষিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শরীরের চামড়া এসব রোগজীবাণুকে বাধা দিয়ে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেয় না। কিন্তু চামড়া সামান্য কেটে গেলে সেখানে রোগজীবাণু প্রবেশ করে এবং তথায় বংশ বৃদ্ধি করে। এর ফলে কিছু রোগের সৃষ্টি

হয়। যথা- ফোড়া, ব্রন, সেলুলিটিস (Cellulities), সেপটিকেমিয়া, (Septicaemia), পাইয়েমিয়া (Pyaemia) ইত্যাদি। হাত ধোয়ার পর মুখমণ্ডল ধোয়ার ফলে রোগ সংক্রমণ ঘটতে পারে না।

চোখের ভ্রু, লোম, গোঁফ ও দাড়ি ঘন ঘন ধৌত করা প্রয়োজন। নতুবা এগুলো সহজে দূষিত হতে পারে। মুখমণ্ডল যদি অপরিষ্কার থাকে তাহলে ধূলাবালি ও রোগ জীবাণু সহজে মুখের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং লালাস্রাবী গ্রন্থী ও ঘর্ম নিঃসরণ বন্ধ করে দিতে পারে। সুতরাং নামাজের আগে অজুর মাধ্যমে হাত-মুখ ধৌতকরণ বাধ্যতামূলক এবং এটা নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যসম্মত। এভাবে যদি দৈনিক পাঁচবার মুখমণ্ডল ধৌত করা হয় তাহলে চামড়ার মাধ্যমে রোগ সংক্রমণের বিপদ বহুলাংশে কমে যায়।

২. কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌতকরণ (Washing hand upto the elbow) ঃ আগেই উল্লেখ করেছি দুই হাত অধিকাংশ সময় উন্মুক্ত রাখতে হয়। তাই হাত দুইটি সহজে দূষিত হয়ে থাকে এবং নানারকম রোগজীবাণু আশ্রয় নিতে পারে। সুতরাং কনুই পর্যন্ত হাত দুইটি ধৌতকরণকে ওজুর মধ্যে ফরজ করা হয়েছে। এটা বিজ্ঞানসম্মতও বটে।

৩. মাথা মাশায়েক করা (To rub the head) : দুই হাত দিয়ে মাথা মাশায়েক করতে হয়। মাথা এবং মাথার চুল প্রায় উন্মুক্ত থাকে। তাই মাথা ও মাথার চুলে ময়লা, ধূলাবালি এবং রোগজীবাণু জমার সুযোগ থাকে।

হাতের সাহায্যে বাইরের এ সমস্ত ময়লা ও ধূলাবালি মুছে ফেলা খুবই স্বাস্থ্যসম্মত। হাল্কা ধরনের ঘর্ষণ বা মাশায়েক ওজুর মধ্যে অবশ্যই করণীয় কাজ এবং ভেজা হাত দিয়ে গর্দান ঘর্ষণ করা নবীজির (স) সুন্নত।

৪. পদযুগল গিট পর্যন্ত ধৌতকরণ (To wash the feet upto the ankles) : পা দু'টি ও সবসময় উন্মুক্ত থাকে। তাই সেগুলো সহজে ধূলাবালিতে দূষিত হয়ে পড়ে। ওজু করার সময় সেগুলোকে ধৌত করা বাধ্যতামূলক।

অতএব পোশাকের বাইরে আমাদের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা থাকে ওজুর মধ্যে সেগুলো যুক্তিসঙ্গতভাবে ধৌত করতে হয়। কেউ যদি এভাবে দৈনিক পাঁচবার উল্লিখিত অঙ্গসমূহ ধুয়ে-মুছে ফেলে তাহলে তার শরীরে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। তাছাড়া ওজুর আওতায় আরো যেসব কাজ অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলো, কব্জি পর্যন্ত হস্ত ধৌত করা, কুলি করে মুখ গহব্বর পরিষ্কার করা, মেসওয়াক করে দাঁত পরিষ্কার করা, নাসারন্দ্র ও কানের বাহ্য-অংশ পরিষ্কার করা। এসব কাজ নবীজির (সা) সুন্নত হিসেবে গণ্য।

আলো ও আঁধার সৃষ্টির রহস্য

সূরা আল-আন'আম-৬ : ১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ.

All Praises be to Allah, Who created the Heavens and the earth and originated the Darkness and the Light; yet those who disbelieve hold others as equal with their Lord.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি যারা অবিশ্বাসী তারা অন্যকে মহান প্রভুর সাথে সমতুল্য সাব্যস্ত করে। (সূরা আল-আন'আম : ১)

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী সূরা বাকারার ১১৭ নং আয়াতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রত্যেকটি পর্যায় খুবই বিস্ময়কর। এ সৃষ্টি রহস্য যে কোনো ব্যক্তিকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তোলে। মানুষ এ বিস্ময়কর সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব তা ভেবে কূল-কিনারা পায় না। তবে তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, এ সৃষ্টি বিস্ময়ের পেছনে অবশ্যই কোনো একক স্রষ্টার হাত রয়েছে। তিনি পরম হিতৈষী মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এ আয়াত থেকে এখানে বিশ্লেষণ করা হবে অন্ধকার ও আলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যে আলো ও অন্ধকার থেকে সৃষ্টি জগৎ অসীম উপকার লাভ করে থাকে।

আলো (Light) শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এক ধরনের বিকীর্ণ বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তিকে বোঝাতে যা আমাদের দৃষ্টি বা দেখার ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সম্প্রসারিত অর্থে আলো বিদ্যুৎ চৌম্বক বর্ণালী নামে পরিচিত গোটা বিকিরণ পরিসরকেই নির্দেশ করে। গোটা বিকিরণ পরিসরে রয়েছে এক ইঞ্চির লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ থেকে শুরু করে শত শত মাইল বিকিরণ যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গামা রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি, অতিবেগুণী রশ্মি, দৃশ্যমান আলো, অবলোহিত তরঙ্গ, মাইক্রোতরঙ্গ, রেডিও ও টিভি তরঙ্গ এবং অতি দীর্ঘ বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ।

আলো সসীম গতিবেগে চলে তা তত্ত্ব ও পরীক্ষা উভয়ের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বহু সংখ্যক নিখুঁত পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শূন্য স্থানে আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ২,৯৯,৭৯২,৪৫৮ কি.মি. (১,৮৬,২৮২,৩৯৭ মাইল)। মোটামুটি হিসাবে এ গতিবেগ ৩,০০,০০ কি.মি./সেকেণ্ড বা ১,৮৬,০০০ মাইল/সেকেণ্ড ধরে নেয়া হয়।

আলোর প্রকৃতি দ্বৈত (Dual)। এ দ্বৈত প্রকৃতির কারণে আলো কখনো তরঙ্গ (Wave nature), আবার কখনো কণা-প্রকৃতি (Particle nature) প্রদর্শন করে। আলোর এ ধরনের দ্বৈত প্রকৃতি কিভাবে সহঅবস্থান করে তা বুঝা খুবই কঠিন। আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী (Theory of relativity) আলোর গতিবেগই সর্বাপেক্ষা জোরালো। এ গতিবেগ কোনো বস্তুই অতিক্রম করতে পারে না। ফোটন একটি রহস্যময় কণা। এটি আলোক শক্তি বহন করে। এর দেহ-বস্তু শূন্যের সমান। তাই এটি আলোর গতিবেগ সম্পন্ন।

ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক প্রতিচ্ছবির দর্শনযোগ্য অংশকে সাধারণত আলো বলা হয়। এ আলো দৃষ্টির অপূর্ব অনুভূতি সৃষ্টি করে। দৃষ্টির অনুভূতি হলো মহান আল্লাহ পাকের অপূর্ব অবদান। উদ্ভিদ আলোর স্পর্শে ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়া সমাধান করে। এটা এক অসাধারণ প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল আলোর ছোঁয়ায় কার্বোহাইড্রেট এবং কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে অক্সিজেন উৎপন্ন করে। ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়া আবহাওয়া মণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যে সমতা রক্ষা করে। কার্বো-হাইড্রেট নানা রকমে গাছের মূল, কাণ্ড, পত্র ও ফলের মধ্যে জমা হয়। অতএব ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়া সত্যিই অসাধারণ। এ প্রক্রিয়া পৃথিবীর বুকে জীবনের উন্নতি অগ্রগতির বাহন।

পৃথিবীর বুকে জীব-জগতকে আলো বহুবিধ উপকার সাধন করে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, গাছে গাছে যখন ফুল ও ফল ধরে তখন তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে আলোক শক্তি গ্রহণ করে থাকে। প্রাণীবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কিছু পাখি আছে যারা ঠিক দুপুরের আলোতে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয়। আলোর সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব জলজ প্রাণীদের সাহায্য করে। এ সাহায্য পেয়ে ঐসব প্রাণী দূরের বস্তুকে দেখতে পায়। এর ফলে এদের সাঁতার কাটায় সুবিধা হয়। জোনাকী পোকাড়া যে নীল আলো বিচ্ছুরণ করে তার দ্বারা তারা জৈবিক সুবিধা লাভ করে। কারণ এ আলোতে বিপরীত লিঙ্গের জোনাকীরা পরস্পরকে দেখে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয়। বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিকের দৃশ্যমান অংশ এবং অদৃশ্য অংশ উভয়কেই মানব জাতির

সেবায় নিয়োজিত করেছে। লেসার (Laser) এক ধরনের তীব্র খুব সূক্ষ্ম আলোক-রশ্মি যা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিকের দর্শনযোগ্য অংশে দেখা যায়। যেমন, চোখের ছানি-কাটা। তাছাড়া এ রশ্মি দ্বারা যে কোনো ধাতুকে সার্বিকভাবে কর্তন করা হয় এবং বর্তমান যুগে যুদ্ধের মারণাস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সৌরবিজ্ঞানীরা এখন সৌরশক্তি ব্যবহার করে যে সব ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন তা হলো সৌরশক্তি দ্বারা উন্মুক্ত স্থানকে উত্তপ্ত করা, বিদ্যুৎ উৎপাদন করা, হিমায়িত করা, রান্নার কাজে লাগানো এবং হাইড্রোজেনকে জ্বালানী কাজে লাগানো। আবার ফ্রেসনাল লেন্সের (Freshnal lenses) সাহায্যে সূর্যের আলোকে কেন্দ্রীভূত করে পানির দুই উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে পৃথক করা যায়। এক ধরনের শৈবাল বা শেওলা (Algae) সূর্যলোকের উপস্থিতিতে পানি থেকে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে পারে। এ পদ্ধতির নাম বায়োফটোলাইসিস (Biophotolysis)।

ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক বর্ণালীর অদৃশ্য অংশ ও মানব জাতির বিশেষ সেবা করে যাচ্ছে।

রেডিও তরঙ্গ ও মাইক্রো-তরঙ্গের সহায়তায় রেডিও ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। Infra red waves রন্ধনের কাজে এবং বাতগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ডাক্তারী চিকিৎসায় রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এক্স-রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মূল্যবান পাথর, ধাতু ও শঙ্কর ধাতুর মধ্যকার খাদ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও এক্স-রে ব্যবহৃত হয়। এক্স-রে বিচ্ছুরণ কৌশলকে ঔষধ তৈরীর ডিজাইন ও নিয়ন্ত্রণেও ব্যবহার করা হয়। ক্যানসার রোগে এক্স-রে এবং ওয়াই-রে উভয়কে ব্যবহার করা হয়। গামা-রে সম্বলিত ক্যামেরা মানুষের বহু ধরনের অঙ্গ-অবয়বের স্থিতিশীল ও গতিশীল উভয় দৃশ্য তুলে ধরে। এর ফলে রোগের ডাক্তারী পরীক্ষা সুবিধা লাভ করে।

অন্ধকারকে (Darkness) দৃশ্যত কম গুরুত্বের বস্তু মনে করা হলেও আসলে আমাদের পৃথিবীর জীবনধারায় এর সুদৃঢ় প্রসারী প্রভাব রয়েছে। পৃথিবী আপন কক্ষে আবর্তনের ফলে পৃথিবীর সকল অংশে ২৪ ঘণ্টায় দিনরাত্রি সংঘটিত হয়। যদি পৃথিবী আবর্তিত না হতো তাহলে পৃথিবীর একদিক সূর্যের সামনে উন্মুক্ত থাকতো। আর অপরদিকে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকতো, এর ফলে আলো আধারের ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটতো না। রাত্রির অন্ধকার দিবাভাগের প্রাণীদের বিরতি দান করে। কোনো কোনো প্রাণী রাতে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে স্বাচ্ছন্দবোধ

করে। এমন কতগুলো রাসায়নিক পদার্থ আছে যেগুলোর পারস্পরিক বিক্রিয়া অন্ধকারে সংঘটিত হয়। ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য এক্স-রে ফিল্ম অন্ধকারে পরিষ্কার করতে হয়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা খুবই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃতিতে আল্লাহ পাক একটি সুষম বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা নিয়ন্ত্রিত হয় দিন ও রাত্রির দ্বারা। দিনের আলোতে কাজ করার স্পৃহা জাগে এবং এর দ্বারা জীবন বেড়ে ওঠে। রাতের অন্ধকারে মানুষ গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত থাকে যা স্বাস্থ্যের সবলতা ও সুস্থতা বিধান করে। যে আলো-আঁধার জীবনের ভিত্তি গঠন করে তা নিশ্চয় একথা ঘোষণা করে যে সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের জন্য যাঁর নির্দেশে অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ পরম হিতৈষী আল্লাহ পাকের সাথে কাউকে সমতুল্য সাব্যস্ত করা নিঃসন্দেহে অপরাধ।

সকল বিচরণশীল প্রাণী কমিউনিটি গড়ে তোলে

সূরা আল-আন'আম-৬ : ৩৮

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ مَافَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ.

There in not a moving creatare on earth, nor a bird that I lies with its two wings but are communities like you. We have neglected nothing in the *Book.* Then unto their Lord shall be gathered.

পৃথিবীতে বিচরণশীল একটি প্রাণীও নেই, উড়ন্ত একটি পাখিও নেই যারা তোমাদের মতো গোত্র রচনা করেনি। আমরা এ কিতাবে কোনো কিছু উপেক্ষা করেনি। অতঃপর তারা সবাই মহান প্রভুর কাছে সমবেত হবে। (সূরা আল-আন'আম : ৩৮)

গোত্র (Community) এর অর্থ হলো একই প্রজাতিভুক্ত জীবন্ত সত্তার সম্মিলিত সংস্থা যাদের মধ্যে একই রকম বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। হাজার বছর ধরে প্রাণীদের মাইগ্রেশন, প্রজনন, বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক নির্বাচন জীবনের একটি জটিল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এ জটিল নেটওয়ার্কই গোত্র বা কমিউনিটি নামে পরিচিত।

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে স্পষ্ট করে ঐসব গোত্রের কথা বলা হয়েছে যে গোত্রসমূহ গঠিত হয় একই প্রজাতি দ্বারা এবং তারা সংঘবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে কিংবা বাতাসে উড়ে বেড়ায়। বৃহত্তর গোত্রের একক হলো মানব গোষ্ঠী। এ মানব গোষ্ঠী অধিকতর জটিল আকারে সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠন করে। জীবন ধারণের সুযোগ-সুবিধা যদি অনুকূলে থাকে তাহলে দুই অংশীদারের জৈব মিলনের দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করে। এর ফলে জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। মানব গোষ্ঠীর সামাজিক কাঠামো তৈরী হয় নারী, পুরুষ, শিশু ও কিশোরদের সমন্বয়ে। আর সামাজিক আচরণ ও সামর্থ্য নির্ধারিত হয় সমাজবদ্ধ দলের সর্দার, পথ-প্রদর্শক, প্রহরী ও অভিভাবক দ্বারা। উপরন্তু মানুষের সমাজ কেবলমাত্র জৈব প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল নয় বরং তা বিশেষভাবে নির্ভর করে মানুষের কৃষ্টির উপর। একজন সৈনিক, একজন রাজনীতিবিদ, একজন শিক্ষক, একজন চিকিৎসক একজন প্রকৌশলী, একজন মিস্ত্রি এবং অন্য সব পেশাজীবি যদিও বাহ্যিক আকারে একই রকম দেখতে তবুও তাদের আচরণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

মানব গোষ্ঠী ছাড়াও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল আরো বহু প্রাণী রয়েছে যারা দল বেধে বসবাস করে। তাদের মধ্যে কেউ পায়ে হেঁটে চলে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে চলে, কেউ মাটির নিচে এবং কেউ পানিতে বাস করে। তবে প্রত্যেক প্রজাতির পৃথক পৃথক সমাজ বা কমিউনিটি রয়েছে। অর্থাৎ তারা দল বেধে বাস করে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এ কথারই ইঙ্গিত করেছেন। দল বেধে বাস করার ফলশ্রুতিতে নানাবিধ উপকার লাভ করা যায়। এভাবে বাস করে জৈব সম্পর্কের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় এবং বিশেষ গুণসম্পন্ন প্রাণীর আর্বিভাব ঘটে। দল বেধে বাস করার সর্বপ্রকার ভালো দিককে একত্রিত করলে দেখা যায় যে, দল যোগ্যতার সাথে তাদের মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস যথা, বাসস্থান, নিরাপত্তা, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়।

আয়াতের দ্বিতীয়াংশে উড়ন্ত পাখিদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে তারাও মানুষের মতো কমিউনিটি রচনা করে থাকে। এ কমিউনিটি পরিলক্ষিত হয় পরিযায়ি পাখিদের (Migratory birds) ক্ষেত্রে। এরা কখনো শীতের সন্ধানে, কখনো খাদ্যের সন্ধানে, কখনো বা মনের সুখে দলবদ্ধভাবে দেশান্তরিত হয়। আবার তারা একদেশ থেকে অন্যদেশে গিয়ে কমিউনিটি রচনা করে এবং জৈব মিলনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে। এ প্রক্রিয়ায় তারা বাসা তৈরী করে, খাদ্য সংগ্রহ করে এবং স্ত্রী পাখিরা বাসায় ডিম পাড়ে। এদের মধ্যে সৈনিক শ্রেণী তাদের সমাজকে রক্ষা করে। তারা প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ করার হাতিয়ার দ্বারা সজ্জিত থাকে। তাদের হাতিয়ার হলো তাদের শক্ত ও দীর্ঘ ঠোঁট যার দ্বারা শত্রুকে কামড়াতে পারে। পরিযায়ি পাখি ছাড়াও সাধারণ পাখি এবং উড়তে পারে এমন কীট-পতঙ্গের মধ্যেও কমিউনিটি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উইপোকা বা ঘুনপোকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে যারা বিশেষ কাজ করার জন্য শ্রেণীভুক্ত হয় তাদের কর্ম প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে এ দলের বেড়ে ওঠার বিষয়। এদের মধ্যে যারা স্ত্রীজাতীয় তারা বাচ্চা জন্ম দেয়। এই অবস্থায় তাদের তলপেট স্ফীত হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে যারা পুরুষ এবং বন্ধ্যানারী তাদের কাজ হলো খাদ্যের সন্ধান করা, খাদ্য মজুদ করা, বাসা তৈরী ও বাসা মেরামত করা। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে। তারা শক্ত চোয়াল দ্বারা শত্রুকে কামড় দিয়ে ধরাশায়ী করে। এছাড়া তাদের দেহ থেকে এক ধরনের রাসায়নিক বস্তু নির্গত করে এবং তা শত্রু ধ্বংস করার কাজে বিষাক্ত গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করে।

সুতরাং এসব আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ পাক অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে কমিউনিটি রচনা করার কৌশলগত শিক্ষা দান করেছেন।

পরম হিতৈষী আল্লাহ্ পাক বিপদ থেকে উদ্ধার করেন

সূরা আল-আন'আম-৬ : ৬৩

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

Say : 'Who rescues you from the darkness of land and sea?'

বলুন : 'কে তোমাদের উদ্ধার করে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে?' (সূরা আল-আন'আম : ৬৩)

এ আয়াতাংশে জমিন ও সাগরের অন্ধকার বলতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বহুবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং তাদের ব্যাপকতায় জলে-স্থলে সংঘটিত হয় ধ্বংসলীলা। তারই কয়েকটি নিদর্শন নিম্নে আলোচনা করা হলো।

রাতের গভীর অন্ধকারের মধ্যে জমিন ও সমুদ্র উভয়ে একাকার হয়ে আবৃত থাকে। যদি আকাশে চাঁদের আলো না থাকে তাহলে এ অন্ধকার আরো গভীরতর হয়। এ অন্ধকারে দুষ্কৃতিকারীরা খুবই কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। ফলে বহু রকম অদৃশ্য বিপদের সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু এ অন্ধকারে কেউ যদি সতর্ক হয়ে না চলে তাহলে সে পথভ্রান্ত হয়ে অন্যপথে চলে যেতে পারে।

ভূমি ও সাগরের উপর যে কৃষ্ণমেঘের সৃষ্টি হয় তা থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে। এর ফলে বিধ্বংসী বন্যার সৃষ্টি হয়। বজ্রাঘাতে জীবন ও সম্পদের ক্ষতিসাধন হয় এবং শিলা-বৃষ্টিতে বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি হয়ে থাকে।

ভূমি ও সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় যে ঘন কুয়াশার অন্ধকার জমাট বাধা অবস্থায় থাকে তার ফলে দূরের বস্তুকে দেখা যায় না। একারণে ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটে। যানবাহনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সমুদ্র পথে চলাচলকারী নৌকা ও জাহাজের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় যখন সমুদ্রের বুকে কিংবা স্থলভাগে তীব্রগতিতে ছুটে চলে তখন বহু নৌকা ও জাহাজ সমুদ্রের ভেতর নিমজ্জিত হয়। ভূখণ্ডের বসতবাড়ি, বৃক্ষরাজী এবং আরো অন্যান্য সম্পদের ধ্বংসসাধন হয়ে থাকে। এ ঘূর্ণিঝড় যখন জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে তখন বহু মানুষের জীবনাবসান ঘটে।

ভূমিতে গভীর গর্তের মধ্যে যে অন্ধকার জমা থাকে সে গর্তে পতিত হয়ে বহু পথচারী প্রাণ হারায়। তাছাড়া এ ধরনের গর্তে বিষাক্ত গ্যাসসহ অনেক ক্ষতিকর বস্তু সঞ্চিত থাকতে পারে।

সাগর ও পৃথিবীর গভীরে "অন্ধকার" বিরাট স্থান জুড়ে অবস্থান করছে। এর ফলে ভূমিকম্প, সুনামী (Tsunami) ও অগ্নীপাতের মতো বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে থাকে।

সুতরাং ভূমি ও সাগরের সূচিভেদ্য অন্ধকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এটা সঠিক যে, পৃথিবীর বুকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সময়ের সাথে ঘটে থাকে। তখন বিরাট আকারে যে ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি হয় তাতে মনে হয় এর থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন। তাই আল্লাহ পাক প্রশ্ন করেছেন কে তোমাদের রক্ষা করেন? প্রতিউত্তরে বলতে হবে পরম হিতৈষী আল্লাহ পাক এ ধরনের মহাবিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করে থাকেন। তাই একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা করা সমীচীন।

কিভাবে শস্য-বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে

সূরা আল-আন'আম-৬ : ৯৫

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ.

Verily, It is Allah Who causes the seed-greain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead and it is He who brings forth the dead from the living. Such is Allah, then how are you deluded away from the truth?

নিশ্চয়ই, তিনি আল্লাহ যিনি শস্য-বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুরোদগম করে থাকেন। তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন।

তিনিই আল্লাহ (যিনি সব কিছু করেন, অতঃপর তোমরা কিভাবে সত্য পথ থেকে ভ্রান্ত পথে প্রতারিত হয়ে থাক? (সূরা আল-আন'আম : ৯৫)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক দু'টি বৈজ্ঞানিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন। একটি বীজের অঙ্কুরোদগম এবং অপরটি মৃত থেকে জীবিত ও জীবিত থেকে মৃতের প্রাকৃতিক চক্র।

বীজের অঙ্কুরোদগম (Sprouting of seed-grain) :

বীজের অঙ্কুরোদগম খুবই সহজ সরল ব্যাপার বলে আমরা মনে করি। এটি প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ পাকের একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার অধীনে আল্লাহ্ পাক প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশকে অঙ্কুরোদগমের পক্ষে সহায়ক করে দেন।

একটি বীজের মধ্যে থাকে বীজের আবরণ ভ্রূণ (Embryo) অথবা প্রারম্ভিক চারা। আরো থাকে তার বীজপত্রে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপুষ্টি যা অঙ্কুরোদগমের সময় সহায়তা করে। মাতৃচারা থেকে আলাদা হয়ে বীজের এমব্রো নীরব অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকে। যখন প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশ লাভ করে তখন ঐ ভ্রূণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অধিকাংশ বীজ খুব শুষ্ক ধরনের হয় এবং তারা তাদের মোট ওজনের ৫ থেকে ২০ শতাংশ পানি শোষণ করে। বীজ যতোক্ষণ না প্রয়োজনীয় পানি গ্রহণ করে

ততোক্ষণ বীজের অঙ্কুরোদগম সম্ভব হয় না। বীজ পানি গ্রহণ করার অর্থ হলো পানির সঞ্চালন। পানি সঞ্চালিত হয়ে কোষ প্রাচীরের গঠন বস্তুকে স্পর্শ করে। পানি গ্রহণ করার ফলে গৃহিত পানির চাপ আশ্চর্যজনকভাবে বেড়ে যায়। বীজ পানি পান করে তার প্রাথমিক গঠন থেকে বহুগুণে স্ফীত হয়ে ওঠে এবং এর ফলে তার উপরের আবরণ ফেটে যায়। এভাবে ফেটে গেলে বীজের মধ্য থেকে প্রথমে বেরিয়ে আসে শিকড়। এ শিকড় মাটির নিচের দিকে বৃদ্ধি পায় এবং চারাগাছকে নোঙ্গরের মতো ধরে রাখে। এরপর গজিয়ে ওঠে অঙ্কুর। এ অঙ্কুর মাটি থেকে উপরের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বীজ থেকে যখন চারাগাছ গজিয়ে ওঠে তখন বীজের মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। বীজ এ খাদ্য হজম করে চারাগাছের বিভিন্ন অংশে খাদ্যপ্রাণ ছড়িয়ে দেয়। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কিছু কিছু বীজের জীবনীশক্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য সংরক্ষিত থাকে। দীর্ঘ জীবনের প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচ্য দেশীয় পদ্ম বীজের মধ্যে। এ বীজ সাফল্যজনকভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে বেঁচে থাকে। এ ধরনের তিনটি বীজ আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৫১ সনে টোকিও শহরের কাছে এক জলজ উদ্ভিদের স্তূপের মধ্য থেকে। এ বীজগুলোকে নিয়ে বীজ বিশেষজ্ঞরা বিশেষ ব্যবস্থায় চারা গাছের উদ্গমন ঘটান এবং সেই গাছে ফুল ধরে। এ রেকর্ডও ভঙ্গ হয়েছে ১৯৬৭ সনে। এ সময় কানাডার ইউকোন এলাকায় একটি বরফ জমা গর্ত থেকে 'Arctic lupine' (শিম জাতীয় গাছ) গাছের বীজ পাওয়া যায়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে এ বীজের বয়স নির্ণয় করা হয়েছে প্রায় ১০,০০০ বছর। এ বীজ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল।

বীজ সুপ্ত থাকার কারণ হলো বাইরের পানি ও অক্সিজেন তার আবরণী ভেদ করতে পারে না। খেজুর বীজ ও আমের আঁটির উপরের আবরণ খুবই শক্ত। এ শক্ত আবরণ যখন বৃষ্টিপাতের ছোঁয়ায় ক্রমে স্ফীত হয়ে ওঠে এবং সেখানকার বাধাদানকারী রাসায়নিক পদার্থ অপসারিত হয়ে যায় তখন ঐ বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে।

বীজ সম্পর্কে যে দু'টি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বীজ সুপ্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে।

মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত থেকে মৃত চক্র (The Cycle of the living from the dead and the dead from the living) : বীজের সুপ্ত অবস্থাকে বাহ্যত শুষ্ক-মৃত বলে গণ্য করা হয়। এরূপ অবস্থায় বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটলে চারাগাছের জীবন শুরু হয়। পক্ষান্তরে গাছ পরিপূর্ণ হয়ে বীজ গঠন করে। বীজ গঠন করার ফলশ্রুতিতে গাছের জীবন-ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে।

বীজের সুপ্ত অবস্থা বা মৃত অবস্থা অন্যান্য গাছের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এসব বৃক্ষরাজির কাণ্ড উষ্ণ আবহাওয়ায় মাটির নিচে কিংবা মাটির উপরে থাকে। ড্যাফোডিল ও টিউলিপ ফুলের কন্দ শীতকালে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে তাদের পাতা ও ফুল ত্যাগ করে। এ ঘটনা ঘটে পাতাঝরা বৃক্ষের বেলায়ও। শরৎকালে পাতাঝরা বৃক্ষরা পাতা পরিত্যাগ করে। এ সময় তাদের জীবন ধারণের কর্মকাণ্ডের গতিও খুব শ্লথ হয়ে পড়ে। যখন বসন্তকালের আগমন ঘটে তখন আবার চারিদিকে পত্র-পল্লবের মধ্যে নবজীবনের চঞ্চলতা জেগে ওঠে। গাছে গাছে কচি পাতা ও ফুলের কলি শোভা বর্ধন করে। শীতকালে যে বৃক্ষরাজি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল তারা আবার নতুন শক্তিতে সজীবতা লাভ করে। সুতরাং এসব ঘটনার মাধ্যমে প্রকৃতির বুকে মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত থেকে মৃত হওয়ার চক্র স্বাভাবিক গতিতে আবর্তিত হয়। আর প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক। এ মহাসত্য উপলব্ধি করার পর আমাদের ভ্রান্ত পথে ধাবিত হওয়া মোটেও সমীচীন নয়।

বিশ্রামের জন্য রাত, সময় নির্ণয়ের জন্য চন্দ্র-সূর্য

সূরা আল-আন'আম-৬ : ৯৬

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

He is the cleaver of the day-break. He has appointed the night for resting and the sun and the moon for reckoning such is the measuring of the All-Mighty, the All Knowing.

তিনি ঊষাকালের উন্মেষক। তিনি রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে (সময়) গণনার জন্য নিয়োজিত করেছেন। এটি সেই সত্তার পরিমাণ যিনি সর্বশক্তিমান-সর্বজ্ঞানী। (সূরা আল-আন'আম : ৯৬)

এ আয়াতটি দু'ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে। ১. দিবসের সূচনাকারী আল্লাহ পাক (২) সূর্য ও চন্দ্র সময়ের হিসাব রক্ষক।

১. দিবসের সূচনাকারী (Cleaver of the day-break) : পৃথিবী নিজ অক্ষে দৈনন্দিন আবর্তনের ফলে ভূমণ্ডলে সর্বত্র দিবা-রাত্রি সংঘটিত হয়ে থাকে। এভাবে ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের সামনে আসে সেখানে দিন আবির্ভূত হয়। আর যে অংশ সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে সে অংশে রাত্রি সংঘটিত হয়। পৃথিবীর এ ঘূর্ণন যেহেতু বিরতিহীন সেহেতু দিনের পর রাত, রাতের পর দিন ক্রমান্বয়ে একই স্থানে আবির্ভূত হতে থাকে।

সূর্যের কিরণ অন্ধকারের বুক চিরে পৃথিবীতে পতিত হলেই ঊষাকালের সাক্ষাৎ মিলে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ্ পাক ঊষার আবির্ভাব ঘটানোর জন্য পৃথিবী ও সূর্যকে একটি শক্তির অধীনে বেঁধে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক রাতের অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করে দিনের সূচনা করেন।

দিবসের কর্মময় অধ্যায় সমাপ্ত করে আমরা রাতের বেলা বিশ্রাম নিই। এসময় অন্ধকারের চাদর আবৃত হয়ে রাতের নিস্তব্ধতা বিরাট ব্যাপকতায় পৃথিবীর বুকে বিরাজ করে। ঘুমের পর সকালে যখন আমরা শয্যা ত্যাগ করে উঠি তখন আমাদের শরীরে আর কোনো ক্লান্তিভাব থাকে না, আমাদের এ অবস্থা দিবসের

কর্ম সম্পাদনের জন্য নতুন শক্তির উন্মেষ ঘটায়। সুতরাং আমরা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারি যে, আল্লাহ্ পাক আমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা রাতে বিশ্রাম নিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারি।

২. সূর্য ও চন্দ্র সময়ের হিসাব রক্ষক :

আয়াতের এ অংশে আল্লাহ্ পাক বলেছেন তিনি মানুষের পক্ষে সময় পরিমাপ করার সুবিধার্থে সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়োজিত করেছেন। সময়ের তিনটি সাধারণ একক আছে। এগুলো হলো দিন, মাস ও বছর। সূর্যের স্পষ্ট গতিবেগের সাহায্যে দিন ও বছরের পরিমাপ করা হয়। আর মাসের পরিমাপ করা হয় চাঁদের স্পষ্ট গতিবেগের দ্বারা।

সৌরদিন হলো এমন একটি সময়কাল যে সময়ের মধ্যে পৃথিবী তার অক্ষে সূর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একবার আবর্তিত হয়। অর্থাৎ এসময়ের মধ্যে সূর্য পর্যায়ক্রমে মধ্য গগণ অতিক্রম করার সময়কে বুঝায়। এ সময় সূর্যাস্ত পর্যায়ক্রমে দুইবার সংঘটিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কে বা দুইবার সূর্যোদয় হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কে ধরা যেতে পারে। আবার দুইবার মধ্য গগণ অতিক্রম করার মধ্যবর্তী সময়কেও ধরা যেতে পারে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে সৌরদিনের সংজ্ঞা হলো এই যে, এটি একটি সময়কাল, এসময় সূর্য দুইবার পর্যায়ক্রমে মধ্য গগণ অতিক্রম করে। একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রের সাথে সম্পর্ক রেখে পৃথিবীর আবর্তনের সময়কে বলা হয় নক্ষত্র দিন।' নক্ষত্র দিন সৌরদিনের সময়কাল অপেক্ষা ৪ মিনিট ছোট। এ নক্ষত্র দিন কেবলমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজে ব্যবহার করা হয়। সৌরদিনকে আরো দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এর একটি হলো দিবাভাগ অপরটি রাত্রিকাল। যে সময় সূর্য দিগন্ত রেখার উপরে অবস্থান করে সেই সময়কে বলা হয় দিন। আর যে সময় সূর্য দিগন্ত রেখার নিচে অবস্থান করে তাকে বলা হয় রাত। মানুষ সাধারণত দিনের বেলা কাজ করে এবং রাতের বেলা বিশ্রাম নেয়। কৃত্রিমভাবে দিনকে আরো তিনটি উপভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড। এ রকম ভাগের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত বিরতির পরিমাপ করা হয়।

চাঁদকেও একটি উল্লেখযোগ্য সময় নির্দেশক বলে ধরা হয়। চন্দ্র তারিখ অধিকাংশ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সূর্যের সাথে সম্পর্ক রেখে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করে চন্দ্র কক্ষপথ পরিভ্রমণ করে যখন এ অবস্থানে এসে পৌছায় আর তাতে চাঁদের যে সময় লাগে সেই সময়কে চান্দ্রমাস বলা হয়। চান্দ্রমাসের গড় দৈর্ঘ্য ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ২.৮ সেকেণ্ড। এটা

আমাদের পঞ্জিকা মাসের সমতুল্য। চন্দ্রের নক্ষত্র মাস হলো একটি নির্দিষ্ট তারকা থেকে যাত্রা শুরু করে আকাশ পরিভ্রমণ করার পর যখন আবার ঐ একই তারার সামনে পৌঁছে সেই সময়ের পরিমাপ হলো ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ১১.৫ সেকেণ্ড। সময়ের তৃতীয় একক হলো বছর। এ বছর নির্ভর করে সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর আবর্তনের গতির উপর। বছরকে ঋতু পরিবর্তনের মাধ্যমে। রাত্রিকালে তারকাদের গঠন পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং দিনের বেলা সূর্যের পথ পরিক্রমার পরিবর্তনের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। একটি নির্দিষ্ট তারকার সাথে সম্পর্কে রেখে যে সময়ের মধ্যে পৃথিবী একবার সম্পূর্ণরূপে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে সে সময়কে বলা হয় নক্ষত্র বছর এবং বিষুব রেখার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে যে সময়ের মধ্যে পৃথিবী একবার সম্পূর্ণরূপে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে সে সময়কে বলা হয় ক্রান্তীয় বছর (Tropical year)। এ দু'ধরনের বছরের মধ্যে সময়ের পার্থক্য ২০ মিনিট।

এটা পর্যবেক্ষণ হয়েছে যে, প্রায় ১২ চান্দ্র মাসে পৃথিবী একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে; অর্থাৎ ১২ চান্দ্র মাসে ১ চান্দ্র বছর হয়। এক নক্ষত্র বছরের চেয়ে এক চান্দ্র বছর ১১ দিন কম হয়।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ পাক চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করে তাদেরকে সময় পরিমাপের জন্য নিয়োজিত করেছেন। আর তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী।

বিশাল সাগরে ও মরুপ্রান্তরে নক্ষত্ররাজি পথনির্দেশক

সূরা আল-আন'আম-৬ : ৯৭

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

It is He Who has set the stars for you so that you may guide yourselves, with their help through the darkness of the land and the sea. We have explained in detail our signs for people who know.

তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজী স্থাপন করেছেন যাতে তোমরা তারকাদের সাহায্যে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকায় পথের দিশা পাও। যারা জ্ঞানী তাদের জন্য আমাদের নিদর্শনসমূহের বিশদ বর্ণনা দান করেছি। (সূরা আল-আন'আম : ৯৭)

এ আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন আকাশে তারকাদের এভাবে সাজানো হয়েছে যে, তারা যেন পথনির্দেশক হিসেবে ঐসব ব্যক্তিকে সাহায্য করে যারা তাদের ভালোভাবে জানে। এ পথনির্দেশক তারকারাজি ঐসব ব্যক্তিদের পথের দিশা দেয় যাতে তারা বিশাল সাগর এবং মরু-প্রান্তরের নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকায় পথভ্রষ্ট হয়ে না পড়ে। এ পথনির্দেশনা পাওয়া যায় কিভাবে।

পৃথিবী তার নিজ অক্ষের চারপাশে আবর্তন করার সময় ঐ অক্ষ উভয়দিকে বর্ধিত হয় বলে মনে করা হয়। অক্ষ এভাবে উভয়দিকে বর্ধিত হয়ে আড়াআড়িভাবে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে ছেদ করে। পৃথিবী আবর্তনের কারণে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র আকাশমণ্ডল যেন ঘুরছে। তবে মেরুদ্বয় দৃঢ়ভাবে স্থির আছে। সুতরাং মেরু দু'টি সম্পর্কে যাদের ধারণা স্বচ্ছ তাদের পক্ষে উত্তর দিক ও দক্ষিণ দিক নির্ণয় করতে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু মেরু বিন্দুদ্বয় কাল্পনিক তাই তাদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান ঠিক করা খুব কঠিন ব্যাপার। তবে মেরু অঞ্চলে কোনো তারকা অবস্থান করলে দিক নির্ণয়ে অসুবিধা হয় না। উত্তর মেরুর কাছে একটি উজ্জ্বল তারকা অবস্থান করে। এ তারকা 'Alpha Ursae minors' নামে পরিচিত। একে Polaris or Polestar বলা হয়। এটা উত্তর গোলার্ধের সকল স্থান থেকে

দেখা যায়। এটা Urse Minor or little bear নামক নক্ষত্রপুঞ্জের লেজের উপরিভাগে অবস্থান করে। সুতরাং যারা নক্ষত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ তারা সহজে উত্তর দিকে চিনে নিতে পারে এবং এটা চিনতে পারলে তাদের পক্ষে অন্যান্য দিক চিনতে সুবিধা হয়। কিন্তু Crux or দক্ষিণ-ক্রস (Southern Cross) তারকাপুঞ্জ এমনভাবে দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত যে, তাদের দীর্ঘ বাহুর বিন্দু দক্ষিণ মেরুর দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। অতএব দক্ষিণ গোলার্ধের লোকজনের জন্য এই নক্ষত্রপুঞ্জ পথ নিদের্শক হিসেবে কাজ করে। এর নির্দেশনায় দক্ষিণ দিকের সন্ধান লাভ করা গেলে অন্যান্য দিকের সন্ধান সহজে পাওয়া যায়।

অন্য আর একটি নির্দেশনা খুবই স্পষ্ট সেটি হলো আকাশমণ্ডলকে যেহেতু মনে হয় আবর্তন করছে সেহেতু তারকাগুলোকেও মনে হয় পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে এদের সাথে রয়েছে একই ধরনের তারকার একটি গুচ্ছ। এভাবে তারকাদের মধ্যে Beta tauri, beta geminorium, Beta Leonis তারকাপুঞ্জ Pleiaedes এবং অন্যান্য তারকা কমবেশি বাংলাদেশের মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করে যায় বছরের বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন তারিখে একটি একক তারকা একটি নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করে একটি নির্দিষ্ট তারিখে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে। তাই Beta Geminorium তারকা প্রত্যেক বছর মে মাসের ২৮ তারিখ রাত ৯ টার সময় মধ্য আকাশ অতিক্রম করে। সমুদ্র অঞ্চলের কিংবা মরু অঞ্চলের বিশালতা কিংবা অন্ধকারের মধ্যে একব্যক্তি কেবল তারকার দিক লক্ষ্য রেখে তার গন্তব্য পথের দিশা অনুধাবন করতে পারে। যদি সে জানতে পারে তার গন্তব্য পথের সাথে সম্পর্কিত কোনো তারকা এখন তার মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করছে তাহলে সে সহজে বুঝতে পারবে ঐ সব তারকাদের দিক অবস্থান এবং তখন সে ঐ দিকে জাহাজ চালাতে থাকবে যতোক্ষণ না সে তার গন্তব্যস্থানে পৌছায়।

যদি কোনো ব্যক্তি তারকা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে তাহলে সে অন্যজনকে দিক দেখানোর কাজে পরামর্শ দিতে পারে। সাগর ও মরু অঞ্চলের বিশালতা এবং অন্ধকার কোনো সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না। সুতরাং কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যখন তারকা দেখা যাবে না তখন কিভাবে দিক নির্ণয় করা সহজ হবে। প্রতিউত্তরে এ কথা বলা যায় যে, তারকাবিহীন অবস্থায় দিক নির্ণয় করার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে তাই আল্লাহ পাক মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন অন্য পদ্ধতি আবিষ্কার করা অর্থাৎ যান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে মানুষ পথের দিশা লাভ করতে পারবে।

এ শুধু বৃষ্টি বর্ষণ নয়, আল্লাহ্ পাকের করুণা

সূরা আল-আন'আম-৬ : ৯৯

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ
طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ
مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

It is He Who sends down water (rain) from the sky and with it we bring forth vegetation of all kinds and out of it we bring forth green stalks, from which we bring forth thick clustered grain. And out of the date-palm and its spathe come forth clusters of dates hanging low and near and garden of graps, olives and pomegranates, each similer yet defferent. Look at their fruits when theybegin to bear and the ripeness there of Verily! In these things there are signs for people who believe.

তিনি সেই সত্তা যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকেন এবং এর দ্বারা আমরা সকল প্রকার উদ্ভিদ নির্গত করি এবং এ থেকে আমরা সবুজ শস্য নির্গত করি যা থেকে আমরা ঘন সন্নিবেশিত শস্যদানা উৎপন্ন করি। খেজুর গাছ এবং এর গলা থেকে গুচ্ছ বের করি যা নিচের দিকে ঝুলতে থাকে। আর আঙ্গুর জলপাই, আনার-এর বাগান তৈরি করি যা সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু বৈচিত্রে ভিন্ন ধরনের, ঐসব গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য করো যখন এগুলো ফল বহন করে এবং পরিপক্কতা লাভ করে। নিশ্চয়ই এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য। (সূরা আল-আন'আম : ৯৯)

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রকৃতির সাবলীল দৃশ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রকৃতির বৃক্ষরাজি, ফল ও ফসল সবকিছু আল্লাহ পাকের করুণা দ্বারা সমৃদ্ধ। এক্ষেত্রে আকাশ থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় তার উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। কারণ এর উপর নির্ভর করে শ্যামল গাছপালার জন্ম, শস্যদানা ও ফসলের উৎপাদন।

বৃক্ষরাজির জন্ম : বৃষ্টির স্বাভাবিক কার্যকারিতা যা গাছপালা জন্মানোর ক্ষেত্রে অবদান রাখে। আরবি 'নাবাতা' শব্দের সাধারণ অর্থ উদ্ভিদ। এ উদ্ভিদের আওতায় পড়ে সকল ধরনের বৃক্ষরাজি। এসব বৃক্ষরাজির সবুজ রঙ ও ক্লোরোফিল তাদের খাদ্য শর্করা তৈরির কাজে সাহায্য করে। ভূখণ্ডের সবুজ বৃক্ষ ও ফসলের রক্ষণাবেক্ষণ নির্ভর করে বৃষ্টির পানি ও আর্দ্রতার উপর। এ পানি ও আর্দ্রতা বীজের অঙ্কুরোদগমে সহায়তা করে এবং সালোক সংশ্লেষণ (Photosynthesis) ও পত্র-পল্লব, শাখা-প্রশাখা উৎপাদনে সহায়ক শক্তি দান করে। উদ্ভিদ জগৎ অতিশয় বিশাল। এর প্রজাতির সংখ্যা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। এর শ্রেণীবিন্যাস করা হয় বিস্তৃতভাবে। একটি শ্রেণী হলো সপুষ্পক উদ্ভিদ। এদের ফুল হয়। পরাগায়ন পদ্ধতিতে বংশ বৃদ্ধি পায়। আর অন্য শ্রেণীর উদ্ভিদসমূহ অপুষ্পক। এদের ফুল হয় না। বংশবৃদ্ধি পায় বিবিধ পন্থায়। বৃক্ষরাজির মধ্যে এমন কতোগুলো উদ্ভিদ আছে যাদের সবুজ রঙ নেই অর্থাৎ ক্লোরোফিল নেই। ব্যাঙের ছাতা ও ছত্রাকের সবুজ রঙ না থাকায় তারা তাদের জীবন ধারণের জন্য মৃত এবং জৈব পদার্থের উপর নির্ভরশীল থাকে বা পঙ্গপালের মতো জীবন্ত জীবকোষের উপর বসে তার রস চুষে খেয়ে বেঁচে থাকে। এসব অসবুজ উদ্ভিদের বৃদ্ধিও নির্ভর করে আদ্রতার উপর যা বৃদ্ধি পায় বৃষ্টিপাতের ফলে।

ঘন সন্নিবেশিত শস্যদানা : শস্যদানার চারা বা খাদ্যশস্য ঘাসের গোত্রভুক্ত। এগুলো মানুষ ও গৃহপালিত পশু-পাখির শাকজাত খাদ্যশস্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এসব খাদ্যে মিলে আছে স্টার্চ, প্রোটিন, কিছু খনিজবস্তু এবং ভিটামিন। খাদ্যশস্যের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পড়ে অসংখ্য রকমের খাদ্যশস্য। পৃথিবীর প্রধান খাদ্যশস্যগুলো হলো ধান, গম, বার্লি, ভুট্টা, যব এবং রাই, এসব খাদ্যশস্যের মধ্যে গম এবং যব ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবদের কাছে পরিচিত ছিলো। এ খাদ্যশস্যগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট অর্থাৎ এদের মঞ্জুরীতে থাকে দুই সারিতে দানার ঠাসা-বুনুনি। এ আয়াতে খাদ্যশস্যের যে ঠাসা-বুনুনির কথা তুলে ধরা হয়েছে তা খুবই সঙ্গত।

খেজুর : আরব দেশে খেজুর গাছ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ফলের গাছ। মধ্যপ্রাচ্যে এ ফলের চাষ শুরু হয়েছে প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে। খেজুর গাছের গুরুত্ব খুবই ব্যাপক। উত্তর আফ্রিকা, আরবদেশ, ইরাক ও ইরানের অধিকাংশ জনসাধারণ এ ফলের উপর নির্ভরশীল। স্ত্রী ও পুরুষ খেজুর গাছ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। খেজুর গাছের চাষিরা ৫০-১০০ টি স্ত্রী খেজুর গাছের মধ্যে অন্তত একটি পুরুষ খেজুর গাছ লাগায়। পুং কিংবা স্ত্রী গাছের ফুলের থোকায় থাকে ১০০টির মতো সূক্ষ্ম শাখা। এ শাখাগুলোকে ঘিরে রাখে একটি খোলস। এ খোলস কুঁড়ি থাকা অবস্থায়

ফুলগুলোকে রক্ষা করে। খেজুর গাছ লাগানোর ৪/৫ বছর পর থেকেই ফল দিতে শুরু করে এবং পুরোমাত্রায় ফল দেয় ১৫ বছর থেকে। এভাবে ৮০ বছর পর্যন্ত ফল দিতে পারে। ভালো ফলের থোকায় প্রায় ৪০টি খেজুর ধরে। পাকা ফলের ভারে ভারাক্রান্ত ছড়াগুলো স্বাভাবিকভাবে গাছের গলায় ঝুলে থাকে এবং সংগ্রহ করার আগ পর্যন্ত এগুলো অপূর্ব শোভা বর্ধন করে ঝুলে থাকে। খেজুর ফলের প্রধান খাদ্যগুণ হলো শর্করা (Carbohydrate)। এদের মধ্যে কিছু ভিটামিনও থাকে যেমন– ভিটামিন A, B_1, B_2,। এছাড়া এতে থাকে নিকোটিনিক এসিড।

আঙ্গুর ফল : দ্বিবীজপত্রী, গুপ্তবীজি উদ্ভিদের Vitaceae গোত্রের লতা জাতীয় Vitis এবং Muscadinia দুইটি গোত্রের প্রজাতি আঙ্গুর গাছ নামে পরিচিত। আঙ্গুর গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Vitis Vinifera, আঙ্গুর ফল দেখতে গোলাকার অথবা ডিম্বাকৃতির হয়ে থাকে। ফলের ত্বক বা চামড়া পাতলা যা মাংস অংশের সাথে লেগে থাকে এবং তা ফলের সাথে ভোজন করা হয়। প্রাচীনকাল হতেই আঙ্গুরের উৎপাদন সমস্ত ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোতে হয়ে আসছে। প্রায় ৬০০০ বছর পূর্বে মিশরের পরিচিতি ঘটে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমনকি বাংলাদেশেও এর চাষ হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে এর উৎপাদন হয় সরাসরি টাটকা ফল খাবার জন্য, কিসমিস-এর রস দিয়ে মদ জাতীয় দ্রব্য তৈরীর জন্য। এছাড়া এর ফল থেকে ডেক্সট্রোজ বা গ্লুকোজ তৈরি করেও বাজারজাত করা হয়।

জলপাই বা অলিভ : মানব সভ্যতার উন্নয়ন ও মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে জলপাই বৃক্ষ এবং জলপাই ফল নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের কাছে জলপাই বা অলিভ শান্তি, সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য, সজীবতা ও শক্তির প্রতীক। অতি প্রাচীনকাল থেকে অলিভ ফল শুধুমাত্র খাদ্য হিসেবে নয় ভোজ্য তেল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অলিভের তেল দ্বারা বাতি জ্বলে, মালিশ করার কাজে লাগে। এছাড়া ঔষধ তৈরিতে, প্রসাধনী দ্রব্য উৎপাদনে, রান্নার কাজে, সালাত তৈরিতে এবং মাছকে টিনজাতকরণে অলিভ ব্যবহৃত হয়। অলিভ প্রথমে সবুজ রঙের হয়। তারপর পাকলে গাঢ় নীল বা গোলাপী রঙ ধারণ করে। অলিভ পূর্ণভাবে পরিপক্ক হওয়ার পর সেগুলোকে সাধারণত আচারে পরিণত করা হয়। এর আচার খুবই সুস্বাদু।

আনার : আনার ফল শক্ত পুরু চামড়ায় আবদ্ধ দানাদার জাম জাতীয় ফল। এর ভেতরে থাকে বেশ কয়েকটি কক্ষ। এ কক্ষগুলো পরিপূর্ণ থাকে আনারের দানায়। এদের রঙ গাঢ় গোলাপী এবং স্বাদে টক-মিষ্টি। এর রস পুষ্টিমানে পূর্ণ ঠাণ্ডা পানীয়। শর্করা, আয়রন ও ক্যালসিয়াম এ ফলের প্রধান খাদ্যমান। অসংখ্য বীচি থাকার দরুন আনারকে ফলোৎপাদন ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

পাকা ফল : পাকা ফলের মধ্যে যে আকর্ষণীয় রঙ্গের সমাহার ঘটে তা সৃষ্টি হয় গাছের প্রাণরসবাহী কোষে যে রঙের উপাদান থাকে তার আনুপাতিক উপস্থিতির মাধ্যমে, ক্লোরোফিল হলো মূল রঙ যা তার সবুজ রঙকে গাছের পাতা ও ফলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। রংয়ের দ্বিতীয় গ্রুপটি Carotenoids নামে পরিচিত যার মধ্যে ৬০টির মতো কম্পাউণ্ড থাকে এবং এর ব্যাপ্তি কমলা-হলুদ রঙ থেকে টমেটো রাঙা লাল রঙের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। রঙের তৃতীয় পরিবারটি Antoocyanin থেকে উদ্ভূত এবং ঝাপসা গোলাপী রঙের আভা থেকে রক্তাক্ত গোলাপী রঙ পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি।

এ্যানথোসাইয়ানীন রঙ নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাণরসবাহী কোষের অম্লত্বের সাহায্যে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এসিডের মধ্যে তাদের লাল দেখায়, স্বতন্ত্রভাবে তাদের বেগুনী দেখায় এবং এলকালীর মধ্যে তাদের নীল দেখায়। গাঢ় লাল রঙ ফুটে ওঠে তা একথাই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ফল খাবার পক্ষে উপযোগী হয়েছে। কিছু ফল আছে যা সবুজ অবস্থায় খাওয়া যায়। যেমন সবুজ আঙ্গুর, সবুজ আপেল এবং বাদামী রঙের অন্যান্য ফল।

এক জাতীয় ফল কিন্তু ধরন ভিন্ন : কিছু ফল আছে শ্রেণীগতভাবে এক ধরনের হলেও বৈচিত্র্যের ভিন্ন ধরনের। এসব ফল সমপ্রজাতিভুক্ত হলেও ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে এবং অন্য প্রজাতির ফল থেকে, সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করা যায়। এ পার্থক্য প্রকৃতির মধ্যে আন্তঃপ্রজনন কিংবা কৃত্রিম পন্থায় প্রজনের কারণে ঘটে থাকতে পারে। বিভিন্ন গ্রোত্র তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো ধরে রাখার ক্ষেত্রে স্থায়ী হতে পারে যদি না তাদের সাথে অন্য গোত্রের বংশগত উপাদানগুলো মিশে যায়।

সুতরাং খেজুর, আঙ্গুর, জলপাই এবং আনার ফলের প্রজাতি একে অপর থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক। তাদের নিজ প্রজাতিগত পরিধির মধ্যেও তারা পৃথক। এ পার্থক্য তাদের ফুল ফোটার সময়, তাদের আকার, তাদের ফলন এবং তাদের পরিপক্কতা লাভের সময় দ্বারা ঘটে থাকে।

সুতরাং সর্বময় শক্তিধর আল্লাহ্ পাক মানুষের কল্যাণের জন্য অসংখ্য ফলের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন, এগুলো যখন পাক ধরে তখন বর্ণ বৈচিত্র্যের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। মানুষ ও পাখি পাকা ফল খেয়ে চারিদিকে তার বীজ ছড়িয়ে দেয়। এভাবে বীজের বিস্তার ঘটে এবং গাছপালার বংশ বৃদ্ধি পায়। ঈমানদার মহিলা-পুরুষের কাছে আল্লাহ্ পাক এ সমস্ত নিদর্শন উপস্থাপন করে বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্ পাকের দানের উপর গভীরভাবে চিন্তা করবে এবং এসব স্বর্গীয় দানের জন্য আল্লাহর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

জ্ঞান একটি সংঘবদ্ধ শক্তি

সূরা আল আ'রাফ-৭ : ১০

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ.

And Surely We gave you authority on the earth and appointed for you therein provisions. lettle thanks do you give.

নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবীতে তোমাদের কর্তৃত্ব দান করেছি এবং সেখানে জীবনোপকরণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। তোমরা খুব সামান্যই শুকরিয়া জ্ঞাপন করো। (সূরা আল-আ'রাফ : ১০)

এ আয়াতে ব্যবহৃত Authority 'কর্তৃত্ব শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একে কেন্দ্র করে প্রশ্ন করা যায় যে কর্তৃত্বের অবস্থান কোথায়? গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় কর্তৃত্বের অবস্থান জ্ঞানের মধ্যে। জ্ঞান হলো একটি সংঘবদ্ধ শক্তি। যে শক্তির নিরিখে মানুষ জীবনের পূর্ণতা বিধান করতে পারে এবং জীবনের সকল পথের সন্ধান লাভ করতে পারে।

এখন একথা ভেবে সবাই আশ্চর্য হয় যে, কেবলমাত্র ২০০ বছর পূর্বেও মানুষ জানতো না কিভাবে আকাশপথে উড়তে হয়। কিন্তু এখন মানুষ বিমানে চড়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে ফিরে আসতে পারে। এমনকি তারা আজকের দিনে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরেও ভ্রমণ করতে সক্ষম হচ্ছে। শুধু তাই নয়, গ্রহের অভ্যন্তরে নভোযান প্রেরণ করে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছে। মাত্র কিছুদিন আগে মানুষ আইটি (Information technology) ডেভেলপ করে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছে। আইটির মাধ্যমে এখন ঘরে বসে সমগ্র বিশ্বকে জানা যায়। আর এসব ঘটনা খুব কম সময়ের মধ্যে ঘটে চলছে। মানুষের সেবায় প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে মানুষ এসব ঘটনার সাহায্যে ক্রমে ক্রমে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এখন সে প্রাকৃতিক শক্তির উপর একটা সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং এ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জ্ঞান থেকে। আগেই বলেছি জ্ঞান নিজেই একটি সংঘবদ্ধ শক্তি। আল্লাহ পাক জ্ঞানের

উপরই কর্তৃত্বের আসন রচনা করেছেন। এ কারণে তিনি মানুষকে জ্ঞান অনুসন্ধান করতে তাগিদ দিয়েছেন।

প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আ) কে জ্ঞান দান করে ফেরেশতাদের উপর তাঁর আসন নির্ধারণ করেছেন। তাই মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি। যদি মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে হয় তাহলে তাকে প্রকৃতিকে জয় করতে হবে। আর প্রকৃতিকে জয় করতে গেলেই তাকে জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে হবে। মানুষ তার প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করে পৃথিবীর কল্যাণ সাধন করবে। আল্লাহ্ পাকের ভয় থাকলে মানুষ শক্তির অপব্যবহার করবে না।

মানুষ বেশি মাত্রায় জ্ঞানের অনুসন্ধান করে বহু বিচিত্র পথের আবিষ্কার করতে পেরেছে। এপথের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তার জীবন ধারণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানুষ একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে শিখেছে অন্যদিকে মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে আল্লাহ্ পাক তার রিযিক অসংখ্য উপকরণের মধ্যে মজুত করে রেখেছেন। একথা সত্য যে, পৃথিবীর সম্পদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু এটাও সত্য যে মানুষ নিত্যনতুন সম্পদ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে চলছে। সাগরের বুকে যে বিশাল সম্পদ-সম্ভার রয়েছে সেখানে মানুষ এখনো হাত লাগাতে পারেনি। সুতরাং একথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষকে যখন আল্লাহ পাক জ্ঞান দান করেছেন প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করার, পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার এবং জীবনের পরিপূর্ণতা আনার ক্ষেত্রে উপায় খুঁজে পাবার তখন তার ভুলে যাওয়া উচিত নয় পরম হিতৈষী করুণাময় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা। কারণ আল্লাহ্ পাক ঐ ব্যক্তিকে গভীর জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ করেন যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুসন্ধান করে। তাই এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থেকে বিরত থাকা মানুষের জন্য সমীচীন হবে না।

আদি পিতা আদম (আ)-এর আবির্ভাব

সূরা আল-আ'রাফ-৭ : ২২

فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ.

So he misled them with deception. Then when they tasted of the tree, that which was hidden from them of their shame became manifest to them and the began to cover themselves with the leaves of Paradise (in order to cover their shame).

"সুতরাং সে প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে ভুল পথে চালিত করলো। যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল তখন তাঁদের গোপন স্থান তাঁদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেলো এবং তারা নিজেদের উপর বেহেশতের পাতা আবৃত করলো (লজ্জা নিবারণের উদ্দেশ্যে)।" (সূরা আল-আ'রাফ : ২২)

এ আয়াতে বলা হয়েছে শয়তান প্রতারণার মাধ্যমে হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়াকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পক্ষে পরিচালিত করেছিল যখন তাঁরা উভয়ে বেহেশতের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে তাঁদের লজ্জাস্থান খুলে গেলো এবং তাঁদের মধ্যে লজ্জাবোধ জেগে উঠলো।

এ আয়াতের ঘটনা থেকে হযরত আদম (আ) এর আবির্ভাবের সময় সম্পর্কে অনুমান করা যায়। আয়াতের এ অংশ থেকে বোঝা যায় ঐ সময় থেকে হযরত আদম (আ) তাঁর লজ্জাস্থান ঢাকার তাগিদ অনুভব করেছেন। তখন যেহেতু কাপড় তৈরির কোনো লোকই ছিলো না তাই তিনি তাঁর গোপন স্থান পাতার সাহায্যে ঢেকেছিলেন। Anthropology থেকে জানা যায় প্রস্তর যুগের শেষ অংশে গাছের পাতা ও বাকলের সাহায্যে কাপড় পরার রীতি চালু হয়েছিল। ঐ সময়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিলো এক লক্ষ বছর থেকে চল্লিশ হাজার বছর পূর্বে। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা যায় যে, হযরত আদম (আ)-এর পৃথিবীতে আগমন ঘটেছিল কমপক্ষে ৫০,০০০ বছর আগে।

দেহ সজ্জার পোশাক আবিষ্কার

সূরা আল-আ'রাফ-৭ : ২৬

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

O Children of Adam! we have bestowed raiment upon you to cover yourselves and as an adornment and the raiment of righteousness that is better. Such are amoung the signs of Allah that they may remember.

"হে আদম সন্তানগণ! আমরা তোমাদের পোশাক অর্পণ করেছি নিজেদের আবৃত করতে এবং সজ্জিত করতে আর পরহেযগারীর পোশাক যা উত্তম। এটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেন তারা স্মরণ রাখে।" (সূরা আল-আ'রাফ : ২৬)

মানুষ তার স্বাভাবিকবোধ থেকে দেহের গোপন স্থান ঢেকে রাখার তাগিদ অনুভব করে। আল্লাহ পাক এ তাগিদ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। এতদ সঙ্গে তিনি আরও দান করেছিলেন মানুষের মধ্যে বুদ্ধির উপস্থিতি ও আবিষ্কারের প্রতিভা। তাই প্রথমদিকে গাছের পাতাকে ঠিকভাবে সেলাই করে সেই পাতার আবরণে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা হতো। ক্রমে প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ ধাপে ধাপে আঁশ ও সুতা আবিষ্কার করে উৎকৃষ্টমানের দীর্ঘস্থায়ী কাপড় তৈরি করে তা ব্যবহার করতে শিখেছে। সুতরাং যে পোশাক-পরিচ্ছদ একদিন সাদামাটা অঙ্গ-আবরণী হিসেবে গণ্য ছিলো তা এখন মানুষের রুচিবোধ ও নবতর ধারণা বিকাশের কারণে দেহ সজ্জায় রূপ লাভ করেছে। দেহ-সজ্জা হিসেবে এর দু'টি উদ্দেশ্য প্রতিভাত হয় (১) পীড়াদায়ক উত্তাপ এবং কনকনে ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে। (২) আকর্ষণীয় রঙ, নকশা ও বুননের উন্নয়ন সাধনের ফলে পোশাক দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পরহেযগারী বা ধার্মিক পোশাক হলো ঐ ধরনের পোশাক যা আল্লাহ্ পাক ও রাসূল (সা) কর্তৃক অনুমোদিত। অর্থাৎ আদর্শ রুচিসম্মত যথার্থ পোশাকই সর্বোত্তম।

দেহ-সজ্জা হিসেবে পোশাক কালক্রমে মানুষের ব্যক্তিত্বের অংশে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ পাক মানুষকে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবনের ক্ষমতা দান করেছেন বিধায় আজকের দিনে পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে উচ্চমানের স্থায়ী গুণ ও আরামদায়ক মিশ্রণ একটি শৈল্পিক রূপ লাভ করেছে। এ কারণে আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

ছয় পর্বে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি

সূরা আল-আ'রাফ-৭ : ৫৪

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

Indeed your Lord is Allah, Who created the Heavens and the earth in six Days and then He rose over the Throne. He brings the night as a cover over the day, seeking it rapidly and he created the sun, the moon, the stars subjected to His command. surely, He is the creation and commandment. Blessed is Allah, the Lord of the worlds.

প্রকৃতপক্ষে তোমাদের প্রভু আল্লাহ্ পাক, যিনি ছয় দিনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে আরোহণ করেছেন। তিনি দিনের উপর অবগুণ্ঠন হিসেবে রাতকে নিয়ে আসেন। তারপর রাত দ্রুতবেগে দিনকে খুঁজতে থাকে। তিনি সূর্য, চন্দ্র, এবং নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করে তাঁর আদেশের অনুবর্তী করে রেখেছেন। নিশ্চয়ই সৃষ্টি তাঁর– আদেশও তাঁর। মহিমান্বিত আল্লাহ্ পাক যিনি মহাবিশ্বের মহান প্রভু। (সূরা আল-আ'রাফ : ৫৪)

ছয়দিনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি

এ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ পাক বলেছেন তিনি ছয়দিনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা হজ্জ এ বলা হয়েছে একদিন সমান এক হাজার বছর। আর সূরা মা'আরেজ-এ একদিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ পাকের নিকট একদিনের অর্থ পৃথিবীর চব্বিশ ঘণ্টা নয়, একটি সময়কাল (A period of time)। এ সময়কাল দীর্ঘও হতে পারে আবার ক্ষুদ্রও হতে পারে। সুতরাং এ আয়াতে প্রকৃতপক্ষে যা বলা হয়েছে তা হলো নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ছয়টি সময়কালে বা ছয়টি পর্যায়ে (Phases) সৃষ্ট। এ ঘটনা আশ্চর্যজনকভাবে সৃষ্টি তত্ত্ব (Cosmology) এবং Geology দ্বারা সমর্থিত।

মহাবিস্ফোরণের (Big bang) পর আদি অগ্নিবল বিস্ফারিত হয়ে দ্রুতবেগে বর্ধিত হতে থাকে এবং শীতল হয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন, ও নিউট্রনের গ্যাসীয়-মেঘ সৃষ্টি হয়। প্রথমদিকে বিকিরণের চাপের দ্বারা সহজ ব্যাপ্তি রক্ষিত হতো। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কিছু হিলিয়ামসহ হাইড্রোজেন এ্যাটম দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবে গঠিত হয়। গ্যাসের এ পিণ্ডগুলো বিচ্ছিন্নভাবে একে অপর থেকে দূরে ভেসে বেড়াতে থাকে। যদিও বস্তুর একটি একক পিণ্ড তার নিজস্ব মহাকর্ষ (Gravitation) শক্তির টানে সংকুচিত হতে পারে তবুও এ সময় দু'টি বিপরীত শক্তি এ পিণ্ডের উপর ক্রিয়া করে। অর্থাৎ সম্প্রারণ গতি (Force of expansion) এবং মহাকর্ষ শক্তি একে সংকুচিত করার চেষ্টা করে। এ বস্তু-পিণ্ডের মধ্যকার উন্মত্ত গতিবেগের জন্য সংকোচনশীল গ্যাস-পিণ্ড বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। যথা- বৃত্তাকার, উপবৃত্তাকার, এবং সর্পিলাকার বা পেচানো ইত্যাদি। এভাবে প্রথম পর্যায়ে গ্যালাক্সিসমূহ সৃষ্টি হয়। এ গ্যালাক্সিসমূহ সৃষ্টির ফলে প্রথম পর্যায়ে আকাশ সৃষ্টির কাজ শেষ হয়েছিল। এ সৃষ্টি সম্পন্ন হতে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন বছর সময় লেগেছিল।

পরবর্তী পর্যায়ে গ্যালাক্সিগুলো বা সংকোচনশীল গ্যাস বলয়গুলো ভেঙ্গে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ অংশগুলো যতো বেশি সংকুচিত হলো ততো দ্রুত গতিতে ঐগুলো আবর্তিত হতে লাগলো। এভাবে আবর্তিত হতে হতে ঐগুলো চ্যাপ্টা আকার ধারণ করলো এবং জমাট বেধে আরো ছোট ছোট বলয়ে বিক্ত হয়ে পড়ল। এভাবে ধীর গতিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে নক্ষত্র ও সৌরজগৎ (Solar System) গঠিত হলো। গ্যাস ও ধূলিকণার গোলাকার মেঘখণ্ডগুলোকে বলা হয় নীহারিকা (Nebula)। ঘূর্ণায়মান নীহারিকাগুলো সংকুচিত হতে লাগল এবং তারা তাদের পশ্চাতে গোলাকার বস্তুপিণ্ড রেখে গেলো। এ বস্তুপিণ্ডগুলো পরবর্তী পর্যায়ে গ্রহতে রূপান্তরিত হলো। সুতরাং তারকারাজি, গ্রহ, উপগ্রহ দ্বিতীয় পর্যায়ে সৃষ্টি হলো।

সাতটি আকাশ সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হয়েছিল দুই পর্যায়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি সম্পন্ন হতে সময় লেগেছিল এক বিলিয়ন বছর।

আজকের দিনে আমরা যে পৃথিবীকে দেখছি তা পূর্ণতা পেয়েছিল ভূতাত্ত্বিক (Geological) যুগে। এ যুগগুলো হলো প্রি-ক্যামব্রিয়ান যুগ (Precambrian era)। প্যালাজয়িক যুগ (Palaeozoic era)। ম্যাসোজয়িক যুগ (Mesozoic era), এবং সিনোজয়িক যুগ (Cenozoic era)।

প্রি-ক্যামব্রিয়ান যুগে পৃথিবী শুরু হয়েছিল একটি সৌরজগৎ বহির্ভূত গ্যাসের ঘূর্ণায়মান বলয় থেকে। এ ঘূর্ণায়মান বলয় হিসেবে পৃথিবী তরল অবস্থা অতিক্রম করে শক্ত আকার ধারণ করেছিল। ঘন বাষ্পীয় পরিমণ্ডল পৃথিবী নামক গ্রহটিকে ঘিরে ফেলেছিল। যখন পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হতে লাগলো তখন জলীয় বাষ্প বৃষ্টিতে জমাট বেধে নদী ও সাগরের সৃষ্টি করলো পৃথিবীর উপরিভাগে পাহাড় পর্বত, মরুভূমি, আগ্নেয়গিরি ও প্রবাহিত লাভা ক্ষেত্রের একটি বিরান দৃশ্যপট সৃষ্টি হলো। এ গঠন পদ্ধতির সময় কাল ছিলো এক বিলিয়ন বছর। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার শেষদিকের একশ মিলিয়ন বছরের মধ্যে এককোষী জীব, মেরুদণ্ডহীন প্রাণী এবং আদিম সাগর বক্ষের গাছপালা সৃষ্টি হয়েছিল। এটা পৃথিবীর প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টিকর্ম।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ প্যালাজয়িক যুগে সাগরের উচ্চতা উঠা-নামা করতো। এর ফলে স্থলভাগে নিয়মিত পরিবর্তন সাধিত হতো। সাগর জলে হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে স্থলভাগ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এ সময়ে ব্যাপকভাবে পাহাড় পর্বতের গঠন সূচিত হয় এবং আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের কাজ চলতে থাকে। এ যুগের শেষভাগে পৃথিবী বিশেষভাবে আন্দোলিত হতে থাকে উপমহাদেশের স্থানাচ্যুতির কারণে। এ যুগ প্রায় ৪০০ মিলিয়ন বছর ধরে চলছিল। এ যুগে মাছ, ব্যাঙ ও সরীসৃপের মতো মেরুদণ্ডী প্রাণী জন্মেছিল। সুতরাং দ্বিতীয় পর্যায়ে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হয়।

পৃথিবী সৃষ্টির তৃতীয় পর্যায়ে ভূতাত্ত্বিক মেসোজয়িক যুগের মধ্যে সীমিত। এ যুগে মরুভূমি ও লতাপাতায় আচ্ছাদিত পাহাড়-পর্বত স্থলভাগে সৃষ্টি হয়েছিল। সমুদ্র পুনরায় স্থলভাগ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। এর ফলে স্থলভাগে গড়ে উঠেছিল জলাভূমি, বনভূমি,হ্রদ ও নদীসমূহ। এ যুগে আবির্ভূত হয়েছিল ডাইনোসর। তারা দাপটের সাথে, স্থলভাগে বিচরণ করতো। এ যুগ বা পর্যায়ের ব্যাপ্তি ছিলো দেড়শ মিলিয়ন বছর।

পৃথিবী সৃষ্টির চতুর্থ পর্যায়ে অর্থাৎ সেনোজয়িক যুগই বর্তমান যুগ প্লেট টেকটোনিক্স (Platet ectonics) অর্থাৎ ভূ-ত্বকের শক্তিশালী আন্দোলন হিমালয় ও আলপস পর্বতের গঠন পূর্ণ করেছিল। এসময় উপমহাদেশ ও মহাসাগরসমূহ সৃষ্টি হয়েছিল। এ যুগে অবস্থিত ছিলো বরফ যুগ। এ যুগে ডাইনোসর ধ্বংস হয়েছিল। স্তন্যপায়ী প্রাণীরা এ যুগে সৃষ্টি হয়েছিল। এ যুগ চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে মানুষ সৃষ্টির পর থেকে।

সুতরাং এভাবে ছয় পর্যায়ে বা ছয়দিনে (আল কোরআনের ভাষায়) নভোমণ্ডল ও

ভূমণ্ডল সৃষ্টি হয়। দিনের দৈর্ঘ্যের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ধারণা নিতে হলে আমাদের জানতে হবে পৃথিবীর বয়স ও মহাবিশ্বের বয়স কতো। পৃথিবীর বর্তমান বয়স প্রায় ৫ মিলিয়ন বছর। আর মহাবিশ্বের বয়স ১৫ বিলিয়ন বছর। যদি পবিত্র কোরআনের আয়াতের অর্থে পৃথিবীর সৃষ্টি চারটি পর্যায়ে বা চারদিনে এবং গোটা মহাবিশ্ব সৃষ্টি ছয়দিনে সম্পন্ন হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর একদিনের দৈর্ঘ্য ১.২৫ বিলিয়ন বছর এবং মহাবিশ্বের ছয়দিনের বয়সের দৈর্ঘ্য ১৫ বিলিয়ন বছর। আর এটাই হলো মহাবিশ্বের আনুমানিক বয়স।

দিনের উপর রাতের অবগুণ্ঠন

গোলাকার পৃথিবী নিজ অক্ষপথে আবর্তিত হওয়ার ফলে দিন ও রাত্রি সংঘটিত হয়ে থাকে। সূর্য-পশ্চিম দিগন্তে বিলীন হয়ে গেলে রাত নেমে আসে এবং রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে দিনের আলোকে গ্রাস করে ফেলে। দিনের উপর রাতের অবগুণ্ঠন নেমে আসার কারণগুলো পৃথিবীর আবর্তনের ফলে এর প্রতিটি অংশ কিছুক্ষণের জন্য সূর্যের দিকে উন্মুক্ত থাকে এবং পৃথিবীর বক্রতার কারণে পৃথিবীর ঐ অংশ সূর্য থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ ঐ অবস্থাতেই থাকে। যে সময়ের জন্য পৃথিবীর কোনো স্থান সূর্যের দিকে উন্মুক্ত থাকে তখন সেই স্থানে দিন এবং যে সময়ের জন্য সূর্য থেকে ঐ স্থান অদৃশ্য থাকে সে সময়ের জন্য ঐ স্থানে রাত্রি হয়। সুতরাং পৃথিবীর আবর্তন যেহেতু চলতেই থাকবে সেহেতু দিনের উপর রাতের অবগুণ্ঠন নেমে আসবেই। আর এ নিয়ম বেধে দিয়েছেন পরম করুণাময় আল্লাহ পাক তাই এর কে নো ব্যতিক্রম হবে না।

সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র সৃষ্টি

সূর্য : সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য অবস্থিত। সকল গ্রহ তার চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিজ্ঞানী কেপলার সূর্যের চারিদিকে যেসব গ্রহ অবস্থিত তাদের গতি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যে সম্পর্কে কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। প্রথম সূত্রের ভাষ্য হলো, "গ্রহের অক্ষগুলো সূর্যের সঙ্গে এক আলোক রেখায় উপবৃত্তাকার।" দ্বিতীয় সূত্রটি হলো, "প্রত্যেক গ্রহের সাথে সূর্যের যোগাযোগ রেখা একই সময়ের ব্যবধানে সমান এলাকা ভ্রমণ করতে পারে।" তৃতীয় সূত্রের ভাষ্য হলো, "যে কোনো গ্রহের নাক্ষত্রকালের বর্গ তাদের সূর্য থেকে মধ্যবর্তী দূরত্বের ঘন অনুপাতের সমান।" এ তিনটি সূত্রের একত্রিকরণ নীতি আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞানী নিউটন। তিনি বলেছেন, গ্রহগুলোকে সূর্যের অক্ষপথে টানছে। তাদের টানছে যে শক্তি নিউটন তার নাম দিয়েছেন মহাকর্ষ শক্তি (Force

of gravitation)। তার মতে মহাকর্ষ শক্তির নিয়ম হলো।, 'Every particle in the universe attacts every other particle with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them.' অর্থাৎ মহাবিশ্বে প্রত্যেক বস্তু কণিকা অপর বস্তু কণিকাকে এমন একটি বল দ্বারা আকর্ষণ করে যা বস্তু দু'টির ভরের গুণফলের সরাসরি আনুপাতিক এবং তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। সৌরজগতে সূর্য বিপুল ভরবিশিষ্ট হওয়ার কারণে সে তার অবস্থানে স্থির হয়ে থাকে। আর গ্রহগুলো যথাযথ নিয়মে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। সূর্য গ্যালাক্সির অন্যান্য তারকার সঙ্গে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারপাশে আবর্তন করতে করতে স্যাগিটারিয়াস (Sagittarrius) চিহ্নের দিকে ধীর গতিতে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ২৫০ কি.মি. হিসাবে এগিয়ে যায়। সূর্য তার অক্ষের চারপাশে আবর্তিত হয় খুব ধীর গতিতে। এই আবর্তনে সূর্যের বিভিন্ন অংশের গতিবেগ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

সূর্য থেকে গ্রহগুলোর আপেক্ষিক দূরত্ব কেপলারের তৃতীয় সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। যেহেতু দূরত্বের হিসাব পাওয়া যায় অনুপাতের ভিত্তিতে সেহেতু সৌরজগতের আভ্যন্তরীণ দূরত্বসমূহের মধ্যে একটি দূরত্ব নির্ধারিত হয় কৌণিক পরিমাপ পদ্ধতির (Parallax metthod) মাধ্যমে। এ দূরত্বের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নির্ধারণ করা হয় ১৪৯,৬০০,০০০ কি.মি. অথবা প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। সূর্যের ভর নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ধারা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ভর 1.99×10^{30}kg। প্রাথমিকভাবে সূর্য হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের ৩ : ১ অনুপাতে গঠিত এবং এতে ১% লৌহের মিশ্রণ রয়েছে।

সূর্যের আলোকময় ফটোস্ফিয়ারের উর্ধ্বে কয়েক হাজার কি.মি. দূরে যে অঞ্চল অবস্থিত তাকে বলা হয় ক্রোমোস্ফিয়ার (Chromosphere)। এর উপরে অবস্থিত সৌর আলোক বলয় করোনা (Corona)। যার বিস্তার প্রায় ১০ সৌর ব্যাসার্ধ। এ করোনা থেকে ইলেকট্রন ও প্রোটন কণা সৌর-বায়ু (Solar Wind) হিসেবে প্রবাহিত হয়। সূর্যের কেন্দ্রে শক্তি উৎপাদিত হয় থার্মোনিউক্লিয়ার সিনথেসিস (Thermo-nuclears synthesis) দ্বারা। এ সিনেথেসিসে কার্বন নিউক্লি প্রোটন সংযোজনের মাধ্যমে কার্বন ও হিলিয়াম নিউক্লী উৎপাদন করে।

সূর্যের অবশিষ্ট অঞ্চল যার ব্যাস প্রায় ৪০০ ০০০ কি.মি. সেখানে শক্তি উৎপাদিত হয় প্রোটন ও প্রোটনের বিক্রিয়া দ্বারা। এ বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।

সূর্যের উপরিভাগে অসংখ্য দাগ (Sport) দেখা যায়। এগুলো তুলনামূলকভাবে কৃষ্ণবর্ণের। সূর্যের এ দাগগুলো কৃষ্ণবর্ণের দেখায় একারণে যে, সেগুলো তাদের আশপাশের অঞ্চল অপেক্ষা কম আলো বিকিরণ করে। কালো দাগগুলোতে চুম্বকক্ষেত্র রয়েছে। এ চুম্বকক্ষেত্রগুলো পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। সূর্য আবর্তিত হলে তার কৃষ্ণ দাগগুলোতে গতিবেগ লক্ষ্য করা যায়। তাদের এ গতিবেগ পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিচালিত।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তার Mass energy থিওরীর মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, $4.28 x 10^9$ kg অথবা 4280,000 মেট্রিক টন সৌরবস্তু প্রতি সেকেণ্ডে শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই হারে সূর্যের গঠন বস্তু বিলুপ্ত হলেও সে আরো ১০০ বিলিয়ন বছরের বেশি সময় ধরে কিরণ দান করে যাবে।

চাঁদ : একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ। পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশি। আমাদের কাছ থেকে এর গড় দূরত্ব ২৩৮৮৫৭ মাইল। উপগ্রহ অনেকাংশে গ্রহের মতোই। অর্থাৎ এরা গ্রহদের মতো প্রধানত কঠিন পদার্থে গঠিত। এদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। নক্ষত্রের আলো দ্বারা আলোকিত হলে এদের উজ্জ্বল দেখায়। চাঁদ একগুচ্ছ জটিল গতিবেগের অধিকারী এটা নিজ অক্ষে আবর্তিত হয় এবং পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে। এটা পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের চারপাশে ঘুরে এবং সৌরজগতের সঙ্গে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারপাশেও আবর্তিত হয়। এটাকে বলা হয় সমসাময়িক আবর্তন। সুতরাং চাঁদ তার একই মুখে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। যখন সে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে তখন তার একই দিক, পৃথিবী ও সূর্যের চারপাশে আসে এবং সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত দেখায় সে অংশটাকে বলা হয় Phase। চাঁদের অর্ধাংশ সূর্যের আলোয় আলোকিত হলে তা পৃথিবী থেকে দেখা যায়। অর্থাৎ এ সময় পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে এসে পড়ে এবং পূর্ণিমা দেখা দেয়। এরূপ কোনো অবস্থায় চন্দ্র যদি পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে এসে পড়ে তখন চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়। পুনরায় চাঁদ যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে তখন তার আলোকিত অংশ দেখা যায় না। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চাঁদকে আর দেখা যায় না। এটা হলো নতুন চাঁদের পর্যায়। এ পর্যায়ে যদি চাঁদের ছায়া পৃথিবীর কোনো অংশে পড়ে তাহলেই ঘটে সূর্যগ্রহণ।

চাঁদের কারণে জোয়ার-ভাটা ঘটে থাকে। পৃথিবীর আবর্তনকালে চাঁদ সমুদ্রের পানির অধিকতর নিকটবর্তী হয়। তখন সমুদ্রের পানির উপর চাঁদের মহাকর্ষ শক্তি প্রবলভাবে ক্রিয়া করে। কিন্তু তা নিরেট ভূমির উপর করে না। এ কারণে চাঁদের দিকে সমুদ্রের পানি ফুলে উঠে এবং জোয়ার সৃষ্টি করে। পৃথিবীর একবার পূর্ণ

আবর্তনকালে অর্থাৎ একদিনে জোয়ার দু'বার সৃষ্টি হয়। একবার সমুদ্র চাঁদের সম্মুখে আসলে আর একবার সমুদ্র থেকে চাঁদ দূরে সরে গেলে। এভাবে দুইবার জোয়ার সৃষ্টি হয়। সূর্যও জোয়ার সৃষ্টি করে থাকে। যখন সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর একইদিকে কিংবা বিপরীত দিকে অবস্থান করে তখন সর্বোচ্চ জোয়ার হয়ে থাকে। এরূপ জোয়ারকে বলা হয় Spring tide বা ভরা কাঁটাল। যখন চন্দ্র ও পৃথিবী ৯০° ডিগ্রী দূরত্বে অবস্থান করে তখন জোয়ার সর্বনিম্নে নেমে যায়। এভাবে নিচে নেমে যাওয়া জোয়ারকে বলা হয় Neaptide বা মরা কাঁটাল।

নক্ষত্ররাজি : আল্লাহ্ পাক নক্ষত্র বা তারকাদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়মনীতি বেধে দিয়েছেন। এরা সেই নিয়মনীতি শৃঙ্খলার সাথে পালন করে যাচ্ছে।

নক্ষত্র বিপুল ভরবিশিষ্ট এবং গ্যাস গঠিত আকাশি বস্তু। এর ব্যাপক শক্তির উৎস এবং পারমাণবিক সংযোজন প্রক্রিয়ায় তারারাজি নিজেদের দেহে শক্তি উৎপন্ন করে। এর ফলে আলো, তাপ এবং শক্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। নক্ষত্রের জন্ম ও বিবর্তন একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা। নক্ষত্রের জীবনচক্র শুরু হয়েছিল ছায়াপথে নিজেদের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ভেঙ্গে পড়া ঘন মেঘের হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের ত্বরণের মাধ্যমে।

এ মেঘের তাপমাত্রা ছিলো প্রায়- 173°C। হাইড্রোজেনের মেঘ যদি ক্ষুদ্র হয় এবং পারিপার্শ্বিক অণুগুলো যদি পরস্পরের নিকটে না থাকে তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যকার আকর্ষণ এমন হয় না যে, তাদের আচরণের কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে। মেঘের আকার যদি বড় হয় তাহলে প্রতিটি অণুর মধ্যকার মহাকর্ষ বল বেশি হয়। ফলে মেঘকে ভেতরের দিকে টানে এবং নিজস্ব মহাকর্ষ বলের প্রভাবে মেঘগুলো সংকুচিত হতে থাকে একটি নাটকীয় প্রক্রিয়ায়। এরূপ সংকোচনশীল গ্যাসীয় ভরকে বলা হয় প্রোটোস্টার (Protostar)। প্রটোস্টার যখন সংকুচিত হয় তখন গ্যাসীয় মেঘের পরমাণুগুলোর পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ ঘটে। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সংকোচন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলে। যার কারণে তাপমাত্রা প্রায়-173°C থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 10^7 ডিগ্রী সেলসিয়াসে এসে দাঁড়ায়। এ অতি উচ্চ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয় এবং চারটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস সংযোজিত হয়ে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করে। তখন যে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তা বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর তাপমাত্রা ও চাপ আরো বৃদ্ধি পায়। প্রোটোস্টার আলো ছড়াতে থাকে এবং নক্ষত্রে পরিণত হয়।

সৌরজগতের ক্ষেত্রে অবস্থিত আমাদের কাছে অতি পরিচিত সূর্য একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এটি পৃথিবীর নিকটবর্তী হওয়ায় এতো উজ্জ্বল এবং বড় দেখায়। কিন্তু সূর্যের চেয়ে লক্ষ গুণ উজ্জ্বল এবং বিশাল আকারে নক্ষত্র মহাকাশে আছে। যেমন, বেটলজিয়ুজ (Betelgeuse)। সূর্যের ব্যাস ১৩,৯২,০০০ কি.মি.। বেটলজিয়ুজের ব্যাস সূর্যের চেয়ে ৮০০ গুণ বেশি। অর্থাৎ সূর্যের মতো ৫০ কোটি তারা বেটলজিয়ুজ-এর ধারণ ক্ষমতা আছে। সূর্যের ভর $1.99 x 10^{30}$ kg। সূর্যের ভরের ৫০ গুণ বেশি ভরবিশিষ্ট দু'টি তারা আছে এরা একে অপরের কাছাকাছি থেকে একটি যুগ্ম তারা গঠন করেছে। এদের একযোগে নাম দেয়া হয়েছে Plasket's Star। সূর্যের চেয়ে ৫০,০০০ গুণ উজ্জ্বল একটি তারা রাতের আকাশে জ্বল জ্বল করে জ্বলে। যার নাম বানরাজ (Rigel)। সূর্যের চেয়ে ১০ লক্ষ গুন উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র যার নাম S.Doradas।

নক্ষত্ররাজি মহাশূন্যে যথেচ্ছভাবে ছড়ানো নয়। বরং তাদের দেখা যায় সুসংহত গুচ্ছের আকারে। প্রধানত দু'ধরনের তারকাগুচ্ছ আছে। গ্যালাকটিক তারকাগুচ্ছ ও গ্লোবিউলার তারকাগুচ্ছ। গ্যালাক্সিভুক্ত তারকাদের থেকে যে Red shifts দৃশ্যের উড্ডয়ন ঘটে তাকে বিশ্লেষণ করে ১৯২৯ সনে বিজ্ঞানী হাবল্ তার বিখ্যাত নিয়ম ঘোষণা করেছিলেন। এ নিয়মে বলা হয়েছে, 'The Velocity of recession of a galaxy is proportional to its distance' এ নিয়ম অনুযায়ী Big bang সংঘটিত হওয়ার কাল থেকে সময়ের হিসাব করতে পারে। ১৫ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিস্ফোরণের ফলে মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে মহাশূন্যে চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতির কার্যাবলী ও গতিবেগ নির্দিষ্ট নিয়মের আওতায় পরিব্যাপ্ত রয়েছে। এসব জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গঠন শৈলী, শৃঙ্খলা দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। এভাবে মহাবিশ্বের সবকিছু সুমহান আল্লাহ পাকের বেধে দেয়া নিয়মের মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

বৃষ্টির পূর্বে আবহাওয়ার পূর্বাভাস

সূরা আল-আ'রাফ-৭ : ৫৭

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ حَتّٰى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

And it is He Who Sends the winds as heralds of glad tidings, going before His Mercy. Till when they have carried a heavy-Laden cloud, We drive it to a land that is dead, then we cause water to descend thereon. Then We produce every kinds of fruit therewith. similarly We shall raise up the dead so that you may remember or take heed.

আর তিনিই করুণাস্বরূপ বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ু পানিপূর্ণ ভারি মেঘমালা বয়ে আনে তখন আমরা একে মৃতভূমির দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর এ মেঘমালা থেকে বারি বর্ষণ করি। তারপর পানি দ্বারা প্রত্যেক প্রকারের ফল উৎপন্ন করি। অনুরূপভাবে মৃতদেরকে উঠাবো যাতে তোমরা স্মরণ করো কিংবা সতর্ক হও। (সূরা আল-আ'রাফ-৭ ঃ ৫৭)

বায়ু গতিবেগ পেয়ে বাতাসে রূপ নেয় এবং উচ্চ চাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এ চাপ সৃষ্টি হয় শক্তির সাহায্যে। এ শক্তি আল্লাহ্ পাকের নির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে কাজ করে থাকে। এ আয়াতে সুসংবাদবাহী বায়ুর অর্থ হলো ঐ বাতাস যা আমাদের কাছে বেশ সুখকর। অর্থাৎ যা আমাদের কাছে খুব তীব্র বা ভয়ঙ্কর নয়। এটাকে মৃদু বায়ু হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এ ধরনের বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তখন যে সকল শুভ সংবাদের সূচনা ঘটে তা হলো (১) মৃদু বাতাস বিভিন্ন এলাকায় জলভরা মেঘ বহন করে নিয়ে যায়। (২) এটা দূষিত বায়ুকে দূরীভূত করে সেখানে এনে দেয় বিশুদ্ধ সতেজ বায়ু। (৩) এ ধরনের বায়ু ফুলের পুংকেশর ও স্ত্রীকেশরের মিলন ঘটিয়ে ফল উৎপাদনে সহায়তা করে। (৪) এটা আবহাওয়ামণ্ডলে তাপমাত্রার সামঞ্জস্যতা বিধান করে।

বিভিন্ন জায়গায় মেঘ বহন করে নিয়ে গিয়ে মৃদুবায়ু যে কল্যাণধর্মী কার্যাবলী সম্পন্ন করে তা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। যখন জলভরা মেঘরাশি বাতাসের তাড়না খেয়ে শুষ্ক বিরান ভূমির দিকে পরিচালিত হয় এবং সেখানে বারি বর্ষণ করে তখন সেখানকার মৃতপ্রায় ভূমি আল্লাহ পাকের করুণায় জীবন্ত, উর্বর ও সুশোভিত হয়ে ওঠে। এরপর বিভিন্ন রকমের ফল ও খাদ্য শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

এটা স্পষ্ট যে, বাতাসে গতিবেগ না থাকলে সে বাতাস রুদ্ধ হয়ে দূষিত হয়ে পড়ে এবং প্রবাহিত বায়ুর অভাব দেখা দিলে সেখানে বৃষ্টিপাত ঘটে না। বৃষ্টিপাত না ঘটলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় না ফলে জমি-বন্ধ্যা হয়ে পড়ে থাকে। এ কারণে ফলের ফলনও খুব বেশি মাত্রায় ব্যাহত হয় এবং বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার সামঞ্জস্যতা একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায়।

অতএব যখনই বাতাস বইতে শুরু করে তখনই আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ পাকের করুণা বিভিন্ন আকারে আমাদের উপর নেমে আসতেছে। তাই প্রবাহিত বাতাস আল্লাহর করুণা দূত হিসেবে আমাদের কাছে শুভ সংবাদ বয়ে আনে।

ভালো জমিতে উৎপন্ন হয় ভালো ফসল

সূরা আল-আ'রাফ-৭ : ৫৮

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَايَخْرُجُ اِلاَّ نَكِدًا كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ.

The vegetation of a good land comes forth by the permission of its Lords and that which is bad brings forth nothing with dificulty. Thus do We explain variously the signs for a people who give thanks.

ভালো জমির ফসল আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে গজিয়ে ওঠে। আর যে জমি উত্তম নয় তাতে কিছুই জন্মায় না। এভাবে আমরা নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করি ঐসব লোকের জন্য যারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। (সূরা আল-আ'রাফ : ৫৮)

ভালো জমির অর্থ হলো, যে জমিতে সহায়ক মাটির গুণাবলী থাকে, প্রচুর পরিমাণে জৈব ও অজৈব পুষ্টিগুণ থাকে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পানি ও যথাযথ গ্যাসীয় পরিবেশ থাকে। এসবের সাথে যখন গ্যাসীয় উপাদান যথা, তাপমাত্রা, আলো, বৃষ্টিপাত বা সেচ সুবিধা সঠিক অনুপাতে থাকে তখন মানসম্পন্ন ফসল ও গাছপালা ঐ মাটিতে সহজেই জন্মাতে পারে। কিন্তু যে মাটি গুণহীন ও বন্ধ্যা সে মাটিতে যদিও পর্যাপ্ত তাপমাত্রা, আলো ও পানি সরবরাহের সুযোগ থাকে তবুও সেই মাটি সন্তোষজনক উৎপাদন দিতে ব্যর্থ হয়। এ দুই ধরনের ঘটনার ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

প্রকৃতিগতভাবে ৯২টি উপাদানের সাহায্যে মৃত্তিকা গঠিত হয়। এ উপাদানগুলো খনিজ পদার্থরূপে প্রাপ্ত। এ খনিজ পদার্থ দুই বা ততোধিক উপাদানে গঠিত। মাটিতে খনিজ পদার্থ ও শিলাখণ্ডের আকারে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে মাটির কণাগুলোকে যে ধরনের শ্রেণীবিন্যাসে বিভক্ত করা হয় তা হলো মোটা বালি, মিহি বালি, পলি ও কাদামাটি। মাটির নিরেট বস্তু গঠিত হয় জৈব ও অজৈব উভয় ধরনের পদার্থ থেকে। ঐ পদার্থগুলো আকারে বিভিন্ন মাটিতে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। মাটির ফাঁকা জায়গা বাতাস ও পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে। এ দুইটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধিতে

সহায়তা করে। উপরন্তু মাটিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পরিপূর্ণ থাকলে সর্বাধিক মাত্রায় শস্য উৎপাদিত হয়।

বিরতিহীনভাবে মাটিতে চাষ করলে মাটির পুষ্টিগুণ কমে যায় এবং এ ধরনের মাটিতে আর মোটেও ফসল হয় না। মাটি ক্ষয়ের কারণে। মাটিতে পানি প্রবেশের ফলে অথবা মাটির উপরিভাগের আস্তরণ যখন পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায় তখন মাটির নাইট্রোজেন হারিয়ে যেতে পারে। জলাভূমিতে ও সেঁতসেঁতে মাটিতে নাইট্রেট ক্ষীণ হয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস এবং নাইট্রাস অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। নাইট্রাস অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। ভূমি ক্ষয়, দূষণ ও ড্রেনেজ পানি হ্রাসের ফলে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস নির্গত হয়ে নদী-নালায় গিয়ে মিশে যায়। যদি মাটির উর্বরতা রাসায়নিক সারের সাহায্যে পূরণ করা যায় তাহলে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমি যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তীব্র পরিস্থিতিতে বন্ধ্যা হয়ে পড়লে জমিতে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বড় হতে পারে না।

সুতরাং উর্বর ভূমি বিদীর্ণ করে উত্থিত হয় আল্লাহ পাকের শস্য সম্ভার ও বন্ধ্যা মাটির অনুর্বরতা নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে ঐ দৃষ্টান্ত তুলে ধরে যার কারণে আমরা মহান প্রভুর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকি।

হযরত নূহ (আ) এবং মহাপ্লাবন

সূরা আল-আ'রাফ-৭ : ৬৪

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ.

But they belied him, so We Saved him and those along with him is the ship and We drowned those who belied Our proofs. They were indeed a blind people.

কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমরা তাকে এবং জাহাজস্থ লোকদেরকে রক্ষা করলাম এবং যারা মিথ্যা আরোপ করল আমাদের প্রমাণসমূহের উপর, তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিলো অন্ধ। (সূরা আল-আ'রাফ : ৬৪)

আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের মহাপ্লাবনের মাধ্যমে যে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের শাস্তি নূহ (আ)-এর জনগণের উপর আরোপ করার আরো কারণ ছিলো যে, তারা আল্লাহ পাকের প্রমাণসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এ মহাপ্লাবন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরায় কিছু না কিছু বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

দু'টি সূরায় বলা হয়েছে চুলা থেকে পানি উদ্গত হয়েছিল। আর একটি সূরায় বলা হয়েছে, "আমরা জমিন থেকে পানি উত্থিত করেছিলাম।" আবার বলা হয়েছে, "আমরা আকাশের গেট উন্মুক্ত করে দিয়ে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছিলাম।" এসব বক্তব্য একত্র করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মহাপ্লাবন ঘটেছিল উপরের বৃষ্টিপাত থেকে এবং মাটি তলা থেকে পানি উদ্গত হয়ে।

এ বিশাল মারাত্মক মহাপ্লাবন সম্পর্কে বহুজাতির জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধারণা চলে আসছে। কিন্তু কোরআন, বাইবেল ও তাওরাতে উল্লেখ আছে যে হযরত নূহ (আ)-এর সময়ে এ মহাপ্লাবন ঘটেছিল। এসব পবিত্র গ্রন্থে মহাপ্লাবনের যে কারণ উল্লেখ আছে তা অভিন্ন– বৃষ্টির পানি ও মাটির নিচ থেকে উত্থিত পানি। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ)-এর কিস্তি ভিড়েছিল জুদী পর্বতের চূড়ায়। বাইবেল (ওল্ড টেস্টামেন্ট) অনুসারে হযরত

নূহ (আ) এর কিস্তি ভিড়েছিল আরাফাত পর্বতে। আর হযরত নূহ (আ) ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকা মেসোপটোমিয়ার অধিবাসী ছিলেন।

মৃত্তিকা বিজ্ঞানীরা বন্যার বিভিন্ন কারণ থেকে বন্যার বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী বিভাগ করেছেন। (১) নদীর বন্যা, (২) তুষার গলিত বন্যা, (৩) বরফের চাই জমে যাওয়ার কারণে বন্যা, (৪) হিমবাহের কারণে বন্যা, (৫) ভূমি ধ্বসের কারণে বন্যা, (৬) বায়ুমণ্ডলের গোলযোগের কারণে বন্যা, (৭) সামুদ্রিক ঝড়ের কারণে বন্যা, (৮) সুনামী বন্যা (Tsunami flood)। হঠাৎ সমুদ্রের তলে আন্দোলনের কারণে সুনামী বন্যা সংঘটিত হয়।

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস উপত্যকায় পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং মিশিসিপি নদীর উপত্যকায় মৃত্তিকা গবেষণার সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে স্মরণযোগ্য মারাত্মক বন্যাগুলো সংঘটিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ বছর আগে। ইতিহাসের রেকর্ডভুক্ত প্রথম মারাত্মক বন্যা ঘটেছিল।

চীন দেশের হোয়াংহো নদীতে ২২৯৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে।

পবিত্র কোরআনে যে বন্যার কথা উল্লেখ আছে তা সংঘটিত হয়েছিল উপরের বৃষ্টিপাত ও নিচের মাটি ভেদ করে পানি উদ্গত হয়ে।

এ বন্যা আধুনিক শ্রেণী বিভাগের আওতায় পড়ে– নদী-বন্যা ও আবহাওয়াজনিত কারণে ঘটিত বন্যার মিশ্রণের মধ্যে।

নদী-বন্যা হলো স্বাভাবিক ধরনের বন্যা যা প্রত্যেক ঋতুতে ঘটে থাকে। এ বন্যার প্রধান কারণ অধিক বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রার বৃদ্ধি। এ ধরনের বন্যা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করা যায়। মাঝারি ধরনের নদীসমূহ যেগুলো ২০০ বর্গমাইল এলাকাকে প্লাবিত করতে পারে সেগুলোর বন্যা সম্পর্কে বৃষ্টিপাতের রেকর্ড থেকে ভবিষ্যৎ বাণী করা সম্ভব।

বড় বড় নদীসমূহ যেগুলো বিশাল এলাকাকে প্লাবিত করতে পারে সেগুলোর বন্যা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করা সহজেই সম্ভব। হযরত নূহ (আ) আল্লাহ পাকের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে মহাপ্লাবন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। পবিত্র কোরআনে এ ভবিষ্যৎ বাণীর কথা উল্লেখ আছে। সূরা কামার থেকে জানা যায়, প্রথমে শুরু হয়েছিল বৃষ্টিপাত। তারপর দেখা দিয়েছিল আবহাওয়াজনিত গোলযোগ। আবহাওয়াজনিত গোলযোগ ঘটে সমুদ্রের তলে ভূমিকম্প হওয়ার কারণে। একে সুনামী বন্যা বলা হয়।

২০০৪ সনে ভারত মহাসাগরের তলে সুনামী সংঘটিত হওয়ার দরুন ব্যাপক প্রলয়

সৃষ্টি হয়েছিল। এতে সাগরের তলা ধাক্কা খেয়ে উপরের দিকে ওঠে গিয়েছিল এবং ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত এবং আরো অন্যান্য দেশের ব্যাপক অংশ পানিতে তলিয়ে গিয়েছিল। প্রায় তিন লক্ষ মানুষ এ সুনামীতে প্রাণ হারিয়ে ছিলো।

জীবাশ্ম রেকর্ড (Fossil record) থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মহাপ্লাবন সম্পর্কে মেসোপটোমিয়ার বহুবিধ গল্প কাহিনী একেবারে অলীক নয়। এসব গল্প প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং আক্কাডিয়ান, সুমেরিয়ান, ব্যাবিলিয়ান ও নিনেভের তথ্য বিবরণীর সাথে পবিত্র কোরআন বা বাইবেলের বিবরণের মিল আছে এবং এসব তথ্য বিবরণী নিঃসন্দেহে মহাপ্লাবনের যথার্থতা তুলে ধরে। এ যাবৎ বিভিন্ন পুস্ত কে মহাপ্লাবন সম্পর্কে বহুকিছু লেখা হয়েছে এবং এসব লেখায় মহাপ্লাবনের ঐতিহাসিক পটভূমি চিত্রিত করা হয়েছে, একই সময়ের সাথে সম্পর্কিত না হলেও মেসোপটোমিয়ার নদী উপত্যকায় অবস্থিত অন্যান্য শহর যেমন, কীস, ফেয়ার এবং নিনেভ-এ এ বন্যা সম্পর্কিত চিহ্নের সন্ধান মিলেছে। পবিত্র কোরআন যেহেতু হযরত নূহ (আ)-এর উম্মতদের মধ্যে মহাপ্লাবনের ব্যাপ্তির কথা উল্লেখ করেছে সেহেতু এ প্লাবন বিশ্বব্যাপি ছিলো না, নিছক স্থানীয় ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মহাপ্লাবন সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এগুলো হলো-

১. হযরত নূহ (আ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে একটি বড় ধরনের মজবুত কিস্তি তৈরী করেছিলেন।

২. বন্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছির বৃষ্টিপাত ও ভূকম্পন সমন্বিত হওয়ার কারণে।

৩. হযরত নূহ (আ) আল্লাহ পাক থেকে অবহিত হয়ে ভয়াবহ মহাপ্লাবন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৪. বর্তমান বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে এ সত্যতা প্রতিভাত হয়েছে যে, মেসোপটোমিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে এ প্লাবন সংঘটিত হয়েছিল। পবিত্র কোরআনের অধিকাংশ ভাষ্যকার এ সত্য মেনে নিয়েছেন।

এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ) কিস্তি তৈরির কৌশল শিল্পের অগ্রনায়ক ছিলেন। কিন্তু তার লোকজনেরা সামুদ্রিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। তাদের পক্ষে বিশাল আকারের জাহাজ (কিস্তি) নির্মাণ করা সম্ভবপর ছিলো না। প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে এ জাহাজ নির্মিত হয়েছিল এবং যারা হযরত নূহ (আ) এর জাহাজে আরোহন করেছিলেন তারা মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন মর্মে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ আছে।

বিকৃত যৌনাচার অনিরাময়যোগ্য রোগের বিস্তার ঘটায়

সূরা আল-আ'রাফ-৭ : ৮০, ৮১

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ. اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ.

And *Lut*, to his people, 'Do you commit the worst sin such as none Preceding you has committed in the worlds?'

Verily, 'You Practise your Lusts on men instead of women, Nay, but you are a people transgressing beyond bounds.'

হযরত লূত (আ) তার লোকজনদের বললেন, "তোমরা কি এমন কদর্য পাপ করবে যা তোমাদের পূর্বে সারাবিশ্বে কেউ করেনি?" (সূরা আল-আ'রাফ : ৮০)

বস্তুত "তোমরা মহিলাদের পরিবর্তে পুরুষদের উপর কামাচার চরিতার্থ করছো। না! তোমরা কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারী লোক।" (সূরা আল-আ'রাফ : ৮১)

আলোচ্য আয়াত দুইটিতে এ মর্মে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, হযরত লূত (আ)-এর লোকজন বিকৃত যৌন-রুচির পূজারী ছিলো। তাদের মধ্যে অধিকাংশ পুরুষই সমকামিতা পছন্দ করতো। তারা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশিত যৌনরীতির পথ পরিহার করে পুরুষের সাথে পুরুষ সমকামিতায় লিপ্ত হতো। হযরত লূত (আ) বললেন যে, পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি বা কমিউনিটি তাদের আগে এ ধরনের পাপাচারে লিপ্ত হয়নি। ইহুদীদের বাইবেল থেকে জানা যায় হযরত লূত (আ)-এর এলাকার নাম ছিলো সোডম ও গোমররাহ্ (Sodom and Gomorrah)। এ এলাকাটির অবস্থান ছিলো মৃত সাগরের (Dead Sea) তীরে। এ ধরনের যৌন-বিকৃতি সোডমি (Sodomy) নামে পরিচিতি।

রোমানস্ ও প্রাচীন গ্রীক জাতির মধ্যে যৌন-বিকৃতি পরিচিত ছিলো বলে মনে করা হয়। কিন্তু এসব দেশের কোথাও সমকামিতা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। কিংবা সারা বিশ্বের কোথাও এ কদর্য পদ্ধতির প্রচলন ঘটেনি। পবিত্র কোরআন অনুসারে এটা পরিজ্ঞাত হয়েছে যে, কেবলমাত্র সোডম ও গোমররাহ্ এলাকার অধিবাসীরা এ কদর্য পাপাচারকে গ্রহণ করেছিল।

হযরত লূত (আ)-এর লোকজনের অপরাধের প্রকৃতি আয়াতে খুব ভালোভাবে

উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে তাদের বিকৃত রুচি সমকামিতাকে আ'রাফ ৮১ নং আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে।

সুনির্দিষ্টভাবে সমকামিতাকে আল্লাহ্ পাকের সীমালঙ্ঘনের চরম দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান মনে করে যে, যৌন আবেদনের বিষয়টি যদি সমজাতীয় লিঙ্গের মধ্যে প্রচলিত হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে নৈতিক অধঃপতন বলে গণ্য হবে। এ অধঃপতন চরম সীমায় পৌঁছলে যা ঘটার তা-ই ঘটবে।

সম্প্রতি পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে পুরুষদের সমকামিতা বহুলভাবে প্রচলিত হয়েছে এবং বেশ কিছু দেশ এ প্রচলনের স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই বিগত দশক থেকে নিরাময় অযোগ্য AIDS রোগ আমেরিকার সমকামীদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুসংখ্যক লোক মারা গেছে। পরবর্তী সময়ে AIDS সমগ্র ইউরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। এটা একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এ ভাইরাসের নাম HIV।

HIV সংক্রমণের কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং এর পরিণতি মারাত্মক রূপ লাভ করে।

বর্তমানে সমকামপ্রবণতার বহুবিদ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী ব্রাসেলস লিখেছেন যে, যারা মানসিক ভারসাম্যহীন, যারা মানসিক অস্থিরতায় পীড়িত, যারা নেশাগ্রস্ত এবং যারা নিঃসঙ্গ বিদ্যানিকেতনের বাসিন্দা তাদের মধ্যে সাধারণত সমকামিতার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। মনোবিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েড সমকামিতাকে মানসিক ভারসাম্যহীনতার এবং মদ্যপানের সাথে যুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যেসব ব্যক্তি কম বয়সী বালকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড সমকামিতার অভ্যাস পরিলক্ষিত হয়। এরূপ প্রচণ্ড সমকামিতাকে 'Pederasty' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সুতরাং হযরত লূত (আ)-এর লোকজন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বিকৃত যৌন রুচির কারণে। আমাদের নবীজি হযরত মুহাম্মাদ (সা) এ মর্মে সাবধান করে দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র বিকৃত যৌনাচারের কারণে কোনো জাতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হবে শুধু তা-ই নয় তাদের মধ্যে যদি অস্বাভাবিক যৌন জীবনের প্রবণতা দেখা দেয় এবং লজ্জা-শরমের অভাব ঘটে তাহলেও আল্লাহ পাক তাদের মধ্যে অনিরামযোগ্য রোগের বিস্তার ঘটাবেন।

ভূমিকম্প প্রতিরোধ করা অসম্ভব

সূরা আল-আ'রাফ-৭ : ৯১

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ.

So the earthquake seized them and they lay (dead) proshale in their homes.

সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল এবং তারা তাদের ঘরের ভেতর উপুড় (মৃত) হয়ে পড়ে রইল। (সূরা আল-আ'রাফ : ৯১)

এ আয়াতে যে ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা আল্লাহর নবী হযরত শোয়াইব (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর আপতিত হয়েছিল। হযরত শোয়াইব (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে এক আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি আহ্বান করেছিলেন। তারা সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল এবং হযরত শোয়াইব (আ) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিকম্প তাদের অসতর্ক মুহূর্তে আঘাত হেনেছিল। এ ভূমিকম্প বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সাধারণত ভূমিকম্প জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। ভূমিকম্পের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। সানফ্রানসিসকোতে ভূমিকম্পের কারণে ২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছিল। ১৯৩৪ সনে বিহারে এবং পাকিস্তানের কোয়াটা শহরে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তাতে হাজার হাজার মানুষের জীবনহানি ঘটেছিল। ২০০৪ সনে ভূমিকম্পের আঘাতে ইরানের ঐতিহাসিক বাম নগরী মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল এবং বহু সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

ভূমিকম্পের সময় পৃথিবীর উপরিভাগ দুলতে থাকে এবং কাঁপতে থাকে। ভূমিকম্পের মাত্রা যখন অল্প কম্পনে সীমিত থাকে তখন তা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনুভূত হয়। কিন্তু কম্পন যখন খুব জোরালো হয় তখন পৃথিবীর উপরিভাগের গঠন সংকুচিত হয়। এর ফলে বহু জীবন ও সম্পত্তির বিনাশ সাধিত হয়। পৃথিবীর নিম্নভাগের যে বিন্দু থেকে ভূমিকম্প উদ্ভূত হয় সেই নির্দিষ্ট বিন্দুকে বলে ফোকাস (Focus)। পৃথিবীর উপরিভাগের বিন্দু যা ঠিক ফোকাসের উপরে অবস্থিত তাকে ভূকম্পনের উপকেন্দ্র বলা হয়।

C-F, Richter ১৯৩৫ সনে ভূমিকম্প মাপার জন্য রিখটার স্কেলের সূচনা করেন। এ স্কেলে ভূকম্পনের মাত্রা $M = Log_{10} (^A/A_o)$। এখানে A হলো সবচেয়ে বেশি মাত্রার বিস্তৃতি যা ভূকম্পনের উপকেন্দ্র থেকে ১০০ কি. মি. সিসমোগ্রাফে (Seismograph) রেকর্ডবদ্ধ হয়ে থাকে। A_o হলো ১ মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ পরিমিত ব্যাপ্তি।

৫.০ এর চেয়ে কম মাত্রার ভূমিকম্প ভূমি অভ্যন্তরে ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম। কারণ এরূপ ভূমিকম্পের স্থিতিকাল অত্যন্ত স্বল্প। পূর্বে এটা মনে করা হতো যে, ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকে পৃথিবীর উপরিভাগে ঝাঁকুনির কারণে। এ ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয় পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের শিলাস্তরগুলোর আন্দোলনের ফলে।

গ্যাস বা লাভা উদ্গীরণের কারণে কিংবা গুহার ছাদ ধ্বসে পড়ার কারণেও ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। গত ২০ বছরে ভূ-বিজ্ঞানে (Earth Science) একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। এ বিপ্লব আমাদের গ্রহ নামক পৃথিবী সম্বন্ধে নতুন ধ্যান ধারণা বয়ে এনেছে এবং যে শক্তি মহাদেশগুলোর আকার নির্ধারণ করছে এবং তাদের চলমান রয়েছে সেই শক্তি সম্পর্কে এ বিপ্লব আমাদেরকে একটি ক্রমবর্ধমান ধারণা দান করেছে। আমাদের পৃথিবীর উপরিভাগ ভেঙ্গে টুকরা হয়ে শীতল শক্ত ১০০ কি. মি. পুরু লিথোস্ফিয়ারিক প্লেটে পরিণত হয়েছে। এ প্লেটগুলো গরম, তুলনামূলকভাবে নমনীয় এবং আংশিকভাবে গলিত এলাকায় ভেসে বেড়ায়। এই এলাকাকে বলা হয় এসথেনোসফেয়ার (Aesthenosphere)। এ প্লেটগুলো অতি ধীরে নড়াচড়া করে– বছরে ৫ থেকে ১০ সে. মি.। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন এগুলো অভিকর্ষ (Gravity) শক্তি দ্বারা চালিত। মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের মতে, পর্যাপ্ত পরিমাণে নতুন শিলা ধীরে ধীরে আবরণ থেকে বের হয়ে আসে সাগরতলের পবর্তমালার পথ ধরে এবং এগুলো প্রশস্ত আকার ধারণ করে এগিয়ে যায় উপমহাদেশের দিকে। এ ঘটনাকে বলা হয় সাগরতলের বিস্তৃতি এবং এটা প্লেটগুলোকে ধাবিত করছে। সবচেয়ে বড় মৃত্তিকাগত ফর্ম সংঘটিত হয় তখনই যখন এগুলো একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়। ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, পর্বত গঠন ইত্যাদিও ঘটে থাকে ঐসব প্লেটগুলোর বিরাট সংঘর্ষের কারণে, যদি একটি ভারি সামুদ্রিক শিলা উপমহাদেশীয় শিলার অধিকতর হালকা প্লেটকে জটলার মাধ্যমে বাধা দেয় তাহলে এ প্লেট বাধ্য হয়ে পুনরায় অভ্যন্তরে ফিরে যায়। যখন এটা অভ্যন্তরে ডুবে যায় তখন এটা গরম হয়ে ওঠে এবং শেষে দ্রবীভূত হয়ে যায়। স্বল্প ঘন গলিত শিলা উপরে উঠে আসে এবং আগ্নেয়গিরির মাধ্যমে তার উদ্গীরণ ঘটে। যখন দু'টি মহাদেশীয় প্লেটের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে তখন ভূমিকম্প হয়।

যখন সংঘর্ষ খুব বড় ধরনের হয় তখন উপমহাদেশগুলো বক্র আকার ধারণ করে এবং রকি ও হিমালয় পর্বতের মতো ভাজ খাওয়া পর্বত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সুতরাং ভূমিকম্প সংঘটিত হয় উপরোক্ত প্লেটগুলোর সীমানার মধ্যে।

ভূমিকম্পের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে। এতে ফাটল ও চ্যুতির সৃষ্টির হয়। চ্যুতির মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ বসে গেলে গ্রস্ত উপত্যকা ও উপরে উঠে গেলে স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি হয়। পাললিক শিলায় উঁচু নিচু ভাঁজের সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো সমুদ্রে বিশাল পর্বত মাথা তুলে দাঁড়ায়।

সুতরাং ভূমিকম্প প্রতিরোধ কিংবা নিয়ন্ত্রণ করা কখনো সম্ভব নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই এর উপর ক্ষমতাবান।

আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টিকর্ম অপার রহস্যে পরিপূর্ণ

সূরা আল-আ'রাফ-৭ : ১৮৫

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ وَّ اَنْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ.

Do the not look in the dominion of the Heavens and the earth and all things that Allah has Created and that in may be that the end of their Lives is near. In what message after this will they then believe?

তারা কি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল রাজ্য এবং সকল জিনিসের প্রতি লক্ষ্য করেনি যা আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন এবং এটা হতে পারে যে, তাদের জীবন নিকটবর্তী হয়ে এসেছে? এরপর কোন্ বাণীর উপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে? (সূরা আল-আ'রাফ : ১৮৫)

এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক মহাবিশ্ব প্রকৃতির নকশা ও শৃঙ্খলার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই বিশাল বিশ্ব তাঁর নির্ধারিত আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখতে পাই আদি অন্তহীন মহাকাশ মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরই মাঝে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জ্যোতিষ্কসমূহ আবর্তিত হচ্ছে। জ্যোতিষ্কসমূহ মহাকর্ষীয় টানে একে অপরের কাছাকাছি আসতে চায়। কিন্তু এর বিপরীতে আল্লাহ্ পাক সম্প্রসারণ গতি (Force of expansion) সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাই জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটতে পারে না। আবার নক্ষত্রসমূহ দলবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ধরনের গ্যালাক্সি গঠন করে আছে।

এ গ্যালাক্সি হচ্ছে মহাবিশ্বের গঠন একক। এ পর্যন্ত ১০০ মিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে বলে জানা গেছে। বিভিন্ন আকারের গ্যালাক্সির মধ্যে আমাদের গ্যালাক্সির নাম Milky Way Galaxy যার আকার হচ্ছে পেঁচানো গোলাকার। এ গ্যালাক্সিতে রয়েছে একশ বিলিয়ন তারকা। বিপুল গতিতে গ্যালাক্সিগুলো একে অপর থেকে পশ্চাদগামী হয়ে সরে যাচ্ছে।

অসীম মহাকাশ এখনো অপার রহস্যে পরিপূর্ণ। যার এক কণা পরিমাণ জানার গর্ব এখনো কেউ করে না। কিছুদিন পূর্বে মহাকাশে বসানো হাবল টেলিস্কোপ থেকে নতুন কিছু বিস্ময়কর তথ্য পাওয়া গেছে। ৫০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে স্কালপটার (Sculpter) মণ্ডলে চাকার মতো একটি গ্যালাক্সি রয়েছে। আকার আয়তনে এটি আমাদের গ্যালাক্সির মতোই দেখতে। লক্ষ্য করা গেছে এ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে আর একটি গ্যালাক্সি প্রচণ্ড বেগে ঢুকে যায়। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে শক্ওয়েভের সৃষ্টি হয় এবং প্রচুর পরিমাণে ধূলি ও মেঘ উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানীরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন গ্যালাক্সিটির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী সংকোচনের ফলে কোটি কোটি নতুন নক্ষত্রের জন্ম হয়। এমন একটি নক্ষত্রের নাম 'ইটা ক্যারিনা।' আকারে বিশাল এবং তীব্র জ্যোতির্ময়। এটি সূর্যের চেয়ে ৫০ গুণ বড় এবং ৪০ লক্ষ গুণ উজ্জ্বল।

মহাকাশের রহস্যময় আর এক জ্যোতিষ্ক কোয়াসার (Quasar)। এদের দেখতে তারার মতো মনে হয় অথচ তারা নয়। Quasar নামটি এসেছে Quasi-Star বা Quasi-Stellar শব্দ থেকে যার অর্থ কিছুটা তারার মতো আবার কিছুটা তারার মতো নয়। মহাকাশের অসংখ্য তারার ভিড়ে মিশে থাকা কোয়াসার বহুকাল পূর্বে নভোচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তাদের কৌতূহল দীপ্ত আচরণের দরুন তাদেরকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। একবার মহাশূন্য ভ্রমণকালে বিজ্ঞানীরা রেডিও তরঙ্গ ধরার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় ২/৩টি অতি উজ্জ্বল তারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, এরা তীব্র রেডিও তরঙ্গ পাঠাতে সক্ষম। এরপর ১৯৬৩ সনে 3c 273 নামক একটি কোয়াসার আবিষ্কার হওয়ার পর এদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এরা আভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড চাপ ও তাপের মাধ্যমে নিজেদের রূপান্তর ঘটায় না। তারকারাজি যে প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন করে তা কোয়াসারের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এদের উজ্জ্বলতা খুবই দীপ্তিময় যা সকল উজ্জ্বল নক্ষত্রকে ম্লান করে দেয়ার মতো শক্তিশালী। সৌরজগতের নিকটতম কোয়াসার 3c 273 থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ১৫০ কোটি বৎসর। দূরতম কোয়াসার 3c9 থেকে আলোক রশ্মি পৃথিবীতে পৌছতে যে সময় প্রয়োজন হবে তার পরিমাণ হচ্ছে ১০০০ কোটি বৎসর। পৃথিবীর বয়স এখন ৫০০ কোটি বৎসরের মতো। তাহলে 3c9 এর আলো পৃথিবীতে পৌছতে আরো সময় লাগবে ৫০০ কোটি বৎসর। বর্তমানে এক হাজারের মতো কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে।

মহাশূন্য থেকে আমরা যদি অণু কণার জগতে প্রবেশ করি তাহলে দেখব যে অণু, পরমাণু ইলেকট্রন, নিউট্রন এবং অন্যান্য অতি ক্ষুদ্র কণিকার জগতে কোনরূপ

বিশৃঙ্খলা নেই। এ সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে পদার্থ বিজ্ঞানীদের গবেষণার দ্বারা। এ সমস্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কতগুলো জটিল নিয়মের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে চারটি মৌলিক শক্তি সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এ শক্তিগুলো হচ্ছে, মহাকর্ষ শক্তি (Gravitational force), বিদ্যুৎচুম্বকীয় শক্তি (Electromegnatic force), সবল নিউক্লিয় শক্তি (Strong nuclear force) এবং দুর্বল নিউক্লিয় শক্তি (Weak nuclear force)। মহাকর্ষ শক্তি সকল বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ শক্তি নিকটতম দূরত্ব থেকে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত ক্রিয়াশীল। বিদ্যুৎচুম্বকীয় শক্তির ব্যাপ্তিও অসীম। কিন্তু এ শক্তি ঐসব বস্তুর উপর ক্রিয়া করে যার ইলেট্রিক চার্জ আছে। এ শক্তি নিউক্লিয়ার শক্তি অপেক্ষা ১৩৭ গুণ দুর্বল। একটি কিংবা দুইটি ফোটনের (Photon) বদলের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎচুম্বকীয় শক্তির দু'টি কণিকা পারস্পরিকভাবে ইন্টারেকশান করে থাকে। ফোটন এমন একটি কণিকা যার কোনো দেহবস্তু নেই এবং চার্জও নেই। আর এটা সবল কিংবা দুর্বল মিথস্ক্রিয়ায় (Interaction) অংশগ্রহণ করে না। শক্তিশালী স্বল্পব্যাপ্তির নিউক্লিয়ার শক্তির মাধ্যমে নিউট্রন এবং ফোটন পারস্পরিকভাবে মিথস্ক্রিয়া করে বলে জানা গেছে। দুর্বল নিউক্লিয় শক্তির স্বল্পব্যাপ্তির পরিমাণ হলো প্রায় 10^{-14} সেমি. এবং এ শক্তি কোনো কিছুকেই বেঁধে রাখতে পারে না। তবে জোরালোভাবে মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী কণিকার অবক্ষয় এ শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং কিছু নির্দিষ্ট রেডিও একটিভ নিউক্লিয় অবক্ষয়ের দায়িত্ব বহন করে। যে কণিকাগুলো সবল শক্তি অনুভব করে তাদের বলা হয় হেডরন (Hadron)। এগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– বেরিয়ন ও মেসন। বেরিয়নে অন্তর্ভুক্ত থাকে প্রোটন নিউট্রন এবং তাদের বিরোধী কণিকাসমূহ। মেসনের অন্তর্ভুক্ত থাকে পাইঅন এবং কেঅন (Pion and kaon)। জানা মতে, একশরও বেশি হেডরণ রয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই আকারে বিশাল এবং অস্থিতিশীল।

যে কণিকাগুলো, সবল মিথস্ক্রিয়া অনুভব করে না কেবল দুর্বল ক্রিয়ার প্রতি উত্তর দিতে পারে তাদের লেপটন (Lepton) বলা হয়। তিন ধরনের আহিত লেপটন আছে– ইলেকট্রন, নিউরন এবং টাও (Taw)। এ তিনটি আহিত লেপটনের প্রতিটির সাথে চার্জবিহীন লেপটন নিউট্রিনো সংশ্লিষ্ট আছে। সব মিলে লেপটন পরিবারে ছয়টি সদস্য– ইলেকট্রন, ইলেকট্রন সংশ্লিষ্ট নিউট্রিনো, মিউঅন, মিউঅন সংশ্লিষ্ট নিউট্রিনো টাও ও তৎসংশ্লিষ্ট নিউট্রিনো।

বস্তুর শেষ গঠন উপাদানের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ১৯৬৩ সনে ক্যালিফোর্নিয়ার টেকনোলজী ইনিস্টিটিউটের Murry Gellmran এবং G. Zweig হেডরনের

বিপুল বিস্তারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নির্ভরশীলভাবে কোয়ার্কের (Quark) ধারণা উপস্থাপন করেন। এখন চিন্তা করা হয় যে, পদার্থের চূড়ান্ত গঠন উপাদান হচ্ছে কোয়ার্ক ও এ্যান্টি কোয়ার্ক। কোয়ার্ক বিন্দুবৎ দেহধারী এবং এদের কোনো আন্তঃগঠন কাঠামো নেই। এরা আবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং এদের কখনো দেখা যায় না। কোয়ার্ক এ যাবৎ ইঙ্গিত করেছে যে, বাস্তবিকপক্ষে সেই হচ্ছে অবিভাজ্য মৌলিক কণিকা। কিন্তু অধুনা পদার্থ বিজ্ঞানীরা কোয়ার্কের অস্তিত্ব নিয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করেন যে, কোয়ার্কের অধীনস্থ আরো গঠন একক আছে। কোয়ার্ক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। অন্তত ছয়টি ফ্লেভার কোয়ার্ক আছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। (ফ্লেভার হল কোয়ার্কের একটি গঠন উপাদান) এদের নাম up quark, down quark, stange quark, charmed quark, bottom quark এবং top quark।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, অণু কণার জগৎ বিশাল এবং সুশৃঙ্খল কার্যপ্রণালী দ্বারা সমৃদ্ধ। এ কার্যপ্রণালী বেধে দিয়েছেন প্রজ্ঞাময় আল্লাহ পাক।

আল্লাহ পাকের অপূর্ব সৃষ্টি প্রাণী ও উদ্ভিদসহ জীবজগৎ যা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা। এ নিয়ম বেধে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। প্রাণী ও উদ্ভিদ অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং সুসংবদ্ধ। তাদের আকার ও গঠনে কোন প্রকার অসংগতি পরিলক্ষিত হয় না। প্রত্যেক জীবন্ত জীবকোষে দুইটি প্রধান অংশ থাকে। এগুলো হচ্ছে সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস। সাইটোপ্লাজম জেলির মতো বস্তু যা বিপাক (Metabolism) ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোষের মধ্যে যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে সেসব রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্গে বিপাক সম্পৃক্ত থাকে। নিউক্লিয়াস কোষের গঠন কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে ক্রোমোজোম এবং DNA।

প্রত্যেক জীবকোষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে জীবনী শক্তি লাভ করে। এ পদ্ধতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূর্য থেকে গৃহীত শক্তির উপর নির্ভরশীল। সবুজ গাছপালার ক্লোরোফিল অণু এ শক্তি ধারণ করে সামান্য পরিমাণ গতিশীল শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বিপাকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এগুলো থার্মোডাইনামিকস্ (Thermodynamics) নিয়ম অনুসারে কাজ করে। থার্মোডাইনামিকস এর প্রথম নিয়মে বলা হয়েছে, শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন হয় মাত্র। একে সৃষ্টি করা যায় না আবার ধ্বংসও করা যায় না। যখন আলোক শক্তি গাছপালার পাতায় সঞ্চারিত হয় তখন গাছপালায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তির পরিবর্তন ঘটে। শোষিত আলোর কিছু অংশ ক্লোরোফিল অণুর ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করে এবং

কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে শর্করায় রূপান্তরিত হয়। শর্করায় প্রচুর শক্তি বিদ্যমান। প্রাণী এবং অসবুজ গাছপালা শক্তি সংগ্রহ করে জৈব পদার্থকে কাজে লাগিয়ে কিংবা অন্য গাছপালা বা প্রাণীর উপর নির্ভর করে। এসব গাছপালা বা প্রাণী জীবিত হতে পারে কিংবা মৃতও হতে পারে।

এ আয়াতের মাধ্যমে শুধুমাত্র মহাবিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি তার নকশা ও শৃঙ্খলার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি সেই সঙ্গে চিন্তা করতে বলা হয়েছে ক্রোমোজোমের মাধ্যমে বংশগতির প্রধান নিয়ন্ত্রক জিন (Gene) সম্পর্কে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও অগাধ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জিন প্রত্যেকের বংশ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে থাকে। এ একক সত্তার সুনির্দিষ্ট পরিচয় এবং বংশগতির ধারাপ্রবাহ মহান আল্লাহ সাবলীল শৃঙ্খলার মাধ্যমে বজায় রেখেছেন। বংশগতির ধারাবাহিক জীবনের নীল নকশা যা প্রধান অণু DNA কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। জীবনের ব্লু-প্রিন্ট DNA মলিকূলে ধরা থাকে যা অপত্য বংশ ধরে পরিবৃত্তি বা প্রকরণের উদ্ভব ঘটায়। তাই সকল প্রশংসা DNA অণুর রূপকার প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিবরণ
Big Crunch Theoury

সূরা আল-আ'রাফ-৭ : ১৮৭

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لاَيُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لاَتَاْتِيْكُمْ اِلاَّ بَغْتَةً.

They ask you about the Hour (Day of Resurrection); 'When will be its appointed time?' Say : 'The Knowledge there of is with my Lord. None can reveal its time but He. Heavy is its burden through the Heaven and the earth. It Shall not come upon you except all of a sudden.'

(হে মুহাম্মদ সা.)! তারা আপনাকে কেয়ামত দিবস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, "কখন তা অনুষ্ঠিত হবে?" আপনি বলে দিন, "এ বিষয়ে জ্ঞান কেবল আমার প্রভুর কাছে রয়েছে। সেই সময় সম্পর্কে তিনি ব্যতীত আর কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যে এটি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠবে। এটা হঠাৎ করে তোমাদের উপর এসে পড়বে।" (সূরা আল-আ'রাফ : ১৮৭)

মক্কায় অবিশ্বাসী লোকেরা মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কখন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। এর উত্তরে বলা হলো, এ বিষয়ে কেবল আল্লাহ্ পাকই জ্ঞান রাখেন। আর কেউ না।

মহাবিশ্ব ঠিক কখন ধ্বংস হয়ে যাবে এ আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়নি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশ্লেষণ থেকে মহাবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রথমে বলা যায় যদি সম্প্রসারণ গতি (Force of expansion) ক্রমান্বয়ে থেমে যায় তাহলে মহাকর্ষ শক্তির (Gravitation) টানে গ্রহ, নক্ষত্রগুলো পরস্পরের কাছাকাছি এসে যাবে। তখন প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হবে। এখন প্রশ্ন হলো সম্প্রসারণ গতি থামবে কিনা। এ বিষয়ে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা হলো মহাকর্ষ শক্তি সম্প্রসারণ বন্ধ করতে পারবে কিনা তা নির্ভর করছে মহাজাগতিক বস্তুর গড় ঘনত্বের উপর। আবার গড় ঘনত্ব সংকট ঘনত্ব থেকে বেশি হলে মহাকর্ষ বল যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী হবে। ফলে মহাবিশ্বের প্রসারণ থেমে গিয়ে

মহাসংকোচনের দিকে ধাবিত হবে। এ অবস্থাকে বলা হয়েছে Closed Big Bang। বিজ্ঞানী Freeman Dyson এটাকে Big Crunch বলেছেন। অর্থাৎ পুনরায় মহাজগৎ একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটাবে। সম্প্রতি মহাকাশে নতুন নতুন নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সি জন্ম নিচ্ছে। যার কারণে মহাজাগতিক গড় ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার বিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর ভেতর ১০ কোটি নিউট্রিনো আছে। তাদের বিশালাকার গঠন উপাদান এবং ওজন মহাবিশ্বকে Closed করার দিকে নিয়ে যাবে। তাছাড়া বিপুল পরিমাণ মহাজাগতিক ধূলি (Cosmic Dust) মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব বৃদ্ধি করে চলছে।

বিজ্ঞানী Freeman আরো দেখিয়েছেন Big Crunch এর প্রায় ১ বিলিয়ন বছর পূর্বে গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যকার শূন্য জায়গা সংকুচিত হতে শুরু করবে। বিগ ক্রাঞ্চের ১০০ বিলিয়ন বছর পূর্বে একক গ্যালাক্সির মধ্যকার জায়গাও সংকুচিত হয়ে যাবে। এভাবে গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হবে এবং তারা একটি অতি উষ্ণ ও অতি ঘন বস্তুপিণ্ড তৈরী করবে। যা একটি বিকট শব্দে বিস্ফারিত হবে।

সুতরাং মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি সঠিক সময়ে সংঘটিত হবে এবং এ সময় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভালো জ্ঞান রাখেন।

হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ)-এর দাম্পত্য জীবন

সূরা আল-আ'রাফ-৭ : ১৮৯

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ.

It is He Who created you from a single person (Adam) and He has created from him his wife (Hawa), in order that he might enjoy the pleasure of living with her. When he had sexual relation with her, she became pregnant and she Carried it about lightly. Then when it became heavy they both invoked Allah, their Lord, "If you give us a good child we shall indeed be among the grateful."

তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (আদম আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তার স্ত্রীকে (হাওয়া) তার থেকে সৃষ্টি করেছেন যে সে তার স্ত্রীর সান্নিধ্যে অতিরিক্ত আনন্দ উপভোগ করতে পারে। যখন সে স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হলো তখন স্ত্রী গর্ভধারণ করলো এবং হালকা ভার বহন করতে লাগল। তারপর গর্ভ ভারাক্রান্ত হলো। তারা উভয়ে তাদের প্রভুর নিকট নিবেদন করলো, "আপনি যদি আমাদের সু-সন্তান দান করেন তাহলে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব।" (সূরা আল-আ'রাফ : ১৮৯)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক আদি পিতা হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ)-এর দাম্পত্য জীবনের সুন্দর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে নারী পুরুষের প্রথম দম্পতি থেকে মানব জাতির উত্থান ঘটেছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানের কাছে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। তবে আদম (আ) এবং মা হাওয়া একই নাফস্ থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। তবে কিভাবে তাঁরা সৃষ্টি হয়েছেন সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার মতো বিজ্ঞানের কাছে কোনো তথ্য নেই। অতএব এ ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না। এখানে ঘটনা হলো এই যে, হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ) একই উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। তাই তাদের জৈবিক

সম্পর্কে কোনো প্রকার অসামঞ্জস্য দেখা যায়নি এবং তাঁদের দ্বারা বংশ বিস্তার খুব সহজভাবে সমাধা হয়েছে।

আয়াতে হালকা ভারের অর্থ হচ্ছে গর্ভধারণের প্রথম পর্যায়। এ পর্যায়ে মা গর্ভধারণের কারণে বাড়তি ভার অনুভব করে না। এ অবস্থা চলতে থাকে প্রায় ৩/৪ মাস ধরে। ২১ সপ্তাহ পরে মা বেশ ভার অনুভব করে থাকেন। এ সময়ে বাচ্চা গর্ভের ভেতরে নড়াচড়া করে। এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন।

আদম (আ) এবং হাওয়া (আ) উভয়ে আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থনা করেছেন সু-সন্তান দানের জন্য। পিতা মাতার বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী ধরা থাকে জিন (Gene) এবং DNA অণুতে যা সন্তান-সন্ততির মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। এ কারণে জিনকে বংশগতির ধারক ও বাহক বলা হয়। তাই সন্তানের আচার-আচরণে পূর্বপুরুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। নবীজির (সা) এক হাদীসে আছে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে অনেক সময় সন্তান-সন্ততির খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তন হয়ে যায়। এটা কেবল আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। এখানে কারো ক্ষমতা নেই যে, জিন এবং DNA পরিবর্তন করতে পারে।

সুতরাং প্রত্যেক দম্পতির উচিত সৎ-কর্মশীল সু-সন্তান দানের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থনা করা।

পাপিষ্ঠ জাতির উপর পাথর বর্ষণ

সূরা আল-আনফাল-৮ : ৩২

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاۤءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.

And (remember) when they said : 'O Allah! If this (The Qur'an) is indeed the truth from you, then rain down stones on us from the Sky or bring on us a painful torment.'

আর (স্মরণ করুন) যখন তারা বলল, 'হে আল্লাহ! এ (কোরআন) যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা আমাদের জন্য অবতীর্ণ করো পীড়াদায়ক যন্ত্রণা।' (সূরা আল-আনফাল : ৩২)

আকাশ থেকে কিভাবে পাথর বৃষ্টি বর্ষিত হতে পারে তা বিভিন্ন ঘটনা থেকে উল্লেখ করা যায়। বিস্ফোরনমুখ আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নি উৎপাত ঘটলে পাথর বর্ষণের ঘটনা ঘটে। আগ্নেয়গিরির মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটলে বহু ধরনের বস্তুর সঙ্গে পাথর ও গ্যাস উৎক্ষিপ্ত হয়ে চারপাশে বর্ষিত হয়ে থাকে।

বিশেষ ধরনের তীব্র ঔদ্ধত অগ্নি উৎপাত সংঘটিত হয়েছিল ১৮৮৩ সনে সানডা প্রণালীস্থ ক্রাকাটুয়াতে। এ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বহু সংখ্যক পাথর ধূলা হয়ে ১৫ মাইল উর্ধ্বে উঠেছিল। পশ্চিমা ভারতীয় দীপপুঞ্জের মার্টিনকো দ্বীপে ১৯০২ সনে অনুরূপ অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল। এ দ্বিতীয় অগ্ন্যুৎপাতটিতে লাভা ছিলো না। তবে এটা গঠিত হয়েছিল গ্যাস ও ধূলিকণার উজ্জ্বল আস্তরণের দ্বারা। এ গ্যাস ও ধূলিকণার আস্তরণ সেন্টপেয়ার শহরটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এ শহরের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২৮০০০ লোক মৃত্যুবরণ করেছিল।

যতদূর জানা যায়, দর্শনীয় উল্কাপিণ্ডের বেশির ভাগ মহাশূন্য থেকে সৌরজগতের কাছাকাছি এসে পৌছে। কিন্তু এসব উল্কাপিণ্ডের অর্ধেক প্রতি সেকেণ্ডে ৪২ কি.মি. গতিবেগে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশ করে। অর্ধসংখ্যক উল্কাপিণ্ড মিহি ধূলার আকারে পৃথিবীর উপরিভাগে ঝরে পড়ে। কিন্তু প্রতি সেকেণ্ডে বহু মাইল চলার

গতিসম্পন্ন বেশ কয়েকশত টন ওজনের উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর উপরিভাগে পতিত হয়ে বায়ু-তরঙ্গের দরুন ইতঃস্তত ছড়িয়ে পড়ে। এসব ঘটনার সন্ধান মিলেছে আরিজোনায় পতিত সুবৃহৎ উল্কার মধ্যে এবং অতি সম্প্রতি সাইবেরিয়ায় যে উল্কাপাত হয়েছিল তার মধ্যে।

১৯২০ সনে দক্ষিণ আফ্রিকায় হুবা (Hoba) নামক ৬০ টন ওজনের একটি উল্কা পতিত হয়েছিল। এটি ছিল সর্ববৃহৎ উল্কাপিণ্ড।

১৯৪৭ সনে পূর্ব সাইবেরিয়ায় সিখোলা আলীন নামক একটি ২৩ টন ওজনের উল্কাপিণ্ড পড়েছিল। নরটন (Norton) অঞ্চলের উল্কাপিণ্ডগুলোর ওজন হয়ে থাকে ১০০ টন। এর মধ্যে ১ টন উল্কাপিণ্ডও থাকে। এ ধরনের একটি উল্কাপিণ্ড ১৯৪৮ সনে আমেরিকার ক্যানসানে পতিত হয়েছিল। এটা দুর্ভাগ্যের কথা যে, বড় আকারের উল্কা কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের উল্কাপিণ্ডের পতনের ফলে একটি শহর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরায় উল্লেখ আছে শাস্তি হিসেবে অতীতে বহু জাতির উপর উল্কাপিণ্ড বা পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল। যেমন– এ ধরনের শাস্তি প্রদত্ত হয়েছিল হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর যারা বিভিন্ন ধরনের পাপাচারে লিপ্ত ছিলো।

বার মাসে এক বছর নির্ধারিত

সূরা আত-তাওবা-৯ : ৩৬

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الْقَيِّمُ.

Verily, the number of months with Allah is twelve months (in a year)_ So was it ordained by Allah on the Day when He created the Heavens and the earth.

নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ পাকের নিকট মাসের সংখ্যা বার মাস (এক বছরে), সুতরাং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ্ পাক এটা স্থির করে দিয়েছেন। (সূরা আত-তাওবা : ৩৬)

এ আয়াতাংশে দু'টি বিষয় আছে। প্রথম অংশে বলা হয়েছে আল্লাহ্ পাকের দৃষ্টিতে মাসের সংখ্যা–১২টি এবং দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ্ পাক সময়ের এককসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

প্রকৃতিগতভাবে সময়ের তিনটি একক রয়েছে। এগুলো হলো দিন, মাস ও বছর। প্রথম একক "দিন" একটি সময়কাল। যে সময়কালের মধ্যে পৃথিবী তার নিজ কক্ষপথে একবার সম্পূর্ণরূপে আবর্তিত হয়। এ সময়কালকে বলা হয় সৌরদিন (Solar day)। আবার এ সময়কে একতরফাভাবে ২৪টি অংশে ভাগ করা হয়েছে প্রত্যেক অংশকে বলা হয় সৌরঘণ্টা (Solar hour)। একে পুনরায় মিনিট ও সেকেণ্ডে ভাগ করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর আবর্তন সম্ভব হয় একটি নির্দিষ্ট স্থির নক্ষত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে। এ দিনকে বলা হয় নক্ষত্র দিন (Sidereal day)। অর্থাৎ যে সময়ে পৃথিবী তার অক্ষে একবার আবর্তিত হয়। এ দুই ধরনের দিনের দৈর্ঘ্য এক নয়। নাক্ষত্র দিনের দৈর্ঘ্য ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। অর্থাৎ সৌরদিনের পরিমাণ থেকে ৪ মিনিট কম। সাধারণভাবে সৌরদিনকে বলা হয় "দিন"।

সময়ের দ্বিতীয় একক হলো "মাস"। অর্থাৎ এ সময় চন্দ্র পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে একবার প্রদক্ষিণ করে। এ প্রদক্ষিণ সম্ভব হয় সূর্যের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে। এ

মাসকে বলা হয় সাইনোডিক লুনার মাস (Synodic lunar month)। আবার চন্দ্র একটি নির্দিষ্ট ধ্রুব তারকাকে প্রদক্ষিণ করে যে সময়ে তাকে বলা হয় নাক্ষত্র লুনার মাস। এ ক্ষেত্রেও দুইটি মাসের দৈর্ঘ্য সমান হয় না। একটি সাইনোডিক লুনার মাস গঠিত হয় ২৯.৫৩০৫৯ দিনে এবং একটি নাক্ষত্র লুনার মাস গঠিত হয় ২৭.৩২১৬৬ দিনে।

সময়কালের তৃতীয় একক হলো বছর (Year)। এ সময়ের মধ্যে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। এ প্রদক্ষিণ কর্ম সমাধা হয় মহাবিষুব (Vernal equinox) এর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে। এ সময়কে বলা হয় ক্রান্তীয় বছর (Tropical year)। আবার পৃথিবীর প্রদক্ষিণ কর্ম সাধিত হয় নির্দিষ্ট স্থির তারার সঙ্গেও সম্পর্ক রেখে। তখন এ সময়কে বলা হয় নাক্ষত্র বছর (Sidecal year)। এ দুই ধরনের বছরের সময়কালের দৈর্ঘ্য একই পরিমাপের নয়। ক্রান্তীয় বছরে দিনের সংখ্যা ৩৬৫.২৪২১৯ এবং নাক্ষত্র বছরে দিনের সংখ্যা ৩৬৫.২৫৬৩৩৬। এ দুই বছরের সময়কালের পার্থক্য অবশ্য খুবই কম।

সুতরাং সময়ের তিন এককের পরিণতি হলো বছর। তাই ৩০ দিনে এক মাস এবং ১২ মাসে এক বছর ধরা হয়। অর্থাৎ তারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে যা বলা হয়েছে অর্থাৎ সৃষ্টির শুরু থেকে সময়ের যাত্রা শুরু হয়েছে। Big bang তত্ত্ব অনুযায়ী বর্তমান মহাবিশ্বের পদার্থ, শক্তি ও স্থান-কাল একটি বস্তুপিণ্ডে কেন্দ্রিভূত ছিলো। মহাবিস্ফোরণের পর মহাবিশ্বের তাবৎ বস্তু সৃষ্টি ও সময়ের সূচনা হয়। সময় স্বতাড়িত বৈশিষ্ট্যে অব্যাহত গতিতে বয়ে চলছে এবং চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী নির্ধারিত নিয়মে আবর্তিত হচ্ছে। আর মাস ও বছর সৃষ্টি করছে।

সূর্যের আলো চন্দ্রে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আসে

সূরা আল ইউনুস-১০ : ৫

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ.

It is He who made the Sun a shining thing and the moon as a light and measured out for it stages that you might know the number of years and the reckoning.

তিনি সেই সত্তা যিনি সূর্যকে উজ্জ্বল বস্তু বানিয়েছেন এবং চন্দ্রকে করেছেন আলোকিত এবং তার মঞ্জিলসমূহ পরিমাপ করে দিয়েছেন যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা এবং সময় গণনা করতে পারো। (সূরা আল ইউনুস : ৫)

এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে সূর্য এবং চন্দ্র দুইটি ভিন্ন পদ্ধতিতে আলো দান করে থাকে। বিজ্ঞানীরা পর্যালোচনা করে দেখেছে যে এ তথ্য খুবই সত্য। সূর্য আলো দেয়, ঐ শক্তি দ্বারা যে শক্তি আহরিত হয় সূর্যের কেন্দ্রে সংঘটিত নিউক্লিয়ার সংযোজন বিক্রিয়ায়। কিন্তু চন্দ্র আলো দান করে চন্দ্র পৃষ্ঠে, প্রতিফলিত সূর্যের আলো থেকে। অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য থেকে আলো লাভ করলে পৃথিবীতে তা প্রতিফলিত হয়।

আয়াতের দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে যে আল্লাহ পাক মনজিল বা চাঁদের স্টেশন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাতে আমরা বছর গণনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং দেখতে হবে মনজিল কী? চন্দ্র পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে এবং নির্দিষ্ট স্থির তারকাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ২৭.৩ দিনে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। আবর্তনকালে এটা করা হয় যে, চন্দ্র যেন প্রত্যেক দিন একগুচ্ছ স্থির তারকাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে যে তারকাগুলো তার কক্ষপথে সাজানো রয়েছে। অতএব ২৭.৩ দিনকে ভাগ করলে চাঁদের কক্ষপথে ভাগের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭-এ। প্রত্যেক অংশে স্থির তারকাগুচ্ছ চাঁদের কক্ষপথের যে জায়গায় অবস্থান করে তাকে বলা হয় মঞ্জিল বা চাঁদের স্টেশন। তারকারা মঞ্জিল গঠন করলে তারা একটি অঙ্গ নকশা বা নামকরণ লাভ করে। তাই বলা হয় চাঁদের ২৭টি নকশাসহ ২৭টি মঞ্জিল আছে। এক বাঁকা চাঁদ থেকে আর এক বাঁকা চাঁদের সময় দৈর্ঘ্যের মধ্যে আমরা চাঁদের যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখি চাঁদ সেই অবস্থাগুলোর মাধ্যমে ২৭টি মঞ্জিল অতিক্রম করে। এভাবে মঞ্জিল অতিক্রমের ঘটনা খুবই যান্ত্রিক ধরনের। কারণ এর দ্বারা সময়ের হিসাব এবং বছর নির্ধারণ সম্ভবপর হয়।

আকাশ থেকে বারি বর্ষণ ভূমিতে ফসল উৎপাদন

সূরা আল ইউনুস-১০ : ২৪

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ
نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتّٰى إِذَآ أَخَذَتِ الْأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ أَتٰهَآ أَمْرُنَا
لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذٰلِكَ
نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

Verily, the likeness of worldly life is as the water (rain) which We send down from the sky; so by it arises the intermingled produce of the earth of which men and cattle eat, until when the earth is clad in its ornaments and is beautified and its people think that they have all the powers of disposal over it. Our command reaches it by night or by day and We make it like a clean-mown harvest as if it had not flourished yesterday! Thus do we explain the signs in detail for the people who reflect.

নিশ্চয়ই, পার্থিব জীবনের উদাহরণ এরূপ, যেমন আকাশ থেকে আমরা বারি বর্ষণ করি যা মিশ্রিত হলে ভূমিতে ফসল উৎপন্ন হয়। মানুষ এবং পশুরা তা খেয়ে থাকে। যখনই ভূমি ফসলের সৌন্দর্য-সুষমায় সুশোভিত হয়ে উঠে এবং এরপর লোকেরা ভাবতে থাকে। ঐসব ফসল তাদের ক্ষমতার এখতিয়ারভুক্ত। যদি আমাদের আদেশ রাত্রে কিংবা দিনে সেখানে গিয়ে পৌঁছে এবং আমরা তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিই যেনো মনে হবেনা গতকাল এখানে কোনো আবাদ ছিলো। এভাবে নিদর্শনসমূহ আমরা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি ঐসব লোকের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে। (সূরা আল ইউনুস : ২৪)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের অশেষ করুণার কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

করুণার বাণী বহনকারী বারিধারা পৃথিবীর বুকে নেমে আসে বৃষ্টিপাতরূপে। বৃষ্টির পানি মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং মাটিকে সিক্ত করে তোলে। এর ফলে মাটি উর্বর হয়ে ওঠে। অসংখ্য ধরনের গাছপালা, শাক-সবজী, শস্যকণা ও ফলমূল উৎপাদিত

হয়। এসব খাদ্যবস্তু মানুষ ও পশু-পাখি খেয়ে জীবন ধারণ করে। এছাড়া সবুজ গাছপালা এবং বিচিত্র বর্ণের ফুল, ফল ও রঙিন পাতার কারণে বসুন্ধরা সুন্দর সুষমায় সুশোভিত হয়ে ওঠে। কৃষকরা ভাবে এ সবের উৎপাদন তাদের মেধা ও প্রচেষ্টার অবদান। তারা গর্বিত হয়ে ওঠে এবং তারা নিজেদের মনে করে যে, তারাই এ দৃশ্যের সক্ষম অধিনায়ক। কী ভুল তাদের ধারণা। ভুলের মধ্যে তারা নিমজ্জিত হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক মেঘ থেকে বৃষ্টি প্রেরণ করেছেন এবং তার দ্বারা বীজ অঙ্কুরিত হওয়া, তাদের বৃদ্ধি এবং ফুল, ফল ধারণ সম্ভব হয়েছে। তাই আল্লাহ পাকই এসবের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব রাখেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে নিমিষে এসব ধ্বংস করে দিতে পারেন। তীব্র তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, পঙ্গপালের আক্রমণ, ভূমিকম্প, বৃক্ষের ক্ষয়রোগ বা অন্য কোনো রোগ হঠাৎ তাদের আক্রমণ করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও ফলের বাগানগুলো সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে দিতে পারে। আল্লাহ পাক যদি এ ধরনের ধ্বংসের আদেশ প্রদান করেন তবে কে আছে তা রুখতে পারে!

এভাবে আমরা পার্থিব জীবনে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরম হিতৈষী আল্লাহ পাকের করুণায় সিক্ত হয়ে আছি। আমরা বাহ্যত সময় ও শ্রম দিয়ে আমাদের বিভিন্ন প্রকারে নিজেদের ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলি। আমরা কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে সবকিছু আবিষ্কার করি। আমরা শক্ত মজবুত ঘরবাড়ি তৈরি করি। সুপরিকল্পিত শহর গড়ি, নদীকে বশে আনি, মহাশূন্য জয় করি, শিল্পকলা রচনা করি, কবিতা লিখি ও সাহিত্য-সঙ্গীত সৃষ্টি করি। এসব কিছুর সুন্দর বহিঃপ্রকাশ সকলকে আনন্দ দান করে। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার কারণে আমরা এসবের জন্য গর্ববোধ করি এবং ভাবি যে, আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আমরা যা অর্জন করেছি সে সবের মালিক আমরাই। এসব বস্তুর উৎপত্তির জন্য যিনি নিয়ম-রীতি বেধে দিয়েছেন। আমাদের জীবন ধারণের জন্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করেছেন। বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তি দান করেছেন এবং শ্রবণ, দর্শন অনুভবের জন্য অমূল্য সম্পদ দান করেছেন। যা না থাকলে আমাদের জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারতো না। সেই মহামহিম আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে অবনত হওয়া কী আমাদের উচিত নয়? আল্লাহ তা'আলার শুভেচ্ছা ও করুণা আমাদের উপর থেকে তুলে নিলে আমাদের সাফল্য ধূলায় গুঁড়িয়ে যাবে এবং আমরা এতোটুকু সময়ের জন্য পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারবো না।

অতএব বিজ্ঞানের বলে আমরা যতোই বলিয়ান হই না কেন সবকিছুর পক্ষে চূড়ান্ত শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই নিহিত। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমরা দৈনিক পাঁচবার সিজদায় অবনত হই।

খাদ্যের যোগান আসে আকাশ ও জমিন থেকে শ্রবণশক্তি ও দর্শন শক্তির অপূর্ব কলাকৌশল

সূরা আল ইউনুস-১০ : ৩১

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ.

Say : (O Mohammad-Sm.) Who Provides for you from the sky and the earth? Or who owns hearing and sight?

বলো, (হে মুহাম্মদ সা.) কে তোমাদের আকাশ ও জমিন থেকে খাদ্য যোগান দিয়ে থাকে? কে শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তির মালিক? (সূরা আল ইউনুস : ৩১)

এ আয়াতাংশে দুইটি আলোচনার বিষয় আছে। (১) আল্লাহ্ পাক আকাশ ও জমিন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করে থাকেন। (২) আমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণে।

১. আল্লাহ্ পাক আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন ভূমিতে। শুষ্ক ভূমি বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়ে বেশ উর্বর হয়ে ওঠে। তখন একদিকে দীর্ঘ ঘুমে ঘুমন্ত বীজগুলো অঙ্কুরিত হয় এবং অন্যদিকে বৃক্ষরাজি ক্ষেতের ফসল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ফুলে ফলে ভরে ওঠে। বৃক্ষের ফল ক্ষেতের ফসল আমাদের খাদ্যের প্রদান উৎস। জমিতে উৎপাদিত প্রথম খাদ্য সামগ্রী হলো ঘাস জাতীয় খাদ্য। এ খাদ্যশস্যের উপরই মানব জাতি সবসময় নির্ভর করে এসেছে। এগুলো হলো– গম, যব, ধান, ভুট্টা ও ডাল। ফল জাতীয় খাদ্যের মধ্যে আমরা পাই আম, আপেল, নাশপাতি, কলা, কমলা, কাঁঠাল ইত্যাদি। জমিতে আরো উৎপাদিত হয় শাকসবজি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, সরিষা, বেগুন, মুলা এবং আরও বহুবিধ তরিতরকারী। এসব খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, প্রোটিন ও আরো অন্যান্য উপাদান বিদ্যমান।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি বজ্রপাতের আশঙ্কায়। কিন্তু বিদ্যুৎ স্পার্কিং হলে বাতাসে নাইট্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইড সৃষ্টি হয়। যা বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে নেমে আসে। নাইট্রেড আকারে সবুজ গাছপালা মাটি থেকে নাইট্রেড শুষে নিয়ে প্রোটিনও অন্যান্য বস্তু তৈরী করে। তাই বিদ্যুৎ স্পার্কিং-

এর দরুন ফলন বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু সবুজ বৃক্ষ ও ফসল সূর্যালোক থেকে শক্তি গ্রহণ করে পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শর্করা তৈরী করে। এ প্রক্রিয়ার নাম ফটোসিনথেসিস। বৃক্ষরাজি ও ফসল মূল রূমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি শোষণ করে তা পাতা ও অন্যান্য অঙ্গে পৌছে দেয়। উদ্ভিদের সবুজ পাতায় থাকে ক্লোরোফিল অণু। ক্লোরোফিল সূর্যের আলো থেকে ফোটন নামক আলোর কণা ধারণ করে উত্তেজিত হয়। এরপর একটি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শর্করা প্রস্তুত হয়।

সুতরাং উপরের উদাহরণগুলো আকাশ ও জমিন থেকে পরম হিতৈষী আল্লাহর দেওয়া খাদ্যবস্তুর সামান্য কিছু উপমামাত্র।

২. আমাদের শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তির অপূর্ব কলা-কৌশল সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদান করা হলো।

ক. কান (Ear) : কান শোনার কাজ করে এবং ভারসাম্য অনুভূতি গ্রহণ করে থাকে। কানের গঠন প্রণালী তিনটি অংশে বিভক্ত। অন্তঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ এবং বহিঃকর্ণ। অন্তঃকর্ণের মূল অনুভূতি গ্রাহক অঙ্গের নাম রোমকোষ (Hair cells) এসব রোমকোষ শুনতে সাহায্য করে এবং ভারসাম্য অনুভূতি গ্রহণ করে। শ্রবণানুভূতি গ্রাহক অঙ্গের উপরি কাঠামো এমনভাবে সৃষ্ট যেন পরিবেশ থেকে শব্দ কম্পন রোমকোষ পরিবাহিত হতে পারে। পক্ষান্তরে ভারসাম্যের অনুভূতি গ্রাহক অঙ্গের উপরি কাঠামো শব্দ কম্পনের পরিবর্তে, মাধ্যাকর্ষণের টানের প্রতি সংবেদনশীল। কানের মধ্যকর্ণ ও বহিঃকর্ণ অংশ দু'টি পুরোপুরি শোনার কাজে নিয়োজিত। বহিঃকর্ণ বাইরে থেকে শব্দগ্রহণ করে। মধ্যকর্ণ ছোট ছোট তিনটি অস্থির সাহায্যে শব্দ তরঙ্গ অন্তঃকর্ণে পরিবহন করে।

শ্রবণ ক্রিয়া (The act of heairng) : শ্রবণানুভূতি একটি বহুমাত্রিক ক্রিয়া। যেমন শব্দের উত্থান, অনুভূতির স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কিত মাত্রাজ্ঞান, শব্দ পার্থক্যকরণ এবং অনুধাবন করার মনোভাব নিয়ে শোনা। শোনার সঙ্গে কানের আবেগজনিত কারণে সৃষ্ট প্রাণ রাসায়নিক ও দেহতাত্ত্বিক পরিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে শব্দের মাধুর্য অনুভব করা যায়। বক্তৃতা, গান কিংবা গোলমালের আবেগের ছোঁয়া পাওয়া যায়।

শ্রবণ শনাক্তকরণ : শব্দ শনাক্তকরণের দু'টি দিক রয়েছে। নীরব এলাকায় একটি শব্দের উদ্দীপনা শনাক্ত করা এবং কোলাহলময় পরিবেশে একটি শব্দের উদ্দীপনা শনাক্ত করা যায়।

শ্রবণ সীমা : কম্পাঙ্ক এবং তীব্রতাভেদে শব্দ শোনার ক্ষমতার সীমা রয়েছে। অবস্থা এবং ব্যক্তি বিশেষে এটার পার্থক্য হতে পারে। মানুষ ১৬ হার্জ থেকে ২০,০০০ হার্জ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ সহজে শুনতে পারে। তবে ১০০০-৪০০০ হার্জ কম্পাঙ্কের শব্দ সবচেয়ে ভালো শোনা যায়। শব্দের তীব্রতার বিস্তৃতি যে এককে প্রকাশ করা হয় তা ডেসিবেল নামে পরিচিত।

উভয় কানে শোনা : দুই কানে শব্দ শুনলে শব্দের উৎস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সহজ হয়। শব্দের উৎসের অবস্থান নির্ণয় করার জন্য শব্দ শনাক্ত করা, দূরত্বের সঙ্গে শব্দের তীব্রতা কিভাবে পরিবর্তিত হয় সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টি শক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। দুই কান দিয়ে শোনা খুবই জরুরী। কারণ দুই কান দিয়ে শুনলে শব্দের কম্পাঙ্কের পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ হয়।

শ্রবণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া : কান শব্দ শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে যার ফলে শ্রবণ স্নায়ুতে (Auditory nurve) স্নায়বিক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। শব্দ কর্ণপট বা কানের পর্দায় আঘাত করার ফলে মধ্যকর্ণের ছোট ছোট তিনটি হাড় কম্পিত হয়। এটা ডিম্বাকার জানালায় কম্পন সৃষ্টি করে এবং পরবর্তিত ককলিয়ার তরল পদার্থে কম্পন সৃষ্টি করে। অন্তঃকর্ণের শ্রবণ অঙ্গ ককলিয়া (Cochlea) নামে পরিচিত। এটা তরল পদার্থে পূর্ণ তিনটি আবদ্ধ নালী দ্বারা গঠিত। তিনটি নালীর মধ্যে ছোট কেন্দ্রীয় নালীর পর্দা ব্যাসিলার মেমব্রেন (Basilar membrane) নামে পরিচিত। এ পর্দার উপরে কর্টির অঙ্গ (Organ of Corti) অবস্থিত। এর রোমকোষ শোনার আসল গ্রাহক কোষ। এসব রোমকোষের সঙ্গে অডিটারি স্নায়ুর সংযোগ রয়েছে। কর্টির অঙ্গে সকল রোমকোষ থেকে উত্থিত সেন্সরি বা বার্তাবাহক স্নায়ুতন্ত্র ককলিয়া থেকে বের হয়ে অডিটারি স্নায়ু গঠন করে। এ স্নায়ু ককলিয়ার নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে এবং এখান থেকে মধ্য মস্তিষ্ক, লঘু মস্তিষ্ক, থ্যালামাস ও টেম্পোরাল কর্টেক্সের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে স্নায়ুবিক কার্যকলাপের ফলে শব্দ-উদ্দীপনা পার্থক্য করা যায়।

চোখ (Eye) : আমাদের চোখ আলোকের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি সঞ্চার করে। অনেক সময় ক্যামেরাকে চোখের সঙ্গে তুলনা করা হয়। চোখের মূলত তিনটি অংশ আছে। অক্ষি গোলকের প্রাচীর, গহ্বর এবং লেন্স। এ তিনটি অংশের সাথে অনেকগুলো আনুষঙ্গিক অঙ্গ জড়িত। যেমন, কর্ণিয়া, স্ক্লেরা, আইরিস, কোরয়েড, রেটিনা, লেন্স, পিউপিল, সিলিয়ারী বডি, অ্যাকুয়াস হিউমার, ভিট্রিয়াস বডি, ম্যাকুলা, আলোক সংবেদী কোষ ইত্যাদি।

চোখের গঠন এবং দেখার পদ্ধতি অত্যন্ত বিস্ময়কর। চোখের আলোক সংবেদী স্তর রেটিনা নামে পরিচিত। কোরয়েডের ভেতরে এ স্তরটি পেয়ালার মতো স্থাপিত।

রেটিনার অভ্যন্তরে অর্ধতরল ভিট্রিয়াস বডি থাকে। চোখে আলো প্রবেশ করে পিউপিল দিয়ে। আলো নিয়ন্ত্রণ করে আইরিস। আবার রেটিনার আছে আলোক সংবেদী গ্রাহক কোষ। এ কোষ দুই ধরনের। কোন্ (Cone) এবং রড (Rod)। আলোক সংবেদী গ্রাহক কোষ Cone সাধারণত দিনের আলোতে দেখতে সাহায্য করে। আর Rod রাতের অন্ধকারে দেখার জন্য অভিযোজিত। Cone এবং Rod আলোর অনুভূতি দ্রুত মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে (Visueal Centre) প্রেরণ করে। যার কারণে আমরা সাথে সাথে দেখতে পাই। প্রত্যেক জিনিসের ছবি রেটিনায় গিয়ে একটা উল্টা প্রতিবিম্ব তৈরী করে। কিন্তু মস্তিষ্কে গিয়ে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সোজা হয়ে যায়। দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ চোখে এসে পড়লে Cone এবং Rod এর মধ্যে যে রাসায়নিক পদার্থ আছে তা আলো চুষে নেয়। Cone এর রাসায়নিক পদার্থ হলো আয়োডপসিন (Iodopsin) এবং Rod এর রাসায়নিক পদার্থের নাম রোডপসিন (Rodopsin)। কোনো বস্তুকে নিখুঁতভাবে দেখার সুবিধার্থে চোখের রেটিনাতে কোনো কোনো স্থানে আলোক সংবেদী কোষ এবং স্নায়ুপ্রান্ত কেন্দ্রিভূত হয়। মানুষের রেটিনার কেন্দ্রভাগে এ রকম ঈষৎ হলুদ বর্ণের স্থানটি ম্যাকুলা (Macula) নামে পরিচিত। ম্যাকুলাতে শুধু Cone থাকে।

চোখের লেন্স একটি স্বচ্ছ মাধ্যম। এর সামনে আইরিস ও পেছনে ভিট্রিয়াস বডি থাকে। লেন্সের সম্মুখস্থ কোষ হলো পাতলা। আবরণী কোষ। পেছনের কোষগুলো লম্বাটে এবং এরা লেন্সতন্তু (Lens fibre) সৃষ্টি করে। সম্পূর্ণ লেন্সটি একটি স্থিতিস্থাপক আবরণ দ্বারা মোড়ানো থাকে। লেন্স সামনে কিংবা পেছনে নড়াচড়া করে আকার পরিবর্তন করে উপযোজনে সাহায্য করে। এর ফলে দৃষ্টিকে আমরা দূর থেকে নিকটে এবং নিকট থেকে দূরে নিবদ্ধ করতে পারি। লেন্স অস্বচ্ছ কিংবা ঘোলাটে হয়ে যাওয়াকে চোখের ছানি বলা হয়।

অতএব, শোনা এবং দেখা উভয়ই অতি সূক্ষ্ম এবং জটিল কলা-কৌশলে সমৃদ্ধ। এ কলা-কৌশলের উপর আল্লাহ পাকের নিয়ম-কানুন নিবিড়ভাবে নিয়ন্ত্রিত।

স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য চোখ এবং কানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ দু'টিকে বাদ দিলে পার্থিব জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ কারণে আল্লাহ পাক শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তির উপর বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এ দুই শক্তির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বুঝিয়ে দিয়েছেন মানুষের উপর তার বিশেষ ধরনের করুণা ন্যস্ত আছে। যদি কেউ কোনো বস্তু দেখতে না পায় এবং কোনো শব্দ শুনতে না পায় তাহলে তার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর বাণী অনুধাবন করা অসম্ভব হবে।

রাত ও দিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য

সূরা আল ইউনুস-১০ : ৬৭

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ.

He it is who has appointed for you the Night that you may rest therein and the Day to make things. Visible verily in this are signs for a people who listen (Those who think deeply).

তিনি সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি নিয়োজিত করেছেন যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো এবং দিন সৃষ্টি করেছেন যাতে দিনের আলোতে সবকিছু দেখতে পাও। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে ঐসব লোকের জন্য যারা শ্রবণ করে (গভীরভাবে চিন্তা করে)। (সূরা আল-ইউনুস : ৬৭)

আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি-কৌশল প্রক্রিয়ায় দিন ও রাত্রি সৃষ্টি হয়। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হতে থাকে। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে এর উপর প্রতিটি অংশ কিছুক্ষণের জন্য সূর্যের দিকে উন্মুক্ত থাকে। যে সময়ের জন্য পৃথিবীর কোন স্থান সূর্যের দিকে উন্মুক্ত থাকে তখন সেই স্থানে দিনের আগমন ঘটে। আবার পৃথিবীর বক্রতার কারণে পৃথিবীর কোনো অংশ সূর্য থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ ঐ অবস্থাতে থাকে। যে সময়ের জন্য সূর্য থেকে ঐ স্থান অদৃশ্য থাকে সেই সময়ের জন্য ঐ স্থানে রাত্রি হয়।

এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক দিন ও রাত্রি সৃষ্টির বিশেষ উপকারিতা ব্যাখ্যা করেছেন। দিনের বেলা আলো থাকে। কারণ সূর্য এ সময় আলো বর্ষণের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল বস্তুকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলে এবং দিনের নানাবিধ কাজ-কর্ম সম্পাদনে আমাদের সহায়তা দান করে। আমরা দিনের উজ্জ্বল আলোতে সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখি এবং কর্মে ডুবে থাকি। দিনের শেষে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং বিশ্রাম কামনা করি, সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে সন্ধ্যার আগমন ঘটে। কিছুক্ষণের মধ্যে কালো চাদরে আবৃত হয়ে যায় সন্ধ্যা। পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় রাত্রির। এ সময় পরিবেশ শীতল হয়ে ওঠে। আমাদের ঘুমের সুব্যবস্থা করে দেয়। ঘুম বা নিদ্রা

দেহের এমন একটি অবস্থা যার দ্বারা শিরা উপশিরাসহ সারাদেহ পুনঃসুস্থ হয়ে উঠে। মস্তিষ্ক নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর নিদ্রার উপকারিতা মস্তিষ্ক ভোগ করে। দিনের কঠিন কর্মের দরুন ক্লান্ত-অবসন্ন শরীর নিদ্রার মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং এর ফলে ক্লান্ত দেহ পুনরায় সবল হয়ে ওঠে।

সুতরাং দিন ও রাত্রি সৃষ্টি মানুষের জন্য আল্লাহ্ পাকের বিশেষ করুণা। তাই সকলের উচিত পরম হিতৈষী আল্লাহ্ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক ফেরাউনের মৃতদেহ সংরক্ষণ করবেন

সূরা আল ইউনুস-১০ : ৯২

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ.

This day We shell deliver your dead body (out from the sea) that you may be a sign to those who come ofter you! And verily many among mankind are heedless of Our sings.

আজ আমরা তোমার (ফেরাউন) মৃত দেহ রক্ষা করবো, (সমুদ্র থেকে বের করে) যাতে তুমি তাদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকতে পারো যারা তোমার পরবর্তী সময়ে আসবে। আর নিশ্চয়ই অনেক লোক আমাদের নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। (সূরা আল ইউনুস : ৯২)

আল্লাহ্ পাকের বিশিষ্ট নবী হযরত মূসা (আ) কে আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দেন ফেরাউনের দরবারে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করার জন্য। ফেরাউন তাওহীদ গ্রহণ না করে দম্ভ, অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল। মূসা (আ) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের কথা ফেরাউনকে বুঝাতে ব্যর্থ হলেন। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মিশর ত্যাগ করার উপদেশ দিলেন। উপদেশ মোতাবেক হযরত মূসা (আ) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে যাত্রা করে "বাহ্‌রে কুলছুম"-এর সামনে উপস্থিত হলেন। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে নদের পানি দুই ভাগ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেলো। ফেরাউন তার সৈন্যদল নিয়ে মূসা (আ)-এর পশ্চাৎ ধাওয়া করে নদের সামনে এসে হাজির হলো। তখন সে দেখল যে, মূসা (আ) এবং তাঁর সঙ্গীরা নদী পথের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। ফেরাউন তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নদীতে তৈরি হওয়া পথে নামল এবং যখন সে মাঝপথে এলো ততক্ষণে মূসা (আ) এবং তাঁর সাথী-সঙ্গীরা অপর পাড়ে পৌছে গেলেন। ফেরাউন এ অলৌকিক পথের কথা ভাবতে পারেনি। তাই সে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে একই পথ অনুসরণ করে যেই মাত্র নদের মাঝখানে এলো অমনি পানির বিরাট ঢেউ এসে

তাদের নিমজ্জিত করে নিলো। ফেরাউন এবং তার সৈন্য-সামন্ত নদীর মাঝখানে এসে ডুবে মারা গেলো। আল্লাহর দেয়া শাস্তির কারণে তারা এভাবে ডুবে মারা গেলো। ডুবে মরার সময় ফেরাউন আল্লাহর উপর বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করলো। এর জবাবে আল্লাহ্ পাক বললেন, "এখন কেন! একটু আগেও তো তুমি ছিলে বিদ্রোহী এবং সীমালঙ্ঘনকারী।" এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোন্ ফেরাউন পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিল তা এখনো সঠিকভাবে নির্ণিত হয়নি। সম্প্রতি কয়েক দশকে ফেরাউনদের কিছু মমি খুঁজে পাওয়া গেছে এবং সেগুলোকে শনাক্ত করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ)-এর সময় কোন্ ফেরাউন ছিলেন তার শনাক্তকরণ নিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, ফেরাউনের মৃত দেহটি সংরক্ষিত আছে কায়রো শহরের তাজীবে অবস্থিত জাতীয় যাদুঘরের "রয়াল মমিজ" কক্ষে। মিশরীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ লরেট কর্তৃক ১৮৯৮ সনে এটি আবিষ্কৃত হয় এবং দেহটি মূসা (আ)-এর সময়ের ফেরাউন মারণেপতাহর বলে শনাক্ত করা হয়। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় ফেরাউন মরদেহটি সংরক্ষিত ছিলো "বাহরে কুলছুম"-এর পাড়ে অবস্থিত থিবিসের নেক্রোপলিস সমাধি ভূমিতে এবং তা মমি করা ছিলো।

আল্লাহ্ পাক সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব নিয়েছেন

সূরা হূদ-১১ : ৬

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.

And no moving (living) Creature is there on earth but its provision is due from Allah. And He knows its dwelling place and its deposit. All is in a clear Book.

পৃথিবীতে এমন কোনো বিচরণশীল (জীবিত) প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক নেননি। আর তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল এবং সঞ্চয়। সবকিছু রেকর্ডভুক্ত আছে স্পষ্ট কিতাবে। (সূরা হূদ : ৬)

আরবি **'দাব্বাতুন'** শব্দের অর্থ হলো– বিচরণশীল প্রাণী (Moving creature)। বিচরণশীল প্রাণী বলতে ঐসব প্রাণীকে বুঝায় যাদের জীবন আছে, জীবন চক্রের মাধ্যমে যারা বর্ধিত হয় এবং যারা চলাচল করার ক্ষমতা রাখে। সকল জীবনধারী প্রাণী এবং জীবকোষ এর আওতায় পড়ে। এ আয়াতে ব্যবহৃত আরো দুইটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো **'মুস্তাক্কার'** যার অর্থ– ভূমণ্ডলে, বায়ুমণ্ডলে এবং পানির ভেতরে প্রাণীকূলের বাসস্থল। অপর শব্দটি **'মুস্তাওদা'** যার অর্থ– পিতার ঔরসে, মায়ের গর্ভে এবং ডিমের ভেতরে জন্মকোষের অবস্থান। প্রত্যেক জীবের এবং জীবকোষের এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট অণুজীবের নিজস্ব বাসস্থান এবং খাদ্য পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে। বাসস্থানগুলোর ভূ-মণ্ডলে, বায়ুমণ্ডলে, জলস্থলে, মাতৃগর্ভে সেখানে হোক না কেন তারা অসংখ্য বিচিত্র ধরনের উৎস থেকে খাদ্য পুষ্টি সংগ্রহ করে। এ খাদ্য পুষ্টি কেবলমাত্র তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তই করে না সেই সঙ্গে তাদের বাচ্চাদেরও ক্ষুধা নিবৃত্ত করে। আর সবার জন্য সর্বত্র খাদ্যপুষ্টির ব্যবস্থা করে রেখেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক।

প্রত্যেক প্রাণী কিভাবে খাদ্যপুষ্টি সংগ্রহ করবে এবং কিভাবে তাদের আবাসস্থল নির্ণয় করবে তা সবই তাদের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত। যখন কোনো এলাকায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় এবং পরিবেশ বিরূপ হয়ে ওঠে তখন জীবকূল

নতুন এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। সেখানকার আবহাওয়া প্রতিকূল নয় এবং খাদ্যের সরবরাহও পর্যাপ্ত। পৃথিবীতে যতো পাখি আছে তাদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরিযায়ী (Migratory)। এ দুই-তৃতীয়াংশ পাখির সংখ্যা হবে কয়েক কোটি।

এরা হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে প্রতি বছর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে হাজির হয়। এরূপ অনেক জীব-জন্তু আছে যারা সময় সময় দেশত্যাগ করে খাদ্যের সন্ধানে কিংবা বাসস্থানের খোঁজে। পাখি ও প্রাণীদের মাইগ্রেশনের রহস্যের বিশদ তথ্য সাম্প্রতিক শতাব্দীতে সংগৃহীত হয়েছে।

সুতরাং সকল জীবনধারী প্রাণী ও জীবকোষ যে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন সকলের জীবনব্যাপি খাদ্যপুষ্টি অপরিহার্য। এ খাদ্যপুষ্টির ব্যবস্থা করে থাকেন মহান আল্লাহ্ পাক যিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালক এবং রক্ষক।

সমগ্র প্রাণীকূলের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্ তা'আলার হাতে

সূরা হূদ-১১ : ৫৬

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

I Put my trust is Allah, my Lord and your Lord. There is not a moving creature but he has grasp of its fore-lock. Verily it is my Lord that is on a straight Path.

আমি আমার প্রভুর উপর ভরসা করেছি যিনি আমার ও রব তোমাদেরও রব। এমন কোনো বিচরণশীল প্রাণী নেই যার নিয়ন্ত্রণের ভার তার হাতে নেই। নিশ্চয়ই আমার প্রভু সরল পথে আছেন। (সূরা হূদ : ৫৬)

এ আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ পাকের সৃষ্ট সমগ্র প্রাণীকূল এবং জীবকোষ তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। ঘোড়াকে লাগামের সাহায্যে যেভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় সেভাবে আল্লাহর নির্ধারিত আইন দ্বারা প্রাণীকূল নিয়ন্ত্রিত হয়।

স্থলভাগের বন্য পশুই হোক আর পাখিই হোক। জলচর প্রাণীই হোক বা মাটির নিচে বসবাসরত প্রাণীই হোক তাদের সকলের রাজ্যের ব্যাপক বৈচিত্রময় জীবন যাপন আল্লাহর নির্ধারিত কতিপয় আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে তাকে। এ নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে তাদের জীবন ধারণের জন্য এবং তাদের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত আইনের আওতায় পড়ে তাদের গৃহ নির্মাণের কৌশল, খাদ্য সংগ্রহের উৎস, আত্মরক্ষার পদ্ধতি, গোষ্ঠীগত জীবন যাত্রা প্রণালী এবং বংশ বৃদ্ধি করার নিয়ম-কানুন। এ চিরন্তন নিয়ম-নীতির কোনো একটি ভঙ্গ করা হলে তদ্বারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের ক্ষতি নেমে আসবে এবং আল্লাহর কল্যাণময় পরিকল্পনা দারুণভাবে বিঘ্নিত হবে। কারণ আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্ট সকল প্রাণীর উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে দয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। তাঁর বেধে দেয়া আইন ভঙ্গ হলে যে ক্ষতি এবং বিপদ নেমে আসে তা হয়তো দূর দৃষ্টির অভাবে সকলে বুঝে উঠতে পারে না। ঐ ক্ষতি এবং বিপদসমূহ নেমে আসে আল্লাহ পাকের প্রতিষ্ঠিত বিধান মোতাবেক।

অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন

সূরা হূদ-১১ : ১২৩

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

And to Allah belongs the unseen of the heavens and the earth and to Him return all affairs (for decision). So worship Him and put your trust in Him. And your Lord is not unaware of what you do.

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু অদৃশ্য তা সবই আল্লাহর কাছে সুবিদিত এবং সব বিষয় তার কাছে ফিরে যাবে (সিদ্ধান্তের জন্য)। অতএব, তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর উপর নির্ভর করো। তোমরা কি করো সে বিষয়ে তোমাদের প্রভু উদাসীন নন। (সূরা হূদ : ১২৩)

আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে জোর দিয়ে বলেছেন, বিশাল মহাবিশ্বের সকল অদৃশ্য বস্তুর খবর একমাত্র তিনিই জানেন। আরবি "গায়েব" শব্দের অর্থ হলো যা চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাকে গন্ধ নেয়া যায় না এবং হাতে স্পর্শও করা যায় না এমন অদৃশ্য বস্তু।

মানুষ সাধারণত দৃশ্যমান বস্তুর উপর তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে থাকে। যেসব বস্তুকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় সেসব বস্তুর উপর মানুষ তাদের মনোযোগ কেন্দ্রিভূত করে। কিন্তু বহু অদৃশ্য বস্তু আছে যাদের অবস্থান ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় জগতের মধ্যে বিদ্যমান যা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেও আনা সম্ভব হয় না। মানব সভ্যতার গতিধারায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জগতের বহু ঘটনাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু বহু ঘটনা এখনো অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিত্যনতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা বহুকিছু নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছি সত্যি। তাই বলে আবিষ্কারের শেষকথা এখনো আমাদের কানে আসেনি। অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এবং অবশেষে লেপটন ও কোয়ার্কস মানুষের পরীক্ষায়

ধরা পড়েছে। এগুলো হলো বস্তুর বিভিন্ন পর্যায়ের মূল গঠন-উপাদান। যখন একটি মৌলিক উপাদান প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অন্য আর একটি উপাদান অতি সূক্ষ্ম সীমায় আবির্ভূত হয়। সুতরাং উপ-আণবিক কণার গবেষণার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ কথা চিন্তা করলে ভুল হবে যে, পৃথিবীর সকল অদৃশ্য গোপন তত্ত্ব উন্মুক্ত হয়ে গেছে। বিজ্ঞান আবিষ্কারের ইতিহাস থেকে এটা দেখা গেছে যে, যখন একটা রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হয় তখন আর একটি রহস্য সামনে এসে হাজির হয়। মহাশূন্যের বিশাল দূরত্বে অবস্থিত বস্তুসমূহ এবং ঘটনাবলী সম্পর্কে একই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্য হতে পারে। এ আয়াতে এমন একটি ইঙ্গিত রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, আমরা অদৃশ্য বস্তুর জটিলতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য যতো কঠিন পরিশ্রম করি না কেন কিছু গোপন রহস্য সবসময়ই থাকবে যা মানুষের বর্তমান জ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে আসবে না। যা হোক, এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অনুসন্ধানের পথ থেকে আমরা বিরত থাকব। প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য বারবার আমরা তাগিদ অনুভব করছি। আমাদের উচিত সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করে যাওয়া, কিন্তু একই সঙ্গে যদি আমরা এ আয়াতের তাৎপর্য স্মরণ করি তাহলে বুঝতে পারি যে, আল্লাহ পাক একাই অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞানের মালিক। যা মানুষ অদম্য উৎসাহের সাথে চেষ্টা করেও হাসিল করতে পারবে না। এর ফলে আল্লাহর প্রতি আমাদের মস্তক আপনা থেকে নুয়ে পড়বে এবং তাঁর ইবাদত করা একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়বে যা আল্লাহ পাক আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন।

চেপে রাখা বেদনা সাময়িক অন্ধত্বের জন্ম দেয়

সূরা ইউসুফ-১২ : ৮৪

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ.

And he (Yakub) turned away from them and said Alas! my grief for Yusuf. And his eyes were whitened with sorrow that he was suppressing.

তিনি (হযরত ইয়াকুব আ.) তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হায়! ইউসুফের জন্য বড়ই দুঃখ– এবং দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেলো যা তিনি চেপে রেখেছিলেন। (সূরা ইউসুফ : ৮৪)

হযরত ইউসুফ (আ) কে হারানোর পর পিতা ইয়াকুব (আ) নিদারুণ শোকে মুহ্যমান ছিলেন। পুনরায় ইউসুফ (আ)-এর সৎ ভ্রাতাগণ মিশর থেকে দ্বিতীয়বারের মতো কনিষ্ঠ পুত্র বিন ইয়ামিন (ইউসুফ আ.-এর ছোট ভাই) চুরির অভিযোগে মিশরে বন্দী হয়েছে। এ সংবাদে হযরত ইয়াকুব (আ) দারুণভাবে আঘাত পেলেন এবং ইউসুফ (আ) কে হারানোর পূর্বের শোক নতুন করে জেগে উঠল তাঁর মধ্যে। তিনি পুত্রদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনি কিছুই করতে পারলেন না তখন নিরবে সকল ব্যথা-বেদনা মুখ বুঝে সহ্য করতে লাগলেন। পুত্র শোকে ব্যাকুল হয়ে মনের যন্ত্রণা হৃদয়ের গভীরে চেপে রাখলেন। শোক-বেদনা বহুদিন ধরে এভাবে চেপে রাখার ফলে তাঁর চক্ষুদ্বয়ের মণি সাদা হয়ে গিয়েছিল। এ আয়াতে সেই ঘটনারই অবতারণা করা হয়েছে। এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে যে, আবেগ ও উদ্বেগের কারণে সাময়িকভাবে শরীর অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ অকার্যকর অবস্থাকে Psychosomatic বিশৃঙ্খলা বলা হয়ে থাকে। এটা বলা হয়েছে যে দুঃখ-কষ্ট চোখের জলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না সে দুঃখ-কষ্ট অন্যান্য দেহাংশের কান্না ঘটায়। চেপে রাখা বেদনা খুব সহজেই উদ্বেগ ও আবেগজাত বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। এছাড়া Psychosomatic ব্যক্তি-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখনই যখন সে ব্যক্তিগত, আভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক ও বিশেষ ধরনের সমস্যা এবং অবদমিত দুঃখের সঙ্গে মোকাবেলা করার উদ্যোগ

গ্রহণ করে। মানসিকভাবে আহত এরূপ ব্যক্তি উদ্বেগ ও মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি ব্যতিরেকে কোনো উদ্যোগ নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারে না। তাই বহু সাইকিয়াট্রিস্ট উদ্বেগকে মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে একটি জীবন্ত উৎস বলে বিবেচনা করে থাকেন। সুতরাং সাইকোনিউরোটিক বিভ্রাটের লক্ষণ হলো স্বাভাবিক কার্য-অক্ষমতা এবং দেহের সংবেদনশীল অঙ্গের বিশৃঙ্খলা, যেমন অন্ধত্ব বা বধিরতা। অতএব এটাই সম্ভবপর যে, দুঃখ-বেদনাকে চেপে রাখার কারণে সাইকোনিউরোটিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল এবং এ কারণে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অন্ধত্বের বদলে 'সাদা' হয়ে যাওয়া শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে যথেষ্ট রহস্য নিহিত আছে। চক্ষু সাদা হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো কর্ণিয়ায় আলসারের কারণে কেরাটিটিস (Keratitis) রোগ হওয়া এবং চোখে ছানিপড়া। এ অবস্থা ক্ষণস্থায়ী যা চিকিৎসার মাধ্যমে ভালো হয়ে যায়। কিন্তু এগুলো কোনটাই চেপে রাখা দুঃখের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। চেপে রাখা দুঃখের কারণে যে স্বল্পকালীন অন্ধত্বের সৃষ্টি হয় তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু সাদা চোখ কালো চোখের বিপরীত অবস্থা সেহেতু আল্লাহ পাক সম্ভবত সাদা চোখের বদলে স্বল্পকালীন অন্ধত্বকে বুঝিয়েছেন।

ইউসুফ (আ)-কে ফিরে পেয়ে হযরত ইয়াকুব (আ) দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন

সূরা ইউসুফ-১২ : ৯৬

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

Then, when the bearer of the glad tidings arrived, he cast it (the shirt) over his face and he became clear-sighted. He said : 'Did I not say to you, I know from Allah that which you know not'.

তারপর যখন সুসংবাদ বাহক পৌছল, সে জামাটি তার মুখের উপর তুলে ধরল এবং তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন। তিনি (ইয়াকুব আ.) বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জানো না।" (সূরা ইউসুফ : ৯৬)

হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর গায়ের জামাটি সৎ ভাইদেরকে দিয়ে বললেন, এটি আমার পিতা ইয়াকুব (আ)-এর মুখের সামনে তুলে ধরবে। যখন ইয়াকুব (আ) এর কাছে ইউসুফ (আ)-এর শুভ সংবাদ এবং প্রেরিত জামা পৌছল তখন হযরত ইয়াকুব (আ) হারানো পুত্র ইউসুফ (আ)-এর গন্ধ অনুভব করলেন এবং দীর্ঘদিন বুকের গভীরে চেপে রাখা দুঃখ হঠাৎ প্রকাশিত হয়ে গেলো। প্রাণের নিধি আদরের দুলাল হারানো সন্তানের খোঁজ প্রাপ্তির শুভ সংবাদটি তাঁকে এতো বেশি আনন্দে উদ্বেলিত করেছিল যে, তাঁর স্বল্পকালীন অন্ধত্বের সাইকোনিউরোটিক (Psychoneurotic) প্রভাব অদৃশ্য হয়ে গেল। দীর্ঘদিন চরম অবদমিত দুঃখের কারণে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর চক্ষুদ্বয় যেভাবে সাদা হয়ে গিয়েছিল তা ক্ষণস্থায়ী অন্ধত্বের কথাই প্রমাণ করে। তাই পুত্রের শুভ সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে পুঞ্জিভূত চাপা দুঃখ হালকা হয়ে গেলো এবং তিনি পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। এটা মেডিক্যাল সাইন্স কর্তৃক সমর্থিত।

সৃষ্টি জুড়ে আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য নিদর্শন

সূরা ইউসুফ-১২ : ১০৫

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ.

And How many a sign in the Heavens and the earth they pass by, while they are averse there from.

কত নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে রয়েছে যেগুলোর পাশ দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে এবং সেগুলো থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে। (সূরা ইউসুফ : ১০৫)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা প্রকৃতপক্ষে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে বিদ্যমান আল্লাহ্ পাকের নিদর্শনসমূহকে ভালোভাবে অবলোকন করেন এবং সেগুলোকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন তারা কোনো দিন আল্লাহ্ পাকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না। অবশ্য বহু লোক আছে যারা আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন অবলোকন করার পরেও তাঁর প্রতি উদাসীন হয়ে থাকে। নিদর্শন সম্পর্কে তাদের বোধ শক্তির অভাব থাকায় তারা উদাসীনতার পরিচয় দেয়। এটা স্মরণে রাখা খুবই জরুরি যে, নিদর্শনগুলোকে বুঝতে হলে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে যেসব নিদর্শন (Sign) উল্লেখ করা হয়েছে তার সবগুলো বৈশিষ্ট্যই বিজ্ঞানধর্মী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি, প্রাণহীন বস্তু থেকে প্রাণের সৃষ্টি, মানুষ সৃষ্টি, মানুষের অন্তরে ভালোবাসা ও করুণার সৃষ্টি ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা সৃষ্টি, সবুজ পত্র-পল্লবের জন্ম বৃদ্ধি, ফটোসিনথেসিস পদ্ধতি এসবই আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন। এসব অসংখ্য নিদর্শন সম্পর্কে তখনই মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে যখন জীব ও জড়বস্তু গঠনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের যে মহাপরিকল্পনা সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। এটা বলা সঠিক নয় যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নয়নের ফলে আমরা সকল নিদর্শন বুঝতে সক্ষম হয়েছি। তবে এটা সত্য যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নতির পটভূমিতে মানুষ এসব নিদর্শনের সামান্য কিছু ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ

করেছেন যে, কেবল জ্ঞানী লোকেরাই আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন সম্পর্কে ধারণা পেশ করতে পারেন। সুতরাং জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নিদর্শন অনুধাবন করতে পারে।

এখন আমরা নভোমণ্ডলের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করব। প্রথমে আমরা উল্লেখ করতে পারি গ্যালাক্সির কথা। গ্যালাক্সি হলো বিশ্ব জগতের গঠন এক। তারকারা মহাকর্ষ শক্তির টানে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে গ্যালাক্সিতে। বিভিন্ন আকারের গ্যালাক্সি রয়েছে। মিলকিওয়ে বা ছায়াপথ গ্যালাক্সির আকার হলো পেঁচানো গোলাকার। এ গ্যালাক্সিতে রয়েছে ১০০ বিলিয়ন তারকা। এরূপ অসংখ্য গ্যালাক্সি মহাবিশ্ব জুড়ে বিদ্যমান। একটি গ্যালাক্সিতে থাকে সূর্য, সৌরজগৎ, গ্রহ-উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা ও নীহারিকা। মজার ব্যাপার হলো সেখানে রাত আর দিন সংঘটিত হয়। সময়ের পরিবর্তন ঘটে।

নভোমণ্ডলের আর একটি বিস্ময়কর নিদর্শন হলো কোয়াসার (Quaser)। এটি অতি অদ্ভুত ও শক্তিশালী আকাশি বস্তু। একটি কোয়াসার ছায়াপথের মতো একটি গ্যালাক্সির চেয়ে ১০০ গুণ কিংবা ১০০০ গুণ বেশি শক্তি উদ্গীরণ করে। কোয়াসারকে ২০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ (ligth) দূরে দেখা যায় এবং এরা তীব্র রেডিও তরঙ্গ পাঠাতে সক্ষম।

আল্লাহ্ পাক বিশাল আকাশে আমাদেরকে তারা (Star) প্রদর্শন করো। তারা বিপুল ভরবিশিষ্ট আকাশি বস্তু। সাধারণত এরা গ্যাস গঠিত এবং ব্যাপক শক্তির উৎস। পারমাণবিক সংযোজন (Atomic fusion) প্রক্রিয়ায় এরা নিজেদের দেহে আলো, তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে। এর ফলে আলো তাপ এবং শক্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত আমাদের অতি পরিচিত সূর্য একটি জ্বলন্ত তারা। পৃথিবী থেকে একে অতি উজ্জ্বল এবং বড় দেখায়। কিন্তু এর চেয়ে লক্ষ গুণ উজ্জ্বল এবং বিশাল আকারের তারা মহাকাশে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বেটলজিয়ুজ নক্ষত্র। সূর্যের ব্যাস ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার কি. মি. বেটলজিয়ুজের ব্যাস সূর্যের চেয়ে ৮০০ গুণ বেশি। অর্থাৎ সূর্যের মতো ৫০ কোটি তারা বেটলজিয়ুজের ধারণ ক্ষমতা আছে। সূর্যের ভর ২×১০^{৩০} কেজি। সূর্যের বরের ৫০ গুণ বেশি ভর বিশিষ্ট দু'টি তারা আছে। এরা একে অপরের কাছাকাছি থেকে একটি যুগ্ম তারা গঠন করেছে। আবিষ্কারের নাম অনুযায়ী এদের এক যুগে নাম দেয়া হয়েছে Plasket's Star। সূর্যের চেয়ে ৫০ গুণ উজ্জ্বল একটি তারা রাতের আকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলে। যার নাম বানরাজ (Rigel)। গভীর দক্ষিণে আর একটি দীপ্তিময় নক্ষত্র যার নাম এস ডরাডাস (S. Doradas)। এটি সূর্যের চেয়ে দশ

লক্ষ গুন উজ্জ্বল। অতএব মহাকাশের এসব বিস্ময়কর নিদর্শন নিঃসন্দেহে আল্লাহর ইঙ্গিতবাহী। বিজ্ঞানের চর্চা ব্যতিরেকে এমন ইঙ্গিত সম্পর্কে ধারণা করা মোটেই সম্ভব নয়।

এখন আমরা পৃথিবীর বাসযোগ্য অবস্থাকে বিবেচনা করব। বহু পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে পৃথিবী আজকের অবস্থায় এসে পৌছেছে। সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ আমাদের পৃথিবী প্রায় ৪৬০০ মিলিয়ন বছর আগে যাত্রা শুরু করেছে। তাপমাত্রা পাওয়ার পর তাকে একটি তরল অবস্থা অতিক্রম করতে হয়। পরবর্তী ১০০০ বিলিয়ন বছর পর এর অধিকাংশ এলাকায় শক্ত আবরণ সৃষ্টি হয়। এক সময়ে পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হলো এবং জলীয় বাষ্প জমে ঘনীভূত হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত শুরু হলো। এ বৃষ্টির পানিতে লেক, নদী, সাগর ও মহাসাগর পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

এটা লক্ষ্য করে বিস্ময়বোধ করতে হয় যে, সৌরজগতের ৯টি বড় ধরনের গ্রহ ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব বজায় রেখে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। সে গ্রহগুলোর মধ্যে কেবল মাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক ব্যবস্থা আছে। বড় বড় গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবীতে একমাত্র ঐ তাপমাত্রা আছে যা খুব বেশি গরমও নয়, খুব বেশি ঠাণ্ডাও নয়। যার ফলে এখানে জীবন বেড়ে চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। একমাত্র পৃথিবীতে পানি ও বায়ুমণ্ডল রয়েছে। বায়ুমণ্ডলে আছে সুষম প্রাকৃতিক গ্যাসসমূহ। যথা, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, অরগান ইত্যাদি। গ্যাসসমূহের সুষম হার বিদ্যমান না থাকলে মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার হয়ে বিলীন হয়ে যেতো। তাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি সম্ভব হতো না।

এখন এ পর্যায়ে আমরা দেখব মানব শরীর কি কি নিদর্শনে গঠিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানব দেহ গঠিত হয়েছে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অনেক ধরনের খনিজ লবণ দিয়ে। এ উপাদানগুলোর নানা রকম ক্রিয়া বিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে প্রাণরস। প্রাণরসে ৯০% পানি এবং বাকি অংশগুলো জৈব ও অজৈব পদার্থ। যেমন– প্রোটিন, স্নেহপদার্থ এবং নিউক্লিক এসিড। প্রাণরস থেকে তৈরি হয়েছে কোষ (Cell)। লক্ষ লক্ষ কোষ দ্বারা মানব দেহ গঠিত। কোষ শুধু গঠনগত নয় শরীরের কার্যগত একক। দেহের এ একক তো একটি অলৌকিক ব্যাপার যা আল্লাহর একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোষ দেখতে পাওয়া যায়। কোষে মূলত দুইটি প্রধান অংশ থাকে। একটি নিউক্লিয়াস যার মধ্যে থাকে বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহনকারী ক্রোমোজোম এবং অপর অংশ সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজম কেবল চারদিক থেকে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখে না এর মধ্যে ভাসমান থাকে কোষের অতি সূক্ষ্ম কতগুলো অঙ্গাণু।

আল্লাহ পাকের অন্যতম নিদর্শন নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম সুতার মতো ক্রোমোজোম সর্বোত্তম হাতের মাস্টার ডিজাইন। এ ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্র স্বকীয়তা গড়ে ওঠে। মানুষের বেলায় প্রথমে একজন শিশু-সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে তা নির্ধারিত হয়ে যায় ঐ মুহূর্তে যখন একটি Sperm একটি Ovum এর ভেতর প্রবেশ করে। প্রত্যেক সাধারণ মানুষের দেহকোষের ৪৬টি ক্রোমোজোমের মধ্যে ২২ জোড়া এবং দু'টি লিঙ্গ ক্রোমোজোম মিলে গঠন করে আর এক জোড়া। সর্বমোট ২৩ জোড়া। পুরুষের দু'টি লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি X এবং অপরটি Y। কিন্তু স্ত্রীলোকের থাকে ২টি X ক্রোমোজোম। যদি Ovum Y ক্রোমোজোমবাহী Sperm এর সাথে মিলিত হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি করে তখন শিশুটি হয় ছেলে (XY)। আর যদি X ক্রোমোজোমবাহী Sperm এর সাথে মিলে তখন শিশুটি হবে মেয়ে (XX)। এভাবে ক্রোমোজোমের মিলন সম্পূর্ণভাবে মানুষের কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘটনা। আল্লাহ পাকই এ ডিজাইন রূপায়নকারী।

আল্লাহ তা'আলার আর এক নিদর্শন হলো জিন (Gene) যা বংশগতির নিয়ন্ত্রণকারী ন্যূনতম একক হিসেবে পরিচিত। প্রতিটি জীবের বৈশিষ্ট্যাবলী জিনের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ জিনই বংশগতির ধারক ও বাহক। জিন ক্রোমোজোমের ভেতরে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে একটি ক্রোমোজেমে অসংখ্য জিন থাকে এবং এ জিনগুলো একটি বিশেষ রীতিতে বিন্যস্ত থাকে। প্রতিটি জিন একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। ঐ নির্দিষ্ট স্থানকে জিনের লোকাস বলা হয়। জিন দুই ধরনের হয়ে থাকে। প্রকট জিন (Dominant gene) এবং প্রচ্ছন্ন জিন (Recessive gene)। যদি পিতার প্রকট জিন সন্তানের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় তাহলে সন্তানটি হুবহু পিতার মতো হয়। আর যখন মায়ের প্রকট জিন শিশুর মধ্যে স্থানান্তরিত হয় তখন শিশুটি মায়ের মতো হয়। আবার পিতা মাতার প্রচ্ছন্ন জিন শিশুর মধ্যে স্থানান্তরিত হলে শিশু পিতা মাতা কারোর মতোই হয় না। মহান আল্লাহ বিস্ময়কর নিদর্শন DNA (Deoxyribonucleic Acid) জীবকোষের নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাণ রাসায়নিক যৌগ। ক্রোমোজোম তথা জিনের সাংগঠনিক উপাদান রূপে DNA জীবের প্রজাতি সত্তা ও বংশগতির নিয়ন্ত্রণ করে। DNA কে বংশগতির প্রতিচিত্রের ধারক বলা হয়। কারণ এটি কোষের বৃদ্ধি ও প্রজননের সময় নির্ভুল প্রতিলিপি সৃষ্টি করতে পারে। বংশগত সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য বহন করার ক্ষমতা এর আছে। এর গঠন কাঠামো অত্যন্ত স্থায়ী এবং বিশেষ কোনো

কারণ ব্যতীত খুব সহজে পরিবৃত্তি ঘটে না। তাই দেখা যায় একজন মানুষের আঙ্গুলের ছাপ আর একজনের সাথে কখনো মিলে না। কারণ আঙ্গুলের অগ্রভাগে যে রৈখিক বিন্যাস আঁকা থাকে তার প্রতিলিপি DNA মলিকূলেই ধরা থাকে। সুতরাং DNA অণুর আণবিক গঠন এতই জটিল যে, বহু বিজ্ঞানী এতে বিস্ময়বোধ করে থাকেন। এ DNA মলিকূলের একমাত্র রূপকার প্রজ্ঞাময় আল্লাহ পাক।

এখন আমরা আর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। এ দৃষ্টান্ত হচ্ছে কিভাবে স্নায়ুকোষ নিউরণ (Neuron) কাজ করে।

বুদ্ধি ও অনুভূতির আধার মানব মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্রস্থল। মস্তিষ্ক (Brain) আল্লাহ পাকের অতি আশ্চর্যজনক নিদর্শন যার মধ্যে নিহিত আছে ১৪ বিলিয়ন নিউরণ। সমগ্র দেহের মূল একক হচ্ছে জীবকোষ (Cell body)। এ কোষের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কোষদেহ যা দ্বারা ইন্দ্রিয়, পেশী মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকোষ গঠিত হয়েছে তার নাম নিউরণ। মস্তিষ্কের থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস অংশ সংবেদী অঙ্গ থেকে আসা যে কোনো সংকেত দ্রুত গ্রহণ করে এবং বুদ্ধি, অনুভূতি চিন্তা, ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, চেতনা শক্তি প্রভৃতি মানসিক বোধের নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞানীরা হাইপোথ্যামাস অংশকে আবেগের কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। দেহের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উদ্দীপনার সংকেত যখন স্নায়ুতন্ত্রর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছে তখন নিউরণ তা গ্রহণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রেরণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দেহের কোনো অংশ একটুখানি স্পর্শ করলে কিংবা গরম বা ঠাণ্ডা অনুভব করলে অথবা কেউ চিমটি কাটলে সংশ্লিষ্ট স্নায়ুতন্ত্র নিউরণ সেলে সংবাদ প্রেরণ করে এবং নিউরণ খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত দেয় সচেতন হও, অথবা চিমটি কাটা স্থানে একটুখানি মেসেজ করে নাও। এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংঘটিত হয় এবং এ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া আল্লাহ পাক মানুষের শরীরে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ পাকের আশ্চর্যজনক সৃষ্টি নিদর্শনের মধ্যে হৃৎপিণ্ড (Heart) আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। এটি দেহের সকল অংশে রক্ত সঞ্চালনের জন্য পাম্প যন্ত্রের মতো কাজ করে। চলমান এ যন্ত্রটি দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার (Vein) মাধ্যমে আনিত রক্ত ধমনীর (Artery) সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে। হৃৎপিণ্ডে রয়েছে চারটি প্রকোষ্ঠ এবং চারটি ভাল্ব। এর কার্যপ্রণালী অত্যন্ত জটিল এবং এর কাজ হলো সংকোচন (Systole) এবং প্রসারণ (Diastole) প্রক্রিয়ায় দেহের ভেতরে রক্ত গতিশীল রাখা। সংকোচন ও প্রসারণ প্রক্রিয়ায় যে ছন্দময় স্পন্দন উদ্গত হয় তা জীবনের গতিকেই সচল রাখে। এ স্পন্দন বন্ধ হলেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

মানুষের আর একটি সংবেদনশীল অঙ্গ হলো চোখ যার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে তুলে ধরেছেন। আমরা আগেই বলেছি চোখের রেটিনায় দুই ধরনের আলো গ্রহণকারী কোষ আছে। একটির নাম Cone অপরটির নাম Rod। দিনের আলোতে দেখতে সাহায্য করে Cone এবং রাতের বেলা দেখতে সাহায্য করে Rod। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে এক ধরনের কোষ চোখের মধ্যে দিতে পারতেন। তিনি যেহেতু রাত আর দিন সৃষ্টি করেছেন তাই দিনে ও রাতে দেখতে যেন কোনো সমস্যায় পড়তে না হয় দৃষ্টি শক্তির কলা-কৌশলে দুই ধরনের কোষ ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করেছেন যা আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

চোখের পরে আর একটি দৃষ্টান্তের বিষয়ে এখানে বিবেচনা করবো। এটি হলো কান (Ear) যা শ্রবণ শক্তি ও ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের কান প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। (১) বহিঃকর্ণ, (২) মধ্যকর্ণ, (৩) অন্তঃকর্ণ। বহিঃকর্ণে তিনটি অংশ আছে। পিনা (Pinna), কর্ণকুহর (Auditory meatus) এবং কর্ণপট (Tympanic membrane)। মধ্যকর্ণে আছে তিনটি অস্থি। ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস। অন্তঃকর্ণ দুইটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। ইউট্রিকুলাস (Utriculus) ও স্যাকুলাস (Saceulus)। পিনা গৃহীত শব্দ তরঙ্গ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে কর্ণপটকে আঘাত করলে তা কেঁপে ওঠে।

কম্পনের ফলে মধ্যকর্ণে অবস্থিত ম্যালিয়াস, ইনকার্স ও স্টেপিস অস্থি তিনটি এমনভাবে আন্দোলিত হয় যার কারণে অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার পেরিলিম্ফে কাঁপন সৃষ্টি হয়। পেরিলিম্ফে কম্পন হলে ককলিয়ার অরগান অব করটির (Cochlear organ of Corti) সংবেদী কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে স্নায়ু আবেগের সৃষ্টি করে। এ আবেগ স্নায়ুতন্ত্রর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রে পৌছার সাথে সাথে আমরা শুনতে পাই।

সুতরাং উপরে যেসব দৃষ্টান্ত আমরা তুলে ধরেছি এরূপ অসংখ্য নিদর্শন আল্লাহ পাকের সৃষ্টির মধ্যে পূর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু মানুষ এসবের প্রতি মনোনিবেশ না করে দৈব-কেরামতি খুঁজে বেড়ায়। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি নিদর্শনই তো একটি অলৌকিক ব্যাপার। তাই যে নিদর্শন আগে থেকেই আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে ছড়ানো সে বিষয়ে গবেষণা করার জন্য এ আয়াতে মানুষের প্রতি ব্যাপক তাগিদ দেয়া হয়েছে। এভাবে আল্লাহ্ পাকের নিদর্শনসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে গেলে বিশ্লেষণের পক্ষে বহু আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষাৎ মিলবে যার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে।

মহাকর্ষ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি অদৃশ্য স্তম্ভ তৈরি করে

সূরা রা'দ-১৩ : ২

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا.

Allah in He Who raised the Heavens without any pillars that you can see.

তিনি আল্লাহ পাক যিনি আকাশমণ্ডলকে স্তম্ভ ব্যতীত উর্ধ্বে তুলে রেখেছেন যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো। (সূরা রা'দ : ২)

এ আয়াতাংশের প্রারম্ভিক অর্থ হলো আল্লাহ পাক স্তম্ভ ছাড়া নভোমণ্ডলকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টি সুদূর প্রসারী গুরুত্ব বহন করে। স্তম্ভের কাজ হলো ভারি বস্তুকে উপরের দিকে তুলে ধরা। যে বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তার বাইরে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মহাশূন্যে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে এবং এসব জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে আমাদের কাছে মনে হয় যেন আকাশের গায়ে এঁটে আছে। কিন্তু এরা বিশাল মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রয়েছে। এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, নক্ষত্রগুলো ওজনবিশিষ্ট আকাশি বস্তু। এ সম্পর্কে মুসলিম বিজ্ঞানীরা ১১ শতকে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে কোরআন নাযিল হওয়ার ১২০০ বছর পর বিজ্ঞানী নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র (Gravitation Law) প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ সূত্র অনুযায়ী আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রত্যেক জ্যোতিষ্ক বা বস্তু কণিকা এমন একটি বল দ্বারা একে অপরকে আকর্ষণ করে যার তীব্রতা বস্তু দুইটির ভরের গুণ ফলের সরাসরি আনুপাতিক এবং তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ উপর থেকে খষে পড়ে না এবং একটার সঙ্গে আর একটা ধাক্কাও খায় না। এর কারণ হলো যে, তাদের কক্ষ পথের গতি থেকে উত্থিত কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) বল এবং মহাকর্ষ বলের সুষম প্রভাব। স্পষ্টতই কেন্দ্রাতিগ শক্তির দ্বারা মহাকর্ষ শক্তির সুসমতা একটি অদৃশ্য স্তম্ভ তৈরি করে যা এ আয়াতাংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটা সকলের জানা উচিত যে, পবিত্র কুরআন কোনো বিজ্ঞান-পুস্তক নয়। যে সময় এ পবিত্র গ্রন্থ নাযিল হয়েছিল সে সময় মানব সভ্যতা এতো বেশি অগ্রসর হয়নি যার সুবাদে মহাকর্ষ বল ও কেন্দ্রাতিগ বল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভবপর ছিল। পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার ১২০০ বছর পরে মহাকর্ষ বল ও কেন্দ্রাতিগ বল আবিষ্কারের মাধ্যমে এটা বোধগম্য হয়েছে যে, অদৃশ্য স্তম্ভের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে যা আল্লাহ পাক এ আয়াতে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ভূ-বিজ্ঞানের কয়েকটি তথ্য

সূরা রা'দ-১৩ : ৩

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

And it is He Who spread out the earth and placed therein firm mountains and rivers and every kinds of fruits He made two in pairs. He brings the Night as a cover over the Day. Verily in these things, there are Signs for people who reflect.

এবং তিনি ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে দৃঢ় পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দুই জোড়া (পুং এবং স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর আবৃত করে দেন। নিশ্চয়ই এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তা করে। (সূরা রা'দ : ৩)

বিগত বছরগুলোতে ভূ-বিজ্ঞানের একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। যার ফলে আমাদের কাছে গ্রহ বিষয়ে একটা নতুন উপলব্ধি সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের পৃথিবীর উপরিভাগ ভেঙ্গে কয়েকটি ঠাণ্ডা, দৃঢ় এবং ১০০ কি. মি. পুরু প্লেটে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এ প্লেটগুলো তুলনামূলকভাবে নমনীয় এবং আংশিকভাবে গলিত তরল অঞ্চলে ভেসে বেড়ায়। যাকে বলা হয় এ্যাসথেনোস্ফেয়ার (Aesthenosphere)। প্লেটগুলো খুব ধীরগতিতে এগিয়ে যায়। প্রতি বছর ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার গতিতে। বাহ্যত এ প্লেটগুলো গতিশীল হওয়ার কারণ হলো এগুলো পৃথিবীর আবর্তন, গুরুত্ব ও আচ্ছাদিত শিলার তাপ সঞ্চালন গতির দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা এই মত পোষণ করেন যে, কিছু সংখ্যক নতুন শিলা আচ্ছাদন ভেদ করে ধীরগতিতে মহাসাগরবর্তী পর্বত শ্রেণী বরাবর মাথা তুলে জেগে উঠে এবং তা সবদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এতে উপরিভাগে একটা শক্ত আবরণের সৃষ্টি হয় এবং তা মহাদেশের দিকে অগ্রসর হয়। সাগরতলের বিস্তৃতি নামে আখ্যায়িত এই ঘটনার দ্বারা প্লেটগুলোর স্থানচ্যুতি ঘটে এবং তার ফলে পরিশেষে বিভিন্ন পথে

পৃথিবী বিস্তৃত হয়ে পড়ে। অন্য একটি ব্যাখ্যায় পৃথিবীর বিস্তৃতিতে পৃথিবীর সমতল অবস্থার দিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

পর্বতসমূহ (Mountains) : পৃথিবীর পাহাড়-পর্বতগুলো একটা মুখ্য সিস্টেমের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে পাহাড়-পর্বতগুলো শ্রেণী-বিন্যাসে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। এ পাহাড়-পর্বতগুলো মহাদেশের প্রান্ত সীমার সীমানা নির্ধারণ করে অবস্থান করছে। পর্বতসমূহ শ্রেণী আকারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেড়ে গিয়ে সাগর ও মহাসাগরে উপস্থিত হয়েছে। এভাবে উপস্থিত হয়ে সাগর ও মহাসাগরের মধ্যে দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি করেছে। পৃথিবী ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে প্লেটে পরিণত হওয়ার পর প্লেটের শেষ সীমায় পর্বতগুলো তাদের গঠন লাভ করেছে। এ প্লেটগুলো হলো ইউরেশিয়ান প্লেট, এরাবিয়ান প্লেট, অস্ট্রালো-ইণ্ডিয়ান প্লেট ও এ্যান্টার্কটিকা প্লেট। অপর একটি সিস্টেম প্যাসিফিক প্লেট, উত্তর আমেরিকান প্লেট ও দক্ষিণ আমেরিকান প্লেটের সীমানা অনুসরণ করেছে।

মজবুত প্রশস্ত ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে পর্বতের অবস্থান খুবই সুদৃঢ়। পৃথিবীর উপরের পৃষ্ঠ সমুদ্র তলের ৫ কি. মি. নিম্ন থেকে মহাদেশীয় সমতল উপরিভাগের ৩৫ কি. মি. নিম্নে অর্থাৎ খুব বেশি হলে পর্বতমালার ৮০ কি. মি. নিম্নে সুষম সমতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকে।

নদ-নদী (Rivers) : নদীর প্রাথমিক উৎপত্তি একটি সাধারণ ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় Tectonic Process বা ভূ-অভ্যন্তরে চলমান শক্তি যা প্রবাহিত জলধারার সমতায় গোলযোগ সৃষ্টি করে।

পানির তরল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে যখন আদি যুগ প্রাগৈতিহাসিক যুগে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং তখন জ্বলজ্বলে তপ্ত পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে সংকট তাপমাত্রার নিচে চলে গিয়েছিল। বায়ুমণ্ডলের গ্যাস ঘনীভূত হয়ে পড়েছিল এবং বাষ্প থেকে পানি সৃষ্টি হয়েছিল। এ পানি বৃষ্টির আকারে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়েছিল। বৃষ্টির পানি ছুটে চলে নদী-নালা দিয়ে। পৃথিবী শীতল হওয়ার সময় এ নদী-নালাগুলো গড়ে উঠেছিল এবং এসব নদী-নালার ফাঁকা শূন্য বুকে পানি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

এভাবে প্রথমে নদ-নদী ও সাগরের সৃষ্টি হয়েছিল এবং একই সময়ে অসীম জলরাশির প্রবাহ ছুটে চলছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নদ-নদী হচ্ছে এ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

মহাদেশের বুক বেয়ে ছুটে চলা নদ-নদীগুলোকে সরু ফিতার মতো মনে হয়।

এসব নদ-নদীগুলো সমম্বিতভাবে প্রকৃতির একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করে। পৃথিবীর উপরিভাগের পানি নিষ্কাশনের নালা হিসেবে এবং পানি চক্রের গুরুত্বপূর্ণ জটিল কৌশল উপাদান হিসেবে নদ-নদীর ভূমিকা ব্যাপক।

পানি-সঞ্চালন বা পানিচক্র গঠিত হয় সাগর, হ্রদ, নদী ও বরফ থেকে বিরতিহীনভাবে উত্থিত বাষ্পের মাধ্যমে। পৃথিবীর বুক বেয়ে যে জলরাশি ছুটে যায় সে জলরাশিকে নদ-নদীই নালা হিসেবে বহন করে নিয়ে যায়। এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া অর্থাৎ বরফ থেকে পানি, পানি থেকে বাষ্প হওয়ার ঘটনা পর্বত ও নদ-নদীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পর্বতের শীর্ষদেশে যে বরফ জমাট বাধে তা গলে গিয়ে পানি হয়ে নদীর বুকে নেমে আসে এবং নদীর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে পরিশেষে সাগরের বুকে এসে পড়ে। পৃথিবীর উপরিভাগের সকল জলাধারের পানি বাষ্প হয়ে অভিকর্ষ বলের টান কাটিয়ে মেঘমালা গঠন করে এবং দূরবর্তী এলাকায় বৃষ্টিপাত ঘটায়।

অবশেষে বাকি অংশ পর্বত-চূড়ার বরফ টুপিতে ঘনীভূত হয়ে সেখানে বরফ হয়ে জেঁকে বসে। সুতরাং বরফ থেকে পানি, পানি থেকে বাষ্পতে রূপান্তরিত হওয়া এবং পুনরায় বাষ্প থেকে পানি ও পানি থেকে বরফে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা পর্বত ও নদীর মাঝে পানি চক্র সৃষ্টি করে। এ ঘটনা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম থেকেই পৃথিবীর উপরিভাগে পানি বয়ে চলছে। পানির গতিধারা প্রতিনিয়ত মহাদেশের ভূমির ক্ষয়সাধন করে চলেছে। অধিকন্তু প্রাচীনকাল থেকে নদীসমূহ ভূত্বকের অংশবিশেষের উত্থান, অবদমন ও একদিকে ঝুঁকে পড়ার পুনঃপুন প্রক্রিয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। আরও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা হচ্ছে মহাসাগরের অগ্রগমন ও পশ্চাৎগমন, মেরু ও মহাদেশের অবস্থান পরিবর্তন, উষ্ণ-শীতল এবং আদ্র-শুষ্ক সময়ের পরিবর্তনের প্রভাবের মধ্যে।

অনেক আগে আমাদের পূর্বপুরুষগণ পানির প্রবাহধারার প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তাদের এভাবে আকৃষ্ট হওয়ার কারণ ছিলো এই যে, নদীগুলো তাদের পানীয় জল (Drinking Water) ও মাছ সরবরাহ করতো। এছাড়া নদীগুলো ভ্রাম্যমান লোকদেরকে পরিবহন সুবিধা দান করতো। আগের দিনের মানুষ ব্যাপকভাবে নদীর উপর নির্ভরশীল ছিলো। নদীপথে ভ্রমণ, পণ্যসামগ্রী পরিবহন, সেচ কাজে ও শিল্পে পণ্য উৎপাদনের কাজে নদ-নদীর পানি অপরিহার্য ছিলো। বর্তমানে বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে নদ-নদীর প্রয়োজনীয়তা মানুষের অগ্রগতির একটা মুখ্য অংশ হয়ে রয়েছে। বড় ধরনের রাসায়নিক উৎপাদনের প্রয়োজন

শিল্পের ক্ষেত্রে নদীর পানিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। পারমাণবিক চুল্লিকে ঠাণ্ডা করার প্রয়োজনও পানিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। জলধারা নির্মাণ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। সর্বোপরি কৃষি উৎপাদনে নদ-নদীর পানি একান্ত অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য হয়ে রয়েছে।

ফলের মধ্যে জোড়া সৃষ্টি করা হয়েছে : বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় যে ফল ধরে সেই ফলের মধ্যে জোড়া (পুং-স্ত্রী) থাকে। অর্থাৎ ফলের মধ্যে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বিদ্যমান। উদ্ভিদ জগতের পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের ঘটনা এবং লিঙ্গগত প্রজননের মাধ্যমে বংশগত বৈশিষ্ট্য বহনের দৃশ্য প্রকৃতির সকল রহস্যের মধ্যে অন্যতম। এ রহস্য গভীরভাবে আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে থাকে। যদিও কিছু গাছপালা আছে যাদের বংশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া লিঙ্গগত নয়। তাদের বংশ বৃদ্ধি ঘটে অন্যভাবে। তবে বংশ বৃদ্ধির সাধারণ নিয়ম প্রচলিত রয়েছে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলনের মাধ্যমে।

গাছপালায় প্রথমে ফুল ফোটে। তারপর ফল ধরে। এ ফল খুবই জটিল ধরনের প্রজনন প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপাদিত হয়। দ্বৈতলিঙ্গধারী ফুলের বেলায় প্রত্যেক ফুলের এক সঙ্গে পুং-অঙ্গ ও স্ত্রী-অঙ্গ থাকে। এগুলোকে বলা হয় পুংকেশর ও গর্ভকেশর। পুংকেশর পরাগরেণু উৎপাদন করে। গর্ভকেশর এ পরাগরেণু ধারণ করে যার ফলে ফল উৎপন্ন হয়।

কিন্তু এক লিঙ্গধারী ফুলের বেলায় ঘটনা ঘটে অন্যভাবে। এক লিঙ্গধারী ফুল কেবলমাত্র পুংকেশর কিংবা গর্ভকেশর বহন করে থাকে। গর্ভকেশর যে অংশে পরাগরেণু ধারণ করে তাকে গর্ভমুণ্ড বলা হয়। বাতাস, কীটপতঙ্গ, পাখি, পানি ইত্যাদি বাহনের মাধ্যমে পুংকেশন থেকে পরাগরেনু, গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরাগায়ন।

পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে অঙ্কুরিত হয়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল তৈরি করে। এ নলগুলো গর্ভমুণ্ড ও তার নিম্নবর্তী টিসু ভেদ করে এগিয়ে যায় এবং শেষে এলাকার পরাগরেণুর একটি গর্ভকোষে প্রবেশ করে পরাগ নল চূড়ান্ত পর্যায়ে দুইটি পুরুষ নিউক্লি (Nuclei) নির্গত করে এবং সেগুলো ডিম্বকোষে দুই স্ত্রী ভ্রূণের সঙ্গে মিলিত হয় এবং এ মিলনের ফলে বীজ ও ফলের উৎপত্তি ঘটে।

সুতরাং সাধারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফলের উন্নয়নকে বলা হয় ফলের প্রজনন ব্যবস্থা। এ প্রজননের অর্থ হলো গাছপালায় পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গের অস্তিত্ব আগে থেকে বিরাজ করে।

যেসব গাছে এক জাতীয় লিঙ্গবাহী ফুল ফোটে (যেমন– পাম গাছ ও খেজুর গাছ)

সেসব গাছের মধ্যে পুরুষ জাতীয় গাছ পরাগরেণু দান করে যা স্ত্রী জাতীয় ফুলগুলোকে ফলবতী করে তোলে। এর কারণে ফল উৎপাদিত হয়। বাহ্যত ঐসব গাছের ফল থেকে এক জাতীয় বীজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই বীজগুলো থেকে কিছু সংখ্যক পুংজাতীয় চারাগাছ এবং কিছু সংখ্যক স্ত্রীজাতীয় চারাগাছ অঙ্কুরিত হয়। যদি আরবি শব্দ "যাওযাই নিসনাইন" এর অর্থ হয় জোড়ার মধ্যে দুই (Two pairs) তাহলে এ আয়াতের অন্য আর একটি ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। এ ব্যাখ্যাটি হবে খুবই আশ্চর্যজনক। এ গাছগুলো যে গোত্রের আওতায় পড়ে সে গোত্রের নাম Angiosperms। এ গোত্রভুক্ত গাছগুলোর ফুলের পরাগ নল ডিম্বকোষের ভেতর প্রবেশ করে দু'টি শুক্রাণু (Sperm) ছাড়ে। এ দু'টির মধ্যে একটি ডিম্বাণুর (Ovum) সঙ্গে মিলিত হয়ে জাইগোট সৃষ্টি করে। অপরটি ডিম্বাশয়ের ভ্রূণ থলির দুই মেরুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভ্রূণের জন্য খাদ্য ভাণ্ডার তৈরি করে। জাইগোট ক্রমান্বয়ে ভ্রূণে পরিণত হয় এবং খাদ্য ভাণ্ডার থেকে খাদ্য আহরণ করে। এ খাদ্য ভাণ্ডারই ভ্রূণের ডিম্বাণুর সঙ্গে এবং অপরটি দুই মেরুর সঙ্গে মিলিত হয়ে যে দুইভাবে মিলিত হওয়ার প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তা থেকে বুঝা যায় যে, দ্বৈতভাবে মিলিত হওয়ার অর্থ হলো দ্বৈত প্রজনন। এ থেকে আমরা আরো বুঝতে পারি, যেসব গাছে ফল ধরে সেসব গাছের মিলন প্রক্রিয়া বিদ্যমান যা এ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

দিনের উপর রাতের আচ্ছাদন : গোলাকার পৃথিবী নিজ অক্ষে আবর্তন করে। এ আবর্তনের মধ্যে সূর্য যখন পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত হয় তখন রাতের আগমন ঘটে এবং রাতের অন্ধকার ক্রমে ক্রমে দিনের আলোকে গ্রাস করে নেয়। এ অবস্থা দেখে মনে হয় যেন রাত্রিকালের তমসার চাদর ধীরে ধীরে দিনের গায়ে টেনে দেয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ চমকালে ক্ষেতের ফসল ভালো হয়

সূরা রা'দ-১৩ : ১২

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ.

It is He Who shows you the lightning as a pear and as a hope. And it is He Who brings up the clouds, heavy with water.

তিনি তোমাদের জন্য বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন ভয় এবং আশা হিসেবে। আর তিনিই তোমাদের জন্য জল ভরা মেঘমালা আনয়ন করেন। (সূরা রা'দ : ১২)

বিদ্যুৎ হলো মেঘলা আকাশে তড়িৎ বিক্ষেপণ মেঘে যে তড়িৎ বিক্ষেপণ উৎপন্ন হয় তা মেঘের জলকণায় গৃহীত হয়ে থাকে এবং পরে সেখান থেকে নেগেটিভ ও পজেটিভ চার্জে বিভক্ত হয়ে দু'টি ভিন্ন ধরনের মেঘখণ্ড সৃষ্টি করে। এভাবে বিভক্ত হওয়ার পর নেগেটিভ এবং পজেটিভ এলাকায় বিশাল আকারের স্ফুলিঙ্গের বিক্ষেপণ ঘটে।এ স্ফুলিঙ্গ কেবলমাত্র একটি মেঘখণ্ডের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে। কিংবা লম্ফ দিয়ে এক মেঘখণ্ড থেকে আর এক মেঘখণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে। এ স্ফুলিঙ্গের বৈশিষ্ট্য হলো চোখ ধাঁধানো আলোর বিচ্ছুরণ।

বিদ্যুৎ বিক্ষেপণ অত্যন্ত গরম এবং এটা চারপাশের বায়ুকে উত্তপ্ত করে তোলে। বায়ু উত্তপ্ত হয়ে অনতিবিলম্বে বিস্তৃতি লাভ করে এবং পরে বিস্ফোরণের মতো বিকট শব্দ সৃষ্টি করে। এ বিকট শব্দকে পৃথিবী থেকে আমরা বজ্রের গর্জন হিসেবে শুনে থাকি।

ভয় (Fear) : শুরু থেকে মানুষ বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের দিকে তাকিয়েছে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে। বিদ্যুতের ঝলক অত্যন্ত চোখ ধাঁধাঁনো। ক্ষণিকের জন্য যেন চোখকে অন্ধকারে ধাঁধিয়ে দেয়। অধিকন্তু বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের পর যে বিকট বজ্রধ্বনি হয় তাতে জীবনহানী ঘটে। বিদ্যুতের আঘাতে জীব জন্তুর তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে। এর দ্বারা সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহ যেসব বস্তু পড়ে বিদ্যুৎ সেসব বস্তুকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়।

আশা (Hope) : উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায় পর্যন্ত মানুষ জানতো না আকাশে বিদ্যুতের চমক কি অসীম উপকার সাধন করে। এখন এটা আবিষ্কার হয়েছে যে,

বিদ্যুৎ বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনকে একত্রিত করে নাইট্রোজেন অক্সাইড গঠন করে। মেঘ থেকে পতিত বৃষ্টিকণা মাটির মধ্যে অক্সাইড বয়ে নিয়ে আসে এবং গাছপালার মধ্যে তরল আকারে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। এ নাইট্রোজেন গাছপালার বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। বৃষ্টির পানিতে যখন বিদ্যুৎ ঝলক দ্রবীভূত হয়ে যায় তখন তা তরল জাতীয় নাইট্রিক এসিড উৎপন্ন করে এবং গাছপালার খাদ্য হিসেবে মাটির নিচে জমা হয়। এটা হিসাব করা হয়েছে যে, স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ফলে প্রতি বছর প্রতি একর জমিতে নাইট্রিক এসিড হিসেবে ৫-৭ পা. নাইট্রোজেন জমা হয়ে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ (Lightning) নাইট্রোজেন চক্রের উৎসসমূহের মধ্যে একটি। এ উৎসের কল্যাণকর অবদান ব্যতিরেকে বৃক্ষলতার জীবন ধারণ খুবই কষ্টকর হতো। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একথাই বলতে হয় যে, আকাশের বিদ্যুৎ চমক ভয়ঙ্কর মনে হলেও আসলে এটা উপকারী ভূমিকায় অবদান রাখে এবং মানুষের মনে আশার আলো জাগিয়ে তোলে।

অতএব, এ প্রেক্ষিতে আকাশের বিদ্যুৎ ঝলক আমরা আল্লাহ পাকের অপার করুণা হিসেবে ধরে নিতে পারি।

মেঘলা আকাশে বজ্রধ্বনি

সূরা রা'দ-১৩ : ১৩

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِى اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ.

The thunder glorifies and praises Him and so do the Angels because of His Awe. He sends the thunder-bolts and there with He strikes whom He wills, yet they dispute about Allah. And He is Mighty in strength and severe in punishment.

বজ্র তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ধ্বনিত করে যেমনিভাবে করে ফেরেশতারা তাঁর ভয়ে। তিনি (আল্লাহ) বজ্রপাত করেন এবং তা দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে আঘাত করেন। তবুও তারা (অবিশ্বাসীরা) আল্লাহ পাক সম্পর্কে বিতর্ক করে। আর তিনি মহাশক্তিমান এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা রা'দ : ১৩)

বজ্রধ্বনি আল্লাহ পাকের মহিমা প্রচার করে : বজ্রধ্বনি উৎপন্ন হওয়ার সাথে তিনটি নিদর্শন জড়িত। (১) ভীষণভাবে মেঘ থেকে তড়িৎ বিচ্ছুরণ, (২) প্রচণ্ড তাপ উৎপাদন, (৩) চোখ-ধাঁধাঁনো আলোর ঝলক।

যে বিকট শব্দকে বজ্র বলা হয় সেই বিকট শব্দের উৎপত্তি বায়ু সংকোচনের পর হঠাৎ প্রসারণকে বুঝায়। এর ফলে ভয় উদ্রেককারী বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। প্রথম অবস্থায় বিদ্যুৎ বিক্ষেপণ শুরু হয় এবং আল্লাহ পাক যেভাবে চান সেভাবে বজ্রধ্বনি সৃষ্টি হয়ে বহুবিধ কার্য সমাধা করে তাঁর নির্ধারিত নিয়মের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে নিয়মের প্রতি সামান্যতম তারতম্য হয় না এবং তারতম্য কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বজ্রধ্বনি আল্লাহ পাকেরই মহিমা প্রচার করে এবং সবসময় তাঁর মহাশক্তি ও ঐশ্বর্য ঘোষণা করে।

এ সূরার ১২ এবং ১৩ নং আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রধ্বনির মধ্যে একটা পার্থক্য বিদ্যমান। বিদ্যুতের মধ্যে কিছু ধ্বংসাত্মক কার্যকারিতা বরাবর থাকে। কিন্তু বজ্রধ্বনির মধ্যে বিকট শব্দ ছাড়া অন্যকিছু থাকে না। অধিকন্তু বিদ্যুৎ শক্তির গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কি. মি.। আর বজ্রধ্বনির গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র ১১৯০ ফুট।

সৃষ্টির আইন-কানুন আল্লাহ্ পাক কর্তৃক বিধিবদ্ধ

সূরা ইবরাহীম-১৪ : ১৯

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ.

Do you not see that Allah has created the Heavens and the earth with Truth? If He wills He can remove you and bring a new creation.

তোমরা কি দেখো না যে, আল্লাহ্ পাক নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সত্যসহকারে সৃষ্টি করেছেন? তিনি যদি ইচ্ছা করেন তোমাদের সরিয়ে দিতে পারেন এবং নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন। (সূরা ইবরাহীম : ১৯)

সৃষ্টি একটি বাস্তব সত্য। এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সত্যসহকারে সৃষ্টি করেছেন। আমরা এ সত্যকে সকল সৃষ্টির ভিত্তি বলে মনে করি।

এটা খুব মজার ব্যাপার যে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হলো এ সত্যকে খুঁজে বের করা। আর এ সত্যকে খুঁজে বের করার জন্য পবিত্র কোরআনে বার বার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

মূলত "তাফাক্কুর" অর্থ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল তথা আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং সৃষ্টি রহস্য উন্মুক্ত করা যেন মানুষের উপলব্ধির মধ্যে এসে পড়ে। বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ যেহেতু প্রকৃতির গোপন তথ্য ব্যক্ত করতে পেরেছে তাই তারা প্রকৃতির নিয়ম-কানুন দেখে খুবই বিস্ময় বোধ করেছে। এ নিয়ম-কানুন জীব ও জড় জগতকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এসব নিয়ম-কানুন আর কিছু নয় সত্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আর এ সত্যই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার সকল সৃষ্টির মধ্যে। মূলত এ সত্য জীব ও জড়বস্তুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সকল দিকের অর্থ প্রকাশ করে থাকে। যথা, কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর আকার, গঠন, আভ্যন্তরীণ গঠন-উপাদান, রঙ, গন্ধ ও অন্য বস্তুর সঙ্গে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া (Interaction)। বস্তুর গঠন-কৌশলে যে আইন ভূমিকা রাখে বা বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে যে গঠন অনুপাতের প্রয়োজন বা প্রকৃতি

ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এক বস্তুর সঙ্গে আর এক বস্তুর সে সম্পর্ক সম্ভবত সেসবের অর্থই সৃষ্টির সত্যকে প্রকাশ করে থাকে। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যেসব পদ্ধতি উন্নত হয়েছে এবং কাজে ব্যবহৃত হয়েছে সেসব পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির মধ্যে নিহিত কিছু সত্যের সন্ধান লাভ করতে পেরেছে। এভাবে সত্যের সন্ধান লাভের মাধ্যমে মানুষ অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করতে পেরেছে স্রষ্টার শক্তি ও মহিমা এবং তার বিশাল-বিপুল ক্ষমতা।

এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক যদি সৃষ্টির সঠিক অনুপাত এবং প্রকৃতির আইন-কানুনগুলোকে বিধিবদ্ধ করে না দিতেন তাহলে বিরূপ সৃষ্টির মাঝখানে টিকে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না। তাকে সরে যেতে হতো এবং নতুন সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হতো। তাই প্রকৃতিকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে মানুষের অস্তিত্ব এখানে সম্ভবপর হয়। যেসব জড় ও অজড় বস্তু তাদের গঠন কাঠামোর মধ্যে পরিব্যাপ্ত সেসব বস্তুকে শুধু আল্লাহ্ পাক যথার্থভাবে সৃষ্টি করেননি সেই সাথে মানুষের উপকার ও অগ্রগতিকে নিশ্চিত করেছেন।

সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করে আবেগ-আপ্লুত হয়ে তাঁর সমীপে মাথা নত করলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে।

আকাশে রাশির চক্র দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে

সূরা হিজর-১৫ : ১৬

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ.

And indeed We have set out the Zodiacal signs in the Heaven and made them fair-seeming to beholders.

নিশ্চয়ই আমরা আকাশে রাশি চক্রের নিদর্শন সৃষ্টি করেছি এবং তা দর্শকদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছি। (সূরা হিজর : ১৬)

সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে এক বছরে সূর্য একবার সম্পূর্ণভাবে আকাশ পরিভ্রমণ করে। সূর্যের এ বার্ষিক পরিভ্রমণ পথ একটি বিরাট চক্র। এ চক্রপথকে বলা হয় সৌর আয়নবৃত্ত (Ecliptic)।

যে বেড়িপথ আয়নবৃত্তের উভয়পার্শ্বে প্রায় ৯ ডিগ্রী বিস্তৃতি সৃষ্টি করে সূর্যের চারপাশে অতিক্রম করে চলে গেছে সে বেড়ি পথকে বলা হয় রাশি চক্র (Zodiacal bell)। এ বেড়ি পথের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সূর্যের বাৎসরিক পথ, চন্দ্র ও গ্রহসমূহ। সকল প্রাচীন সভ্যতায় এ বেড়ি পথকে ১২টি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগ ৩০ ডিগ্রী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেক ভাগের তারকা যখন একই ভিত্তিতে একত্রিত হয় তখন মনে হয় যেন ঐ তারকাগুলো ছবি অঙ্কন করে রেখেছে। যে ছবিগুলোকে বলা হয় রাশি চক্রের নিদর্শন বা সূচক। রাশি চক্রের ১২টি সূচক হলো :

গ্রীক	বাংলা	আরবি
১। Aries	মেষ	হামাল
২। Taurus	বৃষ	থ-অর
৩। Gemini	মিথুন	জজা
৪। Cancer	কর্কট	সারটান
৫। Leo	সিংহ	আসাদ
৬। Virgo	কন্যা	আজরা
৭। Libra	তুলা	মিজান

৮। Scorpion	বৃশ্চিক	আকরাব
৯। Sagitarrius	ধনু	কওস
১০। Capricornus	মকর	জেদ্দি
১১। Aquarius	কুম্ভ	দালওয়া
১২। Pisces	মীন	হাট
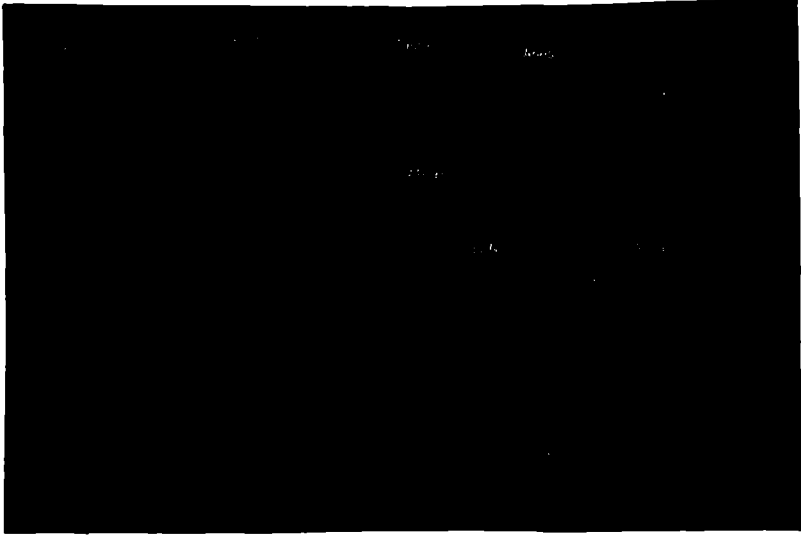
রাশি চক্রের নকশা

আয়াতে উল্লিখিত 'জাইয়ান্না' শব্দটি এসেছে 'তাজিয়িন' শব্দ থেকে। তাজিয়িন শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো সজ্জিত করা বা সাজানো। সুতরাং 'জাইয়ান্না-হালিন্নাজেরিন'-এর অর্থ হলো 'আমরা একে (আকাশ) দর্শকদের জন্য সজ্জিত করেছি।' জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল আকাশি বস্তু দ্বারা আকাশকে সজ্জিত করা হয়েছে। এ আকাশি বস্তুগুলো কেবলমাত্র রাত্রিকালেই দেখা যায়। কোনো উৎসবের দিনে ব্যাপক আলোক সজ্জা বহু সংখ্যক দর্শককে আকৃষ্ট করে। কিন্তু রাত্রিকালীন আকাশের সৌন্দর্য মহিমা যথাযথভাবে দর্শকরা মূল্যায়ন করতে পারতো যদি আকাশের সাজ-সজ্জা নিত্যদিনের ঘটনা না হয়ে মাঝে মধ্যে ঘটতো।

পৃথিবী প্রাকৃতিক সম্পদের আঁধার

সূরা হিজর-১৫ : ২১

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ.

And there is not a thing but with Us are the stores thereof. And We send it not down except in a known measures.

এমন কোনো বস্তু নেই যার মজুদ আমাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়। আর আমরা তা পরিমিত পরিমাণ ব্যতীত পাঠাই না। (সূরা হিজর : ২১)

এ আয়াতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে।

১. পৃথিবীতে যেসব সম্পদের মজুদ আমরা দেখি তা কেবল আল্লাহ্ পাকের।

২. তিনি মানুষের প্রয়োজন অনুসারে ঐসব সম্পদ পরিমিতভাবে সরবরাহ করে থাকেন।

৩. নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির মাধ্যমে ঐসব সম্পদ মানুষের নিকট প্রেরণ করা হয়।

প্রাথমিকভাবে এসব বিষয় আমাদের কাছে বোধগম্য না হলেও গভীরভাবে চিন্তা করলে এসব উক্তির তাৎপর্য বেশ প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে।

স্বর্ণ, লৌহ, মূল্যবান পাথর তথা বিভিন্ন ধরনের খনিজ সম্পদ নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এসব সম্পদ আহরণ করে মানুষ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ঐগুলো রূপান্তর করে থাকে এবং বিক্রয় করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এরূপ পানি, খাদ্য এবং শক্তি আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত সম্পদ, যার দ্বারা জীবন রক্ষা করে জীবন অতিবাহিত করা যায়। এ প্রেক্ষিতে এটা অনুভব করা খুবই সহজ ব্যাপার যে, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। আমরা আমাদের চারপাশে যেসব শাক-সবজী, বৃক্ষ-লতা দেখতে পাই সেগুলো সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ (Photosinthesis) প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে। গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া ও অন্যান্য হালাল প্রাণী আমাদের প্রোটিন খাদ্যের উৎস। এসব প্রাণী শাক-সবজী খেয়ে জীবন ধারণ করে। সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত হয় এবং সেই বাষ্প উপরে উঠে মেঘের সৃষ্টি করে। মেঘ থেকে যে বৃষ্টি পড়ে এবং পাহাড়ের মাথায় যে বরফ জমা থাকে সেই বরফ গলা পানি ও বৃষ্টির পানি অতিশয় বিশুদ্ধ। উচ্চ পর্বতের মাথায়

যে বরফ জমা হয় তা জলীয় বাষ্প বাতাস দ্বারা প্রবাহিত হয়ে ঐসব পর্বতের মাথায় ঘনীভূত হয়ে জমাট বাধে।

থার্মোনিউক্লিয়ার পদ্ধতির মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপাদিত হয় সেই তাপ শক্তিকে সূর্য নিম্নদেশে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় ৪২,৮০,০০০ মেট্রিক টন সৌর বস্তু প্রতি সেকেণ্ডে শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। এই হারে সৌর বস্তু হারালেও সূর্য ১০০ বিলিয়ন বছরেরও অধিককাল ধরে কিরণ দান করে যাবে।

পৃথিবী যে পরিমাণ সৌর তাপ গ্রহণ করে সেই পরিমাণ সৌর তাপই বিস্ময়করভাবে সকল প্রাণের সমতা রক্ষা করে চলছে। যদি তাপ বিকিরণের পরিমাণ কম হতো তাহলে আমাদের পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে যেত এবং এখানে জীবন ধারণ করা অসম্ভব হতো। আবার সূর্যে তাপ যদি অধিক পরিমাণে বিকিরিত হতো তাহলে আমাদের পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে বালুকণায় পরিণত হয়ে যেত। মাটির তলদেশে যেসব জীবাশ্ম ও হাইড্রোকার্বন (তেল ও গ্যাস) জমা হয়ে আছে সেগুলো উৎপাদিত হয়েছে সৌরশক্তির মাধ্যমে। মেঘলাকাশের বিদ্যুৎ আবহাওয়ায় নাইট্রোজেন থেকে যে নাইট্রাইডস উৎপন্ন করে তা মাটিতে বহন করে নিয়ে আসে বৃষ্টির পানি। এ নাইট্রাইডস্ ফসলের সার হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং আল্লাহ্ পাক বিপুল সম্পদ প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জন্য স্টোর করে রেখেছেন। আমাদের প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তা অনুসন্ধান করে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা।

গবাদি পশু খাদ্য ও পোশাকের উৎস

সূরা নাহল-১৬ : ৫

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ.

And the cattle, He has created them for you; in them there is warm clothing and numerous benefits and of them (meat) you eat.

গবাদি পশু, তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন; তাদের মধ্যে রয়েছে গরম বস্ত্র এবং বহু উপকারিতা, যার কিছু সংখ্যককে তোমরা ভক্ষণ করে থাকো। (সূরা নাহল : ৫)

গবাদি পশু থেকে আমরা যেসব উপকার গ্রহণ করে থাকি সেসব উপকার সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে বর্ণনা দিয়েছেন। আরবি 'আনআম' শব্দটির অর্থ হলো সকল গো-জাতীয় প্রাণী। এ শব্দটি দিয়ে সকল চতুষ্পদ গৃহপালিত প্রাণীকেও বুঝানো হয়। তাই গরু, ছাগল, ভেড়া, উট, মহিষ ইত্যাদি পশু এর অন্তর্ভুক্ত। এসব প্রাণী থেকে আমরা যে উপকার লাভ করে থাকি সে উপকারকে এ আয়াতে দুই ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে, এক ভাগ তাদের চামড়া থেকে জাত, অপরভাগ গোশত থেকে জাত।

আরবি 'দিফয়ু' শব্দটির অর্থ হলো উটের লোম থেকে নির্মিত গরম কাপড়, গোশত, দুধ এবং শীত বস্ত্র আমরা গবাদি পশুর দেহ থেকে পেয়ে থাকি। এসব বস্ত্রগুলোও দিফ্য়ু শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ। এছাড়াও উটের লোম এবং ভেড়ার পশম থেকে আমরা গরম পোশাক-পরিচ্ছদ ও কম্বল পেয়ে থাকি। গৃহপালিত ভেড়া ও অন্যান্য প্রাণী থেকেও পশম সংগৃহীত হয়। পশমী কোটে উত্তাপ দান করে। পশম প্রধানত পাকানো সুতা নির্মাণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ পাকানো সুতাকে বলা হয় উল। উল দিয়ে নানা প্রকার পোশাক তৈরি করা যায়। এ পোশাকগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, পুলওভার, জাম্পার, মোজা, মাফলার, গ্লোবস্ ও অন্যান্য পশমী সামগ্রী।

এসব ছাড়াও চামড়ার বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। চামড়া থেকে যুগে যুগে বইয়ের কভার, গান-বাজনার যন্ত্রপাতি তৈরি হয়ে আসছে। শীত প্রধান দেশে চামড়ার পোশাক বেশ উপকারী। গরু, ছাগল, ভেড়া ও উটের মাংসের মধ্যে উচ্চ গুণসম্পন্ন

প্রোটিন বিদ্যমান। আরো যেসব উপকার গবাদি পশু থেকে আমরা পেয়ে থাকি তা নিম্নরূপ :

১. সুদূর অতীতকাল থেকে গরু ও মহিষকে জমি চাষের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও পৃথিবীর বৃহৎ অংশে গরু, ষাঁড়, উট ও ঘোড়াকে কৃষি কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২. উন্নয়নশীল দেশে ষাঁড় ও উটকে প্রায়ই মালপত্র বহনের কাজে, পশু গাড়ি টানার কাজে এবং যাত্রী বহনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩. ভারতীয় উপমহাদেশে এখনো গরু দিয়ে ধান মাড়াই ও গম মাড়াই করার কাজ সমাধা করা হয়।

৪. গরুর পরিত্যক্ত বস্তু বিশেষভাবে গোবর পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপক হারে সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বিশেষ করে গ্রামের লোকেরা গোবরকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

৫. গরুর শিং থেকে চিরুনী, বাঁট ও ঘর সাজানোর দ্রব্য তৈরি করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন রঙ সৃষ্টির রহস্য

সূরা নাহল-১৬ : ১৩

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ.

And whatsoever He has created for you on the earth of varying colours and from animals. In this is a sign for people who remember.

তিনি পৃথিবীতে তোমাদের জন্য বিভিন্ন রঙের যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে সেসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করে। (সূরা নাহল : ১৩)

চোখ ধাঁধানো রঙের সৌন্দর্যে দর্শকেরা অপার আনন্দ লাভ করে থাকে। এ অপার আনন্দ অনুভূতি ছাড়াও বিচিত্র রঙ নিঃসন্দেহে আল্লাহর মহিমা বহন করে। আর এ মহিমা ঐসব লোক উপলব্ধি করতে পারেন যারা দিবা-নিশি আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞানী নিউটনের মধ্যে বিভিন্ন রঙ সম্পর্কীয় উপলব্ধির উন্মেষ ঘটে। প্রিজমের (Prism) সাহায্যে নিউটন সাদা রঙের আলো কাঁচের মধ্যে সাতটি রঙ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ রঙগুলো হলো বেগুনী, নীল, অতি নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। এ রঙগুলোকে এককথায় VIBGYOR বলা হয়। এছাড়া নিউটনই প্রথম প্রাকৃতিক বস্তুর রঙের প্রকৃতিগত মানের ধারণা দিয়েছিলেন। এই প্রকৃতিগত মান সম্পর্কে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ পরবর্তী সময়ে রঙের প্রতিফলন পরিমাপের ক্ষেত্রে স্পেকট্রোফটোমিটার (Spectrophotometers)-এর উন্নতি সাধিত হলে নিশ্চিত হয়।

কোনো বস্তুর রঙ নির্ভর করে ঐ বস্তুর উপর পতিত আলোর প্রকৃতির উপর। একটি শুভ্র শালুক ফুল (White lily) সাদা দেখায় যখন তাকে সাদা আলোতে রাখা হয়। যখন তাকে লাল আলোতে রাখা হয় তখন লাল দেখায়। যখন নীল আলোতে রাখা হয় তখন নীল দেখায়। যখন সবুজ আলোতে রাখা হয় তখন তাকে সবুজ দেখায়। একটি নীল বস্তুকে নীল দেখায় যখন তাকে নীল বা সাদা আলোতে রাখা হয়। কারণ নীল বস্তু নীল রঙ বিচ্ছুরিত করতে পারে। কিন্তু একটি কালো বস্তু

কোনো রঙকে বিচ্ছুরিত করতে পারে না। বরং এই বস্তুটি সকল রঙকে আত্মীকরণ করে নেয়। আর এ কারণে তাকে সবসময় কালো দেখায়।

অস্বচ্ছ বায়বীয় বস্তুর মধ্যে দেহগত রঙের উৎপাদন খুবই জটিল ব্যাপার। ধাতব পদার্থে কিন্তু ততোটা জটিল নয়। অধিকাংশ অস্বচ্ছ বায়বীয় পদার্থের দেহে আলোর বিচ্ছুরণ ও আত্মীকরণের কম্বিনেশান থেকে তাদের রঙ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আকাশে যে আলোর বিচ্ছুরণ হয় এ বিচ্ছুরণ তারই অনুরূপ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান বায়ুমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা সীমিতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এ ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় Rayleigh Scattering। বিচ্ছুরণ বিপরীতভাবে তারতম্য ঘটায় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চতুর্থ শক্তি অনুসারে। নীল রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লাল রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে ক্ষুদ্র আকারের হয়। অতএব যখন লাল রঙের চেয়ে নীল রঙ অধিক পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ে তখন আকাশকে নীলাভ দেখায়। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সূর্যের আলো তার স্বল্পাকার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন অংশ নির্বাচিত পথে সূর্য থেকে নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলের মাধ্যমে আমাদের উপর ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য সূর্যের নিকটতম আকাশকে লাল দেখায়। অস্বচ্ছ ও বায়বীয় পদার্থের রঙ নির্ধারিত হয় নির্বাচিত বিচ্ছুরণ ও আত্মীকরণের ফলে।

প্রাণীজগতে যেসব রঙ দেখা যায় তা বিশেষভাবে উচ্চ পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বিষয়। বিজ্ঞানের আঙ্গিকে প্রাণীদের রঙের শারীরিক এবং রাসায়নিক ভিত্তি এবং তাদের গঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে। পালক কিংবা চুলের শুভ্রতা দেখা যায় এ কারণে যে, সুন্দরভাবে বিভক্ত দৈহিক গঠন বস্তুর পৃথক পৃথক অবস্থান থেকে উদ্ভূত সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ রঙের প্রতিফলের কারণে। এ ধরনের শুভ্রতা বরফের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সূর্যের আলোয় মানুষের ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর চুলের ঔজ্জ্বল দেখা যায় বাধাপ্রাপ্ত রঙের কারণে। বহু দৃষ্টান্তে প্রাণীরাজ্যে নীল রঙের প্রকাশ (চোখের নীল রঙ) ঘটে চরম পর্যায়ে বিক্ষিপ্ত Colloidal Systems-এর দ্বারা প্রতিফলিত আলোর বিচ্ছুরণের মাধ্যমে।

প্রাণীদের দেহে যে বিভিন্ন ধরনের রঙ দেখা যায় সেসব রঙের অধিকাংশই আত্মরক্ষামূলক। এ কারণে প্রাণীরা শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে নিজেদের গোপন করে রাখতে পারে। ক্রান্তিয় অরণ্য অঞ্চলে প্রত্যেক গাছের কাণ্ডের নিজস্ব দর্শনযোগ্য রঙ আছে। এ রঙ বাদামী ও লাল রঙ থেকে সাদা রঙে রূপান্তরিত হয়। যেসব পোকামাকড় এসব কাণ্ডে আশ্রয় নেয় তারা তাদের আবাসস্থলে কিছু রঙ সৃষ্টি করে শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখে। রঙ চোখের মণি এবং কেন্দ্রীয় স্নায়বিক ব্যবস্থাকে সূর্যের কিরণ থেকে রক্ষা করে। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় তাপ

ধরে রাখা খুবই প্রয়োজনীয় ব্যাপার। মানুষের সাদা পোশাক এ তাপ ধরে রাখার পক্ষে সহায়তা দান করে। সাদা পোশাক তাপের বিকিরণকে বাধা দান করে। অনুরূপভাবে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় মানুষের দেহের কালো রঙ বাইরের তীব্র তাপ থেকে তাদের দেহকে রক্ষা করে। ময়ূরের মতো কিছু পুরুষ পাখি তাদের রঙের চাকচিক্য দিয়ে স্ত্রী পাখিদের প্রেমে আকৃষ্ট করে।

ক্লোরোফিল প্রাথমিকভাবে এমন একটি রঙ যা অধিকাংশ উদ্ভিদের মধ্যে সবুজ রঙকে সঞ্চারিত করে এবং প্রকৃতির মধ্যে এটি একটি প্রভাবশালী রঙ। ক্যারোটেনয়ডস (Carotenoids) এর মতো উদ্ভিদ রঙ হলুদ থেকে লাল রঙে রূপান্তরিত করে। এ্যানথোসিয়ানিন (Anthocyanins) বিভিন্ন ধরনের লাল ও নীল রঙ সৃষ্টি করে। ফুলের উজ্জ্বল রঙ কীটপতঙ্গ ও পাখিদের আকৃষ্ট করে। এসব কীটপতঙ্গ ও পাখি পরাগায়ণ ঘটায়।

বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে রঙের পার্থক্য বিশেষ করে মানুষ ও যমজ শিশুদের মধ্যে এ পার্থক্য খুবই বিস্ময়কর। DNA হলো জীবনের ব্লু-প্রিন্ট বা নীল নক্শা। এ DNA এর মধ্যে যে জিন বিদ্যমান থাকে সে জিনের রঙের তারতম্যের হদিস উদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব।

অতএব মহান আল্লাহ পাক বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে বিচিত্র ধরনের রঙের উদ্ভব ঘটিয়েছেন এবং ঐ রঙগুলো যে কি ধরনের কার্যকারিতা সাধন করে থাকে তা বুঝতে পারলে আল্লাহর মহিমাকে বুঝা যাবে। যারা এ মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন তারা গভীর আগ্রহের সঙ্গে আল্লাহ পাককে স্মরণ করে থাকেন।

মেমারী গ্লাণ্ডের সাহায্যে দুধ উৎপন্ন হয়

সূরা নাহল-১৬ : ৬৬

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ.

And Verily! In the cattle, there is a lesson for you. We give you to drink that which is in their bellies, from between excretions and blood, pure milk palatable to the drinkers.

প্রকৃতপক্ষে, গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। আমরা তোমাদের পান করতে দিই তাদের উদরস্থিত মল ও রক্তের মাঝখান থেকে নিঃসৃত বিশুদ্ধ দুধ যা পানকারীদের কাছে অতিশয় সুস্বাদু। (সূরা নাহল : ৬৬)

এ আয়াতে দুধ পান করার যে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে তা আল্লাহ্ পাকের করুণারই একটি দৃষ্টান্ত। শিশুকালে শিশুরা প্রধানত মায়ের দুগ্ধ পান করে পরিপুষ্ট হয়। পরবর্তী সময়ে তারা গরুর দুগ্ধ পান করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সাধন করে থাকে।

জন্মের পর বেশ কিছু দিন ধরে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা মায়ের স্তন-দুগ্ধ পান করে জীবন ধারণ করে থাকে। দুধ একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ খাদ্য। মানুষের পুষ্টির জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ এতে থাকে উচ্চমানের প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং প্রয়োজনীয় সব ভিটামিন। অর্থাৎ ভিটামিন-এ, থায়ামিন, রিবোফ্লাভীন, ভিটামিন-সি ও ডি। অফুটন্ত দুধের মধ্যে প্রতি ১০০ মিলিটিলারে ক্যালরির পরিমাণ থাকে ৬৭ ভাগ। সাধারণত এর মধ্যে পানি থাকে ৮৭%, প্রোটিন থাকে ৩.৩%, চর্বি থাকে ৩৬%, কার্বোহাইড্রেট থাকে ৪.৭% এবং ক্যালসিয়াম থাকে ০.১২%। দুধ ফুটালে কেবল ভিটামিন সি ও থায়ামিন নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য ভিটামিন অটুট থাকে।

গাভী দুগ্ধ দান করে থাকে। এ দুগ্ধ বেরিয়ে আসে মেমারী গ্লাণ্ডের (Mamary gland) উপস্থিতিতে এ্যালভোলার সেলের (Alveolar cells) সাহায্যে। দেহের আভ্যন্তরীণ পদ্ধতির মাধ্যমে স্তনে যে রক্ত সরবরাহ্ হয়ে থাকে সে রক্ত থেকে দুধের গঠন উপাদান তৈরি হয়। সুতরাং গরুর দুধ তৈরি হয় তাদের খাদ্যে যে উপাদান থাকে সে উপাদান থেকে। গরু যে খাদ্য খায় তা হজম হবার পর যে

অবশিষ্ট বস্তু থাকে সেটা গোবর হিসেবে বেরিয়ে আসে। খাদ্যের যে সার নির্যাস রক্তের সাথে মিশে যায় তা পরিশেষে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছায়। হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দ দিয়ে অক্সিজেন প্রাপ্ত রক্ত পুষ্টি গুণসহ দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয়। এভাবে পুষ্টি গুণ স্তনের মেমারী গ্লাণ্ডে পৌঁছে যায়। এখানকার এ্যালভোলার সেল প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদানগুলোকে ধরে রেখে দুধ উৎপাদন করে এবং শিরার মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। সুতরাং এ কারণেই এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুধ উৎপাদিত হয়ে থাকে খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ এবং রক্তের মাঝামাঝি অবস্থান থেকে। মেমারী গ্লাণ্ডের সাহায্যে যে দুধ উৎপাদিত হয় তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। মানুষের দুধে যে পুষ্টি গুণ থাকে তদপেক্ষা গরুর দুধে প্রোটিন থাকে দুগুণ বেশি। ক্যালসিয়াম থাকে চারগুণ বেশি এবং ফসফরাস থাকে পাঁচ গুণ বেশি।

বিস্ময়কর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দুধ উৎপন্ন হয়। দুধের প্রবাহ এমন একটি জটিল রাসায়নিক দুগ্ধ উৎপাদন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে যা মানুষের কাছে এখনো অজ্ঞাত। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ৪০০ আউন্স রক্ত স্তনের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে মাত্র ১ আউন্স পরিমাণ দুধ উৎপন্ন হয়। যাহোক, রক্তের মধ্যে যে এ্যামিনো এসিড থাকে তার গঠন-কৌশল দুধের মধ্যে যে জটিল প্রোটিন থাকে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। রক্তের মধ্যে যে গ্লুকোজ থাকে তা দুধের মধ্যে যে ল্যাকটোজ থাকে তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও সে সম্পর্ক বেশ দূরের। দুধের মধ্যে যে চর্বি থাকে তা রক্তের মধ্যকার চর্বির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

সুতরাং পরম হিতৈষী আল্লাহ পাক পরম করুণাময় যিনি গবাদি পশুর মধ্যে বিস্ময়কর পদ্ধতিতে দুধ উৎপাদন করেন। আর এ দুধ মানুষকে পান করতে দেন পুষ্টি সাধনের জন্য।

খেজুর ও আঙ্গুর ফলের উৎপাদন

সূরা নাহল-১৬ : ৬৭

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

And from the fruits of date-palms and grapes, you derive strong drink and a goodly provision. Verily therein is indeed a sign for a people who have wisdom.

খেজুর ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা উত্তম পানীয় এবং খাদ্য লাভ করে থাক। এতে অবশ্যই জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা নাহল : ৬৭)

খেজুর ও আঙ্গুর এ দু'টি ফল আরবদের জন্য খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দিয়ে থাকে। খেজুর গাছ প্রায় ৪০০০ বছর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও আরবদেশে চাষ হয়ে আসছে। ১০-১৫ বছর বয়স হলে খেজুর গাছে খেজুর ধরে। খেজুর ফল থোকায় থোকায় ঝুলতে দেখা যায়। ১০০ থেকে ২০০ বছর পর্যন্ত খেজুর গাছ বেঁচে থাকে এবং ফল দান করে। উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে খেজুর হচ্ছে প্রধান খাদ্য। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সময়কালে আরবদের নিকট এ খেজুরই ছিলো প্রধান খাদ্য।

এ উপমহাদেশে এবং আমাদের দেশে যে খেজুর উৎপাদিত হয় তা ততোবেশি পুরু নয়। তবে আমাদের দেশের কৃষকেরা খেজুর গাছের গলা চেঁচে খেজুর রস বের করে এবং গলায় হাঁড়ি ঝুলিয়ে রস সংগ্রহ করে। সারারাত ধরে হাঁড়ির মধ্যে ফোটায় ফোটায় রস ঝরে জমা হয়। এ রস সুস্বাদু এবং মিষ্টি এবং এ রস পান করলে দেহমন সতেজ হয়ে উঠে। আবার রসে তাপ দিয়ে গাঢ় আঠালো গুড়ও তৈরি করা হয়।

আঙ্গুর গাছ এক ধরনের লতা-বৃক্ষ যা কোনো না কোনো অবলম্বনের সাহায্যে উপরের দিকে উঠে এবং তাতে আঙ্গুর ফল ধরে থোকায় থোকায় ঝুলে থাকে। আমাদের দেশে আজকাল ব্যাপকভাবে আঙ্গুর ফলের চাষ করা হয়। আরব দেশের মরু এলাকায় আঙ্গুর জন্মায়। ইতিহাসের প্রারম্ভিককাল থেকে আঙ্গুরকে মরুদেশীয়

ফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ ফল থেকে প্রচুর পরিমাণে মধু তৈরি করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক উল্লেখ করেছেন যে, খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষের পানীয় ও পুষ্টিকর খাদ্যের মূল উৎস। আরবি 'শাকার' শব্দটি এ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো নেশা উদ্রেককারী পানীয়। এ পানীয় খেজুর ও আঙ্গুলের রসকে গেঁজিয়ে তৈরি করা হয়। আরব দেশের লোকেরা আঙ্গুর ও খেজুরের রস থেকে এক ধরনের পানীয় উৎপন্ন করে থাকে যার মধ্যে নেশাজাতীয় কিছু থাকে না। এ নেশাহীন পানীয়কে বলা হয় "নাবিজ"।

সুতরাং আল্লাহ্ পাক আঙ্গুর ও খেজুর এ দু'টি ফল সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। আঙ্গুরের রসে যে গ্লুকোজ থাকে তা সরাসরি রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কাজেই এ রস নিঃসন্দেহে পুষ্টির উৎস। অনুরূপভাবে যে পানীয়কে 'নাবিজ' বলা হয় সে নাবিজও পুষ্টিকর পানীয় হিসেবে বেশ সমাদৃত।

মধু বহু রোগের প্রতিশেধক

সূরা নাহল-১৬ : ৬৮-৬৯

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ. ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

And your Lord inspired the bees, saying : 'Take you habitations in the mountains and in the trees and in what they erect.'

'Then, eat of all fruits and follow the ways of your Lord made easy (for you).' There comes forth from their bellies, a drink of varying colour where in is healing for men. Verily, in this is indeed a sign for people who think.

আর আপনার প্রভু মধু মক্ষিকাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, বলেছেন– তোমরা আবাসন গ্রহণ করো পাহাড়-পর্বতে, বৃক্ষসমূহে এবং নির্মিত অট্টালিকায়। অতঃপর সকল ফল থেকে ভক্ষণ করো এবং তোমাদের প্রভুর পথ অনুসরণ করো যা তোমাদের জন্য সহজ। তাদের পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য যারা চিন্তা করে। (সূরা নাহল : ৬৮-৬৯)

এ দুই আয়াতে মৌমাছিদের মধু সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে উচ্চমানের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত মৌমাছিদের প্রবৃত্তি সম্পর্কে আমাদের অবগত করা হয়েছে। এ প্রবৃত্তি যথাযথ স্থানে মৌমাছিদের মৌচাক নির্মাণে সহায়তা করে। এরপর মৌমাছিদের মধুর উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। এতদসঙ্গে মৌমাছিরা কিভাবে মধু সংগ্রহ করে জমা করে তাও বিবৃত হয়েছে। পরিশেষে মৌমাছিদের পেট থেকে কিভাবে বিভিন্ন রঙের মধু নিঃসৃত হয় তা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ মধু মানুষের বহু রোগের প্রতিকার করে থাকে।

মৌচাক নির্মাণ : মৌমাছি কলোনীর সামাজিক কাঠামো খুব ভালোভাবে সুগঠিত। মৌমাছিরা স্থানভেদে তাদের মৌচাক নির্মাণ করে থাকে। মৌচাকগুলো বিভিন্ন ধরনের হয়। কিছু মৌচাক পাহাড়ের গাত্রে, কিছু বৃক্ষ শাখায় ঝুলন্ত অবস্থায় আর

কিছু মৌচাক দালান-কোঠার দেয়ালে গড়ে ওঠে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো মৌমাছিরা এ তিনটি স্থানে মৌচাক নির্মাণ করতে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। মৌচাকে মৌমাছিরা কলোনী নির্মাণ করে বাস করে। মৌচাক তৈরি হয় খাড়াভাবে এবং তার কক্ষগুলো থাকে আড়াআড়িভাবে। প্রত্যেক মৌচাক দুই কক্ষবিশিষ্ট এবং মাঝখানের মোম এলাকা থেকে উভয়দিকে বিস্তৃত। মোম তৈরি হয় মৌমাছির উদরের উপরের অংশে অবস্থিত গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালার দ্বারা। মৌমাছিরা মোমকে চর্বন করে এবং মুখের লালাতে মিশিয়ে পাতলা বেড়ি নির্মাণ করে। যার ফলে মৌচাকে বিভিন্ন ঘর তৈরী হয়। এটা খুব মজার ব্যাপার যে, মৌমাছিরা আশ্চর্যজনকভাবে যে ষড়ভূজ ক্ষেত্র (ছয় কোণ বিশিষ্ট কক্ষ) রচনা করে তা খুব কার্যকরভাবে স্বল্প জায়গার মধ্যে নির্মিত হয়ে থাকে। এ ছয় কোণ বিশিষ্ট কক্ষের মধ্যে মধু সঞ্চিত হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে একটি মৌচাকে একজন রাণী মৌমাছি, কিছু পুরুষ মৌমাছি এবং কিছু স্ত্রী মৌমাছি বা কর্মী মৌমাছি থাকে। মৌচাকের অভ্যন্তরে সৃষ্ট ছয় কোণবিশিষ্ট কক্ষের আকার দুই ধরনের। ছোট আকারের কক্ষগুলোতে কর্মী মৌমাছি অবস্থান করে। এতে মধু ও ফুলের পরাগ সঞ্চয় করা হয়। বড় কক্ষগুলোতে পুরুষ মৌমাছি অবস্থান করে। কোনো নির্দিষ্ট ঋতুতে মৌচাক যখন অধিক মৌমাছি দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন স্ত্রী মৌমাছি বা রাণীর জন্য বিশেষ ধরনের কক্ষ নির্মাণ করা হয়। এ কক্ষগুলোতে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছির বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে। এ কক্ষগুলো আড়াআড়ি না হয়ে খাড়া আকারের হয়ে থাকে। এক পাউণ্ড মোমের দ্বারা ৩৫ হাজার কক্ষ তৈরি হতে পারে এবং কক্ষগুলোতে মধু সঞ্চিত হতে পারে ২২ পাউণ্ডের মতো।

মধুর উৎস : মাত্র এক পাউণ্ড মধু উৎপাদন করার জন্য ৫৫০টি মৌমাছির ২.৫ মিলিয়ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে হয়। এ মধু সংগ্রহের জন্য তাদের ফুলে ফুলে ভ্রমণ করতে হয় প্রায় ৮০ হাজার বার। মৌমাছির খাদ্য হলো মধু ও পরাগ। মধু ও পরাগ মৌমাছিরা সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরনের ফুল থেকে। যখন ফুল পাওয়া যায় না তখন তারা ফলের রস সংগ্রহ করে। গড়ে একটি মৌচাকে ৩০ হাজার থেকে ৬০ হাজার কর্মী মৌমাছি থাকে। এ মৌমাছিগুলো জন্ম থেকে ২১ দিনের মাথায় কর্মক্ষম হয়ে উঠে। তখন মধু ও পরাগ সন্ধানের কাজে তারা বাইরে বের হয়। মধু ও পরাগের সন্ধান পেলে তারা ফিরে এসে অন্যান্য কর্মী মৌমাছিদের খবর দেয়। মৌমাছিদের জন্য এটা প্রয়োজন যে, তারা ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের সীমানায় খাদ্যের অনুসন্ধান করে থাকে যেখানে খাদ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ বিদ্যমান। যে পদ্ধতিতে মৌমাছিরা তাদের সহযোগী কর্মীদের মধু প্রাপ্তির খবর জানায় সে

পদ্ধতিকে বলা হয় 'মধুনৃত্য" (honey dance)। মৌমাছিদের কার্যক্রম নিয়ে পবিত্র কোররআনে যে আলোচনা হয়েছে তাতে তাদেরকে প্রভুর পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে।

মধু বহু রোগের প্রতিকার করে : মধু এক ধরনের সুমিষ্ট আঠালো পদার্থ। এটি বিভিন্ন ধরনের চিনির দ্রবণমাত্র। মধুর রঙ গাঢ় বাদামী থেকে সোনালী হলুদ বর্ণে হয়ে থাকে। ফুল থেকে মৌমাছিরা যে মধু সংগ্রহ করে মৌচাকে তা সঞ্চিত হয়। সঞ্চিত মধু পরবর্তীতে মৌমাছিদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। মধু প্রাচীনতম একমাত্র প্রাকৃতিক মিষ্ট পদার্থ। ফুলে মধুর গুণাবলী অনুসারে মধুর গন্ধ, রঙ ও গঠনের পার্থক্য নির্ণিত হয়। ফুলের উৎসের ধরনের উপর নির্ভর করে মধুর গন্ধ ও বর্ণের ধরন। টানিক এসিড (Tannic acid) মধুর কালচে বর্ণ ও তীক্ষ্ম স্বাদের কারণ বলে মনে করা হয়। হলুদ বর্ণের মধু সরষে থেকে আহরিত মধুর বৈশিষ্ট্য বহন করে। মধুর রঙ হলুদ বর্ণের হয় ক্যারোটিন (Carotin) বা ঝেনতোফিল (Xanthophill)-এর কারণে। সাদা ত্রিফলা গাছের মধু গোলাপ বর্ণের হয় এ্যানথোসায়ানিন (Anthocyanin)-এর কারণে। মৌচাকে পানির আধিক্য বাষ্পীভূত হয়ে বিপরীতভাবে শর্করাজাতীয় পদার্থ একদানা বিশিষ্ট স্যাকারিন যথা, লেভ লুজ ও ডেক্সট্রোজে পরিবর্তিত হয়। মধুতে গড়ে লেভলুজ ৪০.৫%, ডেক্সট্রোজ ৩৪%, সুক্রুজ ১.৯%, পানি ১৭.৭%, ডেক্সট্রিন ১.৯% এবং ছাই (ash) ০.১৮% থাকে। এছাড়া মধুতে অন্যান্য উপাদান থাকে ২-৬%। যেমন অন্যান্য উপাদানের মধ্যে থাকে ভিটামিন-সি ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স, এনজাইম, খনিজ পদার্থ (কপার, ক্যালসিয়াম ও লৌহ), সিলিকা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরিন, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস, সালফার, এ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। মধুতে অধিক পরিমাণে তাপ দিলে তার গন্ধ ও পুষ্টি গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণ মধুকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে মধুতে মানুষের রোগ নিরাময় করার ঔষধী গুণ আছে। মধুর নিম্নলিখিত ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। বেশ কিছু ঔষধ কোম্পানী মধুকে শিশুর খাদ্য হিসেবে অনুমোদন করেছেন। শিশুরা মধু পান করলে ক্যালসিয়াম লাভ করে থাকে এবং হজমের গণ্ডগোল দূরীভূত হয়। কারণ মধুতে থাকে স্বাভাবিক চিনি।

২। এনজাইম, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু মধুতে বিদ্যমান। এসব বস্তু মানুষের পুষ্টি সাধনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

৩। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বহু রকমের রোগের প্রতিষেধক হিসেবে মধু খেতে বলতেন। বিশেষ করে অম্লতা দেখা দিলে লোকেরা মধু পান করতেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে চিকিৎসক লরসেন ১২৫ গ্রাম মধু সেবন করার জন্য সুপারিশ করেছেন। মধুতে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স, থায়ামিন এবং বহু ধরনের চিনি বিদ্যমান থাকে তা যকৃত রোগের বিশেষ উপকার সাধন করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডিগির বলেছেন, "অম্ল রোগের চিকিৎসায় মধু যে বিরাট অবদান রাখে তা আজকের দিনে আবিষ্কৃত হয়েছে।" অম্ল রোগের কোপে পড়ে শরীর ভেঙ্গে গেলে মধু পান করে তা পুনর্গঠন করা যায়। কারণ মধু ভিটামিনের অভাব পূরণ করে এবং অম্লতা উপশম করে।

৪। পোড়া ঘা ও ছেঁড়া ঘায়ের চিকিৎসায় মধু ব্যবহার করা হয়। কারণ মধুতে কিছু এ্যান্টিসেপটিক গুণাবলী আছে।

সুতরাং মধু রোগ নিরাময়ে যে বিরাট অবদান রাখে তা বিশেষভাবে গবেষণার বিষয়। নিবিড়ভাবে গবেষণায় নিয়োজিত হলে মধুর অনেক গুণাবলী বেরিয়ে আসবে।

কর্ণ, চক্ষু ও হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা

সূরা নাহল-১৬ : ৭৮

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

And Allah has brought you out from the wombs of your mothers while you know nothing. And He gave you hearing, sight and hearts that you might give thanks (to Allah).

আর আল্লাহ্ পাক মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদের বের করেছেন যখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং হৃৎপিণ্ড দান করেছেন যেনো তোমরা তাঁর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারো। (সূরা নাহল : ৭৮)

মায়ের গর্ভ থেকে মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এটি একটি বাস্তব ঘটনা। এ সময় শিশুটি সম্পূর্ণ অসহায়। কিছুই সে জানে না। তারপর শিশুটিকে তার পিতামাতা আত্মীয়স্বজন এবং সেবিকারা দেখাশোনা করে এবং খাদ্য, বস্ত্র ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করে থাকে। এখানে আল্লাহ্ পাক বলছেন যে, তিনি শিশুটিকে শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি এবং একটি হৃৎপিণ্ড দান করেছেন এবং এগুলোকে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

কানের দ্বারা শ্রবণ কাজ সম্পন্ন হয়। একটি শিশু সাধারণভাবে জন্মের সময় কান নিয়ে জন্মায় এবং তার সাহায্যে শ্রবণ কাজ সমাধা করে। কানের তিনটি প্রধান ভাগ আছে। যথা, বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ এবং অন্তঃকর্ণ। মাতৃগর্ভে থাকার চার সপ্তাহের মধ্যে কানের আভ্যন্তরীণ অংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিশ সপ্তাহের মধ্যে তা পূর্ণতা লাভ করে। মধ্যকর্ণটি দুইটি শাখা খিলান থেকে প্রাপ্ত। এ শাখা খিলান দুইটি দেখা দেয় যথাক্রমে গর্ভধারণের ২৪ ও ২৮ দিনের মাথায় এবং এগুলো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ভ্রূণের ফীট্যাস জীবনের শেষের দিকে। মধ্যকর্ণে অতি প্রয়োজনীয় তিনটি অস্থি বিদ্যমান। এ তিনটি অস্থির নাম ম্যালিয়াস (Malleus), ইনকাস (Incus) ও স্টেপিস (Stapes)। এগুলো শ্রবণের ক্ষেত্রে সহায়তা দান করে। এ অস্থিগুলোর সাহায্যে জন্মের পর থেকেই শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বহিঃকর্ণ বৃদ্ধি পায় গলার উপরের অংশে। এ বৃদ্ধি শুরু হয় ছয় সপ্তাহ থেকে। কিন্তু যখন

চোয়ালের হাড় বড় হতে থাকে তখন কানের অরিকল (Auricle) বা বহিঃঅংশ মাথার দিকে উঠে যায় এবং ৩২ সপ্তাহে চোখের সমান উচ্চতায় উঠে আসে।

মাতৃগর্ভে চার সপ্তাহের মধ্যে চোখগুলো বাড়তে থাকে এবং ৩২ দিনের মাথায় দৃষ্টি বলয় তৈরি হয়। ছয় থেকে আট সপ্তাহের মাথায় চোখের স্নায়ুতন্ত্র তৈরি হয়। চোখের স্নায়ু সুতার আচ্ছাদন জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ থাকে না। জন্মের পর দশ সপ্তাহের মধ্যে শিশু যখন আলোর মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চার করে তখন ঐ স্নায়ু সুতার আচ্ছাদন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। চোখের দুই অংশের পাতা এক সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রায় দশ সপ্তাহ পর্যন্ত একে অপরকে ধরে রাখে এবং এ একই অবস্থায় থাকে প্রায় ২৬ সপ্তাহ। অবশ্য ২৬ সপ্তাহ পর চোখের পাতা দুইটি পৃথক হয়ে যায়। একটি নবজাত শিশুর চোখের আকার হয়ে থাকে একজন বয়সপ্রাপ্ত ব্যক্তির চোখের আকারের তিন ভাগের দুই ভাগের সমান। প্রথম বছরে চোখ দ্রুত বাড়ে। তারপর সাবালক হয়ে ওঠা পর্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়ে।

শিশুরা প্রথম কয়েক সপ্তাহ ধরে ভালোভাবে দেখতে পায় না। এ সময় তাদের দৃষ্টিতে থাকে শূন্যতা। কারণ এ সময় তাদের চোখের রেটিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হলুদ বর্ণের স্পট যাকে Macula বলা হয় তা অবদমন অবস্থায় থাকে। এখানে রেটিনা খুব পাতলা এবং মোচাকৃতির গঠনে তৈরি। সমস্ত রেটিনাব্যাপী Rod ও Cone খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। কিন্তু যেখানে অপটিক নার্ভ প্রবেশ করে সেখানে Rod এবং Cone থাকে না। যেখানে Rod ও Cone থাকে না সেখানে অন্ধকার থাকে। এ অন্ধকার এলাকাকে বলা হয় ব্লাইণ্ড স্পষ্ট। একজন লোক তখনই দেখতে পায় যখন প্রতিফলিত আলোক রশ্মি আবৃত চোখের মণিতে প্রবেশ করে। ভ্রূণের ফীট্যাস পর্যায়ে হৃৎপিণ্ড ও রক্ত সঞ্চালন বলতে গেলে বলতে হবে যে, অক্সিজোন সমৃদ্ধ প্লাসেন্টা (Placenta) থেকে ভ্রূণের নাভি সংশ্লিষ্ট শিরায় বাহিত হয়। অর্ধেক রক্ত পর্টাল সাইনাস (Portal sinus) এর মধ্য দিয়ে লিভার সাইনুসয়ড (Liver Sinusoid) অতিক্রম করে। বাকি রক্ত Ductus venosus এর মধ্য দিয়ে লিভার পার হয়ে ইনফেরিয়র ভেনা ক্যাভাতে (IVC) পৌছায়। এভাবে রক্তপ্রবাহ নিয়মিত হয়ে থাকে Ductus Venosus এর অন্তর্গত Sphincter দ্বারা। লিভার ও Venosus-এর রক্ত অবশেষে ivc (Inferior vena cava) তে প্রবেশ করে মিশ্রিত হয়।

সুতরাং রক্ত ডান অলিন্দে (Right atrium) প্রবেশ করে অক্সিজেনবিহীন রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু তবুও তা মোটামুটি অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়েই থাকে। দেহের ঊর্ধ্বভাগ থেকে রক্ত সুপেরিয়র ভেনা ক্যাভার (Superior vena cava) মধ্য

দিয়ে ডান অলিন্দে এবং নিম্নভাগ থেকে ইনফেরিয়র ভেনা ক্যাভার মধ্য দিয়ে অধিকাংশ রক্ত বাম অলিন্দে (Left atrium) প্রবেশ করে। বাম অলিন্দের মধ্যে অধিক রক্ত ফুসফুস থেকে অক্সিজেনহীন অবস্থায় এসে মিশ্রিত হয়।

ভ্রূণের (Foetus) ফুসফুস রক্ত থেকে অক্সিজেন শুষে নেয়। কারণ গর্ভের মধ্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো সুযোগ নেই। তারপর রক্ত বাম নিলয়ে (Left ventricle) গিয়ে পৌছে এবং সেখান থেকে ধমনীর (Artery) মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। IVC থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ সামান্য পরিমাণ রক্ত ডান অলিন্দের মধ্যে থেকে যায় যা SVC (superor vena cava)-এর শিরা রক্তে সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের ডান নিলয়ে গিয়ে পৌছে। এখান থেকে রক্ত ফুসফুসের কাণ্ডে গিয়ে হাজির হয়। ফুসফুসে রক্ত প্রবাহ খুব কম প্রায় ৫-১০%। কারণ গর্ভে ফুসফুস কাজ করে না। হৃৎপিণ্ডের রক্তবাহী ধমনীর রক্ত ছড়িয়ে পড়ে তার পরিমাণ ৫৮% এবং এ রক্ত অক্সিজেন সমৃদ্ধ। এ রক্তের অর্ধেক দেহের নিম্নাংশ সঞ্চারিত হয় এবং অপর অর্ধেক নাভিস্থ ধমনীর মাধ্যমে প্লাসেন্টায় পৌছে। এখানে রক্ত পুনরায় অক্সিজেন প্রাপ্ত হয়।

জন্মের অব্যবহিত পরেই শিশুর রক্ত সঞ্চালনকারী ব্যবস্থায় বড় রকমের সমন্বয় ঘটে থাকে। এ সময় প্লাসেন্টায় রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং শিশু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করে।

সুতরাং এটা খুবই স্পষ্ট যে, জন্মের সাথে সাথে নবজাতকের কান, চোখ এবং হৃৎপিণ্ড পরিপূর্ণভাবে কাজ করে না। তবে জন্মের অল্প সময়ের মধ্যে দেহের এসব অঙ্গ কর্মক্ষম হয়ে উঠে। হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিকভাবে কাজ করা শুরু করে। এটা খুবই মজার ব্যাপার যে, নবজাত শিশু প্রথমে কিছুই জানে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সবকিছু শিখতে থাকে এবং তার এ শিক্ষার সাথে সাথে শ্রবণ ও দর্শন শক্তি অতি প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। অতএব এ আয়াতের মর্মার্থ হলো এ যে, একটি শিশু যখন জন্মলাভ করে তখন সে থাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ সময় পরম হিতৈষী করুণাময় আল্লাহ পাক তার চোখ, কান ও হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা দান করে থাকেন। এর ফলে শিশু অল্প সময়ে সবকিছু শিখে নিতে পারে।

পাখি কিভাবে আকাশে উড়ে

সূরা নাহল-১৬ : ৭৯

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللّٰهُ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

Do they not see the birds held (flying) in the midst of the sky? None holds them but Allah verily in these are clear proofs and signs for people who believe.

তারা কী মধ্য আকাশে ভাসমান (উড়ন্ত) পাখিদের প্রত্যক্ষ করে না? আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কেউ এভাবে তাদের ধরে রাখতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী লোকদের জন্য এখানে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। (সূরা নাহল : ৭৯)

এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পাকের করুণার উপর নির্ভর করে পাখিরা বিশাল আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। আকাশে ডান মেলে পাখিদের উড়ে বেড়ানোর অবস্থা সবসময় মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। বিজ্ঞানী নিউটনের তৃতীয় গতি সূত্র (Third law of motion) বিশ্লেষণের সাহায্যে আমরা পাখিদের এ উড়ন্ত অবস্থার ব্যাখ্যা দিতে পারি। সূত্রটি হলো, "Every cation has equal and opposite reaction". ডানা ঝাপটিয়ে উড়ার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানকে ভেদ করে উপরে উঠার ব্যাপারটি নিহিত আছে। ডানা ঝাপটানোর দ্বারা এ কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

পাখি আকাশে উড়ার কৌশল
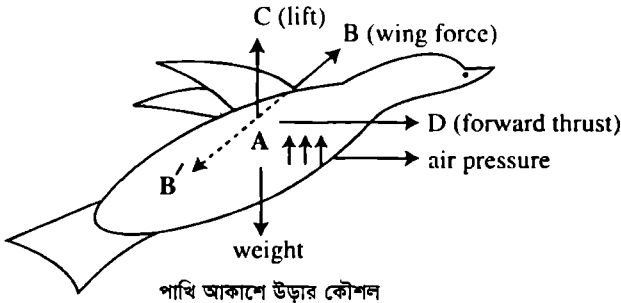
পাখিরা যখন তাদের ডানা নিচের দিকে ঝাপটায় তখন বাতাস AB ডিরেকশনের দিকে ধাক্কা খায় এবং নিউটনের Third law of motion অনুযায়ী ডানার উপর যে বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া কাজ করে তা AB ডিরেকশনের দিকে ক্রিয়াশীল থাকে। AB ডিরেকশনে ক্রিয়াশীল ডানার শক্তি আবার AC ও AD গঠন অংশে রূপান্তরিত হয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানের বিপরীতে উপরে উঠতে এবং ধাক্কার সাহায্যে সামনের দিকে অগ্রগামী হওয়ার শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। আকাশ পথে সামনের দিকে উড়ে যাওয়ার সময় পাখিরা দেহের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ডানাগুলো একবার পেছনের দিকে এবং একবার সামনের দিকে আনয়ন করে। এ অবস্থায় সম্মুখগামী ধাক্কার সৃষ্টি হয়। এ সময় ডানা নিম্নমুখী হয়ে ঝাপটায়। উপরের দিকে ঝাপটাবার সময় ডানাগুলোকে উল্টা অবস্থায় আনা হয় যাতে ডানাগুলো বাতাসে এমনভাবে আঘাত করতে পারে যেন উচ্চমুখী শক্তির উন্মেষ ঘটে এবং ডানা পশ্চাৎদিকে দ্রুতগতিতে নড়তে পারে। এতে অগ্রমুখী শক্তি তৈরি হয়। অতএব উপরে উড্ডয়ন ও সম্মুখগামী ধাক্কার উন্মেষ ঘটে উপর দিকে এবং নিচের দিকে ডানা ঝাপটানোর মাধ্যমে। ডানা ঝাপটিয়ে উড়া পাখিদের জন্য খুবই কার্যকর।

আরো দু'ধরনের উড়ার কৌশল রয়েছে। এর একটি হলো Gliding flight। আর অন্যটি হলো Soaring flight। গ্লাইডিং ফ্লাইটের সময় পাখি উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসে। এ সময় মাধ্যাকর্ষণ বল গ্লাইডের জন্য ধাক্কা দিয়ে থাকে। সোরিং ফ্লাইটের সময় বায়ু প্রবাহ যে উপরের দিকে উঠে পাখি তার সুবিধা ভোগ করে এবং এ কারণে বাতাসে ডানা ঝাপটানোর প্রয়োজন অনুভব করে না। বিশাল সামুদ্রিক পাখি এলবাট্রোস (Albatross) উড়ার সময় সোরিং ফ্লাইট কৌশল অবলম্বন করে থাকে। এভাবে উড়ার সময় সে অত্যন্ত জোরালো গতি-শক্তি বাতাস থেকে গ্রহণ করে থাকে। এ পাখি তারপর গ্লাইডিং পদ্ধতিতে উড়ে বহুদূরে চলে যায়। এভাবে এলবাট্রোস পাখিরা সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। যখন এসব পাখিদের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় তখন তারা পুনরায় উপরের দিকে উঠে শক্তি সঞ্চয় করে। এরপর তারা গ্লাইডিং কায়দায় তীব্রবেগে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এ কৌশলের মাধ্যমে এলবাট্রোস পাখি সমুদ্রের উপরে সোরিং পদ্ধতিতে হাজার হাজার মাইল উড়তে পারে। এ সময় তাদের ডানা ঝাপটাতে হয় না।

গায়ক পাখির মতো কিছু পাখি আছে যারা সোজাভাবে উপর দিকে উঠতে ও নামতে পারে। এদের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড হচ্ছে এরা হেলিকপ্টারের মতো বাতাসে নিশ্চল হয়ে ভেসে থাকতে পারে এবং ভাসমান অবস্থায় ফুল থেকে মধু পান করতে পারে। এ রহস্যময় ক্ষমতা নিহিত আছে তাদের ডানায়।

পাখিদের ডানার পালকগুলো এক অপূর্ব বস্তু। এ পালক তাদেরকে যোগ্য নভোচারী হতে সাহায্য করে। পালকগুলো গঠন কাঠামোর দিক থেকে অত্যন্ত হালকা ধরনের হলেও গঠনগতভাবে খুবই মজবুত। শক্ত পালকের গোড়ার অংশটি দৃঢ় কিন্তু নমনীয়। এ কারণে পাখিরা বাতাসে উড়ার সময় দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে। খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, পাখিদের ডানার নকশার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অত্যন্ত জটিল ধরনের শিল্প-শৈলী রয়েছে। পালকে যেসব সমান্তরাল সুতাতন্তু থাকে সেগুলো গোড়া থেকে জ্যামিতিক কর্ণের মতো তীর্যক প্রকৃতির। প্রত্যেক সুতাতন্তুতে আছে অসংখ্য পার্শ্ব শাখা যেগুলো পার্শ্ববর্তী সুতাতন্তুর উপরে ঝুঁকে থাকে। এসব সূক্ষ্ম সুতাতন্তুগুলো এতো নিখুঁতভাবে সাজানো যা দেখলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় পাখিদের উড়ার জন্য পালকের অবদান নিঃসন্দেহে পরম করুণাময় আল্লাহ পাক প্রদত্ত।

পাখিদের আকার যতো বড় হবে ততবেশি তাদের উড়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে। অক্সিজেন ঘাটতির কারণে যখন তাপমাত্রা কমে যায় ও বাতাস হালকা হয়ে পড়ে তখন স্বাভাবিকভাবে পাখিরা দশ হাজার থেকে পনর হাজার ফুট উপরে উঠতে পারে। ২৪ ঘন্টায় ৩০০ থেকে ৪০০ মাইল দূরত্ব পাখিরা সহজেই পাড়ি দিতে পারে। কিছু কিছু পাখি এ সময়ের মধ্যে ৭০০ মাইল পর্যন্ত উড়ে গেছে বলে প্রমাণ আছে। খাদ্যের সন্ধানে কিছু পাখি উপরে উঠে বিস্তৃত এলাকায় পরিভ্রমণ করে থাকে। মৌসুমী পাখি অর্থাৎ সাইবেরিয়া থেকে যেসব অতিথি পাখি আসে তারা নিয়মিত ও নির্ভুলভাবে অবিশ্বাস্য দূরত্ব পাড়ি দিয়ে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত মানুষের উড্ডয়ন প্রচেষ্টা সফল হয়নি। গ্লাইডিং পদ্ধতিতে উড্ডয়ন রীতি কাজে লাগিয়ে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (Wright brothers) তাঁদের ঐতিহাসিক উড্ডয়ন সফল করেছিলেন। পাখিদের উড়ার কলাকৌশল খুব জটিল ধরনের হলেও সেই কলাকৌশল বিষয়ে মানুষ গবেষণা করতো। এর ফলে তারা ক্রমে ক্রমে আজকের দিনের আধুনিক উড়োজাহাজ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। উড়োজাহাজের সম্মুখ দিকের গতি উৎপন্ন হয় প্রপালসিভ সিস্টেমের (Propulsive system) দ্বারা। এ সিস্টেমে ইঞ্জিন অথবা পারবাইন চালিত প্রপেলার (Propeller) কাজ করে। এভাবে বিমানের ডানায় বাতাস চালিত হয়ে থাকে।

অতএব প্রকৃতির নিয়ম-রীতি অভিজ্ঞতার মধ্যে আল্লাহ পাকের যে ইঙ্গিতবাহী তাৎপর্য নিহিত আছে তা একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা মূল্যায়ন করা সম্ভবপর। পাখিদের উড়ার কলাকৌশলই ছিলো আধুনিক বিমান আবিষ্কারের পথে একমাত্র নিদর্শন।

আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ অপরিসীম

সূরা নাহল-১৬ : ৮১

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلاً وَّجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ.

And Allah has made for you out of that which He has created shades and has made for you places of refuge in the mountains and has made for you garments to protect you from the heat (and cold) and coats of mail to protect you from your (mutual) violence. Thus does he perfcet His Favour unto you, that you may submit yourselves to His will.

আল্লাহ পাক কোনো কোনো বস্তু থেকে এমন কিছু সৃষ্টি করেছেন যা তোমাদের ছায়া দান করে। আর তিনি পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন তোমাদের আশ্রয়ের জন্য। পোশাক-পরিচ্ছদ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের তাপের (এবং ঠাণ্ডার) হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং বর্ম (coats of mail) তৈরি করেছেন যাতে তোমরা (পরস্পর) মারামারি করার সময় আত্মরক্ষা করতে পারো। এভাবে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন যেনো তাঁর ইচ্ছার সামনে তোমরা নিজেদের আত্মসমর্পণ করো। (সূরা নাহল : ৮১)

এই আয়াতে আল্লাহ পাক চার প্রকার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। (১) ছায়া দান, (২) পাহাড়-পর্বতে আশ্রয়, (৩) তাপ থেকে রক্ষাকারী পোশাক-পরিচ্ছদ, (৪) শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বর্ম।

এটা সকলের অভিজ্ঞতা যে, গ্রীষ্ম প্রদান দেশে মানুষ গরমের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছায়া খুঁজে বেড়ায়, ছায়া সৃষ্টি হয় বিভিন্ন প্রকার বস্তুর বিপরীতে। বৃক্ষ-লতাপাতা, উচ্চ পাহাড়-পর্বত, বাড়ির ছাদ ও অন্যান্য বস্তু ছায়া সৃষ্টি করে। এসব বস্তুর ছায়ায় মানুষ আশ্রয় নিয়ে সূর্যের দারুণ দাবদাহ থেকে নিজেদের রক্ষা করে। এমনকি বিভিন্ন ধরনের মেঘপুঞ্জও ছায়াদান করে থাকে। এর ফলে মরুচারী লোকেরা বেশ আরাম পেয়ে থাকে।

পাহাড় সম্পর্কে বলতে গেলে একথা বলতে হয় যে, স্মরণাতীতকাল থেকে মানুষ পর্বতের গাত্রদেশে গুহা অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছে। কারণ গুহাতে বাস করে মানুষ তাপের হাত থেকে ও হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতো। পাহাড়ের এ গুহাগুলো তৈরি হয় পাহাড় গাত্রের ক্ষয়ের মাধ্যমে। পানির স্রোতধারা নেমে আসার সময় পাহাড়ের গাত্রস্থ ফাটল ঢুকে চাপ দিয়ে বড়বড় পাথর খণ্ডকে দূরে ছিটকে ফেলে দেয়। এর ফলে গুহার সৃষ্টি হয়। পাথর খণ্ড বিচ্যুত হওয়ার ফলে যে গুহার সৃষ্টি হয় সেই গুহাগুলোতে সাধারণত বাতাস সহজে প্রবেশ করতে পারে। এই গুহাগুলোতে তাপমাত্রা থাকে স্বাভাবিক যা স্থানীয় গড় তাপমাত্রার সঙ্গে বিশেষ তারতম্য বহন করে না। সবচেয়ে প্রাচীন গুহাবাসীর সন্ধান পাওয়া গেছে চীন দেশে। তারা প্রায় ৩ লক্ষ ৬০ হাজার বছর আগে গুহায় বাস করতো। ইউরোপে গুহাবাসী মানুষের খোঁজ পাওয়া গেছে ৭০ হাজার থেকে এক লক্ষ বছর আগে। এই কিছুদিন আগেও শ্রীলঙ্কার ভেদ্দা (Vedda) গোষ্ঠীভুক্ত আদিম অধিবাসীরা গুহাতে বাস করতো। ফ্রান্স ও স্পেন দেশের কিছু কিছু গুহাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা যেসব ছাপ এবং খোদাইয়ের মাধ্যমে পাথরের দেয়াল গাত্রে চিত্র অঙ্কন করেছিল তা আবিষ্কৃত হয়েছে। ইরাক, জর্ডান ও অন্যান্য দেশের কিছু অংশে এখনো কিছু মানুষ গুহাতে বাস করে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিমান আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ গুহাতে আশ্রয় নিয়েছিল। এখানে তারা খাদ্যও মজুত করে রাখতো। উঁচু পাহাড়-পর্বত এবং পবর্ত শ্রেণীগুলো বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ থেকে কার্যকরভাবে দেশকে রক্ষা করে থাকে।

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বলা যায় যে, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে মানুষ অনুপম সুন্দর সুতা তৈরি করার প্রজ্ঞা ও দক্ষতা লাভ করেছে। এখন মানুষ বহু বিচিত্র ধরনের সুতা তৈরি করে থাকে। পোশাক মানুষকে তাপ ও ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে। কাপড়ের মেশিনে নির্মিত পোশাক পরিধান করলে অধিক মাত্রায় তাপ অনুভূত হয় না। এসব কাপড় পড়ে মানুষ বেশ আরাম বোধ করে।

আত্মরক্ষার বর্ম সম্পর্কে এটা বলা যায় যে, মানুষের জ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সে কাঁচা লোহা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। কাঁচা লোহা থেকে কিভাবে খাঁটি লোহা বের করতে হয় মানুষ তা শিখতে সক্ষম হয়েছে। খাঁটি লোহা গলিয়ে বহু ধরনের আধুনিক জিনিসপত্র তৈরি করা হয়। এর মধ্যে বর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ বর্ম যুদ্ধের সময় সাফল্যজনকভাবে কাজে লাগে।

আসহাবে কাহফের গুহাটি কোথায় অবস্থিত?

সূরা কাহফ-১৮ : ১৭

وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِىْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ.

And you might have seen the sun when it rose, declining to the right from their Cave and when it set, turning away from them to the left, while they lay in the midst of the Cave, that is one of the signs of Allah.

তোমরা সূর্যকে দেখেছ, যখন উদিত হয়েছিল তাদের গুহা থেকে ডানদিকে ঢলে পড়েছিল। আর যখন অস্ত গিয়েছিল, তাদের দিক থেকে বামদিকে সরে গিয়েছিল, তখন তারা গুহার মাঝখানে বিরাট জায়গায় শুয়েছিল। এটা আল্লাহ্ পাকের অন্যতম নিদর্শন। (সূরা কাহাফ : ১৭)

যে গুহার মধ্যে আসহাবে কাহফ (গুহার অধিবাসী) অবস্থান করেছিল সে গুহার অবস্থান সম্পর্কে এ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ে সাত জন বিশ্বাসী যুবক একটি গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখানে তারা নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েছিল। তারা এ গুহার মধ্যে ৩০৯ বছর ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলো এবং যখন তারা জেগে উঠল তখন অবস্থার বিরাট পরিবর্তন দেখতে পেলো।

এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুহাটির অবস্থান এমন পর্যায়ে ছিলো যে, সারা বছর ধরেই সূর্যের কিরণ সোজাসুজি প্রবেশ করতে পারতো না। সূর্য গুহাটির ডানদিকে উদিত হতো এবং বামদিকে অস্ত যেত। সূর্যের দৈনন্দিন কক্ষপথ উত্তরে কর্কটক্রান্তি এবং দক্ষিণে মকরক্রান্তির মাঝ বরাবর ছিলো। সূর্য যেহেতু গুহাটির ডানদিকে উঠতো এবং বামদিকে অস্ত যেতো তাই এটা খুবই স্পষ্ট যে গুহাটির মুখ ছিলো উত্তরদিকে। যদি কেউ এ গুহার মুখে দণ্ডায়মান হতো তাহলে সে দেখতে পেতো যে, সূর্য ডানদিকে উদিত হয় এবং বামদিকে অস্ত যায়। সুতরাং গুহাটি সন্দেহাতীতভাবে কর্কটক্রান্তির উত্তরদিকে অবস্থিত ছিলো।

পবিত্র কোরআনে এ গুহাটির লোকেশান সম্পর্কে কোনো তথ্য উল্লেখ নেই। খ্রিস্টিয় কাহিনী অনুসারে এ গুহাটির অবস্থান ছিল উত্তরে ৩৮° অক্ষাংশে অবস্থিত ইফিসাস পর্বতের উপরে। এরূপ জায়গায় কোনো উত্তরমুখী গুহার মধ্যে কখনো সূর্যের কিরণ প্রবেশ করতে পারে না। সুতরাং ইফিসাস পর্বতে গুহাটির অবস্থান পবিত্র কোরআনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

নাস্তিক্যবাদের পক্ষে প্রমাণ কোথায়?

সূরা কাহফ-১৮ : ৩৭

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا.

His Companion said to him during the talk with him, "Do you disbelieve in Him Who created you out of dust, then out of Nutfa, then fashioned you into a man."

তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল, "তুমি কি তাঁর প্রতি (আল্লাহ পাকের প্রতি) অবিশ্বাস স্থাপন করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, ধূলামাটি থেকে। অতঃপর নুৎফা থেকে, তারপর মানব অবয়ব দান করেছেন।" (সূরা কাহফ : ৩৭)

অবিশ্বাসীরা সবসময় মহান আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব এবং পরকাল সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে। কিন্তু যদি কেউ নিবিড়ভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আল্লাহ পাক এবং পরকাল সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, তাহলে সে বিনাদ্বিধায় আল্লাহর অস্তিত্ব এবং পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে বাধ্য হবে। এখানে আল্লাহ পাক মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ তথ্যটি পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবি "তুরাব" শব্দের অর্থ হলো ধূলা বা মাটি। মাটির মধ্যে যেসব উপাদান থাকে সেসব উপাদান মানব দেহে বিদ্যমান আছে। এসব উপাদান মানুষ খাদ্য থেকে সংগ্রহ করে থাকে। আর এ খাদ্য উৎপাদিত হয় মাটি থেকে। অর্থাৎ মাটির সার নির্যাস বৃক্ষরাজি ও ক্ষেতের ফসল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং বৃক্ষের ফল, ক্ষেতের ফসল মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। খাদ্যের সার নির্যাস থেকে মানুষের দেহে তৈরি হয় নুৎফা। আর নুৎফা থেকে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হয় মানব শিশু। সুতরাং মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে যে তথ্য পবিত্র কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য।

এ আয়াতে আরো বলা হয়েছে, নুৎফা থেকে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। আরবি নুৎফা শব্দের অর্থ Sperm বা Ovum অথবা Zygote হতে পারে। মাতৃগর্ভে জাইগোট থেকে রূপান্তরিত ভ্রূণ যেভাবে বৃদ্ধি পায় তা আল্লাহ.পাকের করুণার জন্য। মায়ের

ডিম্বাণু (Ovum) পিতার শুক্রাণু (Sperm) দ্বারা নিষিক্ত হলে জাইগোট সৃষ্টি হয়। জাইগোট থেকে ভ্রূণ সৃষ্টি হয় এবং ভ্রূণ ক্রমান্বয়ে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে রূপান্তরিত হয়। এ ধরনের সৃষ্টির উপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এসবের নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ্ পাক।

অতএব এখানে আল্লাহ্ পাক ঐ সমস্ত ব্যক্তির কথা তুলে ধরেছেন যারা একটা পর্যায়ে এসে আল্লাহর বাণীর বিরোধিতা করে। তবে তারা মনে করে যে, মানুষ হিসেবে তাদের জন্মের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ পাক কর্তৃক গৃহীত। কিন্তু তারা যখন বয়স প্রাপ্ত হয়ে উঠে তখন আল্লাহ্ পাক এবং পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে উঠতে সাহস দেখায়।

ভ্রূণ তত্ত্বের অধিকতর উন্নয়নের ফলে হযরত ঈসা (আ) জন্ম রহস্য উদ্ঘাটিত হবে

সূরা মারিয়াম-১৯ : ২০

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ۔

She Said : "How can I have a son when no man has touched me, nor am I unchaste?"

তিনি (মারিয়াম) বললেন, "কিভাবে আমার পুত্র হবে, যখন কোনো মানব আমাকে স্পর্শ করেনি কিংবা আমি ব্যভিচারিণীও নই?" (সূরা মারিয়াম : ২০)

He Said : "So (it will be), your Lord said : 'That is easy for Me : And (We Wish) to appoint him as a sign to mankind and a mercy from Us' and it is a matter decreed (by Allah)."

তিনি (ফেরেশতা) বললেন, "তাই হবে, আপনার প্রভু বলেছেন, 'এটা আমার পক্ষে খুবই সহজ এবং আমরা তাকে, (হযরত ঈসা) মানব জাতির জন্য একটি নিদর্শন এবং আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ পাঠাতে চাই।' এটা (আল্লাহ্ পাক কর্তৃক) নির্ধারিত বিষয়।" (সূরা মারিয়াম : ২১)

So she conceived him and she withdrew with him to a far place.

অতঃপর তিনি গর্ভে তাকে (হযরত ঈসা) ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (সূরা মারিয়াম : ২২)

And the pains of childbirth drove her to the trunk of a date-palm. She said : "Would that I had died before this and had been forgotten and out of sight."

প্রসব বেদনা তাঁকে একটি খেজুর-বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো। তিনি বললেন, "আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের দৃষ্টির আড়ালে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম।" (সূরা মারিয়াম : ২৩)

Then Cried unto her from below her, Saying : "Grieve not, your Lord has provided a *water stream* under you."

অতঃপর (ফেরেশতা) তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়াজ দিলেন– বললেন, "দুঃখ করবেন না, আপনার প্রভু আপনার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন।" (সূরা মারিয়াম : ২৪)

And shake the trunk of date-palm towards you, it will let fall fresh ripe-dates upon you.

আর আপনার নিজের দিকে খেজুর গাছের গোড়া নাড়া দিন। তাতে আপনার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। (সূরা মারিয়াম : ২৫)

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতগুলোতে কুমারী মাতা মরিয়ম (আ)-এর গর্ভধারণ এবং তাঁর নির্জন জনহীন এলাকায় চলে যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, এই নির্জন স্থানটি ছিলো বেথেলহেম এলাকার একটি খেজুর গাছের নিচে। জেরুজালেম থেকে বেথেলহেমের দূরত্ব প্রায় ৪-৬ মাইল। যখন হযরত মরিয়ম (আ)-এর তীব্র প্রসব বেদনা শুরু হলো তখন তিনি ব্যথায় কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় ঐশী বাণীর মাধ্যমে তাঁকে এ মর্মে অবহিত করা হলো যে, তাঁর কদমের নিচে আল্লাহ্ পাক একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছেন যার পানি পান করে তিনি পিপাসা নিবারণ করতে পারবেন এবং সেখানে গোসল ও ওজু করতে পারবেন। তারপর তাঁকে বলা হলো তিনি যেন খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে ঝাঁকুনি দেন। তাহলে সুস্বাদু পাকা খেজুর তাঁর কাছে ঝরে পড়বে। এ স্বর্গীয় নির্দেশের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। এই নির্দেশের ফলে হযরত মরিয়ম (আ) অশেষ সাহায্য লাভ করেছিলেন। এ সময় তিনি দারুণভাবে প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন–

এক. প্রসব বেদনার সময় জরায়ু ও তলপেটের পেশীগুলোতে হঠাৎ সংকোচন দেখা দেয়। এ সংকোচন তড়িৎগতিতে কিছুক্ষণ পরপর চলতে থাকে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে মহিলারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে যখন তার পাশে কোনো মহিলা সান্ত্বনা দেয়ার জন্য থাকে না। প্রসব বেদনার সময় ধাত্রী বিদ্যা বিশারদরা মহিলাদের যে সাধারণ উপদেশ দিয়ে থাকেন তার মধ্যে থাকে লাঠির মতো কোনো শক্ত বস্তুকে দৃঢ়ভাবে হাতে ধরে রাখা যাতে কিছু স্বস্তি অনুভব করা যায় এবং এতে শিশু বের হয়ে আসার জন্য যোনিপথ কিছুটা প্রশস্ত হয়। খেজুর গাছের কাণ্ডকে আঁকড়ে ধরার বিষয়টি প্রশংসনীয়ভাবে এ উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করেছে এবং গাছে ঝাঁকুনি দেয়ার ফলে পাকা খেজুরও পাওয়া গেছে।

দুই. প্রসবের অব্যবহিত পরে মা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব অনুভব করে। কারণ

প্রসবকালে জরায়ুর সংকোচন ও ব্যথার ফলে যে শক্তি ক্ষয় হয় তা পূরণ করতে হলে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে। মধ্যপ্রাচ্যে খাদ্যবস্তুর মধ্যে খেজুরের গুরুত্ব খুব বেশি। খেজুরের শর্করা উপাদান অতিশয় পুষ্টি গুণের অধিকারী। খেজুরে শর্করার পরিমাণ ৬০-৭০%। এছাড়া খেজুরে আছে ভিটামিন A, B, B_2 এবং নিকোটিনিক এসিড। হযরত মরিয়ম (আ)-এর দ্রুত পুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহ্ পাক খেজুরের আকারে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করেছিলেন।

অতএব, কুমারী মাতার সন্তান হযরত ঈসা (আ) পিতার অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেন। এ বিষয়টি সূরা আল ইমরানের ৪৭ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্ পাক পুনরায় বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম মানব জাতির জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় এবং তিনি হলেন মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। কারণ তিনি মানুষের জন্য শান্তির বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন। মানব জাতির ইতিহাসে ঈসার (আ) জন্ম একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। সুতরাং এ ধরনের জন্ম লাভ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাকের সীমাহীন ক্ষমতার তাৎপর্য বহন করে।

বিশাল মহাবিশ্বের সবকিছু আল্লাহ তা'আলার আইনের আওতাধীন

সূরা ত্বাহা-২০ : ৬

لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى.

To Him belongs all that is in the Heavens and all that is on the earth and all that is between them and all that is under the soil.

নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং মাটির নিচে যা আছে সবই তাঁর এখতিয়ারভুক্ত। (সূরা ত্বাহা : ৬)

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বস্তুসমূহের আলোচনা খুবই প্রণিধানযোগ্য। একজন রাজার ভৌগলিক এলাকা হলো তার রাজ্য। যদি এ এলাকায় তার হুকুম হয় একমাত্র এবং যদি তার রাজ্যের সকলে তার প্রবর্তিত আইনকে মান্য করে চলে। নভোমণ্ডল আল্লাহ পাকের রাজ্যের একটি অংশ। এ অংশে আছে তারকা, গ্রহ, উপগ্রহ, পালসার, ব্ল্যাক-হোল, নেবুলা, গ্যালাক্সি, কোয়াসার এবং মানুষের জানা অজানা আরও অনেক বস্তু। আল্লাহর নির্ধারিত আইনের মাধ্যমে সকল জীবন্ত এবং জীবনহীন বস্তু পরিচালিত হয়ে থাকে। তাঁর আইনের বাইরে কেউ যেতে পারে না। তাঁর নির্ধারিত আইন যদি কেউ ভঙ্গ করে তবে তাকে আইন ভঙ্গের ফল ভোগ করতে হয়। তারই নির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে।

আকাশ রাজ্যের মতো ভূমণ্ডলও আল্লাহ পাকের রাজ্য। প্রকৃতির সকল আইন যা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন এবং যা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি সবই তাঁর নির্ধারিত। পৃথিবীর সাতটি স্তর আছে। এ স্তরগুলো হচ্ছে- (1) Inner Solid core, (2) Outer liquid core, (3) Mantle, (4) Asthenosphere, (5) Lithosphere, (6) Crust, (7) Atmosphere. এ সাত স্তরে যেসব জীবন্ত এবং প্রাণহীন বস্তু আছে তারা বিজ্ঞানভিত্তিক আইনের অধীন। এ আইন আল্লাহ পাক কর্তৃক প্রণীত। প্লেট টেকটনিকস (Plate tectonics), সমুদ্রের তলদেশের বিস্তৃতি, চুম্বকের বিপরীত ধর্ম, উষ্ণ স্থানের উদ্গীরন এবং ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বে এবং নিম্নস্তরের অন্যান্য কাজকর্ম এলোমেলোভাবে সম্পন্ন হয়নি। সেগুলো সম্পন্ন

হয়েছে নিয়ম অনুসারে। এ নিয়ম আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্দিষ্ট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবী আল্লাহ তা'আলার আইনের আওতাধীন একটি রাজ্য।

বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছে আইনোস্ফেয়ার। এ স্তরটি সৃষ্টি হয়েছে এক্স-রে এবং আল্ট্রা-ভায়োলেট বিকিরণ থেকে। আইনোস্ফিয়ারের উপরে বায়ুমণ্ডলের স্তরে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে দ্রুতগতিসম্পন্ন ধাবমান ইলেকট্রন ও প্রোটনগুলো পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রে আটকা পড়ে যায়। এ স্তরকে বলা হয় ম্যাগানেটোস্ফেয়ার। বাইরের দিকে এ ম্যাগনোটোস্ফেয়ার ম্যাগনেটোপজ-এ এসে মিলে যায়।

এ স্থানকে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। বায়ুমণ্ডলের এসব স্তরে যা কিছু ঘটে সবই আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত নিয়মে। সুতরাং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু মহান আল্লাহর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

শিশু মূসা (আ)-কে নদীতে ভাসিয়ে দেন

সূরা ত্বাহা-২০ : ৩৯

اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ۔

Saying : 'Put him (the child) into the chest and put it into the river : then the river shall cast it up on the bank and there, an enemy of Mine and an enemy of his shall take him.' And I endued you with love from Me in order that you may be brought up under My Eye.

বলা হলো, 'তাকে (শিশুটিকে) সিন্দুকের মধ্যে রাখ এবং নদীতে ভাসিয়ে দাও। নদী তাকে তীরে উঠিয়ে দেবে। সেখান থেকে এমন এক ব্যক্তি উঠিয়ে নেবে যে আমার শত্রু এবং ঐ শিশুরও শত্রু।' আর আমি তোমাকে মহব্বত দ্বারা আবৃত করে নিচ্ছি যেনো তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হতে পার। (সূরা ত্বাহা : ৩৯)

হযরত মূসা (আ) এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন মিশরের সম্রাট ফেরাউন ইসরাইলীদের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করতেন। তিনি এ মর্মে আদেশ জারী করেছিলেন যে, যখনই কোনো ইসরাইলীর পুত্র সন্তান জন্মাবে তখন তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। হযরত মূসা (আ)-এর জননী তাঁর পুত্রের জন্মের পর তাঁকে লুকিয়ে রাখলেন। এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, হযরত মূসা (আ)-এর মা একটি ঐশী প্রেরণা লাভ করেছিলেন। যার ফলে তিনি তাঁর শিশু সন্তানকে একটি সিন্দুকের মধ্যে রেখে নদীর স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এ নদীর নাম নীল নদ। এটি বয়ে গেছে ফেরাউনের বাগানের পাশ দিয়ে। নদীর তীরে যে বেণু বাঁশ (Reed) জন্মেছিল সেই বাঁশের ঝোঁপে সিন্দুক দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল। তারা সিন্দুকের কাছে গিয়ে দেখতে পেলো একটি ফুটফুটে মানব শিশু। শিশুটিকে তারা ফেরাউনের স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেলো পালন করার জন্য।

এ আয়াতের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সিন্দুকের প্রকৃতি ছিলো একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ সময় নীল নদের তীরে যে বেণু বাঁশ জন্মাতো তা খুবই উল্লেখযোগ্য। কারণ পিরামিডের মধ্যে যেসব চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে প্রায় বেণু বাঁশের ছবি বিদ্যমান। বেণু বাঁশের গোড়ার অংশ তখনকার দিনে জাহাজ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতো। এছাড়া ঝুড়ি তৈরি, সিন্দুক তৈরি এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর ব্যবহার্য বস্তুও ব্যাপকভাবে তৈরি হতো। বেণু বাঁশের শক্তি এবং ভেসে থাকার ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন মিশরীয়রা বেণু বাঁশ দিয়ে নৌকা তৈরি করতো এবং এ নৌকার সাহায্যে এমনকি তারা আটলানটিক মহাসাগরে সাফল্যজনকভাবে সমুদ্র ভ্রমণ করতো। এসব নৌকা সম্পূর্ণভাবে তৈরি হতো প্যাপিরাস (Papyrus) গাছের কাণ্ড দিয়ে। সুতরাং এটা ভালোভাবে বুঝা যায় যে, যে সিন্দুকে শিশুটিকে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল তা শিশুর ভার বহন করে স্বাচ্ছন্দে ভেসে যেতে পেরেছিল।

বৃষ্টিপাতের ফলে বহুবিদ ঘটনার উদ্ভব ঘটে

সূরা ত্বাহা-২০ : ৫৪

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ الْاُوْلِ النُّهٰى.

Eat and pasture your cattle (therein); verily in this are proofs for men of understanding.

খাও এবং তোমার গবাদি পশুকে সেখানে চরাও। নিশ্চয়ই বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য এর মধ্যে রয়েছে প্রমাণ। (সূরা ত্বাহা : ৫৪)

বৃষ্টিপাতের কারণে বহুবিধ ঘটনার উদ্ভবের মাধ্যমে অবশেষে গাছপালার উৎপাদন এবং তাদের জৈবিক বিভিন্নতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। আলোচ্য আয়াতে জোর দেয়া হয়েছে মহান আল্লাহ পাকের করুণার উপর। সবুজের সমারোহ থেকে আমরা নিজেদের জন্য এবং আমাদের গবাদি পশুর জন্য যে খাদ্য সংগ্রহ করি সেই খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ নিহিত। আমাদের প্রধান খাদ্য চাল, গম, ভুট্টা, যব ও ডাল এবং মাটির তলার খাদ্য বস্তু। বিভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন ফল সবই সবুজ বৃক্ষে জন্মায়। এসব সবুজ গাছপালার মধ্যে কিছু গাছপালা মানুষ নিজেদের বাড়িতে লাগিয়ে থাকে। বর্ণিত সবুজ গাছপালার মধ্যে বাকিগুলো হচ্ছে ঘাস ও অন্যান্য আগাছা। এসব ঘাস ও আগাছার রাসায়নিক গঠন বৈশিষ্ট্যের কারণে এগুলো মানুষের পাকস্থলীতে হজম হয় না। তবে এগুলো সতেজ শ্যামল চারণভূমি গঠন করে থাকে। ঐসব চারণভূমিতে গো-বাছুর এবং অন্যান্য তৃণভোজী গৃহপালিত প্রাণীরা ঘাস আগাছা খেয়ে জীবন ধারণ করে। কারণ এদের পরিপাকযন্ত্র ঘাস, আগাছাকে সুন্দরভাবে হজম করে নিতে পারে।

একজন বোধসম্পন্ন মানুষ নিবিড়ভাবে দেখতে পায় যে, গাছপালার জগৎ থেকে আল্লাহ্ পাক মানুষ এবং গবাদি পশুর জীবন রক্ষার জন্য যে পুষ্টি সরবরাহ করে থাকেন সে পুষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ পাকের অশেষ অনুগ্রহ ও কল্যাণের স্পর্শ বিদ্যমান। বৃক্ষরাজির জগৎ আশ্চর্যজনকভাবে খাদ্যচক্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তৃণভোজী প্রাণীরা সবুজ রঙের লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। আর মানুষ শাকসবজি ও গরু-ছাগলের মাংস উভয়ই খেয়ে থাকে। প্রকারান্তরে গরু-ছাগলের মাংসও সবুজ গাছপালা থেকে আসে। অতএব এর প্রেক্ষিতে এটা বলা যায় যে,

'সকল মাংসই ঘাস থেকে আসে' শীর্ষক যে উক্তিটি আছে তা রূপক অর্থে সত্য। মৃত মানুষ ও গরু-ছাগলের গলিত দেহ সত্তা মাটিতে মিশে গিয়ে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কারণ এসব গলিত দেহ সারের আকারে মাটির সাথে মিশে গিয়ে সবুজ গাছের সমারোহ গড়ে তুলে। এসব ঘটনা বোধশক্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষের কাছে ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে। আল্লাহ পাক বোধ শক্তিসম্পন্ন, চিন্তাশীল ও জ্ঞান সমৃদ্ধ মানুষকে তাঁর আয়াতের প্রতি বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছেন।

মৃত্যুর পর মানুষ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মাটিতে মিশে যায়

সূরা ত্বাহা-২০ : ৫৫

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى.

There of (earth) We created you and into it We shall return you and from it We shall bring you out once again.

মাটি থেকে আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং এ মাটিতে আমরা তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব এবং এ মাটি থেকে পুনরায় আর একবার তোমাদেরকে তুলে আনব। (সূরা ত্বাহা : ৫৫)

এখানে বলা হয়েছে যে, মানুষকে মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছে এবং মানুষ মাটিতে ফিরে যাবে। আবার মাটি থেকে তুলে আনা হবে।

মানুষ যখন মরে যায় তখন বিভিন্ন জাতি মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ সকল জাতি মৃতদেহকে মৃত্তিকার মধ্যে সমাহিত করে না। ইহূদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানগণ মৃতদেহকে কবরস্থ করে থাকে। কবরের মধ্যে মৃতদেহ পচে গিয়ে সরাসরি মাটিতে মিশে যায়। মুসলমানগণ মৃতদেহকে কাফনের কাপড়ে আচ্ছাদিত করে সমাহিত করে বলে মৃতদেহ পঁচে যাওয়ার পথে বাধার সম্মুখীন হয় না। ইহুদী ও খ্রিস্টানেরা কাঠের কফিনে মৃতদেহ রেখে সমাধিস্থ করে বলে কফিনের ভেতর পচা মৃতদেহ সহজে মাটির সাথে মিশে যেতে পারে না। কাঠনির্মিত কফিন ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হতে অনেক সময় লাগে। যদি মৃতদেহকে পাথর কিংবা কংক্রীটের খিলানে আবদ্ধ করা হয় তাহলে মৃতদেহ পচবে স্যাপ্রোফাইটিক অরগানিজমের দ্বারা যা মৃতদেহ বিদ্যমান থাকে। এভাবে পচে মৃতদেহ মাটিতে মিশতে অনেক সময় লেগে যায়। প্রাচীন মিশরীয়রা মৃতদেহ সুগন্ধি ঔষধাদি মাখিয়ে লাইনেন কাপড় দ্বারা আবৃত করে কংক্রীটের কবরে বা পিরামিডের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে দিত। বহু মৃতদেহ আজও সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং এসব মৃতদেহ মাটিতে মিশতে অনেক সময় নেবে।

মৃতদেহকে নিশ্চিহ্ন করার আর একটি পদ্ধতি হলো পুড়িয়ে ফেলা। হিন্দু সম্প্রদায় মৃতদেহকে কাঠের চিতায় শুইয়ে পুড়িয়ে ফেলে এবং দেহের পুড়া ছাইকে নদী বা সাগরের পানিতে নিক্ষেপ করে দেয়। মৃতদেহের যে অংশ পুড়ে বাষ্পাকারে

আবহমণ্ডলে গিয়ে মিশে তা আবার বৃষ্টির আকারে নিচে নেমে এসে মাটিতেই মিশে যায়। অর্থাৎ পরিশেষে মৃতদেহের গঠন-উপাদান মাটিতে এসে মিশে যায়। অগ্নিপূজক পারসিক সম্প্রদায় মৃতদেহকে একটি সুউচ্চ টাওয়ারে স্থাপন করে রাখে। শকুনরা টাওয়ার থেকে মৃতদেহের মাংস খেয়ে যায় এবং তাদের মাংস খাওয়ার নিক্ষিপ্ত বিষ্ঠা মাটিতে এসে পড়ে এবং তা মাটিতে মিশে যায়। এছাড়া মৃতদেহের হাড়-হাড্ডিগুলো মাটিতে এসে পড়ে এবং মিশে যায়। শকুনরা মরে গেলে মাটিতে পড়ে গিয়ে মিশে যায়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি নদী বা সাগরে ডুবে মারা গেলে তার লাশ মাছে-হাঙ্গরে খেয়ে ফেললেও তাদের নির্গত বিষ্ঠা মাটিতে মিশে যায় নতুবা লাশ পচে গিয়ে মাটিতে মিশে যায়। অতএব একথা একান্ত সত্য যে মৃত্যুবরণ করার পর মানুষ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মাটিতে গিয়েই মিশে।

এ আয়াতের তৃতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, মৃত মানুষকে কবর থেকে বিচারের দিন পুনরায় জীবিত করে তোলা হবে। এ ব্যাপারটি আল্লাহ পাকের ক্ষমতার এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতাবান।

ক্রুশে বিদ্ধ করে মারার কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী

সূরা ত্বাহা-২০ : ৭১

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَاۤ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى.

Firaun said : 'Believe you in him before I give you permission?' Verily he is your chief who has taught you magic. So I will surely cut off your hands and feet on opposite sides and I will surely crucify you on the trunks of date-palms.

ফেরাউন বলল, "আমি অনুমতি দানের পূর্বে তোমরা কি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ? দেখছি সে তোমাদের প্রধান, সে তোমাদের যাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবো এবং তোমাদের খেজুর গাছের কাণ্ডে ক্রুশে বিদ্ধ করবো।" (সূরা ত্বাহা : ৭১)

হযরত মূসা (আ) কে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ফেরাউন যাদুকর নিয়োগ করেছিল। মূসা (আ)-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের যাদুর সাপগুলো গ্রাস করে ফেললো তখন যাদুকরদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এ কাজ যাদুর জোরে হতে পারে না। বরং এটা নিঃসন্দেহে মুজেযা যা একান্তভাবে আল্লাহ্ পাকের কুদরতের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এমতাবস্থায় যাদুকররা মূসা (আ)-এর প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আনলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

এ দৃশ্য অবলোকন করে ফেরাউন যাদুকরদের প্রতি আয়াতে বর্ণিত শাস্তির কথা ঘোষণা করলেন।

যে শাস্তির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা ঐ যুগের এক বিশেষ ধরনের শাস্তি। যদি কোনো ব্যক্তির হাত পায়ের একদিকটা কেটে দেয়া হয় তাহলে সে আর দাঁড়াতে পারবে না কিংবা চলতেও পারবে না। যদি বিকল্প কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে দেয়া হয় তাহলে কোনক্রমে সমতা বজায় রেখে চলা যায়।

ফেরাউনের এ ধরনের শাস্তির উদ্দেশ্য ছিলো এ বিষয়ে জনসাধারণকে অধিক পরিমাণে সচেতন করে তোলা। সে বিপরীত দিক থেকে অঙ্গ-অবয়ব কর্তন করার হুকুম দিলো। ক্রুশে বিদ্ধ করে মারার ভয়ও দেখালো। ক্রুশে বিদ্ধ করে মারার মতো কষ্টকর শাস্তি আর নেই। ক্রুশে বিদ্ধ করে মারার মধ্যে কষ্ট হয় দীর্ঘস্থায়ী কারণ এ পন্থায় জীবন শেষ হতে সময় লাগে দীর্ঘক্ষণ। সে যুগে ক্রুশে বিদ্ধ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পেরেক মেরে আটকে দেয়া হতো। ক্রুশ তৈরি করা হতো খেজুর গাছের কাণ্ডকে চেরাই করে সেই কাঠ দিয়ে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে রক্তক্ষরণ ও অবসন্নতার কারণে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করতো।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির
Big Bang Theory

সূরা আম্বিয়া-২১ : ৩০

اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ.

Do not the unbelievers see that the Heaven and the earth were joined to gether as one united piece, then We parted them? And We have made from water every living thing. will they not then believe?

অবিশ্বাসীরা কি এটা দেখে না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল একক বস্তুর মতো একসঙ্গে সংযুক্ত ছিলো, আমরা তাদের পৃথক করেছি? আর আমরা পানি থেকে সমস্ত জীবজগৎ সৃষ্টি করেছি। তারা কী এ সত্য বিশ্বাস করবে না? (সূরা আম্বিয়া-২১ ঃ ৩০)

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল একসঙ্গে সংযুক্ত ছিলো

বিজ্ঞানীরা এ সত্য মেনে নিয়েছিল যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল বস্তু একসঙ্গে সংযুক্ত ছিলো এবং তাদের অবস্থান ছিল অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন এবং অতি উষ্ণ বস্তুপিণ্ডের (Blob) মধ্যে যা একক বিন্দুতে সন্নিবেশিত ছিলো। কোনো শূন্য সময়ে এ বস্তুপিণ্ড বিকট শব্দে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে পড়ে। এরপর সৃষ্টি শুরু হয় (Creation strated)। বস্তুপিণ্ডের একক অবস্থান কিরূপ ছিলো সে সম্পর্কে পদার্থ বিজ্ঞান কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। তবে ঐ শূন্য সময়ে বস্তুপিণ্ডটির ঘনত্ব ছিল অসীম। Big Bang সংঘটিত হওয়ার 10^{-43} সেকেণ্ড পর বস্তুপিণ্ডটির একক শক্তি ভেঙ্গে অভিকর্ষ বল (Gravity) মুক্ত হয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে মহাবিশ্বের ব্যাসের পরিমাণ ছিলো 10^{-28} সেমি. এবং তাপমাত্রা ছিলো 10^{-32} K। Big Bang ঘটার 10^{-32} সেকেণ্ড পর শক্তি বস্তু কণিকায় জমতে থাকে। যেমন কোয়ার্কস, ইলেকট্রন্স এবং তাদের বিপরীতধর্মী কণিকা। মহাবিশ্ব বিস্তৃত হয়ে নরম বর্তুল আকার ধারণ করে। Big Bang-এর 10^{-6} সেকেণ্ড পর মহাজগৎ 10^{-13} K তাপমাত্রাসহ আমাদের সৌরজগতের আকৃতি ঘটন করে। Big Bang সংঘটিত

হওয়ার 10^9 বছর পর তাপমাত্রা নিম্নগামী হয়ে 15 K-এ নেমে আসে। এ সময় মহাবিশ্ব আজকের পরিচিত দেহ-অবয়ব নিয়ে গ্যালাক্সিসহ মূর্ত হয়ে উঠে। গ্যালাক্সিগুলো অকল্পনীয় গতিতে একে অপরকে পশ্চাতে রেখে ছুটে চলেছে। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে বিশ্বজগৎ একটি সুষম হারে সম্প্রসারণ হয়ে চলেছে।

সুতরাং আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে, বস্তুসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে সুসংবদ্ধ। কিন্তু প্রাথমিকভাবে সকল বস্তু একসঙ্গে সংযুক্ত ছিলো এবং মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) পর তারা বিদীর্ণ হয়ে আজকের আকারে আবির্ভূত হয়েছে।

পানি থেকে জীবজগৎ সৃষ্টি

আমাদের জীবন পদ্ধতি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধারাবাহিকতা ধারণ করে রেখেছে। এ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মলিকূল (Molecules) ভিত্তিক কার্বন ব্যবহার হয়ে থাকে। অঙ্গ-অবয়ব গঠিত হয়ে থাকে এক বা একাধিক কোষের সাহায্যে। যে কোষে অসংখ্য জৈব ও অজৈব মলিকূল বিন্যস্ত থাকে। জন্ম এবং বংশগতির বিধানসমূহ DNA-এর মধ্যে ধরা থাকে। DNA-এর অবস্থান নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রে। আদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা পৃথিবীকে যেভাবে ঘিরে রেখেছিল তার মধ্যে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া বিদ্যমান ছিলো তারই ফলে জীবনের উৎপত্তি। ১৯৫০ সনে রসায়নবিদ এস.এল. মিলার হাইড্রোজেন, এমোনিয়া, মিথেন ও জলীয় বাষ্পের গ্যাসীয় মিশ্রণ জলাশয়ের উপরে বিন্যস্ত করেন এবং ঐ জলাশয়ের উপরে বৈদ্যুতিক ঝলক অতিক্রম করান। কিছুদিন পর ঐ জলাশয়ের পানি এ্যামিনো এসিডের একটি দ্রবণ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন এসিডের সংযোগে প্রোটিন তৈরি হয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন যে, হয়তো এ ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়াকর্মের ফলে প্রথম জীবকোষের উদ্ভব হয়।

অল্পদিনের মধ্যে এ বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত হয়। প্রতিবাদে বলা হয়েছে রাসায়নিক ক্রিয়াকর্ম দ্বারা প্রথম জীবকোষের সৃষ্টি মূলত কাল্পনিক। এর বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নেই। DNA অণুর গঠন এ সময় পরিচিতি লাভ করে। DNA এর গঠন পদ্ধতি এতোই জটিল যে, তা কখনো পানিতে জন্মলাভ করে না। DNA কে দেখতে কিছুটা মোচড়ানো মইয়ের মতো দেখায়। বিজ্ঞানীরা একে বলে Double Helix (স্ক্রুর ন্যায় পেঁচানো)। এ মইয়ের ধাপগুলো চার ধরনের অণুর বহুবিধ জোড়ার সংযোগে তৈরি হয়ে থাকে। এ চার প্রকার অণু হলো Adenine (A), thymine (T), Guanine (G) এবং Cytosin (C)। মইয়ের প্রত্যেক ধাপ গঠিত হয় অণুর জোড়ার সংযোগে। যথা– AT বা TA, GC বা CG। আবার

AT, CG, GC এবং TA ধারা-শৃংখল জিন থেকে জিনে পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তন সূচিত হয় নবজাত শিশুর বংশগত বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করার জন্য। DNA-এর ধাপগুলো সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে একই রকম। প্রাণীকূলের মধ্যে যে বিভিন্নতা বিদ্যমান তার উৎপত্তি ঘটে ধাপগুলো কিভাবে বিন্যস্ত হয়েছে সে পদ্ধতির উপর এবং AT থেকে CG সংখ্যার অনুপাতের উপর। এ ধারা এবং অনুপাত নীলমাছি ও কুকুর, গোলাপ ফুল ও ক্যাকটাস, মানুষ ও বানরের মধ্যে সকল প্রকার বিভিন্নতার জন্ম দিয়ে থাকে।

বিজ্ঞানী J. D. Bernal বলেছেন, সমুদ্র সৈকতে রৌদ্রে শুকানো কাদামাটি DNA এর বহুবিধ গঠন উপাদানকে একত্রিত করে থাকে। রাসায়নিকভাবে কাদামাটি তৈরি হয় সিলিকেট সঞ্চয়ের দ্বারা। এ সিলিকেটের স্তরের মধ্যদিয়ে পানি চলাচল করতে পারে। সূর্যের আলোয় শুষ্ক এবং সমুদ্রের পানিতে সিক্ত কাদামাটি মলিকূলগুলোকে একত্রিত করার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করে থাকে। কাদামাটির বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রগুলো তাদের মধ্যদিয়ে অতিক্রান্ত যে কোনো মিশ্রণের উপর কিছু পরিবর্তন আরোপ করে থাকে। আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, প্রথম জীবন কণা অস্তিত্ব লাভ করেছিল ঐ সময় যখন জটিল মলিকূলগুলো প্রাথমিকভাবে কাদামাটির স্তর গঠনের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করেছিল। সবকিছুর মধ্যে যে সত্যটি অধিক মাত্রায় নাটকীয় তা হলো প্রাণহীন অবস্থা থেকে প্রাণের দিকে আদি অগ্রগতি। এ ঘটনা সম্ভবপর হয়েছে সমুদ্র সৈকতে রৌদ্রে শুকানো কাদামাটির মধ্যে।

প্রত্যেক প্রাণী মরণশীল

সূরা আম্বিয়া- : ৩৪-৩৫

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ.
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ.

And We granted not to any human being immortality before you, then if you die, would they live forever? Everyone is going to taste death.

তোমাদের পূর্বে কোনো মানব সন্তানকে আমরা অমরত্ব দান করিনি। যদি তোমরা মৃত্যুবরণ করো, তবে তারা কী চিরজীবি থাকতে পারে? প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। (সূরা আম্বিয়া : ৩৪-৩৫)

একথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না যে, পৃথিবীতে কোনো মানুষ অমরত্ব লাভ করতে পারেনা। অর্থাৎ কোনো মানুষকেই শাশ্বত জীবন দান করা হয়নি। জীবনকাল বিভিন্ন জাতির মানুষের বিভিন্ন রকম হতে পারে। পৃথিবীতে একশত বছরের বেশি মানুষ সাধারণত বাঁচে না। পুষ্টিযুক্ত খাদ্য, জনস্বাস্থ্য, রোগ-ব্যাধির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং পূর্বাহ্নে উন্নত পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয়, উন্নত চিকিৎসা, এমনকি নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গের পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে গড় জীবনকাল একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় উন্নীত হলেও কিন্তু কোনো ব্যক্তি একশত বছরের বেশি বাঁচতে পারে না। উন্নত দেশে উন্নত পদ্ধতির জীবন যাত্রার কারণে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে এবং বৃদ্ধলোকের সংখ্যা বেড়েছে।

পৃথিবীর বুকে সকল মানুষ যে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে তা চিরন্তন সত্য। মৃত্যুর চিহ্ন হলো হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া। যখন হৃৎযন্ত্রের কোনো সাড়া পাওয়া যায় না তখন স্টেথস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে নিশ্চিত করা হয় যে মৃত্যু ঘটেছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যেসব মৃত্যুর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় তা হলো দম বন্ধ হয়ে যাওয়া, যা অবলোকন করলে বুঝা যায়। মুখের সামনে আয়না তুলে ধরে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যাবে যে, মুখে কোনো আবছায়া নেই। অথবা একটি পালক উপরের ওষ্ঠে স্থাপন করলে দেখা যাবে ঐ পালক কাঁপছে না। কিংবা মৃত ব্যক্তির বুকের উপর পানি ভর্তি একটি গ্লাস রেখে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে ঐ গ্লাসের পানিতে যে

প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে তাতে কোন আন্দোলন নেই। মৃত প্রমাণ করার জন্য আর একটি তথ্য দ্বারা উপলব্ধি করা যায় যে, মৃত মানুষের চামড়া বা ব্লাড ভেসেল (Blood vessel) কাটলে রক্ত বের হয় না। মৃত্যুর অন্যান্য বাহ্যিক চিহ্ন হলো মাংসপেশীর নিথর অবস্থা যা চক্ষুকে উন্মিলিত রাখে, মুখকে হাঁ করে রাখে, বক্র-পিঠকে সোজা করে দেয়, গায়ের চামড়াকে বিবর্ণ করে দেয়, দেহকে ফোসকা-শূন্য করে এবং দেহের পোড়া চামড়াকে রক্তাভ করে দেয়।

দেহের কোনো অঙ্গ বদলানোর ফলে এবং যান্ত্রিক উপায়ে দম ছাড়া ও নেয়ার পদ্ধতি চালু হলে এর কারণে কিছু কিছু মৃত্যুর ঘটনায় মৃত্যু নির্ণয় করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ সমস্যা দূর করার প্রয়োজনে 'Brain death'-এর ধারণা চালু হয়েছে। যদি Brain বা মস্তিষ্ক কোনো কাজ না করে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে ধরে নিতে হবে মৃত্যু ঘটেছে। যদিও কৃত্রিম পদ্ধতিতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া এবং হৃৎপিণ্ডের সাড়া বজায় রাখা যায়।

জীবন সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সকল জীবন্ত সেল (Cells) নীরবে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। কৃত্রিম উপায়ে এ ক্ষয়প্রাপ্তিকে বিলম্বিত করা গেলেও অনির্দিষ্টকালের জন্য দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অবশেষে সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অর্থাৎ জীবনধারী যে কোনো প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবেই।

মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি

সূরা আম্বিয়া-২১ : ১০৪

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ.

The Day when We shall roll up the Heaven like a scroll rolled up for books. As We began the first creation similarly shall We repeat it. (It is) a promise binding upon Us. Truly, We shall do it.

সেদিন আমরা নভোমণ্ডলকে পুস্তকের গুটানো কাগজের মতো গুটিয়ে নেব। যেভাবে আমরা প্রথম সৃষ্টি শুরু করেছিলাম সেভাবে আবার সৃষ্টির সূচনা করবো। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সত্যি সত্যি আমরা তা করবো। (সূরা আম্বিয়া : ১০৪)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মহাবিশ্বের চূড়ান্ত অবস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করেছেন। এ মহাবিশ্ব একদিন সৃষ্টি হয়েছিল Big Bang-এর মতো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের মাধ্যমে। এ মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) পর থেকেই মহাবিশ্বর সম্প্রসারণ গতি আজও কার্যকর রয়েছে।

গ্যালাক্সি ও গুচ্ছ গ্যালাক্সিগুলো দারুণ গতিবেগে একে অপরকে পশ্চাতে রেখে ছুটে চলেছে। এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, মহাবিশ্ব কী চিরকাল সম্প্রসারণ হতে থাকবে? সম্প্রসারণ গতিকে বাধা দেয়ার জন্য মহাকর্ষ বল (Gravitation force) সক্রিয় হয়ে রয়েছে। মহাকর্ষ বলের কারণে গুচ্ছ গ্যালাক্সি এবং একক গ্যালাক্সি একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মহাকর্ষ বলের কারণে সম্প্রসারণ গতির অনুপাত নিয়ন্ত্রণ সীমায় রয়েছে। মহাবিশ্বের উপর ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ শক্তি এবং সম্প্রসারণ শক্তি পরস্পর দুটি বিপরীতধর্মী শক্তি। এখনও সম্প্রসারণ শক্তি মহাকর্ষ শক্তির উপর প্রভুত্ব বজায় রেখেছে যার ফলে গ্যালাক্সিসমূহ একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যদি সম্প্রসারণ গতি মহাবিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেই চলে তাহলে মহাজগতের সম্প্রসারণ বিরামহীন অবস্থায় সম্প্রসারিত হবে। অপরপক্ষে যদি মহাকর্ষ শক্তি প্রাধান্য লাভ করে তাহলে এমন একদিন আসবে তখন সম্প্রসারণ গতির অনুপাত

কমতে থাকবে এবং কমতে কমতে অবশেষে শূন্যে নেমে আসবে। মহাকর্ষ বল আজও কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে মহাজগৎ একদিন সংকুচিত হতে থাকবে এবং অবশেষে বিকট শব্দে ধ্বংস হয়ে অতি ঘন, অতি ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ডে পরিণত হবে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বিশ্বজগৎ গুটানো কাগজের মতো গুটিয়ে যাবে। এর ফলে এ ইঙ্গিত বহনকরে বিশ্বজগতের চূড়ান্ত অবস্থার কর্মসূচি যা আমেরিকান বিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসন নকশার মাধ্যমে তুলে ধরে দেখিয়েছেন। এ অবস্থাকে তিনি নাম দিয়েছেন Big Crunch। মি. ডাইসন বলেছেন, Big Crunch-এর প্রায় এক বিলিয়ন বছর পূর্বে গ্যালাক্সির মধ্যকার ফাঁকা জায়গা সংকুচিত হতে শুরু করবে। বিগ ক্রাঞ্চের একশত মিলিয়ন বছর পূর্বে একক গ্যালাক্সির মধ্যের জায়গাও (Space) কমে যাবে। তখন মহাকাশ কেবল তারকারাজিতে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তারকাগুলো একে অপরের কাছাকাছি এসে পড়বে। বিগ ক্রাঞ্চের প্রায় এক লাখ বছর পূর্বে গ্যালাক্সিগুলো সম্মিলিত হবে এবং তারকাগুলো একে অপরের এতো কাছে এসে পড়বে যে, সেগুলো একসঙ্গে একটা বিশালাকার রূপ ধারণ করে সূর্যের মতো কিরণ বিচ্ছুরিত করবে। Big Crunch-এর ১০০০ বছর পূর্বে নক্ষত্রসমূহের মধ্যে বিরাট সংঘর্ষ ঘটবে এবং এর ফলে অসংখ্য কৃষ্ণ বিবরের (Black hole) সৃষ্টি হবে। অবশেষে এসব কৃষ্ণ বিবর পরস্পর আকৃষ্ট হয়ে একসঙ্গে মিলিত হবে এবং তারা একটি অতি ক্ষুদ্র, অতি উষ্ণ, অতি ঘন বস্তুপিণ্ড তৈরি করবে। আর এটাই হলো Big Crunch।

অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, বিগ ক্রাঞ্চের পরে আর একটি বিস্ফোরণ ঘটবে এবং আর একটি নতুন বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হবে। এ ভাষ্যটি বর্তমান আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

মানব ভ্রূণ তত্ত্ব

সূরা হাজ্জ-২২ : ৫

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَاۤءُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ ثُمَّ لِتَبْلُغُوْاۤ اَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۤءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ.

O man kind if you are in doubt about the Resurrection, then We created you from dust, then from a *Nutfa* (mixed of sperm & ovum) then from a leech-like clot, then from a lettle lump of flesh-some formed and some unformed so that We may make clear to you. And We cause whom We will to remain in the wombs for an appointed time, then We bring you out as infants, then give you growth that you attain your full strenth. And among you some are called to die and some are brought back to the feeblest old age, so that they know nothing after having known.

হে মানব জাতি, যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে থাক তাহলে দেখ আমরা তোমাদের ধূলামাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর নুৎফা (শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিশ্রণ) থেকে, তারপর জোঁক সদৃশ জমাট রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর ছোট মাংসপিণ্ড থেকে– যা কিছুটা আকৃতিপ্রাপ্ত এবং কিছুটা আকৃতিহীন যেনো আমরা তোমাদের কাছে পরিষ্কার করতে পারি। আর আমরা যেভাবে ইচ্ছা মাতৃগর্ভে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত রাখি। এরপর শিশু হিসেবে তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ থেকে বের করে

আনি। এরপর আমরা তোমাদের বড় করি যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ করতে পার। তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে মৃত্যুর কোলে ডেকে আনি। আর কয়েকজনকে দুর্বল বার্ধক্যকাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাই যেনো তারা জানার পর কিছুই জানে না। (সূরা হাজ্জ : ৫)

এ আয়াতে মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধির কয়েকটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বলা হয়েছে মানুষকে ধূলামাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পিতা মাতার পুষ্টির প্রয়োজন মাটি থেকে যেসব উপাদান সংগৃহীত হয়ে থাকে সে উপাদান থেকে নুৎফা (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) তৈরি হয়। একটি শুক্রাণু (Sperm) দ্বারা একটি ডিম্বানু (Ovum) নিষিক্ত হলে প্রথম ভ্রূণকোষ জাইগোট (Zygote) সৃষ্টি হয়। জাইগোট জরায়ুর (Uterus) আভ্যন্তরীণ দেয়ালে স্থান লাভ করে। এখানে জাইগোট অবস্থান করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিকশিত জাইগোটের প্রাথমিক অবস্থাকে আরবিতে বলা হয় আলাক। আরবি আলাক শব্দটির অর্থ হলো জোঁক সদৃশ বস্তু (Leech like substance) বা জমাট রক্তপিণ্ড। তিন থেকে চার সপ্তার মধ্যে উন্নয়নশীল ভ্রূণ জোঁকের মতো আকার ধারণ করে। এ জোঁকের মতো আকারে থাকে মাথার সম্মুখ ভাগের উন্নত অংশ। এটাই তার মাথা। এ পর্যায়ে হৃৎপিণ্ডের সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং ভ্রূণ পুষ্টির জন্য মাতৃ রক্তের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। 'আলাক' স্তর ১৫-২৪ দিন কন্‌টিনিউ করে। পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধিকে আরবিতে বলা হয় 'মুদগাহ' বা মাংসপিণ্ড।

এ অবস্থা চলতে থাকে ২৩-৪২ দিন পর্যন্ত। এ অবস্থায় ভ্রূণকে মূলত চর্বন বস্তুর মতো (Chewed-like mass) দেখায়। এখানে দাঁতের মতো খাঁজকাটা ১৩টি মাংসপিণ্ডের (Somites) ব্লক গঠিত হয়। এ মাংসপিণ্ডগুলো পৃথক পৃথকভাবে ভ্রূণের নার্ভ নালীর পাশাপাশি সাজানো থাকে। এগুলোই শিরদাঁড়া ও পেশী গঠন করে। এদেরকে বলা হয় মেসোডার্মাল অংশ (Mesodermal segments)। এ অবস্থায় যেহেতু সকল দেহাংশের গঠন-অবয়ব একইভাবে গঠিত হয়ে থাকে তবুও তাদের কোনো কাজ থাকে না। তবে সকল অঙ্গ ও পদ্ধতি কিছুটা আকৃতিপ্রাপ্ত ও কিছুটা আংশিক আকৃতিতে মূর্ত হয়ে উঠে। অতএব 'মুদগাহ' সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুদগাহ কিছুটা আকৃতিপ্রাপ্ত এবং কিছুটা আকৃতিবিহীন যা বিজ্ঞানসম্মতভাবে সত্য।

গর্ভসঞ্জাত হওয়ার পর গর্ভধারণের সময়কাল আনুমানিক ২৬৬ দিন বা ৩৮ সপ্তাহ কিংবা শেষ ঋতুস্রাবের পর ২৮০ দিন বা ৪০ সপ্তাহ। কিন্তু প্রকৃত গর্ভধারণে

সময়কালে ব্যাপক পার্থক্য দেখা দেয় নির্ধারিত প্রসব তারিখের পূর্বে বা পরে কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে প্রসবের তারিখ নির্ধারিত হয় আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার দ্বারা। অন্য কারো প্রত্যাশায় নয়। শিশুর জন্মলাভের ঘটনাটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার। জন্মলাভের পরপরই শিশু পার্থিব আলো, বাতাস, আর্দ্রতা ও উষ্ণতার সংস্পর্শে আসে। তখন তার মধ্যে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তারপর আমরা দেখতে পাই যে, শিশু বিকশিত হয়ে কিভাবে কৈশোর এবং যৌবনে পদার্পণ করছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে কেউ কেউ বার্ধক্যে পৌছার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আল্লাহ্ পাক বিশেষভাবে কিছু মানুষের বৃদ্ধাবস্থার কথাও উল্লেখ করেছেন। মানুষ যৌবনকালেই শক্তিশালী থাকে এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুনরায় বৃদ্ধাবস্থায় দুর্বল হয়ে পড়ে। অল্পসংখ্যক লোক দেখা যায় যারা অধিক বয়স পর্যন্ত বাঁচে। এভাবে বাঁচার কারণে তারা শিশুর মতো শিশুসুলভ আচরণ করে এবং তারা তাদের অতীতের সবকিছু ভুলে যায়। এ অবস্থায় দৈহিক দুর্বলতার কারণে মস্তিষ্কের কঠিন পরিবর্তন সাধিত হয় যার ফলে তার চিত্তভ্রম ঘটে।

এটা খুবই মজার ব্যাপার যে, আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে একটি জাইগোট (Zygote) থেকে সৃষ্টি করেছেন। এই জাইগোট বিকশিত হয় বিভিন্ন পর্যায়ে। বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তিত হয়ে মানুষের জন্ম আজ আমরা জানতে পারছি। কিন্তু সপ্তম শতাব্দিতে অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনে এসব স্তর বা পর্যায়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আধুনিক ভ্রূণবিদ্যায় উল্লিখিত স্তরগুলোর সাথে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত পর্যায়গুলোর আশ্চর্যজনক মিল পরিলক্ষিত হয়।

সপ্তম শতাব্দিতে যখন পবিত্র কোরআনে এসব স্তরের কথা উল্লেখ করা হয় তখন ভ্রূণবিদ্যার (Embryology) জন্মলাভ ঘটেনি।

বিভিন্ন গ্রহে সময়ের বিভিন্নতা

সূরা হাজ্জ-২২ : ৪৭

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ.

And they ask you to hasten on the torment! And Allah fails not His promise. And verily a day with your Lord is as a thousand years of what you reckon.

আর তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ্ পাক তার প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের কাছে একদিন তোমাদের হিসাবে হাজার দিনের সমান। (সূরা হাজ্জ : ৪৭)

পৃথিবী তার অক্ষে একবার আবর্তিত হতে যে সময় লাগে সেই সময়কে আমরা একদিন বলে হিসাব করে থাকি। কিন্তু এক বছর হিসাব করা হয় যে সময়ে পৃথিবী একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। যে কোনো জ্যোতিষ্কের নিজ অক্ষে আবর্তনের সময়কালকে ঐ জ্যোতিষ্কের হিসাবে অনুরূপভাবে 'একদিন' বলা হয়। বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের এরূপ 'একদিন' এর কাল-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন ধরনের হবে যখন পৃথিবী থেকে হিসাব করা হবে। যেমন চন্দ্রের নিজ অক্ষে আবর্তনের সময়কাল চন্দ্রের হিসাবে একদিন, যা আমাদের হিসাবে ২৯ দিন। সূর্যের নিজ অক্ষে আবর্তনের সময়কাল সূর্যের হিসাবে একদিন, আমাদের হিসাবে ২৭ দিন। ছায়াপথ গ্যালাক্সির আবর্তনের সময়কাল ছায়াপথের হিসাবে একদিন আমাদের হিসাবে ২২০ মিলিয়ন বছর। আবার দেখা যায় বুধ গ্রহে ৮৮ দিনে এক বছর হয়। শুক্র গ্রহে ২২৫ দিনে এক বছর হয়। মঙ্গল গ্রহে ৬৮৭ দিনে এবং বৃহস্পতি গ্রহে ৪৩৮০ দিনে বছর হয়। তাই বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের হিসাবে বিভিন্ন দিন আমাদের হিসাবে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে।

এটা জেনে রাখা দরকার যে, আরবি 'ইয়োম' শব্দের অর্থ হলো সময়কাল (Period of time)। সময়ের স্বীকৃত সূত্র হিসাবে যদিও আমরা এখানে দিনের অর্থে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। আল্লাহ্ পাক উল্লেখ করেছেন তাঁর কাছে একদিন আমাদের হিসাবে ১০০০ বছর। এটা খুবই বিজ্ঞানসম্মত।

আল্লাহ তা'আলার একদিন সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হতে পারে যা আমাদের জন্য অগণিত বছরের সমান।

ভ্রূণের ক্রমবিকাশ

সূরা মুমিনুন-২৩ : ১২-১৪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ. ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ.

And Indeed We created man out of an extract of clay. Then We placed him as a *Nutfah* in a safe custody firmly fixed. Then We made the *Nutfah* into a clot (leech-like substance), then We made the clot into a somites (a chewed like mass), then We made out of that somites the bones and We clothed the bones with muscles, then We developed it into a another creation. So blessed in Allah, the best of the creators.

প্রকৃতপক্ষে আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটির সার নির্যাস থেকে। পরে তাকে নুৎফা হিসেবে একটি সুরক্ষিত আঁধারে (জরায়ু) স্থাপন করেছি। তারপর এ নুৎফাকে জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি। তারপর জমাট রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে (চর্বন বস্তুর মতো) পরিণত করেছি। এরপর এ মাংসপিণ্ডকে অস্থি বানিয়েছি। এরপর অস্থিকে মাংসপেশী দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে একটি ভিন্ন সৃষ্টিতে উন্নীত করেছি। অতএব মহামহিম আল্লাহ্ পাক সবার উপর শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। (সূরা মুমিনুন : ১২-১৪)

এ আয়াতগুলোতে ভ্রূণ বিকাশের পর্যায়গুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানব ভ্রূণ বিজ্ঞানের (Human Embryology) সংক্ষিপ্ত সার হিসেবে একে গণ্য করা যায়।

প্রথম পর্যায়ে বলা হয়েছে মাটির সার নির্যাস থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মাটির সার নির্যাস হিসেবে মাটিতে রয়েছে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, নাইট্রোজেন, আয়রন এবং আরো অন্যান্য উপাদান, বৃক্ষরাজি এবং ক্ষেতের ফসল

মূলের সাহায্যে এসব উপাদান চুষে নেয়। এরপর বৃক্ষ ফল (আম, কাঁঠাল, আপেল, আঙ্গুর, কলা) দেয় এবং ক্ষেতে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয়।

ফল এবং ফসলগুলো পুষ্টির প্রয়োজনে মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং খাদ্যের সার নির্যাস রক্তের সাথে মিশে যায় এবং পরবর্তীতে পিতার শরীরে সৃষ্টি হয় Sperm এবং মায়ের শরীরে সৃষ্টি হয় Ovum। Sperm দ্বারা Ovum নিষিক্ত হয়ে জাইগোট গঠন করে যা জরায়ুতে (Uterus) স্থানান্তরিত হয়। অতএব সুলালাহ্ হলো বেসিক উপাদান যা থেকে মানুষ সৃষ্টির মলিকুল আহরিত হয়। অর্থাৎ পিতা মাতার পুষ্টির প্রয়োজনে মাটির নির্যাস থেকে যেসব উপাদান সংগৃহীত হয় সেসব উপাদান থেকে নুৎফা তৈরি হয়।

নুৎফা দ্বারা মানব ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। আরবি নুৎফা শব্দ দ্বারা Sperm কে যেমন বুঝায় তেমনি Ovum কেও বুঝায়। আবার Sperm ও Ovum এর মিলনের ফলে যে জাইগোট গঠিত হয় তাকেও পবিত্র কুরআনে নুৎফা বলা হয়েছে। Sperm, Ovum-এর ভেতরে প্রবেশ করে জাইগোট (Zygote) তৈরি করে। লক্ষ লক্ষ Sperm-এর মধ্যে কোনো একটি Sperm একটি Ovum-এ প্রবেশ করে নিষেক (Fertilization) ঘটায়।

জাইগোট বাচ্চা-থলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানে পার্শ্ব দেয়ালে দৃঢ়ভাবে এঁটে থাকে। এটা তার জন্য বেশ নিরাপদ স্থান।

সুতরাং আমরা যদি নুৎফা শব্দ দ্বারা Sperm বুঝি তবে যখন সেটা Ovum-এর ভেতরে প্রবেশ করে তখন সেটা বেশ নিরাপদ স্থান লাভ করে। কিন্তু যদি জাইগোটকে নুৎফা হিসেবে ধরা হয় তাহলে যখন সেটা বাচ্চা-থলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন সেটা একটি নিরাপদ অবস্থানে পৌছায়। আরবি মুকিন শব্দের সঠিক অর্থ হলো জরায়ু বা বাচ্চা-থলির পার্শ্ব দেয়ালে জাইগোটের দৃঢ়ভাবে এঁটে থাকা বা নোঙ্গর করা। সুতরাং 'কারারিম মুকিন'-এর অর্থ এ যে, জরায়ুর অভ্যন্তরে জাইগোটের আগমন এবং তার পার্শ্ব দেয়ালে পূর্ণ নিরাপত্তায় নোঙ্গর করা। যদি আমরা Sperm কে চঞ্চল বলে বিবেচনা করি তাহলে যখন সে Ovum-এ প্রবেশ করে তখন সে নিরাপদ বাসস্থান পেয়ে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। জরায়ু হলো জাইগোটের বাসস্থান। জাইগোট এখানে জরায়ুর দেয়ালে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে।

পরবতী পর্যায়ে জাইগোট বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্ধিষ্ণু জাইগোটের প্রাথমিক অবস্থাকে আরবিতে বলা হয় 'আলাক'। একটি জোঁক রক্ত চুষে নিয়ে যে রূপ ধারণ করে আলাক দেখতে অনেকটা সে রকম। ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে উন্নয়নশীল ভ্রূণ জোঁকের মতো আকার ধারণ করে। এর মধ্যে থাকে মাথার সম্মুখভাগের উন্নত

অংশ। এ পর্যায়ে হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ Cardiovascular system এর উন্নয়ন ঘটে। এরই মধ্যে ১৫-১৬ দিনের মাথায় আলাক জরায়ুর দেয়ালে ঝুলন্ত দেহবস্তুর মতো ঝুলে থাকে। অতএব আলাক শব্দটির তিন ধরনের অর্থ বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য। (১) জমাট রক্তপিণ্ড, (২) জোঁক সদৃশ বস্তু, (৩) ঝুলন্ত দেহবস্তু।

পরবর্তী পর্যায়ের রূপান্তরকে আরবিতে বলা হয় মুদগাহ বা মাংসপিণ্ড। এ অবস্থা চলতে থাকে ২৩-৪২ দিন পর্যন্ত। এ অবস্থায় ভ্রূণকে প্রকৃতপক্ষে চর্বন বস্তুর মতো (Chewed-like substance) দেখায়।

পরবর্তী পর্যায়টি হলো হাঁড় তৈরির স্তর। প্রথমে যে হাঁড়গুলো দেখা দেয় সেগুলো হলো উপরিভাগের কচি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। প্রাথমিক ৬ সপ্তাহে কচি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মেসেনচিমাল টিশুগুলো (Mesenchymal tissue) কোমল অস্থিতে পরিণত হয়ে ভবিষ্যৎ অস্থির একটি স্বচ্ছ মডেল গঠন করে। ১২ সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণের একটি পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল (Skeleton) গঠিত হয়।

ভ্রূণ বিকাশের পরবর্তী স্তর হলো পেশী গঠনের স্তর। সপ্তম সপ্তাহ থেকে কঙ্কাল দেহে বিস্তার লাভ করে এবং হাঁড়গুলো পরিচিত আকার ধারণ করে। এ সময় ভ্রূণটি একটি মানব চিত্র লাভ করে। সপ্তম সপ্তাহ শেষ হলে অষ্টম সপ্তাহের সময় পেশীগুলো হাঁড়ের চারপাশে আবৃত হতে থাকে। যদিও হাঁড় গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পেশী গঠন শুরু হয় তবুও পরবর্তী সময় না আসা পর্যন্ত পেশী তার সঠিক অবস্থান গ্রহণ করে না। সুতরাং পেশী দ্বারা হাঁড়ের উপর আচ্ছাদন কথাটি খুবই তাৎপর্যবাহী।

অষ্টম সপ্তাহ শেষ হলে নির্দিষ্ট পেশীকাণ্ড, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মাথা খুব ভালোভাবে দেখা যায় এবং এ সময় ভ্রূণটি নড়াচড়া করতে থাকে।

এরপর ভ্রূণটি একটি সময়কাল ধরে বড় হতে থাকে। আরবি শব্দ 'খালকান আখারা' যে অর্থ প্রকাশ করে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'খালকান আখারা' অর্থ ভিন্ন সৃষ্টি। গর্ভে থাকার পূর্ণ সময় পরে শিশু জন্মলাভ করে অর্থাৎ নতুন এক সৃষ্টি আপন অস্তিত্বে মূর্ত হয়ে ওঠে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক 'আহসানুল খালেকীন' অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। এ অর্থ যথোপযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। শুধু আল্লাহ পাক প্রদত্ত বস্তুসমূহের রূপান্তর করতে পারে। অর্থাৎ সৃষ্টির উপজীব্য উপাদান আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি। তাছাড়া মানব সৃষ্টি সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম এ কারণে মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত।

বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ

সূরা মুমিনুন-২৩ : ১৭

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ.

And indeed We have created above you seven paths and We are never unmindful of (Our) creation.

আমরা তোমাদের উপরে সাতটি পথ তৈরি করেছি। আর আমাদের সৃষ্টির ব্যাপারে আমরা কখনো অমনোযোগী নই। (সূরা মুমিনুন : ১৭)

আমরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বসবাস করি। আমাদের মাথার উপর রয়েছে বায়ুমণ্ডলের সাতটি স্তর। এসব স্তর আল্লাহ্ পাক সুকৌশলে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর বাসিন্দাদের রক্ষা করার জন্য।

সূর্য একটি জ্বলন্ত নক্ষত্র। এ নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে আসে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ, তেজস্ক্রিয় রশ্মি, অতি বেগুনী রশ্মি এবং এক্স-রে, সূর্যের বাইরের পরিমণ্ডলে যে সৌরবায়ু উত্থিত হয় তাতে থাকে আয়ন ও ইলেকট্রন কণা। এসব তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও অণু কণা ঘন্টায় ৯০০০০০ মাইল বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত করে। এক ধরনের নিউট্রন তারকা আছে যাদেরকে এক্স-রে পালসার বলা হয়। সেই নিউট্রন তারকাগুলো জীবনঘাতী এক্স-রে উৎপন্ন করে। সুদূর মহাশূন্য থেকে মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays) আলোর গতিতে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে আঘাত হানে। সুতরাং বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ, তেজস্ক্রিয় রশ্মি, অতি বেগুনী রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি, আয়ন এবং ইলেকট্রন কণা, যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো তাহলে উদ্ভিদজগৎ, প্রাণীজগৎ ও মানব জগতের ব্যাপক বিনাশ সাধন করেই ছাড়তো। কিন্তু বায়ুমণ্ডলীয় স্তরগুলো সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর রশ্মি ও অণু কণাগুলো আটকে রাখে কিংবা চুষে নেয়। একজন সৈনিক আত্মরক্ষার জন্য যেমনি করে প্রতিরক্ষা ঢাল ব্যবহার করে তেমনি বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলো পৃথিবীর বাসিন্দাদের রক্ষা করার জন্য সূর্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও অণু কণার বিরুদ্ধে ঢালের মতো কাজ করে। তাই উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল নিরাপদে পৃথিবীতে বাস করতে পারে। নিম্নে বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলোর উল্লেখপূর্বক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল :

১. ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere) : এটি বায়ুমণ্ডলের প্রথম স্তর। ভূপৃষ্ঠের

উপরিভাগে এর ব্যাপ্তি হলো ৮-১০ কি. মি.। এ স্তর রাত্রিকালে পৃথিবী যে তাপ পুনঃবিকিরণ করে ছেড়ে দিতে চায় সে তাপের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে রোধ করে থাকে। এ প্রক্রিয়াকে গ্রীন হাউস ইফেক্ট বলা হয়।

২. স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere) : এটি বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তর। এ স্তরটি ট্রপোস্ফিয়ারের উর্ধ্বে ৭০ কি. মি. বিস্তৃত। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মধ্যে আছে ওজন স্তর। এ ওজন স্তর পৃথিবীর প্রায় ৩০ কি. মি. উপরে অবস্থিত। এটা সূর্য থেকে আগত অতি বেগুনী রশ্মি (Ultra violet rays) এবং এক্স-রের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জীবজগতকে রক্ষা করে।

৩. মেসোস্ফিয়ার (Mesosphere) : মেসোস্ফিয়ার প্রায় ৮০ কি. মি. পুরু। এখানে বায়ুর চাপ অত্যন্ত ক্ষীণ। এ স্তরে তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে –১৫° সেলসিয়াসে স্থির হয়। শৈত্যপ্রবাহ এবং হিমেল জলীয় কণা কেন্দ্রিভূত হয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. থার্মোস্ফিয়ার (Thermosphere) : এ স্তরের তাপমাত্রা থাকে সাধারণত ৪৫০° সেলসিয়াস। সূর্য থেকে আগত বিভিন্ন ক্ষতিকর রশ্মি এ স্তরে শোষিত হয়।

৫. আয়নোস্ফিয়ার (Ionosphere) : এটি গ্যাসীয় স্তর। এর বিস্তৃতি প্রায় ৩২০ কি. মি.। সূর্যের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেতস্কণা এখানে এসে আয়নকণার রূপান্তরিত হয়। তাছাড়া এ স্তরে রেডিও তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়।

৬. এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere) : এ স্তর অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা গঠিত। সূর্যের তীব্র কিরণ রশ্মি এ স্তরে পতিত হলে হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হয়।

৭. ম্যাগনেটোস্ফিয়ার (Magnetosphere) : এ স্তরের কাজ হলো চুম্বক-ঢাল হিসেবে রক্ষণ কার্য সমাধা করা। সূর্য থেকে নির্গত ইলেকট্রন ও প্রোটন এ স্তরে বন্দি হয়ে থাকে। চুম্বক-ঢাল না থাকলে আমাদের পৃথিবীর উপর পতিত পটভূমি বিকিরণ (Background radiation) কয়েক গুণ বড় হতো। এর ফলে তার দ্বারা সকল প্রাণীজগৎ ধ্বংস হয়ে যেত। আজকের দিনে আমরা তা জানতে পেরেছি।

সুতরাং বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলো সম্পর্কে যে আলোচনা করা হলো তা আমাদের জ্ঞানের আওতায় এসেছে বর্তমান শতাব্দীতে। প্রকৃতির এসব রক্ষাকারী এবং কল্যাণময় প্রক্রিয়াগুলো আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টির প্রতি অসীম করুণার কথা ঘোষণা করে। এগুলো ছাড়া মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী পৃথিবীতে একদিনও বেঁচে থাকতে পারতো না। এসব কি শুধুমাত্র আকস্মিক ব্যাপার? না, এগুলো পরম হিতৈষী করুণাময় আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টির প্রতি তার গভীর মনোযোগের কথাই প্রকাশ করে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি কখনো অমনোযোগী নন।

বাতাসের ঘনত্বের কারণে আলোক রশ্মি বক্র হয়

সূরা নূর-২৪ : ৩৯

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً
حَتّٰى اِذَا جَاءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰهُ حِسَابَهٗ
وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

As for those who disbelieve, their deeds are like a mirage in a desert. The thirsty one thinks it to be water, until he comes up to it, he finds it to be nothing but he finds Allah with him, Who will pay him his due. And Allah is swift in taking account.

যারা অবিশ্বাসী তাদের ব্যাপারে বলা যায় যে, তাদের কার্যকলাপ মরুভূমির মরীচিকার মতো। যাকে তৃষ্ণার্ত মানুষ মনে করে পানি। যখন সে তার কাছে যায় তখন সে দেখতে পায় সেখানে কিছুই নাই। কিন্তু সেখানে তার সাথে আল্লাহ পাককে দেখতে পায় যিনি তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দেন। আর আল্লাহ পাক খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণ করে থাকেন। (সূরা নূর : ৩৯)

মরীচিকা এক প্রকার দৃষ্টি বিভ্রান্তকারী বস্তু। এ বিভ্রান্তির কারণে দূরবর্তী কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব বক্রাকারে দেখা যায়। এর কারণ হলো বাতাসের ঘনত্বের কারণে আলোক রশ্মির বক্রতা। দিনের বেলা মরুভূমিতে বালুকা অত্যন্ত উষ্ণ হয়ে উঠে এবং এর ফলে বাতাস গরম হয়ে ভূমি থেকে কিছুটা উপরে উঠে যায় এবং তখন এ বাতাসের ঘনত্ব কিছুটা কমে যায়। এ বাতাসের উপরের স্তরের বায়ুর ঘনত্ব বেশি থাকে। যখন আকাশ থেকে কিংবা গাছপালার মাথার উপর থেকে আলোক রশ্মি এসব স্তর ভেদ করে নিচের দিকে নামে তখন তারা প্রতিসরিত হয় এবং অবশেষে উপর দিক বেঁকে দৃষ্টি লাইনের নিচে দর্শকের চোখে প্রবেশ করে। দর্শক তখন আকাশ এবং গাছের প্রতিবিম্ব উল্টোভাবে উপরের অংশকে নিচের দিকে দেখে। এরূপ প্রতিবিম্ব দেখা যায় পুকুরের পানিতে। অতএব দূরে কোনো হ্রদের ঝরনা সৃষ্টি হলে এবং সে হ্রদের নিকটে গেলে তা আর দেখা যায় না। কিছু মরীচিকা খুবই বিস্ময়কর। এসব মরীচিকাকে আপাতদৃষ্টিতে ঊর্মিকার মতো দেখায়। এর কারণ হলো বাতাসের গরম স্তরগুলো তাদের অবস্থানে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক অবিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ডকে মরীচিকার সাথে তুলনা করেছেন যা খুবই প্রণিধানযোগ্য।

অন্ধকারের গভীরতা অত্যন্ত ব্যাপক

সূরা নূর-২৪ : ৪০

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ.

Or, (the state of a disbeliever) is like the darkness in a vast deep sea, overwhelmed with waves topped by waves, topped by dark clouds, darkness upon darkness; if a man stretches out his hand, he can hardly see it! And he for whom Allah has not appointed light, for him there is no light.

অথবা (একজন অবিশ্বাসীর অবস্থান হবে) বিরাট গভীর মহাসমুদ্রের মধ্যে অন্ধকারের গভীরতায়। যা উদ্বেলিত থাকবে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ দ্বারা এবং ঘন কালো মেঘ দ্বারা, অন্ধকারের উপর অন্ধকার; যদি কেউ তার হাত বের করে তখন তা সে একেবারে দেখতে পাবে না। আর আল্লাহ্ পাক যাকে আলো দেন না তার জন্য কোনো আলো নেই। (সূরা নূর : ৪০)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক গভীর সমুদ্রের তলদেশের গাঢ় অন্ধকারের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করেছেন উপমা উপস্থাপনের মাধ্যমে।

স্বাভাবিক এবং বিক্ষুব্ধ জলরাশির মধ্যে বিরাট গভীর মহাসমুদ্রের বুকে অন্ধকারের গভীরতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এমনকি যখন সাগর শান্ত থাকে এবং আকাশ পরিষ্কার থাকে তখনো গভীর সমুদ্রের তলদেশ সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে। যে ব্যক্তি যতবেশি সাগরের গভীরে যাবে সে ততবেশি আলোশূন্য অবস্থা দেখতে পাবে। আলোশূন্য অবস্থা সবচেয়ে বেশি হবে সাগরের তলদেশে। এ অন্ধকারই হলো প্রাথমিক অন্ধকার।

যদি সাগরের উপরিভাগ শান্ত হওয়ার পরিবর্তে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ দ্বারা চরমভাবে আন্দোলিত হয় তাহলে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে তরঙ্গের হেলানো দিক দিয়ে অপসৃত হয়ে যায় এবং আলোর পরিমাণ অবশেষে প্রতিসরণের মাধ্যমে সাগর

তলে পৌঁছতে দারুণভাবে হ্রাস পেয়ে যায়। এই সময় সাগরের তলদেশের অন্ধকার বেশ ভালোভাবে জমে উঠে। একে বলা হয় দ্বিতীয় মাত্রার অন্ধকার।

আমরা জানি যে, মেঘ হলো ঘনীভূত জলীয় বাষ্পের দেহবস্তু। এর মধ্যে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি কণা এবং তুষার কণা। এ কণাগুলো বাতাসে ভেসে বেড়ায়। বৃষ্টি ভরা মেঘকে বলা হয় জমাট বাধা মেঘ। যার আকার বিশাল মেঘের পর্বতের মতো। এর উচ্চতা বেশ দীর্ঘ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন এর গভীরতার ব্যাপ্তি ২৫০০ থেকে ৩৫০০ হাজার ফুটের মধ্যে। উপর থেকে সূর্যের আলো যখন একে ভেদ করে তখন ঐ আলো প্রতিফলিত হয়ে চলে যায়। অতএব যখন সূর্যের আলো গাঢ় মেঘে ঢাকা পড়ে তখন সূর্য কিরণের বড় অংশটা মেঘ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং যে ম্লান সূর্য কিরণ ঢেউয়ের উপর পড়ে তা কখনো পানির গভীরতার অতিক্রম করতে পারে না। ফলে সাগরের তলদেশ সমগ্র আলো থেকে বঞ্চিত থাকে। এর ফলে সাগরের তলদেশে নিশ্চিহ্ন অন্ধকার বিরাজ করে। এটাকে তৃতীয় মাত্রার অন্ধকার বলা হয়। এরূপ অন্ধকারে কেউ তার নিজের হাত পর্যন্ত দেখতে পাবে না। এমনকি হাত চোখের সামনে তুলে ধরলেও না। তাহলে বুঝা যাচ্ছে অন্ধকারের গভীরতা কতো বেশি ব্যাপক।

আল্লাহ্ পাক অবিশ্বাসীদের অবস্থাকে এরূপ অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ্ পাকের মহিমা প্রচার করে

সূরা নূর-২৪ : ৪১

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ.

See you not that Allah, He it is whom glorify whosoever is in the Heavens and the earth and the birds with wings out spread (in their flight)? Each one knows its own (mode of) prayer and praise. Allah knows well all that they do.

তোমরা কি দেখনা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে এবং পাখিসমূহ তাদের পাখা বিস্তার করত আল্লাহ পাকের মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার প্রার্থনা এবং প্রশংসা করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানে। তারা যা করে আল্লাহ্ পাক সে বিষয়ে ভালোভাবে অবহিত আছেন। (সূরা নূর : ৪১)

মহান আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত নিয়মের অধীনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ছোট বড় সবকিছু নিয়ন্ত্রিত। বিশাল মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সিসমূহ, নক্ষত্র ও গ্রহসমূহ আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্ধারিত আইন-কানুনসমূহ অনুসরণ করে থাকে। অণু, পরমাণু, নিউট্রন, ইলেকট্রন এবং অন্যান্য অতি ক্ষুদ্র কণিকার জগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অতিশয় সুন্দর নিয়মের মাধ্যমে। এ নিয়মগুলো কার্যপ্রণালী বিশেষ ধরনের। প্রাণী ও উদ্ভিদসহ জীবজগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা। প্রাণী ও উদ্ভিদ অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধভাবে এ আইন মেনে চলেন। পাখিরা ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত হয়ে।

অতএব প্রকৃত ঘটনা এ যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবকিছু স্পষ্টভাবেই মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতিসমূহ অনুসরণ করে চলেছে এবং আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি অনুগত হয়ে রয়েছে। তাদের এ কর্মকে আল্লাহ পাকের প্রতি তাদের প্রার্থনা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু তাদের প্রার্থনার ধরন তাদের স্বকীয়। তারা আল্লাহ্ পাকের মহিমা প্রচার করে তাদের নিজস্ব ভাষায়। এভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রার্থনা ও মহিমা ঘোষণার মাধ্যমে তারা বিপুলভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। কারণ তাদের প্রার্থনা ও আনুগত্যে আল্লাহ পাক বিশেষভাবে সন্তুষ্ট।

সৃষ্টির সঠিক পরিমাপ : অসীম প্রজ্ঞার প্রমাণ

সূরা ফুরকান-২৫ : ২

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا.

He has created everything and has measured it exactly according to its due measurements.

তিনি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকের পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন যথাযথভাবে। (সূরা ফুরকান : ২)

এ আয়াতাংশে বলা হয়েছে আল্লাহ পাক যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের যথার্থ পরিমাপ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এটা খুবই সত্য যে, পরিমাপ সঠিক এবং নির্ভুল না হলে সৃষ্টির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতো। তাই আয়াতে যে বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রথমে আমরা মানুষের আকারের (Size) হিসাব করবো। সাধারণভাবে মানুষের দৈর্ঘ্য ১ থেকে ২ মিটারের মধ্যে। এ দৈর্ঘ্যের আকার পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (Gravity) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে পদার্পণ করে তখন থেকেই সে এ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে মানিয়ে নিয়েছে। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, মানুষের বর্তমান দৈর্ঘ্যের চেয়ে যদি তার দৈর্ঘ্য ২-৩ গুণ বেশি হতো তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াতো? এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে এককদম হাঁটা খুবই বিপদজনক হতো। যদি মানুষের দৈর্ঘ্য বর্তমান অপেক্ষা তিন গুণ হয় এবং দেহের অনুপাত একই রকম থাকে তাহলে তার ওজন হবে ৩x৩x৩=২৭ গুণ। ২৭ গুণ ভারি হওয়ার কারণে মানুষ চলতে গিয়ে পড়ে যাওয়ার শিকার হবে এবং তিনবার আছাড় খাবে। আছাড় খাওয়ার ফলে যে ফল দেখা দেবে তার পরিমাণ হবে অধিক মাত্রায় ৮১ (২৭x৩) গুন। তার দেহের হাড়গুলো ৯ গুণ শক্তিশালী হবে যেহেতু সেগুলো নির্ভর করে ঐগুলোর সংযোগ এলাকার উপর। অতএব আছাড় খাওয়ার ফলে ক্ষতির পরিমাণও হবে ৯ গুণ।

এখন কেউ বিপরীতভাবে প্রশ্ন তুলতে পারেন, যেমন, বর্তমান মানুষের যে দৈর্ঘ্য আছে তার চেয়ে যদি এ দৈর্ঘ্য কম হয় তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে? এর ফলে এটা

দেখানো যেতে পারে যে মানুষ অগাধ অসুবিধার সম্মুখীন হবে। এটা সকলে জ্ঞাত যে, দেহ থেকে যে পরিমাণ তাপ শক্তি নষ্ট হয়, তা নির্ভর করে দেহের উপরিভাগের এলাকায়। যদি মানুষ অতি খর্বাকৃতির হতো তাহলে তার দেহের বাহ্য এলাকা সমগ্র দেহ-অবয়বের তুলনায় অনেক স্থূল হতো। এমতাবস্থায় শীতল দেহ অধিক পরিমাণে তাপশক্তি হারিয়ে হয়ে পড়তো। তাই তার শরীরকে গরম রাখার জন্য তাকে অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হতো। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের ঘটনা দেখা যায় মুষিক জাতীয় পতঙ্গভুক প্রাণীদের (Shrew) মধ্যে। এসব প্রাণী আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র কিন্তু তাদের রক্ত বেশ উত্তপ্ত। ঐসব প্রাণী অধিক পরিমাণে আহার করে নিজেদের গরম রাখে। তারা যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে তা তাদের দেহের ওজনের চেয়ে বেশি। অতএব মানুষ যদি তার বর্তমান আকারের চেয়ে কয়েক গুণ ক্ষুদ্রাকার হতো তাহলে কেবল মাত্র খাদ্য সমস্যায় দেখা দিত না উপরন্তু তার মগজের আকারও ভয়ঙ্করভাবে ছোট হতো। এর ফলে মানুষ আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বুদ্ধিমান জীব বলে গর্ব করতে পারতো না। এসব আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ পাক মানুষের যে দৈহিক আকারের পরিমাপ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা অতিশয় প্রজ্ঞাদীপ্ত।

এভাবে সকল জীবের দৈহিক পরিমাপ আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্ধারিত এবং তা তাদের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ পরিবেশেই আল্লাহ পাক তাদের জীবন ধারণ করার এখতিয়ার দিয়েছেন।

পরিমাপের অস্তিত্বের বিষয়টি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গণিত শাস্ত্রবিদদের দ্বারা আলোচিত হয়েছে। তারা দেখিয়েছেন যে, সূর্যমুখী ফুলের পাপড়িগুলোর আবির্ভাব খুবই সুন্দর দেখায়। পাপড়িগুলো কেন্দ্র থেকে ক্রমবর্ধমান দূরত্বে সজ্জিত থাকে। এদের দূরত্বের অনুপাত ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১। এই সংখ্যাগুলোকে বলা হয় Fi-bonacci সংখ্যা।

অতএব অঙ্কের নিয়মানুসারে সূর্যমুখী ফুলের মডেল তৈরি করতে গিয়ে আনন্দের সঙ্গে একথা স্বীকার করতে হয় যে, মহান আল্লাহ পাক এর গঠন পদ্ধতিতে পরিমাপ যোজনা করেছেন। এটা বিস্ময়ের বিষয় নয় যে, বিশ্বপ্রকৃতি আল্লাহ পাকের প্রতিষ্ঠিত গাণিতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

সুতরাং উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেকটা সৃষ্টি মহান আল্লাহ পাক একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের দ্বারা সুচারুরূপে গঠন করেছেন।

সৌরজগতের পরিণতি

সূরা ফুরকান-২৫ : ২৫

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰئِكَةُ تَنْزِيلاً.

And the Day when the Heaven shall be rent asunder with clouds and the Angels shall be sent down with a grand descending.

সেদিন মেঘমালাসহ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং ফেরেশতাদের নিচে পাঠানো হবে। (সূরা ফুরকান : ২৫)

এটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, এমন একদিন আসবে সেদিন সৌরজগতসহ সূর্য বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে এবং তথায় গ্যাসীয় মেঘরাশি আচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। সূর্যের মধ্যে দুইটি বিপরীত শক্তি কাজ করে যাচ্ছে। একটি হলো সম্প্রসারণ শক্তি (Force of expansion)। এ শক্তি কার্যকর হয় সংযোজন শক্তির (Fusion energy) মাধ্যমে। আর এ সংযোজন শক্তির উদ্ভব ঘটে হাইড্রোজেন গ্যাস দগ্ধ হয়ে হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে। অপর শক্তিটি হলো মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে সংকোচন শক্তি। যতদিন এ শক্তিদ্বয় ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারবে ততদিন সূর্য স্বীয় অবস্থানে অবিচল থাকবে। যতই দিন যাবে ততবেশি হাইড্রোজেন হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হতে থাকবে। এর ফলে হিলিয়াম গ্যাস অধিকতর ভারি হয়ে কেন্দ্রীয় এলাকায় নেমে পড়বে। ধীরে ধীরে অভ্যন্তরভাগ দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এ দুটির একটি হবে হিলিয়াম গ্যাস ভরা কেন্দ্রীয় অন্তঃঅঞ্চল যা সৃষ্টি হবে জ্বলন্ত হাইড্রোজেনের পারিপার্শ্বিক আচ্ছাদনসহ। আর একটি হবে বহিঃঅঞ্চল যা প্রাথমিকভাবে গঠিত হবে হাইড্রোজেন দ্বারা। সূর্য তখন একটা বিকৃত বিশাল আকার ধারণ করবে। কারণ তার অন্তঃঅঞ্চলের নিউক্লিয়াস বৃদ্ধি পেয়ে তার বহিঃঅঞ্চলের নিউক্লিয়াসের চার গুণ হয়ে যাবে। অন্তঃঅঞ্চল যতবেশি ব্যাপকতা লাভ করবে সূর্যের বিকৃত অবস্থা ততবেশি গুরুত্ব পাবে এবং তার স্থিতাবস্থা হুমকির সম্মুখীন হবে। যখন আনুমানিক সূর্যের ১০% হাইড্রোজেন পুড়ে যাবে তখন সূর্য আর স্থির হয়ে থাকতে পারবে না। হিসাব করে দেখা গেছে সূর্য যখন এ অবস্থায় পৌছবে তখন সূর্যের বহিঃস্তর দ্রুতবেগে সম্প্রসারিত হয়ে পড়বে এজন্য যে, মোট বহিঃচাপের ফলে

সূর্যের ফটোস্ফয়ারের (Photosphere) ব্যাস মূল ব্যাস থেকে দশ গুণ বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রহদের কক্ষপথ গিলে ফেলবে। যেসব গ্রহের কক্ষপথ গিলে ফেলবে সেগুলো হলো বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল। এ অবস্থায় মাঝে মাঝে সংকোচন বা আকর্ষণ শক্তি বেড়ে যাবে এবং কখনো কখনো সম্প্রসারণ গতিতে প্রাধান্য পাবে। এভাবে সূর্য হাজার হাজার বছর ধরে কম্পমান অবস্থায় থাকবে। পরিশেষে আভ্যন্তরীণ হিলিয়াম-স্তর ভেঙ্গে পড়বে এবং কার্বন সংযোজন ঘটবে। এটাই হবে স্থিতাবস্থা। সূর্যের বহিঃস্তর ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে এবং ঐ টুকরা টুকরা স্তর মেঘের আকারে ভেসে বেড়াবে। যেদিন এরূপ অবস্থা হবে সম্ভবত সেদিনের কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে।

সূর্য স্থির নয় বলে ছায়া পরিবর্তন হয়

সূরা ফুরকান-২৫ : ৪৫-৪৬

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلاً. ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا.

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا.

Have you not seen how your Lord spread the shadow. If He willed, He could make it stationary! Then do We make the sun its guide. Then We withdraw it to Us a gradual concealed withdrawal.

তোমরা কি দেখোনা তোমাদের প্রভু কিভাবে ছায়াকে প্রসারিত করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন একে স্থির রাখতে পারতেন। অতঃপর আমরা সূর্যকে এর নির্দেশক বানিয়েছি। এরপর একে আমরা ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করে আমাদের দিকে গুটিয়ে আনি। (সূরা ফুরকান : ৪৫-৪৬)

অস্বচ্ছ বস্তু দ্বারা আলো বাধাপ্রাপ্ত হলে ছায়া সৃষ্টি হয়। ছায়া উৎপন্ন হয় আলোর উৎসের বিপরীত দিকে। আলোর প্রধান উৎস সূর্য। সূর্য স্থির অবস্থায় থাকে না বলে ছায়ার দৈর্ঘ্য ও অবস্থান স্থির অবস্থায় থাকে না। কারণ তা সূর্যের অবস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। সকালবেলা সূর্যের উচ্চতা কম হওয়ার ফলে ছায়া হয় দীর্ঘ। সূর্যের উচ্চতা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে পর্যায়ক্রমে ছায়া ততই ক্ষুদ্র হতে থাকে। পুনরায় সূর্যের উচ্চতা হ্রাস পেলে ছায়া ক্রমান্বয়ে বড় হতে থাকে।

সূর্যের দ্বারা উৎপন্ন ছায়ার এ পরিবর্তন সংগঠিত হয় আল্লাহ পাকের নির্ধারিত নিয়মের আওতায়।

এ আয়াতে আরো বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছে করতেন তাহলে ছায়াকে তিনি স্থির অবস্থায় রাখতে পারতেন। এ বক্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ অবস্থা হতে পারতো তখনই যখন পৃথিবী যে সময়ের মধ্যে সূর্যকে একবার সম্পূর্ণভাবে প্রদক্ষিণ

করে সেই সময়ের মধ্যে যদি পৃথিবী তার নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করতো। এরূপ অবস্থা হলে পৃথিবীর এক অংশ স্থায়ীভাবে সূর্যের দিকে উন্মুক্ত থাকতো এবং এ অংশের সকল ছায়া স্থির হয়ে থাকতো। আর পৃথিবীর অপর অংশ স্থায়ীভাবে অন্ধকারে ডুবে থাকতো। অবস্থা এরূপ ঘটলে মহাবিপদ দেখা দিতো। কারণ পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের দিকে সর্বদা উন্মুক্ত থাকতো সে অংশ মরুভূমিতে পরিণত হতো। আর যে অংশ সূর্যের বিপরীত দিকে থাকতো সেখানে বিরাজ করতো কনকনে শীত যা জীবন ধারণকে অসম্ভব করে তুলতো।

আল্লাহ পাকের অশেষ করুণায় পৃথিবী পেয়েছে তার অক্ষে ঘূর্ণন গতি। যার ফলে ছায়ার আকৃতি একবার দীর্ঘ হচ্ছে আবার ক্রমান্বয়ে ছোট হচ্ছে। সুতরাং পৃথিবীর কোনো অংশকেই দীর্ঘ সময়ের জন্য সূর্যের সামনে থেকে সরিয়ে রাখা হয় না। এর ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বেশ সহনীয় এবং জীবনকে গতিশীল করে তোলার পক্ষে সহায়ক অবস্থা লাভ করেছে।

সাগরের পানিতে দুইটি ধারা পরস্পরের সাথে মিশে না

সূরা ফুরকান- ২৫ : ৫৩

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا.

And it is He Who has let free the two seas (kinds of water); one palatable and sweet and the other saltish and bitter; and He has set a barrier and a complete partition between them.

আর তিনি সমুদ্রের পানিকে দুইটি ধারায় প্রবাহিত করেছেন; এক ধারার পানি সুস্বাদু এবং মিষ্টি এবং অপর ধারার পানি লবণাক্ত এবং তিক্ত। তিনি উভয় ধারার মধ্যে একটি অন্তরায় এবং একটি সম্পূর্ণ আড়াল স্থাপন করেছেন। (সূরা ফুরকান : ৫৩)

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পানি উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসে। এ পদ্ধতিতে পানির দুইটি পৃথক ধারার সৃষ্টি হয়। একটি ধারা স্থলভূমির উঁচু এলাকায় এবং আর একটি ধারা পৃথিবীর নিম্ন এলাকায় প্রবাহিত হয়। পানি সাধারণত ভূমি থেকে সাগরে বয়ে যায়। জোয়ারের সময় কিংবা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় সাগরের পানি স্থলভাগের দিকে সবেগে ধেয়ে আসে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলে ধেয়ে আসা পানি পুনরায় সাগর বুকে নেমে যায়। পৃথিবীর উপরিভাগ প্রায় ৭০% পানি দ্বারা আবৃত। এ পানি ধারণ করে রেখেছে সমুদ্রগুলো। সাগরের পানি লবণাক্ত এবং অনেক রকম প্রাকৃতিক রাসায়নিক উপাদান সাগরের পানিতে মিশ্রিত থাকে। যথা– কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আয়রণ, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং পটাসিয়াম সমুদ্রের পানিতে বিদ্যমানা। সাগরের পানি বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে গেলে সেখানে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুন লবণাক্ততা কিছুটা হ্রাস পায়। শৈল চূড়ার বরফ টুপিগুলো গলে গিয়ে নিচের দিকে বহমান নদী তৈরি করে। এ নদীগুলো সাগরের বুকে প্রচুর পরিমাণ পানি বয়ে নিয়ে যায় এবং বহু ধরনের লবণ ও খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে মিশে যায়।

সুতরাং বিভিন্ন উৎস থেকে বয়ে আসা পানি সাগরের পানিতে দুইটি ধারা সৃষ্টি

করে। একটি ধারার পানি লবনাক্ত অপরটি লবণমুক্ত পানির প্রবাহ্। লবণমুক্ত পানি অপেক্ষা লবণাক্ত পানি অধিক ঘন। কিন্তু যখন তাদের একই সমতায় রাখা হয় তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। আয়াতে তাদের মধ্যে যে বাধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে বাধার কারণ হলো তাদের উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব। মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানির চৌহদ্দীর মধ্যে ঘনত্বের একটি মধ্যবর্তী স্তরের সৃষ্টি হয়। মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানি পারস্পরিকভাবে মিশ্রিত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা সত্ত্বেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাদের মধ্যবর্তী স্তরে পৃথক করে রাখে।

বিবাহ একটি সুন্দর ব্যবস্থা

সূরা ফুরকান-২৫ : ৫৪

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا.

And He it is Who has created man from water and has appointed for him kindred by blood and kindred by marriage, for your Lord has power (over all things).

আর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে এবং তাকে রক্তের সম্পর্ক এবং বৈবাহিক সম্পর্ক প্রদান করেছেন। কারণ আপনার প্রভু সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (সূরা ফুরকান : ৫৪)

পানি হলো মানব দেহের প্রধান গঠন উপাদান। কারণ মানব দেহে ৮০% পানি আছে। মানুষের জন্ম পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখি যে, পিতার তরল বীর্যস্থ Sperm এবং মায়ের Ovum থেকে যে Zygote গঠিত হয় তা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়ে একটি পূর্ণ শিশুতে রূপ লাভ করে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে পুরুষ এবং নারীর স্খলিত বীর্য স্বাভাবিকভাবে তরল পদার্থ। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, "মানুষ চিন্তা করে দেখুক সে কোন্ বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সে সৃষ্টি হয়েছে সবেগে নির্গত তরল পদার্থ থেকে" (৮৬ : ৬)। অতএব আরবি 'মাআ' শব্দটির অর্থ হলো পানি বা তরল বস্তু বা ভ্রূণ প্রদায়ী তরল বস্তু। সুতরাং বলা হয়েছে মানুষ পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তা প্রকৃতপক্ষে বাস্তব সত্য।

দৈহিক, মিলনের মাধ্যমে নবজাতকের জন্মলাভ রক্তের সম্পর্ক সৃষ্টি করে থাকে। এ রক্ত সম্পর্কের আওতায় পড়ে পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, দাদা-দাদী, নাতি-নাতনি ইত্যাদি। বর্তমানকালে রক্ত গ্রুপের উন্নত জ্ঞান, DNA পরীক্ষা ও বংশগত সম্পর্ক পিতৃত্ব নির্ধারণে সহায়তা দান করে এবং বিপরীতক্রমে রক্ত সম্পর্কও নির্ধারণ করে।

বিবাহ একটি সুন্দর ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা সার্বজনীনভাবে সকল ধর্মে স্থান লাভ

করেছে। বিবাহ একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানুষের জন্মলাভ ঘটে। বর্তমান সময়ে তথাকথিত উন্নত দেশে দীর্ঘদিনের এ বিবাহ ব্যবস্থাকে চরমভাবে অবজ্ঞা করা হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে বিয়ের পূর্বে যৌন মিলনে অংশ নেয়া হচ্ছে। তবে এর শেষ ফলাফল ভালো হচ্ছে না। কারণ তথাকথিত মুক্ত সমাজ (Free society) অবৈধ জন্মের ভারে ভারাক্রান্ত। অনিরাময়যোগ্য নতুন মারাত্মক রোগ এইডস্ (AIDS) অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলশ্রুতি এবং আরো অন্যান্য যৌন ব্যাধি পারিবারিক সুখি জীবন ভেঙ্গে নষ্ট করে দিচ্ছে। পবিত্র কোরআন অনুসারে মানুষের বিবাহ বন্ধনই হলো যৌন সম্পর্কের একমাত্র উপায়।

নীল নদের অলৌকিক ঘটনা

সূরা আশ-শুআরা-২৬ : ৬৩

فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ.

Then We revealed to Musa, 'Strike the sea with your stick.' And it parted, and each separate part became like huge mountain.

এরপর আমরা মূসা (আ) কে আদেশ করলাম, "আপনার হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করুন।" অমনি এটা বিভক্ত হয়ে গেলো এবং প্রত্যেক পৃথক অংশ বিশাল পাহাড়ের মতো হয়ে গেলো। (সূরা আশ-শুআরা : ৬৩)

হযরত মূসা (আ) এবং তাঁর সংগীদের ধরার জন্য ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী তাঁদের পেছনে ধাবিত হলো। মূসা (আ)-এর সঙ্গীরা বললেন, আমাদের পেছনে ফেরাউনের সৈন্যবাহিনী এবং সামনে বাহরে কুলসুম। আমরা বোধ হয় ধরা পড়ে গেছি। হযরত মূসা (আ) বললেন, কখনো নয়, আমাদের সাথে আল্লাহ পাক আছেন। তিনি আমাদের পথ বলে দেবেন। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ পাক মূসা (আ) কে ঐশী আদেশ দিলেন তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা সমুদ্রের পানিতে আঘাত করার জন্য। সাথে সাথে সমুদ্রের পানি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পথ তৈরি হয়ে গেলো এবং হযরত মূসা এবং তাঁর সঙ্গীরা ঐ পথ ধরে নদী পার হয়ে গেলেন।

এটা ছিলো একটি মুজেযা বা অলৌকিক ঘটনা। এ অলৌকিক ঘটনার পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি। যা হোক সম্প্রতি কোরিয়া দেশের একটি ঘটনা থেকে এটা উপলব্ধি করা যায় যে এ ধরনের ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। হযরত মূসা (আ)-এর অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি প্রাকৃতিক বিস্ময়কর ঘটনা সমুদ্র চ্যানেলে বছরে দুইবার ঘটে। এই ঘটনাটি ঘটে চিন্ডে দ্বীপের হয়েডংনি গ্রাম এবং নিকটস্থ দ্বীপ বা দক্ষিণ কোরিয়ার মেডা নামক স্থানের মাঝে যেখানে উন্মুক্ত হয়ে থাকে ২.৮ কি. মি. দীর্ঘ এবং ৪০ মিটার প্রশস্ত পথ। এ জায়গাটি সিউলের ৩৫০ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত। ১৯৭০ সনের মাঝামাঝি সময়ে এ দৃশ্যটি প্রথম বিশ্বের জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কোরিয়ায় ফ্রান্সের

রাষ্ট্রদূত পিয়ারে ল্যানডি ১৯৭৩ সনে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। পরে তিনি ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে খবরের কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এ প্রবন্ধে তিনি হযরত মূসা (আ)-এর অলৌকিক ঘটনার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন।

কোরিয়ার সমুদ্র বিভক্ত হওয়ার ঘটনাটি ঘটে থাকে জোয়ারের সময়। ১৯৭৩ সনে ঘটনাটি ঘটেছিল বেলা ৫ ঘটিকার সময় এবং ২৪শে এপ্রিল তারিখে যখন জোয়ার কমে যেতে আরম্ভ করেছিল। ৫ মিনিট পরে সাগরটি সম্পূর্ণরূপে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল এবং মধ্যবর্তী জায়গাটা একেবারে শুষ্ক হয়ে দেখা দিলো। এ জায়গাটা পূর্বেও পানিতে পূর্ণ ছিলো। সরে যাওয়া পানি ধীরে ধীরে তার পূর্বের স্থান পূর্ণ করতে শুরু করল। ১০টা ৬ মিনিটের সময় সমুদ্রের বুকে জেগে উঠা শুকিয়ে পড়া পথকে ঢাকা দিয়ে দিলো।

এ ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা অত্যন্ত বিরল এবং একে অলৌকিক ঘটনা বলা যেতে পারে।

অতএব, এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল বাহরে কুলসুমে হযরত মূসা (আ)-এর সময়ে। সুদূর অতীতে এ ঘটনা হয়তো কেউ দেখেনি। হযরত মূসা (আ) ঐশী নির্দেশে ঐ স্থানে হাজির হয়েছিলেন এবং এ ঘটনাটি ঠিক ঐ মুহূর্তে ঘটেছিল যখন তিনি তাঁর হাতে লাঠি দ্বারা সমুদ্রের পানিতে আঘাত করেছিলেন।

যদি পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র নিজ অক্ষে আবর্তিত না হতো?

সূরা কাসাস-২৮ : ৭১-৭৩

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ
جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ
اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ. وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ
جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

Say : ‘Tell me! If Allah made the Night continuous for you till the Day of resurrection which Allah besides Allah could bring you light? will you not then hear?’

Say : ‘Tell me! If Allah made the Day continuous for you till the Day of resurrection, which Allah besides Allah could bring you Night wherein you rest? will you not then see?’

It is out of His Mercy that He has made for you the Night and the Day that you may rest therein and that you may seek of His Bounty and in order that you may be grateful.

বলুন, (হে মুহাম্মদ সা.) দেখ! যদি আল্লাহ্ পাক রাত্রিকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত একটানা দীর্ঘায়িত করে দিতেন তাহলে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন প্রভু কি তোমাদের আলো দিতে পারতো? তারপরেও কি তোমরা শুনবে না?

বলুন, (হে মুহাম্মদ সা.) দেখ! যদি আল্লাহ তাআলা দিনকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত একটানা দীর্ঘায়িত করে দিতেন তাহলে আল্লাহ ব্যতিত কোনো প্রভু কী তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত আনতে পারতো? তারপরেও কী তোমরা দেখবে না?

করুণাবশত তিনি তোমাদের জন্য রাত্রি ও দিন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা রাত্রিকালে বিশ্রাম নিতে পারো এবং দিনের বেলা তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, এ কারণে যে তোমরা তাঁর প্রতি সকৃতজ্ঞ থাকবে। (সূরা কাসাস : ৭১-৭৩)

এ তিনটি আয়াতে যে মূল্যবান তথ্য নিহিত আছে তার মূল্যায়ন একসঙ্গে করা প্রয়োজন। পরম হিতৈষী করুণাময় আল্লাহ্ পাক পৃথিবীকে নিজ অক্ষে আবর্তন করার গতিদান করেছেন। এ আবর্তনের ফলে দিন-রাত্রি সংঘটিত হয়ে থাকে।

পৃথিবী নিজ অক্ষে আবর্তনের সময় এবং সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর পরিভ্রমণের সময় যদি সমান হতো তাহলে এক গোলার্ধে স্থায়ীভাবে রাত্রি থাকতো আর অন্য গোলার্ধে চিরস্থায়ী দিন থাকতো। পৃথিবীর যে অংশ স্থায়ীভাবে সূর্যের দিকে থাকতো সে অংশের তাপমাত্রা হতো অত্যধিক বেশি। ফলে সে অংশে জীবন ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়তো। কারণ সেদিকে বিরাজ করতো পানির অভাব এবং সবুজ গাছপালার অভাব। অনুরূপভাবে যে অংশে সূর্যের আলো পড়তো না সে অংশ গভীর অন্ধকারে ঢাকা থাকতো। আর সেদিকে বিরাজ করতো কনকনে শীত। হিমেল আবহাওয়া। এরূপ অবস্থায়ও জীবন ধারণ করা সম্ভব হতো না।

মহান আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তিনি প্রথম থেকেই পৃথিবীকে তার অক্ষে আবর্তনের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ঘূর্ণন গতি দিতে পারতেন। আমাদের সৌরজগতে অক্ষীয় আবর্তন সম্পর্কিত কিছু উদাহরণ আছে যা পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রকৃতির সাথে বিরূপ। চন্দ্র তার নিজ অক্ষে যে সময়ে একবার আবর্তন পূর্ণ করে ঠিক সেই সময়ের মধ্যে সে আর একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এর ফলে চন্দ্রের উপরের যে কোনো জায়গায় একদিন ও এক রাত্রির দৈর্ঘ্য হয় যথাক্রমে পৃথিবীর ১৫ দিন ১৫ রাত্রির সমান এবং চন্দ্রের একদিকের মুখটা স্থায়ীভাবে পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে। ইউরেনাস গ্রহের অক্ষীয় আবর্তন আরো বিস্ময়কর। এর আবর্তনের অক্ষ প্রায় এর পরিভ্রমণ ক্ষেত্রে শায়িত। এর ফলে এ গ্রহ যে সময়ে সূর্যের অর্ধেক অংশ পরিভ্রমণ করে সেই সময়ে তার এক মেরু সূর্যের দিকে উন্মুক্ত থাকে। আর অপর মেরু সূর্য থেকে দূরে থাকে।

অন্যান্য গ্রহের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, শুক্র গ্রহ আবর্তন করে উল্টোদিকে এবং এর অক্ষীয় আবর্তনের সময়কাল এর পরিভ্রমণ সময়কাল অপেক্ষা দীর্ঘতর। এর অক্ষীয় আবর্তনের সময় পৃথিবীর ২৪৩ দিনের সমান এবং সূর্যের চারিদিকে এর প্রদক্ষিণকালের সময় পৃথিবীর ২২৫ দিনের সমান।

সুতরাং দিন ও রাত্রি যে কোনো একটি চিরস্থায়ী হলে জীবন ধারণ করা একেবারে অসম্ভব হতো। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ পাক তাঁর করুণার কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করার উপদেশ দিয়েছেন। এ কারণেই তিনি পৃথিবীতে পরিমিতভাবে দিন ও রাত্রির আসা-যাওয়া সুনিশ্চিত করেছেন। আল্লাহ পাকের এ করুণার কথা স্মরণ করে আমরা কি তাঁর প্রতি সকৃতজ্ঞ থাকতে পারি না?

ভূমিকম্প বসতবাড়িসহ গিলে ফেলে

সূরা কাসাস-২৮ : ৮১

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ.

So We caused the earth to swallow him and his dwelling place. Then he had no group or party to help him against Allah, nor was he one of those who could save themselves.

অতঃপর আমরা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করলাম তাকে এবং তার বসতবাড়িকে গিলে ফেলতে। তখন আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে তার কোনো দল ছিলো না। এগুলোর মধ্যে সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারলো না। (সূরা কাসাস : ৮১)

এ আয়াতে কারুনের উপর প্রদত্ত শাস্তির কথা তুলে ধরা হয়েছে। কারুন ছিলো হযরত মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই। সে (কারুন) বিশাল ধন সম্পদের মালিক ছিলো। প্রাচুর্যের অহঙ্কারে কারুন হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি প্রতিহিংসা প্রদর্শন করেছিল এবং আল্লাহর নবী মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছিল। এ কারণে কারুনকে আল্লাহ পাক ভয়ানক শাস্তি প্রদান করেছিলেন। তার পায়ের তলার মাটি ফেটে গর্ত তৈরি হয়েছিল। আর সে গর্ত তার সমস্ত সম্পদসহ তাকে গিলে ফেলেছিল।

মাটি গিলে খাওয়ার সহজ উদাহরণ হলো চোরাবালি (quicksand)। চোরাবালির চারপাশে যে বালি বা স্তর থাকে তা থেকে বিশেষ পার্থক্য বুঝা যায় না। এ কারণে চোরাবালি ভ্রমণকারীদের নিকট বিপদজনক। চোরাবালির উপরের স্তর ঠিক থাকে। নিচে সুরঙ্গ সৃষ্টি হয়। তাই এখানে কোনো মানুষ বা প্রাণী পা দিলে উপরের স্তর ভেঙ্গে নিচে তলিয়ে যায়। অর্থাৎ যখন কেউ চোরাবালিতে পা দেয় তখন পায়ের নিচের ভূমি দেহের ভার তুলে ধরতে পারে না। তাই মাটি দেহটাকে গিলে ফেলে।

ভয়াবহ ভূমিকম্পও গিলে ফেলার ঘটনা সংঘটিত করে। ভূমিকম্প হলেই তার শিকার হয়ে বহু মানুষ মাটির তলায় চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করে। খুব বড় আকারের

ভূমিকম্পের সময় বড় বড় পাকাবাড়িতে ফাটল ধরে ও জমিনে ফাটল সৃষ্টি হয়। এমনকি বসতবাড়িসহ বিশাল অট্টালিকা মাটির গভীরে তলিয়ে যায়।

১৭৫৫ সনে লিসবনে ভূমিকম্পে ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার লোক ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল এবং লিসবন শহরের বিরাট অংশের ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। ১৭৮৩ সালে ইটালির ক্যালাব্রিয়া শহরে ভূমিকম্পের ফলে ৬০ হাজার লোক জীবন হারিয়েছিল। ১৯২৩ সনের ১লা সেপ্টেম্বর জাপানে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল। এর ফলে জাপানের রাজধানী শহর এবং প্রধান বন্দর ইয়োকোহামার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল, ফলে ২,৪৬,৫৪০ জন লোক মারা গিয়েছিল।

১৯৩৫ সনের ভূমিকম্পে বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা শহর ধ্বংস হয়েছিল। ১৯৩৪ সনের ভূমিকম্প বিহারের বহু লোককে গিলে ফেলেছিল।

সুতরাং ভূমিকম্পের দরুন মাটি ফেটে যায়। কারুন হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি দৃষ্টতা দেখিয়েছিল বলে আল্লাহ পাক মাটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কারুনকে তার সম্পদসহ গিলে ফেলতে।

মানুষের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য

সূরা রূম-৩০ : ২২

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ.

And among His signs in the creation of the Heavens and the earth and the difference of your languages and colours. Verily in that are indeed signs for men of sound knowledge.

তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনের মধ্যে একটি হলো নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি এবং ভাষা ও দৈহিক রঙের পার্থক্য। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে সুশিক্ষিত লোকদের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন। (সূরা রূম : ২২)

এ আয়াতে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং মানুষের ভাষা ও শরীরের রঙের মধ্যে পার্থক্য তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির ব্যাপারটি সূরা বাকারার ১১৭ নং আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে ভাষা ও দেহের রঙের বিষয়টি আলোচনা করা হবে।

ভাষা : আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে একটি হলো মানুষের ভাষা। এ ভাষা পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত। মানুষ তার মনের ভাব আদান প্রদান করার জন্য ভাষা বিনিময় করে থাকে। মানব শিশু পিতা-মাতা এবং তার সংস্পর্শে যারা থাকে তাদের সাথেই প্রথম কথা বলার অভ্যাস গড়ে তোলে। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, শিশুকাল থেকে মানুষ ব্যাকরণ মেনে মাতৃভাষায় কথা বলতে পারে। এটা সম্ভব হয় জন্মগত বিশ্লেষণ শক্তির জন্য যা আল্লাহ পাক দান করেছেন। ভাষা আয়ত্ত করার পেছনে দৈনন্দিন অভ্যাসের একটি ভূমিকা থাকে যাকে বলা হয় Operant conditioning.

কথা বলার পেছনে মস্তিষ্কের ভূমিকা সবচেয়ে বড়। কিন্তু শরীরের আরও কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন, কণ্ঠনালী, স্বরপর্দা, বুকের মাংসপেশী, মুখগহ্বর, জিহ্বা, ঠোঁট এসবের ভূমিকাও কম নয়। জিহ্বার নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের যে বিশেষ অংশটি তার নাম ব্রোকার জোন। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর মস্তিষ্কে এ ব্রোকার জোনের সন্ধান মেলেনি। তাই অন্যান্য প্রাণীরা কথা বলতে পারে না।

মানব সমাজে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে এবং ভাষাগুলোর মধ্যে পার্থক্যগত

ভিন্নতা আছে। যে ভৌগলিক অংশে সে জন্মগ্রহণ করে এবং তার পিতা-মাতা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষাই সর্বপ্রথম সে আয়ত্ত করে। মানুষ অন্যান্য ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু মাতৃভাষায় কথা বলতে সে বেশ স্বাচ্ছন্দবোধ করে। ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে স্মৃতি শক্তি অর্থাৎ মনে রাখার ক্ষমতা একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। কাকাতুয়া বা ময়না পাখির জিহ্বা এবং কণ্ঠনালীর গঠন এরূপ যে, তারা সময়ে সময়ে মানুষের কথাকে হুবহু নকল করতে পারে। কিন্তু তাদের স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত দুর্বল বলে ভাষা আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভাষা আয়ত্ত করার পেছনে স্মৃতি শক্তি ছাড়াও যুক্তি-বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তির একটা সম্পর্ক আছে। উপরন্তু মানুষের মস্তিষ্কের সামনের অংশ সবচেয়ে বেশি উন্নত বলে ভাষা আয়ত্ত করার পক্ষে তা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। কোন্ ভাষা সে কতটা আয়ত্ত করবে সেটা পরিবেশের উপরেই অনেকটা নির্ভর করে। এটা লক্ষ্য করার ব্যাপার যে, একটি শিশু যত তাড়াতাড়ি একটি ভাষা আয়ত্ত করতে পারে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ তা পারে না।

দৈহিক রঙের পার্থক্য : যদিও মানব জাতির উৎস এক বলে বিশ্বাস করা হয় তবুও বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন গায়ের রঙ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। রঙ কেবলমাত্র চামড়ার উপরেই সীমিত। কারো চামড়া ফর্সা, কারো বাদামী, কারো কালো। আবার ইউরোপীয়দের গায়ের ত্বক খুব বেশি সাদা, গায়ের রঙের এ রকম পার্থক্য হয় কেন?

আমাদের ত্বকে দুইটি স্তর আছে। একটির নাম এপিডারমিস (Epidermis)। এটি বহিঃত্বক নামে পরিচিত। অপর স্তরের নাম ডারামিস বা অন্তঃত্বক। বহিঃত্বককে আবার কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে আভ্যন্তরীণ স্তরটির নাম স্ট্র্যাটাম বেসাল (Stratum basale)। এই স্তরে মেলানোসাইট (Melanocyte) নামে বিশেষ ধরনের কতগুলো কোষ আছে। মেলানোসাইট কোষগুলোর মধ্যে থাকে গাঢ় রঙের মোলানিন কণা। এসব কণা চামড়ার কালো রঙের জন্য দায়ী। যাদের চামড়ায় মেলানিনের পরিমাণ খুব বেশি তাদের গায়ের রঙ কালো হয়। ত্বকে মেলানিন কম থাকলে গায়ের রঙ ফর্সা হয়। মস্তিষ্কের পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (Melanocyte stimulating hormone) মেলানিন কণা তৈরিতে সাহায্য করে। ত্বকে মেলানিন কম থাকবে না বেশি থাকবে তা যেমন নির্ভর করে বংশগত বৈশিষ্ট্যের উপরে তেমনি কোনো বিশেষ দেশের মানুষের গায়ের রঙের সঙ্গে সেই জায়গার ভৌগলিক অবস্থান এবং সূর্যের আলো সেখানে কতটা চড়া এসব কিছুরও একটা সম্পর্ক আছে।

সুতরাং আল্লাহ পাক পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানব জাতিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের ভাষা ও গায়ের রঙে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

ঘুমের সময় হৃৎপিণ্ড বিশ্রাম গ্রহণ করে না

সূরা রূম-৩০ : ২৩

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ.

And among His signs is your sleep by night and by day and your seeking of His Bounty. Verily in that are indeed signs for a people who listen.

আর তাঁর নিদর্শনের মধ্যে রাত্রে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ। নিশ্চয়ই এতে শ্রবণকারীদের জন্য রয়েছে প্রকৃত নিদর্শন। (সূরা রূম : ২৩)

ঘুম হলো মানুষের স্বল্পকালীন বিশ্রাম। বিশেষভাবে এ সময় গোটা স্নায়ুতন্ত্র কর্ম থেকে বিরত থাকে। মানুষ দিনের কঠিন কর্ম তৎপরতা দ্বারা যখন ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন নিদ্রা যাপনের পর শরীরে শক্তি সঞ্চারিত হয়। বিশ্রাম অপেক্ষা নিদ্রার গুরুত্ব অনেকটা বেশি। নিদ্রা জীবদেহে কর্মবিরতি টেনে আনে বলেই স্বাস্থ্য সবলতা ও সুস্থতা লাভ করে। দৈহিক শক্তির পুনরুদ্ধার বলতে এটা বুঝায় যে নিদ্রার মাধ্যমে যে বিশ্রাম নেয়া হয় তার দ্বারা কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্ক নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর নিদ্রার উপকারিতা মস্তিষ্ক ভোগ করে। সচেতনতা বিভিন্ন মাত্রায় হ্রাস পেলে আমরা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি। সাধারণত আমরা রাত্রে ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমে আচ্ছন্ন থাকি। এ ঘুম দিনেও হতে পারে।

নিদ্রা সম্পর্কে বেশ কিছু তত্ত্ব রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি তত্ত্ব উপস্থাপন করা হলো।

১। সেরিব্রাল এ্যানোক্সেমিয়া (Cerebral anoxaemia) কারণে নিদ্রাকালে মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ রক্ত প্রবাহ পরিবর্তিত হয় না। মস্তিষ্কের কোনো বিশেষ অংশে যথেষ্ট রক্ত প্রবাহের কমতি থাকে যা নিদ্রার সঙ্গে সম্পর্কিত।

২। নার্ভ কেন্দ্রে অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে কর্ম দিবসে এবং রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হলো :

	Intake of O_2	Exhalation of CO_2
Day (working)	67.0%	58%
Night (Sleeping)	33.0%	42%

সুতরাং নিদ্রাকালীন সময়ে অক্সিজেন গ্রহণ কম হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনও কম হয়। এর ফলে নিদ্রা নিশ্চিত হয়ে পড়ে। এটা সকলের জানা আছে যে, কার্বন ডাই অক্সাইডের আধিক্য আরামহীনতা ও অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা সরলভাবে বলা হয় যে অক্সিজেনের অভাব এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতি এবং টিস্যুর মধ্যে অন্যান্য ক্রিয়ার উদ্ভব সাধারণভাবে নিদ্রা ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু এসব ঘটনা ব্যাখ্যা দিতে পারে না কেন নিদ্রা নিয়মিতভাবে ঐ সমস্ত লোকজনকে আচ্ছন্ন করে যারা দৈনন্দিন কর্মতৎপরতার দরুন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৩। যখন কোনো ব্যক্তি চোখ বন্ধ করে বাইরের প্রতিচ্ছবি দেখা বন্ধ করে দেয় তখন সে নিজেকে বাহ্য প্রভাব থেকে গুটিয়ে নিয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। এ অবস্থায় মন উদ্দীপ্ত হতে পারে না। এটা মনে করা হয় যে, মানুষ যখন জাগ্রত অবস্থায় থাকে তখন তার মস্তিষ্কের মধ্যে নিদ্রা সৃষ্টিকারী বস্তু সমন্বিত হয়ে উঠে এবং কিছুক্ষণ পরে সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

নিদ্রার রহস্য উদঘাটনের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে আরো গবেষণা কর্ম চালানো হচ্ছে। ঘুমকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। একটা হলো Rapid Eye Movement বা REM পর্যায়। অপরটা Non Rapid Eye Movement বা NREM পর্যায়। ঘুমে আক্রান্ত হয়ে মানষ সরাসরি NREM পর্যায়ে গিয়ে হাজির হয়। এ NREM পর্যায়ের স্থায়িত্ব এক ঘণ্টা কিংবা তারও বেশি। NREM কে অনুসরণ করে চলে REM যার স্থায়িত্ব ২ মিনিট থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত।

যখন চোখে ঘুম নেমে আসে তখন স্বভাবত চোখ দুটি বুজে আসে। বাইরের দৃশ্যানুভূতি অতিসত্বর বিলুপ্ত হয়ে যায় যদিও চোখ দুটি কোনো কোনো সময় খোলা থাকে। এ সময় চোখের মণিগুলো সংকুচিত হয়ে যায়। স্পর্শ দ্বারা দেহের অঙ্গগুলোকে নড়াচড়া করলেও ঘুম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে। তবে দেখা যায় কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে মৃদু স্পর্শেই তাদের গভীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ইচ্ছা শক্তির নিরিখে মানুষ ঘুমিয়ে পড়তে পারে। অবশেষে ঘুম থেকে জেগে উঠে।

মস্তিষ্কও দেহের অন্যান্য বহু অংশ ঘুমের মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ করে। আবার দেহের কোনো কোনো অঙ্গ যেগুলো নিদ্রাকালীন সময়েও বিশ্রাম গ্রহণ করে না।

এগুলো হলো হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহ। এটা খুবই রহস্যজনক। অধিকাংশ মানুষ নিদ্রাবস্থায় অবস্থান পরিবর্তন করে থাকে। ফটোগ্রাফিক রেকর্ড থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বেশির ভাগ লোক ঘুমন্ত অবস্থায় ২০ থেকে ৩০টি অবস্থান পরিবর্তন করে এবং এ অবস্থান পরিবর্তন হয় ৭ মিনিট পরপর। তাই ঘুমন্ত অবস্থায় নড়াচড়ার সুবিধার্থে বিছানা বড় আকারের হওয়া সমীচীন।

সুতরাং পরম করুণাময় আল্লাহ পাক আমাদের জন্য নিদ্রা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ নিদ্রার প্রকৃত রহস্য এখনো অজানা। মস্তিষ্ক আল্লাহ পাকের এমন বিস্ময়কর সৃষ্টি যার বহুবিধ কর্মকাণ্ড সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে।

মেলানিন অণুর অভাব ঘটলে মাথার চুল সাদা হয়ে যায়

সূরা রূম-৩০ : ৫৪

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ.

Allah is He Who created you is a state of weakness, then gave you strength after weakness, then after strength gave (you) weakness and grey hair. He creates what He wills. And it is He Who is the All-knowing, the All-Powerfull.

আল্লাহ্ পাক তোমাদের দুর্বল অবস্থার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারপর দুর্বল অবস্থা থেকে শক্তিশালী অবস্থা দান করেছেন। এরপর শক্তিশালী অবস্থা থেকে পুনরায় দুর্বল অবস্থায় পর্যবসিত করেছেন। এ সময় চুল হয় ধূসর বর্ণের। তিনি যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আর তিনি সর্বজ্ঞানী-সর্বশক্তিমান। (সূরা রূম : ৫৪)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের শৈশবের অবস্থা, যৌবন এবং বার্ধক্যের পরিণতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন।

জন্মের পর মানব শিশু অত্যন্ত দুর্বল অসহায় অবস্থার মধ্যে থাকে। এ অবস্থায় পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচর্যাকারীদের সেবাযত্নের উপর তাকে নির্ভর করতে হয়। নিজের কাজ সে কিছুই করতে পারে না। শিশুকালের অসহায় অবস্থা থেকে শিশু ক্রমে ক্রমে হামাগুড়ি দিতে শিখে কথা বলতে শিখে এবং হাঁটতে শিখে। অবশেষে শিশুকাল অতিক্রম করে নিজের পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তখন সে নিজের দেখাশোনা নিজেই করতে পারে। এ সময়ে সে পৃথিবী সম্পর্কে, নিজের জীবন রক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান লাভ করে। আর তার সামনে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তা হলো লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করা।

এরপর বলা হয়েছে আল্লাহ পাক তাকে শক্তি দান করেন। অর্থাৎ সে যৌবনশক্তি লাভ করে। সাধারণত ১৫-১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে যৌবনশক্তির সূচনা হয়। রোগ ব্যাধিতে যদি সে আক্রান্ত না হয় তাহলে যৌবনের শক্তি অন্তত ৫০-৬০ বছর পর্যন্ত

অটুট থাকে। এ পর্যায়ে তাকে বাকি জীবনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে যদি এতটুকু ভুল হয় তাহলে জীবনব্যাপি তাকে অনেক অনুসূচনা করতে হয়। কর্মক্ষমতা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জীবনে উত্থান-পতনের মধ্যদিয়ে যৌবনকাল ক্রমান্বয়ে অতিবাহিত হয়।

এরপর আল্লাহ্ পাক তাকে বার্ধক্যের জড়াজীর্ণ অবস্থায় নিয়ে যান। পরিণত বৃদ্ধ বয়সে শিশুদের মত দুর্বল শক্তিহীন অসহায় হয়ে পড়ে। সাধারণত বৃদ্ধকাল গণনা করা হয় ৭০ বছর বয়স থেকে। এ সময়ে শিশুদের মতো তারও একজন পরিচর্যাকারী প্রয়োজন হয়। বৃদ্ধকালের অসহায় অবস্থায় ফেলে আসা দিনগুলোর কথা বারবার মনে পড়ে। বিশেষকরে মেহেরবান পিতামাতার কথা। শিশুকালে কতো আদর ভালোবাসা স্নেহ মমতা দিয়ে পিতামাতা তাকে লালন পালন করেছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম কেটে ভালো মিষ্টি অংশটা মা তাকে খেতে দিতেন। ভাত খাওয়ার সময় মাছের কাঁটা বেছে-বেছে দিতেন। গোশতের হাড্ডিটা ছাড়িয়ে গোশতের সার অংশটা তাকে খাওয়াতেন। আর পিতামাতা হাড্ডিটা খেতেন। বৃদ্ধ বয়সে এসব স্মৃতি যখন মনে পড়ে তখন সে ডুকরে কেঁদে ওঠেন। আয়াতে আরো বলা হয়েছে এ সময় মাথার চুল ধূসর বর্ণের শুভ্রতা লাভ করে। সাধারণত মানুষের মাথার চুল কালো দেখায় শরীরে মেলানিন নামক এক ধরনের অণু থাকার কারণে। মেলানিন তৈরি কতটা হবে তা নির্ভর করে মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোনের উপরে। এ হরমোন তৈরি করে পিটুইটারী গ্রন্থি। বৃদ্ধ বয়সে যখন মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন কম নির্গত হয় তখন মেলানিন তৈরির পরিমাণও কমে যায়। এর ফলে মেলানোসাইট কোষগুলো থেকে মেলানিন শূন্য হয়ে যায়। তার জায়গা দখল করে নেয় সূক্ষ্ম বাতাসের কণা। যার কারণে চুল সাদা হতে থাকে। আবার কম বয়সেও মাথার চুল সাদা হতে পারে। এর কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন শারীরিক প্রতিকূলতার কারণে মেলানিন ঠিকমত তৈরি না হওয়া। কারো দেহে মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন কম বের হওয়া। আবার বংশগত কারণে শরীরে মেলানিন কম তৈরি হওয়া। এসব কারণে চুল সাদা হতে পারে অল্প বয়সেও। আর এগুলো ব্যতিক্রমধর্মী কারণ। তবে স্বাভাবিক নিয়ম হলো বৃদ্ধ বয়সে চুল-দাড়ি শুভ্রতা লাভ করে।

আলট্রাসনোগ্রাফী দ্বারা মাতৃগর্ভে শিশুর লিঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়

সূরা লুকমান-৩১ : ৩৪

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

Verily Allah, with Him is the knowledge of the Hour, He sends down the rain and knows that which is in the wombs. No person knows what he will earn tomorrow and no person knows in what land he will die. Verily Allah is All-knower All-Aware.

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের কাছে রয়েছে কেয়ামত দিবসের জ্ঞান। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জানেন গর্ভে কি আছে। আগামীকাল কি লাভ করবে কেউ জানে না। কোনো ব্যক্তি জানে না সে কোনো জায়গায় মৃত্যুবরণ করবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকই সর্বজ্ঞানী, সম্যক অবগত। (সূরা লুকমান : ৩৪)

এ আয়াতে আল্লাহ পাক বেশ কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এবং ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কোনো ব্যক্তি যদি দাবি করে যে, আগামীকাল কি ঘটবে অথবা কার মৃত্যু কোথায় হবে সে সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে। তাহলে তাকে মিথ্যাবাদী প্রতারক ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। এ আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই রয়েছে। তিনিই সর্বজ্ঞানী সর্বময় স্রষ্টা। মানুষ যে মানুষের ভাগ্য গণনা করে, গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান রাখার দাবি করে এবং অহমিকা প্রকাশ করে তা সুস্পষ্ট ভণ্ডামী বলে প্রতীয়মান হয়।

মাতৃগর্ভে কি আছে : গর্ভের মধ্যে কিভাবে জাইগোট গঠিত হয় এবং তা কিভাবে স্থায়িত্ব লাভ করে সে সম্পর্কে মানুষ কোনো কিছু জানে না। তবে এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় তখনই যখন গর্ভধারণের এক সপ্তাহ পরে ভ্রূণ দেহধারণ করে অবস্থান গ্রহণ করে এবং যখন পরবর্তী মাসিক-স্রাব বন্ধ হয়ে যায়। মাসিক বন্ধ

হওয়ার পর গর্ভের পরীক্ষা করা হয় স্বাভাবিকভাবে গর্ভধারণের দুই সপ্তাহ পরে।

গর্ভধারণের পর ভ্রূণের লিঙ্গ কি হবে ছেলে না মেয়ে তা অনেকদিন ধরে অজানা থেকে যায়। যখন গর্ভাবস্থা বেশ কিছুদিন অতিক্রম করে তখন বায়োলজিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু লিঙ্গের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় যদি আলট্রাসনোগ্রাফী পরীক্ষায় ভ্রূণ তার সুবিধাজনক অবস্থানে আছে বলে ধরা পড়ে।

যা হোক এ আয়াতে এটা বলা হয়নি যে গর্ভের মধ্যে কোন্ লিঙ্গের ভ্রূণ আছে তা পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা যাবে না। তবে এ আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকেরই আছে। অধিকন্তু গর্ভে অনেক সময় কিছু জটিলতা দেখা দেয়। তখন গর্ভ পরীক্ষা জরুরি হয়ে থাকে। তবে এ পরীক্ষার নির্ভুল অবস্থা সম্পর্কে রোগীকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলতে পারে।

সময় স্থানীয় মাত্রায় বিরাজমান

সূরা সাজদা-৩২ : ৫

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ.

He manages and regulates affair from the Heavens to the earth; then it will go up to Him, in one Day; the space whereof in thousand years of your reckoning.

তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন। তারপর একদিন সবকিছু তাঁর কাছে ফিরে যাবে। মহাশূন্যের একদিনের পরিমাপ তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান। (সূরা সাজদা : ৫)

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে সবকিছু আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট আইনের আওতায় পরিচালিত হয়। গ্রহ নক্ষত্র তথা গ্যালাক্সিসমূহ মহাকর্ষ শক্তি (Gravitational force) দ্বারা বাধা। এ নিয়ম তারা কখনো অতিক্রম করতে পারে না। আবার গ্রহ নক্ষত্রসমূহের রয়েছে নিজস্ব অভিকর্ষ বল (Gravity) যা তাদের আভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহকে সংকুচিত করে। এভাবে গ্রহ নক্ষত্রসমূহের নিজস্ব কক্ষপথ রয়েছে যে কক্ষপথগুলোতে তারা আবর্তিত হয় এবং আল্লাহ পাকের নিয়মের বাইরে তারা ঐ কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে সূর্য। তার চারপাশে গ্রহসমূহ আবর্তিত হচ্ছে কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়মে বিজ্ঞানী কেপলার প্রথম এ নিয়মগুলো আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এভাবে আমরা যদি দেখি পৃথিবীতে যা কিছু আছে বৃক্ষরাজি, নদী-সমুদ্র, পশু-পাখি, বস্তুজগৎ, অণু-পরমাণু ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে।

একদিনের হিসাব : এ আয়াতে আল্লাহ পাক আরো বলেছেন মহাশূন্যের একদিনের পরিমাপ আমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান। প্রকৃতপক্ষে আমাদের হিসাবে একদিন অর্থাৎ এক জাগতিক দিন পৃথিবী যে সময়ে তার অক্ষে একবার আবর্তন করে তার সমান। যদি এ সূত্র অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের দিনের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে এমন কিছু গ্রহ নক্ষত্র আছে যাদের দিন পৃথিবীর একদিনের চেয়ে বড় এবং

এমন কিছু জ্যোতিষ্ক আছে যাদের দিন পৃথিবীর একদিনের চেয়ে ছোট। যেমন, বৃহস্পতি গ্রহের একদিন অর্থাৎ যে সময়ে সে একবার তার অক্ষে আবর্তন করে তা আমাদের হিসাবে হয় ৯.৯৬ ঘণ্টা। অর্থাৎ পৃথিবীর একদিনের অর্ধেক। ঠিক একই নিয়মে চন্দ্রে একদিনের সমান পৃথিবীর ২৭ দিন। ক্রান্তীয় অঞ্চলে সূর্যের একদিন সমান পৃথিবীর ৩১ দিন। বুধ গ্রহের ১ দিনের সমান পৃথিবীর ৫৮ দিন। শুক্র গ্রহের ১ দিনের সমান পৃথিবীর ২৪৩ দিন। আমাদের গ্যালাক্সি মিলকি-ওয়ে একবার আবর্তনের সময়কাল পৃথিবীর ২৫০ মিলিয়ন বছরের সমান। সুতরাং এটা খুবই সম্ভব যে, মহাশূন্যে এমন কোনো জগৎ থাকতে পারে যার একদিনের দৈর্ঘ্য আমাদের হিসাবে ১০০০ বছরের সমান। শাব্দিক অর্থে এটা অনুধাবন করা মোটেও কষ্টসাধ্য নয় যে, একদিন সমান হাজার বছর যা এ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবী ঘিরে অতীতে কি ঘটেছিল ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে!!

সূরা সাবা-৩৪ : ৯

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاۤءِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ.

See they not what is before them and what is behind them of the Heaven and the earth? It We wished We could cause the earth to swallow them up, or cause a piece of the sky to fall upon them. Verily in this is a sign for every devotee who Turns to Allah.

তাদের সামনে এবং পিছনে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কি তারা দেখে না? আমরা যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদের গিলে ফেলতে পৃথিবীকে আদেশ দিতাম। অথবা আকাশের একটি অংশ তাদের উপর ফেলে দিতে পারতাম। নিশ্চয়ই প্রত্যেক আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য এখানে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা সাবা : ৯)

এখানে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন অতীতে পৃথিবী ও আকাশের বুকে কি ঘটেছিল এবং ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে মানুষ চিন্তা করবে না। আর আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান যিনি সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের উপর অভূতপূর্ব শাস্তি আরোপ করতে পারেন।

আকাশ ও পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বহু ঘটনাবলী আমাদের উপলব্ধিকে নাড়া দিয়ে থাকে। আদি অগ্নিবলের বিস্ফোরণ (Big Bang) থেকে আমাদের উপলব্ধি শুরু। গ্যালাক্সি এবং প্রাচীনতম তারকাগুলোর গঠন গড়ে উঠেছিল ১০ থেকে ১৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে। গ্যালাক্সিগুলো যখন সমতল আকার ধারণ করে চাকতিতে পরিণত হয় তখন সূর্য গ্যাস-মেঘ ও ধূলিকণা ঘনীভূত হয়ে দেহ ধারণ করে। প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীসহ সৌরজগতের সকল গ্রহ আত্মপ্রকাশ করে। ৪.৫ বিলিয়ন বছর থেকে ৬০০ বিলিয়ন বছর পূর্বে প্রি-ক্যামব্রিয়ান যুগের সৃষ্টি হয়। এ যুগে পৃথিবীর বুকে জীবনের উদ্ভব ঘটেছিল। প্রথমে এককোষী জীব দেখা দিয়েছিল।

এরপর দেখা দিয়েছিল মেরুদণ্ডহীন প্রাণী এবং আদিম সামুদ্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছপালা। ৬০০ মিলিয়ন থেকে ২০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে গঠিত হয়েছিল প্যালাজয়িক (Paleozoic) যুগ। এ যুগে মেরুদণ্ডী মাছের আগমন ঘটেছিল। এরপর দেখা দিয়েছিল উভয়চর প্রাণী এবং সরীসৃপ। এরপরের যুগকে বলা হয় মেসোজয়িক যুগ। এ যুগ শুরু হয়েছিল ২০০ মিলিয়ন বছর থেকে ৬৫ মিলিয়ন বছরের মধ্যে। এ যুগে পৃথিবীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল ডাইনোসর নামক বিশাল আকারের সরীসৃপ প্রাণী। এ যুগের শেষ অংশে দেখা দিয়েছিল ঘোড়ার মতো স্তন্যপায়ী প্রাণী। এ সময় ডাইনোসর তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ছিলো। এরপরের যুগই হলো বর্তমানের সেনোজয়িক যুগ। এ যুগ শুরু হয়েছিল ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে। বর্তমান যুগের প্রায় ১ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল।

পৃথিবীর ভৌগলিক অবস্থান কোনো সময়ই একরকম ছিল না। কমপক্ষে ৫০০ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর অন্তর্গত প্লেটগুলো একসঙ্গে সন্নিবেসিত ছিলো। তখন একটি মাত্র মহাদেশ ছিলো যার নাম প্যানজিয়া (Pangaea)। প্লেট টেকটনিকের কারণে পৃথিবীর ভৌগলিক অবস্থান বিরামহীনভাবে পরিবর্তন হয়ে চলেছে এবং অবশেষে বর্তমান আকার লাভ করেছে। প্লেট টেকটনিকস এখনো চলছে এবং ৫০ মিলিয়ন বছরের মধ্যে বর্তমানের চেহারা পাল্টে ভিন্ন আকার ধারণ করবে। দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর আমেরিকা থেকে পৃথক হয়ে পড়বে। আটলান্টিক মহাসাগর আরো বিস্তৃত হবে। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ এগিয়ে এসে এশিয়া মহাদেশের স্থলভাগকে স্পর্শ করবে এবং বহু অন্যান্য ধরনের পরিবর্তন সাধিত হবে।

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সূর্যের ভবিষ্যতের সঙ্গে একীভূত। সকল ঘটনার মূল কেন্দ্র বিন্দুতে সূর্য ছয় বিলিয়ন বছর ধরে অবস্থান করছে এবং ছয় বিলিয়ন বছর ধরে একই অবস্থায় অবস্থান করবে।

এরপরে সূর্য লাল-দৈত্যে (Red giant) পরিণত হবে। এর উপরিভাগ বুধ ও শুক্র গ্রহকে গিলে ফেলবে এবং পরিশেষে পৃথিবীর কক্ষপথে এসে হাজির হবে। মহাসাগরগুলো ফুটন্ত অবস্থায় পর্যবসিত হবে এবং পৃথিবীর উপরিভাগে সবকিছু জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

পৃথিবীর গিলে খাওয়া : আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমরা যদি ইচ্ছে করতাম তাহলে পৃথিবীকে আদেশ দিতাম তাদের গিলে ফেলতে।' পৃথিবীর গিলে খাওয়ার প্রেক্ষিত সৃষ্টি হয় তখন, যখন পৃথিবী পৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পের ফলে এ ফাটল সৃষ্টি হয় এবং ভূমিকম্পের শিকার হয়ে বহু মানুষ জীবন্ত অবস্থায় মাটির তলায়

চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করে। অতীতের বহু ভূমিকম্প অল্প সংখ্যক মানুষকে মাটির তলায় চাপা দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও মানুষ ভূমিকম্পের শিকার হবে।

আকাশের অংশবিশেষ ফেলে দেয়া : আকাশের একটি অংশ তাদের উপর পতিত হবে বলার মধ্যদিয়ে একথা বুঝানো হয়েছে যে, আকাশে অবস্থিত একটি বস্তু পৃথিবীর উপরিভাগে পতিত হবে। আকাশ হলো পৃথিবীর বহির্ভূত স্থান। পৃথিবীর উপরিভাগের স্তর হলো বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল আবার কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। এ স্তরগুলোর পর পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে ৩০০ মাইল উর্ধ্বে আকাশ সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই ৩০০ মাইলের অধিক উর্ধ্বে যদি কোন বস্তুর অবস্থান লক্ষ্য করা যায় তাহলে ঐ বস্তুকে আকাশে খণ্ড বলে অভিহিত করা হবে। আকাশের বস্তুসমূহ হলো গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু নক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ ইত্যাদি। মঙ্গল ও জুপিটার গ্রহের মধ্যবর্তী প্রশস্ত এলাকায় অবস্থান করে হাজার হাজার গ্রহাণু (asteriods) যেগুলো প্রতিনিয়ত সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হচ্ছে।

সমগ্র আন্তগ্রহমণ্ডলীয় এলাকায় পাথরের এবং লৌহের অসংখ্য টুকরা রয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করে এবং এদের মধ্যে কিছু কিছু নাক্ষত্রীয় এলাকা থেকে ঝড়ের গতিতে এসে সৌরজগতে প্রবেশ করে। এ ধরনের ১,০০০,০০০,০০০ বস্তুপিণ্ড প্রতিদিন পৃথিবীর বুকে আঘাত হানে এবং বিরামহীন জলস্রোতের মতো সেগুলো বায়ুমণ্ডলের উপর ঝরে পড়ে। বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলো যদি না থাকতো তাহলে বিরামহীনভাবে ঐ বস্তুগুলো পৃথিবীর বুকে ছিটকে পড়তো এবং পৃথিবীর উপরিভাগ চাঁদের উপরিভাগের মতো হয়ে যেতো। এ বস্তুগুলো হলো উল্কা (meteor)। সাধারণত উল্কার পতন আমরা প্রায়ই দেখে থাকি তবে অল্প সংখ্যক। কারণ এগুলো ভূপাতিত হয়ে থাকে মহাসমুদ্রের বুকে, মরুভূমির বুকে এবং বিরাণ এলাকায়। এগুলো দিনের বেলা যখন পতিত হয় তখন সেগুলোকে দেখা যায় না। এগুলোর পতন কালে যদি আকাশে মেঘ তাকে তাহলেও তারা আমাদের দৃষ্টিতে আসে না।

বিশাল আকারের উল্কাপাতকে বায়ুমণ্ডল বাধা দিতে পারে না বলেই পৃথিবীর বুকে মাঝে মাঝে উল্লেখযোগ্য উল্কাপাত ঘটে থাকে। এ কারণে পৃথিবীর বুকে উল্কাপিণ্ডের আঘাতে ক্ষতস্থানের সৃষ্টি হয়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ক্ষতস্থানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অ্যারিজোনায়। এ ক্ষতস্থান আড়াআড়িভাবে ১.২ কি. মি. বিস্তৃত, ১৭০ মিটার গভীর এবং এর চতুস্পার্শ্বের বেড়ের পরিমাণ ৫০ মিটার। প্রায় ৩০টি প্রমাণিত উল্কাপাতের ক্ষতস্থান পৃথিবীতে পাওয়া যায়। সুতরাং এ উল্কাপিণ্ডসমূহকে বলা হয় আকাশের অংশবিশেষ যা পৃথিবীর বুকে পতিত হয়।

ধূমকেতুগুলোকেও (Comets) আকাশের অংশবিশেষ হিসেবে গণ্য করা যায়। সৌরজগতের এসব কনিষ্ঠ সদস্যগণ সময় সময় আবির্ভূত হয়ে থাকে এবং তারা তাদের কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে পরিভ্রমণ করে থাকে। এগুলো সাধারণত গ্রহ অপেক্ষা অধিকতর উন্মত্ত ধরনের। জঅওয়াক (Jaywalk) নামক ধূমকেতুগুলো খেয়ালীভাবে গ্রহসমূহের কক্ষপথে ভ্রমণ করে থাকে। এদের মধ্যে কতগুলো মাঝে মধ্যে গ্রহদের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায়। এ শতাব্দীর প্রথমভাগে একটি ধূমকেতু পৃথিবীর গায়ে ধাক্কা দিয়েছিল। ধাক্কা খাওয়ার ফলে ধূমকেতুটি সাইবেরিয়ার উপরিভাগের বায়ুমণ্ডলে জ্বলে গিয়েছিল। এটা ছিলো হিরোশিমায় ঘটানো পারমাণবিক বোমার চেয়ে ১০০০ গুণ তীব্র আকারের বিস্ফোরণ। এ ঘটনাটি Tunguska নামে পরিচিত। সম্ভবত এ ঘটনাটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে মানব জাতি জ্ঞাত হয়ে আছে। এ ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯০৮ সনের ৩০শে জুন সকাল ৭.১৫ মিনিটে। এ ঘটনার কোনো পূর্ব সংকেত মানুষ জানতে পারেনি। এ Tunguska বিস্ফোরণের ঘটনা দেখা গিয়েছিল এবং তার বিকট শব্দ শোনা গিয়েছিল বিশাল এলাকাব্যাপী যার পরিমাপ হবে ফ্রান্স এবং জার্মানীর সমান। এ ঘটনাটি ঘটার পর কয়েক রাত্রি ধরে ইউরোপের আকাশ এতো বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে, মধ্যরাত্রির পরেও এ উজ্জ্বলতায় পড়াশুনা করা যেতো। এ ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছিল একটি ক্ষুদ্র ধূমকেতুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের কারণে। অতএব আকাশের অংশবিশেষ এ ধূমকেতুর পতন ঘটে পৃথিবীর বুকে।

গ্রহাণুগুলোও আকাশের অংশবিশেষ। এটা সকলেই বিশ্বাস করে থাকে যে, অতীতে কমপক্ষে পৃথিবীর বুকে একবার গ্রহাণুর পতন ঘটেছিল। প্রায় ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে ডাইনোসর এবং এদের সঙ্গে অন্যান্য মেসোজয়িক যুগের প্রাণীরা গ্রহাণু পতনের ফলে পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

অতএব আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা করেন তখনই আকাশের বুক থেকে বিভিন্ন আকাশি বস্তু পৃথিবীর বুকে পতিত হয় এবং অতীতের মতো তিনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে ভবিষ্যতেও এ ধরনের ভয়ঙ্কর ঘটনার অবতারণা হতে পারে।

হযরত সুলাইমান (আ)-কে বাতাসের উপর কর্তৃত্ব দান

সূরা সাবা-৩৪ : ১২-১৩

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ. يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ اِعْمَلُوْآ اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ.

And to Sulaiman (We gave) the wind, whereof its morning course was a month's journey and the evening course a month's journey. We made a font of molten brass (copper) to flow for him...

They (the Jinns) worked for him as he desired making arches, statues, basins as large as reservoirs and cauldrons fixed :

আর আমরা সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বাতাসকে যার প্রভাতকালীন প্রবাহে একমাস এবং সন্ধ্যাকালীন প্রবাহে একমাস পরিভ্রমণ করা যেতো। আমরা তাঁর প্রয়োজনে গলিত তামার উৎসকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম।

তারা (জীনেরা) সুলাইমান (আ)-এর ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, জলাধার সদৃশ বৃহৎ গামলা এবং মজবুত কড়াই তৈরি করে দিতো। (সূরা সাবা-৩৪ ঃ ১২-১৩)

এ আয়াত দুইটিতে হযরত সুলাইমান (আ)-এর প্রতি আল্লাহ পাক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা এবং তাঁর আমলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথমে বলা হয়েছে হযরত সুলাইমান (আ) বাতাসের উপর হুকুমদারী করতেন। এ বিষয়টি এরূপ যে আল্লাহ পাক বাতাসের উপর তাঁকে প্রভুত্ব খাটাবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত সুলাইমান (আ)-এর একটি বৃহৎ সিংহাসন ছিলো। তিনি এ সিংহাসনে আরোহণ করলে বাতাস তাঁর নির্দেশে সিংহাসনটি ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। আধুনিক ভাষ্যে একথা বলা হয়েছে যে, হযরত সুলাইমান (আ)-এর প্রভুত্ব ব্যাপ্ত ছিলো ভূমধ্যসাগরের উপর এবং আকাবা উপসাগরের মধ্যদিয়ে লোহিত সাগরের উপর পর্যন্ত। তাঁর এ বিরাট প্রভুত্বের নিরিখে রূপকভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি বাতাসের উপর কর্তৃত্ব করতেন।

এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, হযরত সুলাইমান (আ)-এর সময়ে ভাস্কর্য,

বৃহৎ আকারের গামলা, বয়লার ইত্যাদি নির্মিত হতো গলিত লোহা থেকে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ঐ সময়ে ধাতুর কাজ বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেছেন ঐ সময়ে আকাবা এলাকায় লোহা ও অন্যান্য ধাতুর কিছু খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রাচীন 'Ezion Geber' লোহিত সাগরের উৎস মুখে অবস্থিত ছিলো। আকরিক লোহা ও তামা পার্শ্ববর্তী পাহাড় এলাকায় পাওয়া যায় এবং খনিজ পদার্থ গলানোর একটি স্থাপনা মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ স্থাপনা চলতো তীব্র বাতাসের প্রবাহের তোড়ে। এ তীব্র ধরনের বাতাস বইতো উত্তর দিক থেকে। এর থেকে পাওয়া যেতো বাধ্যতামূলক টান। এ টানের ফলে প্রয়োজন হতো না হাপর পদ্ধতি (Bellow system)।

সমগ্র বিষয়টি দেখে এটা প্রতীয়মান হয় যে বর্তমানের অগ্নি-চুল্লির উদ্ভব হয়েছে যেন প্রাচীনকালের ঐ চুল্লি থেকে। বর্তমানের 'Bessemer system' প্রাচীন রীতির আলোকে নির্মিত। ফারটাইল ক্রিসেন্ট, ব্যাবিলন, কিংবা মিশরে এ ধরনের বৃহৎ আকারের কোনো অগ্নি-চুল্লির সাক্ষাৎ মেলে না।

আমেরিকান স্কুল অব ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এর প্রফেসর Nelson Glueck এই এলাকায় ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে বলেছেন যে, হযরত সুলাইমান (আ) কে 'তাম্র সম্রাট' বলে আখ্যায়িত করা চলে। কারণ যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য রপ্তানীকারক প্রাচীনকালে তামা রপ্তানী করতো তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অধীনে বিপুল পরিমাণ আকরিক লোহা ও তামা খনি থেকে উত্তোলন করা হতো এবং উত্তোলিত লোহা ও তামাকে গলানো হতো। নিঃসংশয়ে একথা বলা যায় যে, এ সময়ে যে কোনভাবেই হোক কিছু যান্ত্রিক উপায়ে লোহা ও তামাকে গলানো হতো এবং অত্যন্ত গরম বাতাস উৎপন্ন করা হতো। এ গরম বাতাসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা হতো। বেলুন তৈরির কাজে এ গরম বাতাসকে নিপুণ কৌশলের মাধ্যমে ব্যবহার করা হতো।

ঐতিহাসিকভাবে ১৯৮৩ সনে মন্টগলফ্লিয়ার ও তার ভাইয়েরা প্রথম গরম বাতাসের বেলুন উদ্ভাবন করেছিলেন। বর্তমানে হিলিয়াম গ্যাসেই একমাত্র প্রধান হালকা গ্যাস। বর্তমানে দুই ধরনের বেলুন আছে। বন্দী ও মুক্ত। বন্দী বেলুনগুলো সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে এবং এ বেলুন দ্বারা অগ্নি-নির্বাপণের কাজ করা হয়। বায়ুমণ্ডলের অবস্থা এবং কসমিক-রে সম্পর্কে জানার জন্য মুক্ত বেলুন ব্যবহার করা স্ট্রাটোসফিয়ারে (Stratosphere) উড়ে যাওয়া যায়। এ ধরনের মুক্ত বেলুন ঊর্ধ্বে ৭০০০০ ফিট পর্যন্ত উঠতে পারে। এই বেলুন বাতাসে ভেসে চলতে পারে এবং সবকিছু সমন্বিত হলে এবং আবহাওয়া ভালো থাকলে এর ১০০০ মাইলেরও বেশি দূরত্বে উড়ে যাওয়া সম্ভব। এটা অসম্ভব নয় যে হযরত সুলাইমান (আ)-এর সময়ে এ ধরনের কিছু বেলুন উদ্ভাবিত হয়েছিল যেগুলো বাতাসে ভেসে বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারতো।

সাবা শহরের পরিণতি

সূরা সাবা-৩৪ : ১৬

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ.

But they turned away, so We sent against them flood released from the dam and We converted their two gardens into gardens producing bitter bad fruit and tamarisks and some few lote-trees.

কিন্তু তারা (আল্লাহ্ পাকের নির্দেশিত পথ থেকে) ফিরে গেলো। তাই আমরা বাঁধ ভেঙে বন্যা পাঠিয়ে দিলাম এবং তাদের দুইটি ফলের বাগানকে তিক্ত ফলের বাগানে রূপান্তরিত করলাম এবং সেখানে কিছু ঝাউগাছ ও বাবলাগাছ জন্মাতে লাগলো। (সূরা সাবা : ১৬)

এই আয়াতে ইয়েমেনের অন্তর্গত সাবা শহরের কথা বলা হয়েছে। হযরত সুলাইমান (আ) ও বিলকিস রাণীর সময় সাবা শহরে মাআরিব নামের একটি বিখ্যাত পানির বাঁধ ছিলো। এই বাঁধের সাহায্যে এ দেশের সেচকার্য সুচারুরূপে সমাধা হতো। এর ফলে ফলের বাগানগুলো খুবই সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। এসব বাগানে পাওয়া যেতো সুস্বাদু ফল, মশলা, কিসমিস ইত্যাদি। হযরত সুলাইমান (আ)-এর ইন্তিকালের পরেও বাগানগুলোতে ফলের সমারোহ অব্যাহত ছিলো। কিন্তু পরে যখন সাবা শহরের লোকজন আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের কথা ভুলে গেলো এবং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশিত পথ থেকে ফিরে গেলো তখন বন্যার আকারে আল্লাহ্ পাকের ক্রোধ তাদের উপর নেমে আসল এবং ঐ মাআরিব বাঁধ ভেঙে গেলো। এর ফলে সেচকার্য বিঘ্নিত হলো এবং দারুণ খরা দেখা দিলো। যেসব সতেজ শ্যামল বাগানগুলোতে একদিন সুস্বাদু ফল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হতো এখন সেখানে আর ঐসব দ্রব্য উৎপন্ন না হয়ে বাজে গাছপালা দেখা দিলো। এ আয়াতে দুইটি গাছের উদাহরণ দেখানো হয়েছে যা এ অবস্থায় সাধারণভাবে জন্মাতে থাকে। এগুলো হলো ঝাউজাতীয় গাছ ও বাবলাজাতীয় গাছ। ঝাউজাতীয় গাছে যে ফল ধরে তা ক্ষুদ্র, শুষ্ক ও অভোজ্য। আর বাবলাজাতীয় গাছে যে ফল ধরে তা খুবই তিক্ত যা মানুষ খেতে পারে না। বাবলাজাতীয় গাছ কণ্টকময় এবং এগুলো ছায়াদান মানুষের উপকার করতে পারে না।

বিভিন্ন রঙের ফল আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি নৈপুণ্যতা

সূরা ফাতির-৩৫ : ২৭

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ.

See you not that Allah sends down water (rain) from the sky and We produce therewith fruits of various colours and among the mountains are streaks white and red of varying colours and very black.

তোমরা কি দেখোনা যে, আল্লাহ্ পাক আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন। আর আমরা বৃষ্টির সাহায্যে বিভিন্ন রঙের ফল উৎপাদন করি। পাহাড়ের বুকে কিছু কিছু জায়গাকে সাদা ও লাল বর্ণে রঞ্জিত করে রাখি এবং কিছু জায়গা অত্যন্ত কালো বর্ণের। (সূরা ফাতির : ২৭)

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ পাক প্রকৃতির তিনটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। (১) আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত, (২) বিভিন্ন রঙের ফল উৎপাদন, (৩) এবং পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন ধরনের রঙের বিন্যাস।

১. আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত : পানি মৌলিক প্রয়োজনগুলোর একটি। সকল উদ্ভিদ তার পুষ্টি, বৃদ্ধি, প্রজনন এবং অস্তিত্বের জন্য পানির প্রয়োজন অনুভব করে। আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত হয়। এর ফলে উদ্ভিদ কোষের মধ্যে পুষ্টিজনিত বিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং পানির সাহায্যে মাটি থেকে বহু রকমের পুষ্টিকর উপাদান সংগৃহীত হয়।

এরপর ফটোসিনথেসিস ক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত খাদ্যবস্তু উদ্ভিদের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় প্রেরিত হয়। সুতরাং উদ্ভিদ কোষের কর্মকাণ্ডের বৃষ্টির যে মুখ্য ভূমিকা সেটাই উদ্ভিদের খাদ্যবস্তু প্রস্তুত কর্মে সহায়তা দান করে।

২. বিভিন্ন রঙের ফল উৎপাদন : যে জৈবিক ঘটনা প্রবাহ বৃষ্টিপাতের মধ্যদিয়ে শুরু সেই ঘটনা প্রবাহ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে বৃক্ষে ফল উৎপাদন হওয়ার মাধ্যমে। কাঁচা

ফল প্রায় সবুজ রঙের হয়। এগুলো সবুজ পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে বলে পাখি, বাদুড় বা অন্যান্য কীটপতঙ্গ খুঁজে পায় না। তবে যখন ঐগুলো পাকতে শুরু করে তখন সেগুলো ঐসব প্রাণীদের নজরে পড়ে এবং তারা পাকা ফলকে দূর-দূরান্তে বয়ে নিয়ে যায়। বিশেষ করে পাখিরা বীজের বিস্তার ঘটায়। ফল যে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ থেকে লাল বর্ণ লাভ করে তার দায়িত্ব বহন করে পিঙ্গল রঙ। গোলাপী কিংবা নীল রঙের অভিব্যক্তি ঘটে 'এ্যানথোসায়ানিন' দ্বারা। যদিও আরবি 'সামারাত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ ফল তবুও এ শব্দটির বিস্তৃত অর্থ খাদ্যবীজ অর্থাৎ গম, যব, বার্লি ও অন্যান্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। ডালকেও বীজ বলা যায়। কারণ ডাল হলো ফলের অংশ। সুতরাং ফলের সংখ্যা যাই হোক না কেন ফলের মধ্যে বিভিন্ন রঙের যে সমাবেশ ঘটে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ও প্রাণীজগতের প্রতি আল্লাহ পাকের যে করুণা তা এসব ফল মূর্ত করে তুলে।

৩. পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন রঙের বিন্যাস : যে বিভিন্ন ধরনের শিলাপাথর দ্বারা পাহাড় গঠিত হয় তা বিভিন্ন ধরনের রঙ প্রদর্শন করে। তাদের এ রঙ নির্ভর করে তাদের প্রাথমিক উৎপত্তির ধরনের উপর। পর্বত রেঞ্জের ডলোমাইট (Dolomites), চুনাপাথর এবং চক মাটি অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর মৃতদেহ থেকে গঠিত হয়েছে। এদের রঙ সাদা কিংবা ধূসর বর্ণের। মার্বেল পাথর সাধারণত সাদা থেকে ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। তবে সুন্দর ডিজাইনের মাধ্যমে তাকে প্রায় কমন রঙের বলে মনে হয়। সর্পিলাকার শিলাপাথরের মাধ্যমে স্বচ্ছ, লাল ও সবুজ রঙ প্রকাশিত হয়। লাল মাটির রঙ লাল, আগ্নেয়শিলার রঙ ধূসর কিংবা কালো এবং ফ্লিন্ট পাথরের রঙ গাঢ় কালো। খনিজ পদার্থ গ্যালেনাতে (Galena) থাকে গন্ধক যা প্রদর্শন করে নীল-ধূসর রঙ। ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইডের উপস্থিতির কারণে ফ্লোয়ারস্পার (Flourspar) এর রঙ হয় সবুজ ধরনের।

উপরে উল্লিখিত রঙগুলো কিছু রঙের উদাহরণ মাত্র যা কোনো ব্যক্তি পাহাড়ের গায়ে অবলোকন করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের রঙ নির্ভর করে শিলার দৈহিক ও রাসায়নিক গঠনের উপর। এসব শিলা দ্বারা পাহাড় গঠিত যা আমাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করে এবং সবগুলো শিলা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নৈপুণ্যতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

মানুষ, বিচরণশীল প্রাণী ও গবাদি পশুর রঙের বিভিন্নতা

সূরা ফাতির-৩৫ : ২৮

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا. اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ.

And likewise of men and moving creatures and cattle are of various colours. It is only those who have knowledge among His slaves that fear Allah. Verily Allah is All-mighty, off forgiving.

আর অনুরূপভাবে মানুষ, বিচরণশীল প্রাণী এবং গবাদি পশুদের রঙ হয় বিভিন্ন ধরনের। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যাদের জ্ঞান আছে কেবল তারাই আল্লাহ পাককে ভয় করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাক সর্বময় শক্তিধর, পরম ক্ষমাশীল। (সূরা ফাতির : ২৮)

এ আয়াতের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যে বিষয়টি এখানে বিশেষত্ব লাভ করেছে তা হলো মানুষ, বিচরণশীল প্রাণী এবং গবাদি পশুর রঙের বিভিন্নতা।

সব মানুষের গায়ের রঙ এক রকম নয়। কারো রঙ ফর্সা, কারো রঙ তামাটে এবং কারো রঙ কালো। এরকম তফাত হওয়ার কারণ হিসেবে জানা যায় মানুষের ত্বকের ভেতরের অংশে কতগুলো বিশেষ ধরনের কোষ আছে। তাদের নাম মেলানোসাইট (Melanocyte)। মেলানোসাইটের মধ্যে থাকে রঙের কণা মেলানিন। মেলানিন ত্বকের কালো রঙের জন্য দায়ী। যাদের ত্বকে মেলানিনের পরিমাণ খুব বেশি থাকে তাদের গায়ের রঙ হয় কালো। ত্বকে মেলানিন কম থাকলে গায়ের রঙ ফর্সা হয়। ত্বকে মেলানিন কম থাকবে না বেশি থাকবে তা যেমন নির্ভর করে বংশগত বৈশিষ্ট্যের উপরে তেমন কোন বিশেষ দেশের মানুষের গায়ের রঙের সঙ্গে সেই জায়গার ভৌগলিক অবস্থান, সূর্যের আলো সেখানে কতটা প্রখর এসব কিছুরই একটা সম্পর্ক আছে।

আরবি 'দাওয়াব' শব্দের অর্থ হলো বিচরণশীল প্রাণী। বিচরণশীল প্রাণীদের মধ্যে যারা বুকে ভর দিয়ে হাঁটে তাদেরকে আমরা সরীসৃপ প্রাণী বলি। এসব বুকে হাঁটা

প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে। এদের একটি গোত্র খুবই বিচিত্র রঙের। এরা হলো সাপ। এদের গায়ের রঙ গাঢ় কালো থেকে আকর্ষণীয় সবুজ, হলুদ অথবা বাদামী রঙের হয়। মাঝে মাঝে তাদের গায়ে উজ্জ্বল বর্ণের ফুলের মতো নকশা দেখা যায়। এরূপ বিভিন্ন রঙের সমাবেশ সরীসৃপদের শিকারী প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং তাদেরকেও শিকার ধরার কাজে সহায়তা দান করে।

আবার আরবি 'আনআম' শব্দ দ্বারা গাভী, মহিষ, ষাঁড় ইত্যাদি বুঝানো হয়। কিন্তু সম্প্রসারিত অর্থে এ শব্দ দ্বারা সব ধরনের গৃহপালিত পশুদের বুঝানো হয়। যাদের দুধ, মাংস, চামড়া ও পশমকে আমরা কাজে লাগাই। মহিষের গায়ের রঙ কালো ধরনের কিন্তু গাভী, বলদ, ছাগল ও মেষের গায়ের রঙ হয় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। এসব প্রাণীর ত্বকের রঙ ধবধবে সাদা থেকে খাঁটি বাদামী এবং গায়ে খণ্ড খণ্ডভাবে কালো কিংবা বাদামী রঙের সমাবেশ থাকে। তাদের পশমের রঙ নির্ভর করে তাদের বংশ বৈশিষ্ট্যের উপর।

সুতরাং বস্তুজগৎ এবং জীবজগতের এ বিশ্বে বর্ণের বিভিন্নতা আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। কিন্তু তাদেরকে প্রকৃত জ্ঞানী হিসেবে বিবেচনা করা যায় যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের অসীম জ্ঞানের প্রশংসা করে থাকে।

চাঁদ-সূর্য ও দিবা-রাত্রি আল্লাহ্ পাকের আইন অনুসরণ করে

সূরা ইয়াসীন-৩৬ : ৪০

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ.

It is not for the Sun to catch up the Moon, nor does the Night out strip the Day. They all float each in own orbit.

চাঁদকে ধরে ফেলার ক্ষমতা সূর্যের নেই এবং দিনকে ঢেকে ফেলার ক্ষমতা রাত্রির নেই। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে ভেসে বেড়ায়। (সূরা ইয়াসীন : ৪০)

একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে ধরে ফেলে তখনই যখন ঐ দুটি বস্তু একত্রিত হয়। অর্থাৎ একই সমতায় অবস্থান করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিন রকম Co-ordinate চালু আছে। যথা– Altitude-Azimuth, celestial latitude-longitude এবং Right ascension-declination। এ্যালটিচিউড-এ্যাজিমুথ হলো স্থায়ী কো-অর্ডিনেট। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে পৃথিবীর উপরিভাগে যেভাবে দেখা যায়। দুইটি বস্তুর একই এ্যালটিচিউড-এল্যাজিমুথ থাকে যদি ঐ বস্তু দুইটিকে একই স্থান থেকে দেখা যায়। কিন্তু যদি ভিন্ন স্থান থেকে দেখা হয় তাহলে ঐ সমপর্যায়ের বস্তু দুটিকে সাধারণত ভিন্ন বলে মনে হবে। যদিও সেলেসচিয়াল ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউড বিশ্বজনীন কো-অর্ডিনেট তবুও তাদের ব্যাপক ব্যবহার নেই। তবে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় এর ব্যবহার আছে। রাইট এ্যাসেনসান-ডিক্লাইনেশন কো-অর্ডিনেটগুলো বিশ্বজনীন এবং এরা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। সূর্য ও চন্দ্রের দুই কো-অর্ডিনেট সূর্যগ্রহণের সময় একই ধরনের হয়ে থাকে। ঐ সময় এটা মনে হয় যে, সূর্য চন্দ্রকে ধরনে ফেলেছে। কিন্তু এ দুইটি কো-অডিনেট দ্বৈত আকার বিশিষ্ট। কারণ সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে পৃথিবী থেকে একই দূরত্বে অবস্থান করছে বলে মনে হয়। অথচ সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব অতি সুবিশাল। অতএব সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান প্রায় ১৫৮ মিলিয়ন কিলোমিটার। এ কারণে সূর্য কোনো সময়ে চন্দ্রকে ধরতে বা গ্রাস করতে পারবে না।

এ আয়াতের আর একটি বিষয় হলো রাত্রি দিনকে ঢেকে ফেলতে পারবে কিনা। একথা খুবই সত্য যে, রাত্রি দিনের কোনো অংশকেই ঢেকে ফেলতে পারে না। যে স্থানে সূর্য দিগন্তের (Horizon) নিচে অবস্থান করে সে স্থানে দেখা দেয় রাত্রি এবং যে স্থানে সূর্য দিগন্তের উর্ধ্বে অবস্থান করে সেখানে দেখা দেয় দিন। সূর্য একই সময়ে দিগন্তের উর্ধ্বে এবং নিম্নে অবস্থান করতে পারে না। অতএব কোনো স্থানে একই সময়ে দিন-রাত্রি যুগোপথ দেখা যায় না। সুতরাং রাত্রি দিনকে কখনো ঢেকে ফেলতে পারবে না।

চন্দ্র, সূর্য তথা সকল গ্রহ-নক্ষত্র তাদের নিজ কক্ষপথে অত্যন্ত সঠিকভাবে আবর্তিত হয়। স্পষ্টতই তারা আল্লাহ পাকের নির্ধারিত আইন অনুসরণ করে বিচরণ করে। অন্যথা তারা একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে যেত।

সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন

সূরা ইয়াসীন-৩৬ : ৮০

اَلَّذِیْ جَعَلَ لَکُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ.

He Who produces for you fire out of the green tree, when behold you kindle therewith.

তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন যার সাহায্যে তোমরা আগুন জ্বালাতে পারো। (সূরা ইয়াসীন : ৮০)

পবিত্র কোরআনের প্রাথমিক পর্যায়ের মুফাসসিরদের একজন হলেন ইবনে আব্বাস (রা)। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর একজন সঙ্গী ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যাখ্যায় প্রথম সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, আরবের মরুভূমিতে 'মার্খ' (Markh) নামক এক ধরনের পত্রহীন বৃক্ষ জন্মায় যার ডালে ডালে ঘর্ষণের ফলে আগুন বের হয়ে আসে। P. Forskal প্রাথমিকভাবে এ গাছের বর্ণনা দিয়ে এর নামকরণ করেন 'Cynanchum Pyrotechnica Forsk'। পরবর্তীতে এ নাম সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়ায় পাইরোটেকনিকা ডেকনী। এ বিশেষ নামকরণটি করেছিলেন গাছের সবুজ শাখার বৈশিষ্ট্যগত গুণাবলীর ভিত্তিতে। কারণ সবুজ শাখার মধ্যে পারস্পরিক ঘর্ষণের ফলে আগুন জ্বলে উঠতো। বিশেষ করে আগুন জ্বলে উঠতো যখন বাতাস বইতো। প্রাচীনকালে আরবরা আগুন জ্বালানোর প্রয়োজনে সবুজ বৃক্ষের শাখা ব্যবহার করতো। তারা যে পদ্ধতিতে আগুন জ্বালাতো সে পদ্ধতিতে একটি কাঠ নির্মিত যন্ত্র ব্যবহার করতেন। এ যন্ত্রের নাম হলো 'জিনাদ'। এটা নির্মিত হতো ঐ বৃক্ষের দুটি শাখা দ্বারা। এর উপরের শাখাটির নাম এ্যাফার (Afar) বা জান্দ (Zand) এবং নিচের অংশের নাম মার্খ। এ দুইটি শাখাকে পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণ করা হলে আগুন জ্বলে উঠে। ইস্পাত এবং পাথরের গায়ে ঘষা দিয়ে আগুন জ্বালানোর পূর্বে আরব দেশের লোকেরা উপরোক্ত কায়দায় আগুন জ্বালাতেন।

এ. এম. মিগাহিদ তাঁর 'Flora of Saudi Arabia' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পাইরোটেকনিকা চারগাছের আরবি নামকরণ করা হয়েছে মার্খ বলে। এ চারা

গাছগুলো পত্রহীন ঝোঁপের মতো এবং এদের উচ্চতা ৫ মিটার। এগুলোতে অসংখ্য লম্বা লম্বা ছড়িজাতীয় শাখা-প্রশাখা আছে।

আরবি শব্দ 'আল-সাজার আল-আখদার' এর অর্থ হলো সবুজ বৃক্ষ। এ আয়াতের প্রেক্ষিতে ঐ সবুজ বৃক্ষের বিশেষ ধরনের তাৎপর্য আছে। সবুজ ক্লোরোফিলের গুণের দ্বারা সবুজ গাছ সৌরশক্তি ধরে রাখতে পারে। সৌরশক্তিকে যে পদ্ধতিতে ধরে রাখে সে পদ্ধতিকে বলা হয় সালোক সংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিস। যা থেকে উৎপন্ন হয় কার্বোহাইড্রেট। আর এ কার্বোহাইড্রেট সৌরশক্তিকে মজুত করে রাখতে পারে। যখন গাছের দুইটি শাখা ঘর্ষণে জ্বলে উঠে তখন সৌরশক্তি অবমুক্ত হয়ে যায় আলো ও তাপের আকারে।

আল্লাহ পাকের ঐশী নির্দেশ 'হও' অমনি হয়ে যায়

সূরা ইয়াসীন-৩৬ : ৮২

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

Verily His Command when He intends a thing, is only that He says to it 'Be'- and it is!

নিশ্চয়ই তিনি যখন কোনো জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন 'হও' অমনি তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন : ৮২)

এ আয়াত থেকে এটা বেশ স্পষ্ট যে আল্লাহ পাক যা কিছু সৃষ্টি করতে চান তা খুব সহজেই করতে পারেন, আমরা যখন কোনো কিছু উদ্ভাবনের কথা বলি তখন সেটা সম্ভব কি অসম্ভব তা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করি। এমনকি কোনো ঘটনা সম্ভব কি অসম্ভব তা নিয়েও আমরা দ্বিধাবোধ করি। যেমন, যদি কেউ একটি বলকে পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে তার স্থিতি অবস্থা থেকে গতিশীলতা সৃষ্টি করে পাহাড়ের অনেক উচ্চতায় তুলে দিল কিন্তু বলটি পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারল না তখন ঐ ব্যক্তি বলে থাকে বলটির পক্ষে পাহাড় অতিক্রম করা অসম্ভব। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বলে না যে এ ঘটনা অসম্ভব। কোয়ান্টাম মেকানিক্স যে কোনো ঘটনার পক্ষে ব্যাপকতা সংযুক্ত করে থাকে। এই ব্যাপকতার পূর্ণ বর্গ কোনো ঘটনা ঘটার পক্ষে সম্ভাবনা সূচিত করে। অতএব কোনো একটি ঘটনা খুব জোরালোভাবে সম্ভাবনাময় কিংবা সম্ভাবনাহীন হতে পারে। তাই বলে অসম্ভব নয়। যে সম্ভাবনার ব্যাপকতা উল্লেখ করা হয়েছে তাকে বলা হয় ওয়েভ ফাংশন (Wave function) কোয়ান্টাম মেকানিক্স একথা বলে যে, এমনকি বলের গতিবেগ পাহাড়ের উচ্চ স্থানে তার গতি শক্তি স্থিতিশক্তি অপেক্ষা কমও

হয় তাহলেও বলটির পক্ষে সুন্দর সম্ভাবনা থাকে পাহাড়টির মাথা টপকে ডিঙিয়ে যেতে।

কারিগরী দিক থেকে এটাকে বলা হয় কোয়ান্টাম টানেলিং (Quantum tunneling)।

বিজ্ঞানী Evan Squirers তার সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'Mystery of the Quantum world' এ আল্লাহ পাকের দুইটি ভূমিকার (Role) উপর গুরুত্ব আরোপ

করেছেন। আল্লাহ পাকের প্রথম ভূমিকা এ আয়াতের সঙ্গে খুবই নিবিড় এবং তা হলো পছন্দ করে বাছাই করা। এ পছন্দ তখনই প্রয়োজন পড়ে যখন পরিমাপ করা হয়। এ পরিমাপ দ্বারা কোয়ান্টাম সিস্টেম থেকে সম্ভাব্য ফলসমূহের একটি বেছে নেয়া হয়। এভাবে আল্লাহ পাক পৃথিবী থেকে ইনডিটারমিনেসি দূর করে থাকেন। ইনডিটারমিনেসি দূর করতে গিয়ে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব বহন করেন। এ সিদ্ধান্ত পদার্থ বিদ্যার নিয়মের দ্বারা স্থিরকৃত হয় না। তবুও তা যুক্তিসঙ্গতভাবে আল্লাহ পাকের ভূমিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সকল বিষয়ে আল্লাহ পাক একজন সর্বশক্তিমান সত্তা। ইসলামী জীবন ধারায় আমরা একজন কেবলমাত্র একজন স্রষ্টার কথাই বলে থাকি। তিনি আল্লাহ। এটা খুবই স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার এমন ক্ষমতা আছে যা দ্বারা তিনি যে কোন অসম্ভব ঘটনাকেও উদ্ভূত ফল হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন যদি তিনি চান যে তা ঘটুক। তিনি বলেন হও (Be), আর সঙ্গে সঙ্গেই তা হয়ে যায়।

Big Bang এর মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টি বিজ্ঞানের নিরিখে একটি বিস্ময়কর ঘটনা এবং এ ঘটনা আল্লাহ পাক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কেউ কেউ একথা বলতে পারেন যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি শুরু হয়েছিল একটি বিন্দু থেকে। যে বিন্দুর মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিলো বিশ্বজগতের সকল বস্তু। কেউ হয়তো জোরালোভাবে প্রশ্ন তুলতে পারেন কিভাবে একটি বিন্দুর মাঝে এতো অসীম শক্তির ধারণ সম্ভব? নিঃসন্দেহে এ প্রশ্নের উত্তর বেশ সমস্যাসংকুল। তবে এটা বুঝে নিতে হবে যে, সমগ্র বস্তুটি একটি সিংগুলারিটির মধ্যে ছিলো এবং সময়ের শুরু Big Bang থেকে। এভাবে বুঝে নেয়া একটি বিশ্বাসের ধারা এবং পরবর্তীতে সকল ঘটনা ব্যাখ্যাযোগ্য বলে মনে হয় যদি প্রারম্ভিক এবং আকস্মিক বিস্ফোরণকে স্বীকৃত বলে গ্রহণ করা যায়।

যাহোক এ প্রশ্নের কেউ উত্তর দিতে পারে না যে কে বিস্ফোরণ ঘটাবার সিদ্ধান্ত দান করেছিল। কেউ হয়তো কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন (Quantum fluctuations)-এর মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু তা থেকে এ ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। অপরপক্ষে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক যার কোনো সমকক্ষ নেই তিনিই মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) ঘটনার পক্ষে সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তা যতখানি অসম্ভব হোক না কেন। ঐশী নির্দেশ 'হও' (Be) বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পক্ষে বিবর্তন ঘটাতে পারে।

মহাকাশ নক্ষত্রের সৌন্দর্য সুশোভিত

সূরা সাফফাত-৩৭ : ৬

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاۤءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ.

Verily we have adorned the near Heaven with the stars (for beauty).

প্রকৃতপক্ষে আমরা নিকটতম আকাশকে নক্ষত্রের সৌন্দর্য দিয়ে সুশোভিত করেছি। (সূরা সাফফাত : ৬)

বিশাল মহাশূন্য সাতটি পৃথক অঞ্চলে বা আকাশে বিভক্ত হয়ে আছে। প্রথম অঞ্চলে বা আকাশে অবস্থান করে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহসমূহ। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের উপগ্রহ আছে। সৌরজগতের গ্রহগুলোকে পরিচ্ছন্নভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা– টেরেসট্রিয়াল (Terrestrial) ও জোভিয়াল (Jovial)। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহ হলো টেরেসট্রিয়াল শ্রেণীভুক্ত। আর অন্য পাঁচটি গ্রহ হলো জোভিয়াল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সৌজগতের টেরেসট্রিয়াল অঞ্চল অর্থাৎ প্রথম আকাশ পৃথিবীকে ধারণ করে রাখে। তাই এ আকাশকে বলা হয় পৃথিবীর আকাশ। মহাশূন্যের এ অঞ্চলটি সজ্জিত হয়েছে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহসমূহের দ্বারা। দিনের বেলা আকাশে সূর্যের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। এ সময় সূর্য আকাশের বুক বেয়ে এগিয়ে চলে। আর সেই সঙ্গে ঔজ্জ্বল্যের বিচিত্র আলোছায়া প্রদর্শন করে। এ আলোছায়া শুরু হয় ভোরের স্নিগ্ধ কোমল আলোর মাধ্যমে এবং তা পূর্ণতা লাভ করে ঐ সময় যখন সূর্য উপরে উঠে রাজকীয় প্রদীপ্ত বলয়-আকার পরিগ্রহ করে। তারপর সূর্যকে দেখা যায় আকাশের বুকে ভ্রমণ করে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে সকালের মুগ্ধ আলো থেকে দুপুরের ঝলসানো রোদ পর্যন্ত ব্যাপক কিরণ ছড়িয়ে চলেছে। পরবর্তী পর্যায়ে নম্রভাবে সূর্য অবশেষে দিগন্তের নিচে অস্তমিত হয়ে যায়। এরপর প্রতিভাত হয় লাল গোলাপের মতো আলোক আভা। এ আভা আবার ধীরে ধীরে মিশে যায় সন্ধ্যা গোধূলীর আলো-আঁধারের পরতে। সূর্য অস্ত গেলে চাঁদ আকাশের বুকে ভেসে ওঠে। চাঁদ আকাশের বুকে ছড়িয়ে দেয় তার সকল সৌন্দর্য, চাঁদ ধীরে ধীরে তার প্রাথমিক অবস্থা কাস্তের রূপ থেকে পরিপূর্ণ হয়ে একটা বৃত্তে পরিণত হয়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অল্প পরেই বুধ ও শুক্র গ্রহকে আবির্ভূত হতে দেখা যায়।

সুতরাং প্রথম আকাশ এমন একটি অঞ্চল যেখানে ধরা থাকে সূর্য এবং টেরেসট্রিয়াল গ্রহসমূহ। এদের সীমানায় অবস্থান করে গ্রহাণু বেল্ট।

নক্ষত্র বিবর্তনের বর্তমান তত্ত্বে বলা হয়েছে যে অধিকাংশ নক্ষত্রই গড়ে উঠেছে ক্লসটার আকারে অর্থাৎ এককভাবে নয় দলবদ্ধভাবে। মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোনো সম্পর্ক টেনে এনে একসঙ্গে দলবদ্ধ করে। ঠিক একইভাবে কোনো বিশেষ অঞ্চলের তারকাসমূহ অতি অগোছালোভাবে দলবদ্ধ হয়ে গেছে। এরূপ হয়েছে মহাকর্ষ শক্তির টানে। তারকাগুলো গ্রুপের মধ্যে তাদের নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে একক হিসেবে ঘুরপাক খায়। আমাদের মিল্‌কী ওয়ে গ্যালাক্সিতে প্রায় ১০০ বিলিয়ন তারকা আছে। মহাকর্ষ শক্তির টানে অধিকাংশ তারকা স্থানীয় গ্রুপে বাঁধা থাকে। আমাদের সূর্যের ৩০টি তারকার একটি আঞ্চলিক গ্রুপ আছে। এ তারকাগুলো একটি অঞ্চলে একসঙ্গে বাঁধা থাকে। এ অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ২০ আলোক বর্ষের সমান। সূর্যের এ স্থানীয় গ্রুপের তারকাগুলো তৃতীয় আকাশ গঠন করেছে।

স্থানীয় গ্রুপের মধ্যকার দূরত্ব ১০ হাজার আলোক বর্ষের চেয়ে বেশি। এরূপ স্থানীয় গ্রুপের তারকাসমূহ একক তারকাসহকারে মিলকী ওয়ে গ্যালাক্সি গঠন করেছে। এ মিলকী ওয়ে গ্যালাক্সি-ই হলো চতুর্থ আকাশ।

একইভাবে গ্যালাক্সিরও স্থানীয় গ্রুপ বা ক্লাসটার আছে। এগুলো বাঁধা পড়েছে মহাকর্ষ শক্তির দ্বারা। স্থানীয় গ্রুপের মধ্যে গ্যালাক্সিগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব ৫ লক্ষ আলোক বর্ষের চেয়ে বেশি। গ্যালাক্সির আঞ্চলিক গ্রুপের ছায়াপথ হলো একটি সদস্য। এই গ্রুপগুলো পঞ্চম আকাশ গঠন করেছে।

গ্যালাক্সির আঞ্চলিক গ্রুপগুলো একটি পৃথক একক গঠন করেছে। একে বলা হয় সুপার গ্যালাক্সি। স্থানীয় গ্রুপের মধ্যকার দূরত্ব ২৫ লক্ষ আলোক বর্ষ। এটা ষষ্ঠ আকাশ গঠন করেছে।

সকল সুপার গ্যালাক্সি মহাবিশ্বের বাকি সবকিছু গঠন করেছে। যাকে সপ্তম অকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আ)

সূরা সাফফাত-৩৭ : ১৪২-১৪৬

فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ. فَلَوْلَاۤ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ.
لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَاۤءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ.
وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ.

Then a (big) fish swallowed him as he had done an act worthy of blame.

Had he not been of them who glorify Allah, He would have indeed remained inside its belly till the Day of Resurrection.

But We cast him forth on the naked shore while he was sick.

And We caused a plant of gourd to grow over him.

তারপর একটি বিরাট মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। তিনি দুর্নামের কাজ করেছিলেন।

যদি তিনি আল্লাহ পাকের মহিমা ঘোষণা না করতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই মাছের পেটের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতেন।

কিন্তু আমরা তাকে উন্মুক্ত সৈকতে অসুস্থ অবস্থায় নিক্ষেপ করলাম এবং তার উপর একটি লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্গাত করলাম। (সূরা সাফফাত : ১৪২-১৪৬)

এখানে পাঁচটি ধারাবাহিক আয়াতে হযরত ইউনুস (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইউনুস (আ) কে আল্লাহ পাক আসিরিয়ার রাজধানী নিনেভে প্রেরণ করেছিলেন। নিনেভবাসী তাঁকে চরমভাবে বর্জন করেছিল। তাই তিনি ক্রোধবশত তাদের কাছ থেকে সরে দাড়িয়েছিলেন। তিনি নিনেভবাসীকে তাদের দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা করার পক্ষে কাজ না করে বিরত রইলেন। নিনেভের অবস্থান ছিলো টাইগ্রিস নদীর তীরে এবং ইরাকের বর্তমান মসুল বন্দরের বিপরীত দিকে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝে পড়ে আল্লাহ পাকের সাহায্য আসার আগে তিনি নিনেভ শহর ত্যাগ করেছিলেন এবং জাহাজে চড়ে সরে এসেছিলেন জাফা বন্দরে। জাফা

বন্দরের অবস্থান ছিলো পূর্ব ভূমধ্যসাগরের তীরে এবং নিনেভ শহর থেকে ৬০০ মাইল পশ্চিমে। তিনি যাত্রীবাহী জাহাজে উঠেছিলেন খুব সম্ভব টাইগ্রিস নদীর কাছাকাছি সীমানায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে জাহাজের অবস্থা টালমাটাল হয়ে গিয়েছিল এবং জাহাজের নাবিকেরা হযরত ইউনুস (আ) কে মন্দ লোক মনে করে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তাঁকেও সাগরের পানিতে নিক্ষেপ করে দিয়েছিল। এ সময় একটি বিরাট আকারের মাছ এসে তাঁকে গ্রাস করে নিয়েছিল। কিন্তু তিনি যখন মাছের পেটে আটকা পড়ে ভুল সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহ পাককে স্মরণ করে তাঁর মহিমা ঘোষণা করলেন তখন মাছ বমি করে তাঁকে তীরে নিক্ষেপ করে দিল। মাছের পেটে থাকার দরুন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় যখন সমুদ্র তীরে শুয়ে থাকলেন তখন তাকে বৃক্ষ-লতার ছায়া সরবরাহ করা হলো। বৃক্ষ-লতার ছায়ায় থাকার ফলে তিনি ক্লান্ত-অবসন্ন অবস্থা থেকে বেশ সতেজ ও সবল হয়ে উঠলেন।

এ ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দুইটি শব্দকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে পারে। একটি হলো 'আলহুত' এবং অপরটি 'ইয়াকতিন'।

আলহুত : আরবি আলহুত শব্দটির অর্থ হলো বৃহৎ আকারের মাছ। সমুদ্রে বৃহৎ আকারের মাছ বলতে সাধারণত তিমি মাছকে বুঝায়। তিমি মাছের অন্যান্য প্রজাতি আছে যাদের আকার অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে বৃহৎ। এসব প্রজাতি আর্কটিক, এন্টারক্টিক, আটলান্টিক, ইন্ডিয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরে বাস করে। এ বিষয়ের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় একজন মানুষকে গিলে ফেলতে হলে জন্তুটিকে অবশ্যই বৃহৎ হতে হবে, খাদ্য গিলে খাওয়ার অভ্যাস থাকতে হবে এবং এ প্রাণীটিকে নিনেভের নিকটবর্তী পানি অঞ্চলের বাসিন্দা হতে হবে। অতএব উল্লিখিত কারণগুলোর আলোকে তিমি মাছের সম্ভাব্যতা গ্রহণ করা যায় না। এরপর অন্যান্য বৃহৎ আকারের মাছের মধ্যে আছে হাঙ্গর ও সামুদ্রিক স্টারজন (Sturgeon)। হাঙ্গর বসবাস করে সমুদ্রে এবং অতিশয় শয়তান প্রকৃতির মাছ। এর চোয়াল খুব ধারালো। একে ঐ মাছের সঙ্গে তুলনা করা যায় যে মাছ তার শিকারকে ক্ষতবিক্ষত করে গিয়ে ফেলে। অপরপক্ষে সামুদ্রিক মাছ 'স্টারজন' বর্তমান সময়ে স্বচ্ছ জলের বৃহত্তম মাছ। এ মাছ সমুদ্রের পানিতে বাস করে। কিন্তু মাঝে মধ্যে স্বচ্ছ পানির এলাকায় এসে ব্যাঙ, শামুকের ডিম, ও পোনা খেয়ে চলে যায়। এদের মুখ-গহ্বর দন্তহীন ও শিকারকে সরাসরি গিলে ফেলে। তাই এরা বহু ধরনের ক্ষুদ্রতম প্রাণী ও উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে সরাসরি ভক্ষণ করে। এ পর্যন্ত জানা গেছে স্টারজনের বিশ ধরনের প্রজাতি আছে। এগুলো ইউরোপ, এশিয়া ও

উত্তর আমেরিকার উভয়কূলে ছড়িয়ে রয়েছে। রাশিয়ান স্টারজন হলো এক ধরনের প্রজাতি যার দৈর্ঘ্য ও ওজন যথাক্রমে ২৪ ফুট ও ২০০০ পাউন্ড। এ প্রজাতির নাম Acipenser huso। এরা কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগরে বাস করে। এ সাগরগুলোর সঙ্গে মেসোপটোমিয়ার বহু নদী ও তাদের শাখা মিশেছে। একথা বিবেচনা করা যেতে পারে যে, উল্লিখিত মাপের স্টারজনগুলো হযরত ইউনুস (আ)-এর সময়ে ঘনঘন টাইগ্রিস নদী বক্ষে আসা যাওয়া করতো। হযরত ইউনুস (আ)-এর সময়কাল প্রায় ৮০০ খ্রিস্টপূর্ব। স্টারজন মাছের অতি অদ্ভুত ধরনের খাদ্য গ্রহণ অভ্যাস এবং দন্তহীন মুখ গহ্বর বিনা ক্ষতিতে হযরত ইউনুস (আ) কে গিলে নেয়ার বিষয়টি নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দান করতে পারে। এই বিষয়ের বিশ্লেষণ একথা খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের বড় মাছের পেটে প্রচুর পরিমাণে বাতাস তাকে যে কারণে মাছের পেটের ভেতরে আবদ্ধ শিকারের পক্ষে নিঃশ্বাস গ্রহণ বিঘ্নিত হয় না। কিন্তু মাছের পেটের ভেতরের অম্লজাতীয় তরল পদার্থ দারুণভাবে অস্বস্তি ঘটায় কিংবা এসিডজনিত জ্বালার সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় পড়ে হযরত ইউনুস (আ) যেহেতু আল্লাহ পাককে স্মরণের মাধ্যমে তাঁর গরিমা প্রকাশ করেছেন সেহেতু আল্লাহ পাক তাঁর করুণার মাধ্যমে হযরত ইউনুস (আ) কে মাছের পেট থেকে বের করে তীরে তুলে দিয়েছিলেন।

ইয়াকতিন : আরবি "ইয়াকতিন" শব্দের অর্থ হলো কুমড়া বা লাউজাতীয় গাছ। কুমড়া গোত্রের মধ্যে পড়ে লাউ, তরমুজ ও তাদের আরও অন্যান্য সহযোগী ফল। এসব ফল মূলত ট্রপিক্যাল ও আধা ট্রপিক্যাল এলাকার ফল। কুমড়া বা লাউগাছ অন্য বৃক্ষের মতো শক্ত হয়ে বেড়ে উঠতে পারে না। তবে তাদের নরম ডাঁটা এবং ডাঁটা থেকে নির্গত লতা যে কোনো অবলম্বনের সাহায্যে উপর দিকে বেড়ে উঠতে পারে। এসব গাছ খুব বড় ঝাঁকড়া ধরনের হয়ে থাকে এবং এগুলো মাচায় খুব ভালোভাবে বেড়ে ওঠে। এদের ঘনছায়ায় বসে যে কেউ খুব ভালোভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। লাউয়ের গোত্রভুক্ত গাছপালা পানি নিষ্কাসিত বালুময় মাটিতে ভালোভাবে জন্মে থাকে। তাই মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় মরুঅঞ্চলে এসব গাছপালা দেখা যয়। নদীর তীরে বালুকাবেলায়ও এসব লতাগাছ গোচরীভূত হয়। এটা মনে রাখার পক্ষে বেশ মজার ব্যাপার যে, আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ পাক একটি লাউ জাতীয় গাছকে বেড়ে উঠতে আদেশ করেছিলেন। অসহায়ভাবে পড়ে থাকা অসুস্থ ইউনুস নবীকে এ লতাবৃক্ষ ছায়াদান করে সতেজ করে তুলেছিল। আরবি "আনবাত্না আলাইহি" শব্দগুচ্ছ যে অর্থ প্রকাশ করে প্রকৃতপক্ষে এখানে তাই তুলে ধরা হয়েছে।

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ আল্লাহ্ পাকের অপার রহমত

সূরা যুমার-৩৯ : ২১

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ.

See you not that Allah sends down water (rain) from the sky and causes it to penetrate the earth as water springs and afterward thereby produces crops of defferent colours and afterward they wither and you see them turn yellow; then He makes them Dry and broken pieces. Verily in this is a Reminder for men of understanding.

তোমরা কি দেখতে পাও না যে, আকাশ থেকে আল্লাহ্ পাক বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন এবং তিনি মাটির নিচে প্রস্রবণের মাধ্যমে বৃষ্টির পানিকে প্রবাহিত করেন এবং তা দ্বারা উৎপাদন করেন বিভিন্ন বর্ণের ফসল। তারপর যখন ফসল শুকিয়ে যায় তখন তা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এরপর তিনি একে শুষ্ক করে গুড়া করে ফেলেন। নিশ্চয়ই এ ঘটনার মধ্যে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ রয়েছে। (সূরা যুমার : ২১)

আল্লাহ্ পাক তাঁর করুণার মাধ্যমে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এ বৃষ্টিপাতের ফলে গাছপালার জন্ম ও বৃদ্ধি ঘটে এবং বহু শস্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে মৌসমী বৃষ্টিপাতের উপর। যে বৃষ্টির পানি মাটির নিচে চলে যায় সেই পানিও কাজে লাগে। ফসলের ক্ষেতে অনেক সময় পানি সেচের প্রয়োজন হয়। আর্টেজীয় কূপ, গভীর নলকূপ এবং পার্বত ঝর্ণাধারা থেকে সেচকার্য পরিচালনা করা হয়। মাটির আর্দ্রতার উপস্থিতিতে শস্য বৃদ্ধি পেয়ে পরিপক্কতা লাভ করে এবং উৎপাদিত শস্য তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রঙ ধারণ করে। শস্য উৎপাদিত হওয়ার পর বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের আর প্রয়োজন হয়না। তার ফলে সমস্ত গাছপালা শুকিয়ে যায়। এ প্রক্রিয়া কার্যকর হয় ধীরে ধীরে এবং এটা তাদের জীবন্ত টিস্যু ও কোষের মৃত্যুর ফলশ্রুতি। যে

গাছপালা এক সময় হরিৎ বর্ণ লাভ করেছিল সেগুলো তাদের সবুজ রঙের ধ্বংসের কারণে হলুদ রঙ ধারণ করে। এ সবুজ রঙই হলো ক্লোরোফিল। কোষের মৃত্যু ঘটলে গাছপালার আকার, দৃঢ়তা এবং পত্রপল্লব নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় গাছ ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় এবং ক্ষয়ে ক্ষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে মাটির সাথে মিশে মাটির অংশে পরিণত হয়।

সুতরাং বৃক্ষ ও ফসলের জন্ম, বৃদ্ধি এবং শেষ পরিণতি মহান আল্লাহ্ পাকের করুণার মাহাত্ম্য ও তাঁর শক্তির বহুবিধ উদাহরণ। বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ এসব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যখন তারা এসবের অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় তখন বিস্ময়ে বিভোর হয়ে বলে উঠেন আল্লাহ পাক সুমহান এবং তারা তখন সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্ পাকের মহিমা ঘোষণা করে। আর গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর নিকট মস্তক অবনত করে।

অধিক ভয়ের অনুভূতি হৃৎ-স্পন্দন বৃদ্ধি করে

সূরা যুমার-৩৯ : ২৩

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ.

Allah has sent down the Best statement a Book (this Qur'an), its parts resembling each other and oft-vefeated. The skin of those who Fear their Lord shiver from it. Then their skin and thier heart soften to the remembrance of Allah. That is the guidance of Allah.

He Guides therewith whom He wills; and whomever Allah sends astray, for him there is no guide.

আল্লাহ্ পাক সর্বোত্তম বাণীর একটি কিতাব নাযিল করেছেন। এর অংশগুলো পারস্পরিক সঙ্গতিপূর্ণ এবং পুনঃপুন পঠিত। যেসব ব্যক্তি তাদের প্রভুকে ভয় পায় তাদের চামড়ায় শিহরণ উঠে। তারপর তাদের ত্বক ও হার্ট কোমল হয় আল্লাহ পাকের স্মরণে। এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই। (সূরা যুমার : ২৩)

এ আয়াতে ভীষণ ভয়ের কারণে দেহের যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত বিপদকালে মানুষ ভীতি প্রকাশ করে থাকে। কোনো ব্যক্তির সমন্বিত দৈহিক অবস্থার উপর কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে তখন ভয়-ভীতি খুব ঘন ঘন আতঙ্কিত করে। ভয়ের অনুভূতি তখনই সৃষ্টি হয় যখন আসন্ন দৈহিক বিপদ সঠিকভাবে ধরা পড়ে। এছাড়া ভয়ের অনুভূতি সৃষ্টি হয় তখনই যখন ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কোনো ভয়ঙ্কর ফলশ্রুতির কথা শোনা যায়।

যা হোক, ভয়ের কারণে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লে বৃক্কগ্রন্থি (Adrenal glands) থেকে অধিক মাত্রায় রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। যখন এ অধিক রাসায়নিক পদার্থ রক্তে প্রবেশ করে তখন রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। একইসঙ্গে বৃদ্ধি পায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের অনুপাত। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অনুপাত এবং চামড়াস্থ ধমনীর সংকোচন

অনুপাত। এ ধরনের পরিবর্তনসমূহ ফুসফুসে, পেশীতে এবং মস্তিষ্কে অধিক রক্ত সরবরাহের সহায়তা করে।

ভয়ের অনুভূতি ত্বকস্থ পেশীর স্পর্শকাতর স্নায়ুগুলোকেও উত্তেজিত করে তোলে। তাদের সংকোচন শরীররর লোমকে খাড়া করে দেয় এবং চামড়ার সংকোচনের ফলে চামড়া কুঞ্চিৎ রূপ ধারণ করে। দুইটি অংশ নিয়ে গায়ের চামড়া গঠিত। একটি বহিঃত্বক (Epidermis) অপরটি অন্তঃত্বক (Dermis)। বহিঃত্বক খুবই পাতলা হয়ে থাকে। অন্তঃত্বক এর মধ্যে লোমের মূল, ব্লাড-ভেসেল, স্নায়ু, পেশী, ঘাম ও তরল চর্বিজাতীয় বস্তুর নিঃসরণ গ্রন্থি অবস্থিত। এটা সাধারণ ঘটনা যে, ভয় পেলে চামড়া সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া শক্তি উৎপাদন হওয়ার প্রয়োজনে পেশীতে শর্করা এগিয়ে যায়। ক্ষতস্থান যাতে মারাত্মক আকার ধারণ করতে না পারে এবং চোখের মণিদ্বয় যাতে বিস্ফারিত হতে পারে সেজন্য রক্তের জমাট বাঁধা গুণ বৃদ্ধি পায়।

এ সকল পরিবর্তন ব্যক্তির আত্মরক্ষার পদক্ষেপকে সহায়তা দান করে এবং এগুলো অনুভূতি ও চেতনার ক্ষেত্রে সংযুক্ত হয়ে যায়। অনুভূতি ও চেতনার ফলকেই ভয় (Fear) বলা হয়।

যারা ধর্মপ্রাণ এবং ঈমানদার এবং আল্লাহ পাককে ভয় পায় তারা ভয়ের অনুভূতি লাভ করে তখন যখন পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহে পাপিষ্ঠ লোকদের ভয়াবহ শাস্তির কথা শোনে। শাস্তির বাণী শোনা মাত্র দ্রুতবেগে তাদের চামড়া সংকুচিত হয়ে যায় এবং হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায়। কিন্তু যারা পার্থিব জীবনে তেমন কোনো পাপের কাজ করেনি তারা এ ভেবে আশ্বস্ত হয় যে, আল্লাহপাক অবশ্যই পরকালে তাদের জন্য পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।

আল্লাহ পাকের ওয়াদা কখনো ব্যর্থ হবার নয়। এরূপ ওয়াদা সমৃদ্ধ আয়াতগুলো তাদের ভয়ের অনুভূতিকে প্রশমিত করে। ত্বককে পুনরায় কোমল ও সম্প্রসারিত করে এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকে স্বাভাবিকভাবে চলতে সাহায্য করে। যখন ভয়ের অনুভূতি দূরীভূত হয় তখন কর্মতৎপর পেশীগুলো শিথিল হয়ে পড়ে।

হৃৎপিণ্ড ও মনের প্রশমনের বিষয়টি একটি মনোস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। এ ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতায় আসে না। তবুও এটা আমাদের জানা আছে যে, যখন ভয়ের অনুভূতি দূরীভূত হয় তখন আমাদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে এবং হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে থাকে। এটা এখানে বলা যেতে পারে যে, হার্ট-বীট অস্বাভাবিক হয়ে উঠে ভয়ের কারণে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে হার্টের উপর ভয়ের কার্যকারিতা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভয়ের অনুভূতি দূর হয়ে গেলে হার্ট স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে থাকে।

মহাবিশ্ব একটি বিন্দুতে গুটিয়ে আসবে

সূরা যুমার-৩৯ : ৬৭

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

They made not a just estimate of Allah such as is due to Him. And on the Day of Resurrection the whole of the earth will be grasped by His Hand and the Heavens will be rolled up in His Right Hand. Glorified be He and High be He above all that they associate as partners with Him.

তারা আল্লাহ্ পাককে যথার্থ মর্যাদায় মূল্যায়ন করতে পারে না। কেয়ামত দিবসে সমগ্র পৃথিবী তাঁর হস্তগত হবে এবং নভোমণ্ডল গুটানো অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে। তিনি মহাপবিত্র আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে তাঁর সাথে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (সূরা যুমার : ৬৭)

আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন যে, কেয়ামতের দিন সমগ্র মহাবিশ্ব গুটিয়ে যাবে এবং আমাদের এ পৃথিবী একটি অতি ক্ষুদ্র সত্তায় মিশে যাবে। এটা সবাই জানে যে দুইটি বিপরীত শক্তি মহাবিশ্বে কাজ করে চলেছে। এর একটি হলো সম্প্রসারণ গতি যা মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) পরপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অন্যটি হলো মহাকর্ষ শক্তি। সম্প্রসারণ গতির কারণে গ্যালাক্সিসমূহ একে অপরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সম্প্রসারণ শক্তি এখনো প্রভূত্ব বজায় রেখে চলেছে। তাহলে কি মহাবিশ্ব চিরকাল দরে সম্প্রসারিত হবে– এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

মহাকর্ষ বল মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতিকে রোধ করে থাকে। গ্যালাক্সিপুঞ্জের পারস্পরিক আকর্ষণ তাদের মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনে। মহাজগতের সম্প্রসারণ গতি এবং সুদূরপ্রসারী মহাকর্ষ শক্তির মধ্যে এটা একটি চলমান সংঘাত। যদি সম্প্রসারণ গতি বিজয়ী হয় তাহলে মহাবিশ্ব অনাদিকাল ধরে সম্প্রসারিত হতে থাকবে। অপরপক্ষে যদি মহাকর্ষ শক্তি বিজয়ী হয় তাহলে আকর্ষণ শক্তি গ্যালাক্সিপুঞ্জের গতিবেগকে মন্থর করবে এবং পরিশেষে এটাকে

একেবারে স্থির অবস্থায় পর্যবশিত করবে। অর্থাৎ মহাকর্ষ শক্তি সবকিছুকে পুনরায় একত্রিত করবে। এ সময় মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে একটি অতি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করবে। বিজ্ঞানীরা এখনো দ্বিধাবিভক্ত যে, দুইটি শক্তির মধ্যে কোন্‌টি চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজয়ী হবে। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের আয়াতে একথা বলেছেন যে, মহাবিশ্ব অবশেষে গুটিয়ে যাবে। অর্থাৎ একটি অতি ক্ষুদ্র সত্তায় রূপান্তরিত হবে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে মহাকর্ষ শক্তি জয়ী হবে। অতএব এটাকে আমরা সঠিকভাবে ধরে নিতে পারি যে, শেষ পর্যন্ত মহাকর্ষ শক্তি প্রাধান্য লাভ করবে এবং সমগ্র সৃষ্টিজগৎ একটি বড় ধরনের আন্তঃসংকোচনের মধ্যে নিবদ্ধ হবে। একে বলা হয় বিগ্ ক্রাঞ্চ (Big crunch)। এরূপ ধারণার মধ্যে আমরা একটি সময়ের হিসাব করতে পারি। যে সময়ের মধ্যে বিশ্বজগৎ বিগ্ ক্রাঞ্চের পর্যায়ে এসে উপস্থিত হবে। আমেরিকান বিজ্ঞানী Freman Dyson বলেন, Big Crunch-এর ১০০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে সুপার গ্যালাক্সিসমূহ এবং কোয়াসারগুলো একসঙ্গে ধাবিত হয়ে তাদের মধ্যকার খালি স্পেস ভরিয়ে তুলবে। বিগ্ ক্রাঞ্চের ১০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে এক একটি গ্যালাক্সির মধ্যকার স্পেস ভরে উঠবে এবং সমস্ত গ্যালাক্সি একসঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে সমগ্র বিশ্বজগৎ নক্ষত্র দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। এসব নক্ষত্র যেভাবে গ্যালাক্সির মধ্যে অবস্থান করে স্পেসের মধ্যেও মোটামুটি সেভাবে অবস্থান করবে। স্পেস সংকুচিত হতেই থাকবে। গ্যালাক্সিগুলো একীভূত হবে এবং মহাকর্ষ বল তারকাগুলোকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। বিগ ক্রাঞ্চের ১০০০০০ বছর পূর্বে কোনো একসময়ে তারকাগুলো এতো কাছাকাছি এসে পড়বে যে, ঐ সময় সমগ্র আকাশ চোখ ধাঁধানো আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যাবে এবং সেই সঙ্গে ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এ সময় কোনো গ্রহের মধ্যেই প্রাণের চিহ্ন থাকবে না। মহাবিশ্ব ধ্বংস হওয়ার ১০০০ বছর পূর্বে শত সহস্র তারকা একে অপরের গায়ে ধাক্কাধাক্কি শুরু করবে। এর ফলে তারকারা বিশৃঙ্খলভাবে কৃষ্ণ গহ্বরে (Black whole) পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে সমগ্র মহাবিশ্বের সকল বস্তু সংকুচিত হয়ে সীমাহীন একক ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ডে নিবদ্ধ হয়ে পড়বে।

এভাবে কেয়ামতের দিন মহাবিশ্ব গুটিয়ে অতি ক্ষুদ্র অবয়বে পরিণত হবে।

আল্লাহ্ পাকের নিদর্শনসমূহ মহাবিশ্বের দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত

সূরা হা-মীম সাজদাহ (ফুসসিলাত)-৪১ : ৫৩

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ.

We will show them Our signs in the univers and in their ownselves, until it becomes manifest to them that this is the touth. Is it not sufficient in regard to your Lord that He is a witness over all things?

আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করবো মহাবিশ্বের দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে যতক্ষণ না প্রকাশিত হবে এটি (কোরআন) অতি সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে আপনার প্রভু সকল জিনিসের সাক্ষী? (সূরা হা-মীম সাজদা : ৫৩)

জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসাতি হওয়ার সাথে সাথে কিভাবে দিগন্ত সম্প্রসারিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে এবং দিগন্তের নিদর্শন সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা যেতে পারে। সভ্যতার প্রথম থেকে আল্লাহ পাকের নিদর্শনগুলোকে পর্যায়ক্রমে মানব জাতির সামনে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং অনাগতকালেও একইভাবে প্রদর্শন করা হবে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এটা জানা ছিলো যে, আকাশে নক্ষত্ররাজি ও সাতটি গ্রহ আছে। সেই সময়ে সূর্য এবং চন্দ্রকেও দুইটি গ্রহ মনে করা হতো। পৃথিবীকে গ্রহ বলে মনে করা হতো না। তবে এটা মনে করা হতো যে পৃথিবী কেন্দ্রস্থলে স্থির অবস্থায় বিরাজমান। তারপর এটা জানা গেলো যে সূর্য ও চন্দ্র দুইটি গ্রহ এবং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে। এরপর এটাও জানা গেলো যে, মহাশূন্যে বিভিন্ন ধরনের আকাশি বস্তু রয়েছে। যেমন, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নেবুলা, গ্যালাক্সি, কোয়াসার ইত্যাদি। সুতরাং বর্তমানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নয়নের ফলে মহাকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া গেছে। গ্রহ নক্ষত্রগুলো তাদের নিজস্ব কক্ষ পথে আবর্তিত হচ্ছে এবং গ্যালাক্সিসমূহ মহাবিশ্বের সম্পস্রারণ গতির কারণে একে অপরের নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। গ্রহ নক্ষত্র ছাড়াও আল্লাহ্ পাক আকাশের বুকে ঐসব জ্যোতিষ্কসমূহকে উন্মুক্ত করে রেখেছেন যাদের বৈশিষ্ট্যাবলী ব্যাপক রহস্যের সৃষ্টি করে চলেছে। যেমন, কোয়াসার, পালসার, নেবুলা ও বিভিন্ন ধরনের ক্লাস্টার গ্যালাক্সি।

সৌরজগতের গ্রহগুলো ছাড়া তারকাদের যেসব গ্রহ আছে এবং যে গ্রহগুলো তাদের চারিদিকে ঘুরে সে সম্পর্কে বেশ মজবুত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। নেবুলা বলতে আমরা গ্যাস ও ধূলিকণার মেঘপুঞ্জকে বুঝি। এই মেঘপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে আন্তঃনাক্ষত্রীয় শূন্যস্থানে। নক্ষত্রের আন্তঃবিস্ফোরণের কারণে নক্ষত্রের টুকরোগুলো বহির্দেশে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং এর দ্বারা নোভা এবং সুপারনোভার বিস্ফোরণ ঘটে। এসব বস্তু আন্তঃনাক্ষত্রীয় গ্যাস ও ধূলিকণা গঠন করে। এর ফলে নেবুলার দেহসত্তা গড়ে ওঠে। নক্ষত্র এবং নক্ষত্রীয় জগতের জন্মস্থান হলো নেবুলা। গ্যালাক্সি হলো মহাকর্ষ শক্তি দ্বারা বাঁধা তারকাদের বাসস্থান। বিপুল গতিতে গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের কাছ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। মহাশূন্যে কোয়াসার হলো সবচেয়ে আশ্চর্যজনক এবং শক্তিশালী আকাশি বস্তু। ১০০ বিলিয়ন তারকা নিয়ে গঠিত মিলকী ওয়ে (Milky way) এর মতো একটি গ্যালাক্সির চেয়ে একটি কোয়াসার ১০০ বা ১০০০ গুণ বেশি শক্তি উদ্গীরণ করে থাকে। ২০ বিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরত্বে কোয়াসারসমূহের অবস্থান। আধুনিক তত্ত্বে বলা হয়েছে কোয়াসার হলো অদৃশ্য গ্যালাক্সি এবং এর মাঝখানে রয়েছে বিশাল ব্ল্যাক হোল।

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিশ্বজগতের শেষসীমা থেকে পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত জগতসমূহ জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান দিগন্তের কথাই ঘোষণা করে। সবসময় জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। এর মধ্যে আমরা আল্লাহ পাকের নতুর ইঙ্গিত দেখতে পাই। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গবেষণা করলে আল্লাহ পাকের বহু নিদর্শন উন্মুক্ত হয়ে যায়। এসব নিদর্শন প্রত্যেকটি বস্তু গঠনে আল্লাহ পাকের অসীম জ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরে। ক্ষুদ্র জগতের মধ্যেও আমরা গঠন বস্তুর কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করে থাকি। আগুন, পানি, বাতাস ও মাটিকে উপাদান বলে গণ্য করা হয়। এ উপাদানগুলো থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষ বস্তুর গঠন উপাদান মলিকূল, এ্যাটম, প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন পর্যায়ের মধ্যদিয়ে এগিয়ে গিয়ে কোয়ার্ক (Quark) এ গিয়ে পৌছায়। কোয়ার্ক হলো বস্তুর গঠন উপাদানের সর্বশেষ পিণ্ড। এটা একটা বড় প্রশ্ন যে কোয়ার্ক কিসের দ্বারা তৈরি। ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান হয়তো একসময় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে। সুতরাং বস্তুর সর্বশেষ গঠন উপাদান খুঁজতে গিয়ে অতি ক্ষুদ্র আকারের বস্তুর গঠন সত্তায় কিছু সংখ্যক দিগন্তের আবিষ্কার হয়েছে। এ পন্থায় মানুষ আল্লাহ পাকের কিছু তাৎপর্যমণ্ডিত নিদর্শনের খোঁজ পেয়েছে। এগুলো হচ্ছে এ্যাটম তৈরির কাজে সক্রিয় ইলেকট্রোমেগনেটিক শক্তি, মহাকর্ষ শক্তি, দুর্বল নিউক্লিয়ার শক্তি এবং সবল নিউক্লিয়ার শক্তি। এ শক্তিগুলো নিউক্লিয়নগুলোকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে একসঙ্গে ধরে রাখে। এসব শক্তি কিভাবে উদ্ভব হচ্ছে তা আজও রহস্যাবৃত্ত।

পদার্থ বিজ্ঞানীরা এসব শক্তি কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিলেও ঐ শক্তি কেন এভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। অথচ এ ঘটনা জেনে সবাই অবাক হবেন যে, জীব ও জড় বস্তু বর্তমানে যেভাবে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে সেভাবে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারতো না এসব শক্তি ছাড়া। এটা খুব দর্শনীয় ব্যাপার যে বিজ্ঞানী ড. সালাম, ওয়েনবার্গ, গ্ল্যাসো এবং সাম্প্রতিক কালের অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ এখন পর্যন্ত জানা প্রকৃতির চার শক্তির একত্রায়নে গবেষণা করেছেন। তারা বলেছে এ চার শক্তি সৃষ্টির মূলে আলো নিক্ষেপ করে চলেছে এবং এগুলো আশ্চর্যজনকভাবে খুব বড় ও খুব ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে। বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র এর এই বিস্ময়কর সিনথেসিস মহান প্রভুর আশ্চর্যজনক শিল্পশৈলীর অভিব্যক্তি প্রদর্শন করে। মহান আল্লাহ পাক তাঁর গ্রান্ড ডিজাইনের নিরিখে একটানা মেথমেটিক্যাস নিয়মের মাধ্যমে সৃষ্টির সূত্রপাত করেছেন এবং এ সৃষ্টিকে নিখুঁতভাবে পালন করে যাচ্ছেন।

আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে অর্থাৎ মানব দেহে যেসব নিদর্শন ব্যক্ত করে রেখেছেন সে সম্পর্কে বলতে গেলে এ কথাই বলতে হয় যে, আমাদের দেহের মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলো খুবই সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। গত একশো বছর ধরে মানব দেহ নিয়ে বিজ্ঞানীরা যে গবেষণা করেছেন সে গবেষণা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, মানব দেহ একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ। মানব দেহে যে কোষ (Cell) দ্বারা গঠিত সেগুলোকে অচিন্তনীয় অতিশয় সফিসটিকেটেড কারখানা বলা যেতে পারে। আমাদের দেহের জন্য যেসব জিনিস খুবই প্রয়োজন কোষ সেসব প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে। কোষের অভ্যন্তরে সুতার মতো ক্রোমোজোম থাকে। এ ক্রোমোজোম বংশগতির উপাদান বহনকারী কোষের অন্যতম অঙ্গাণু। যে DNA-কে জীবনের মাস্টার মলিকূর বলা হয় তা বংশগত বৈশিষ্ট্যের নীল নকশা তৈরি করে। আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলো (রঙ, উচ্চতা, বুদ্ধিমত্তা) এবং আমাদের জৈব কর্মের সকল তথ্য-সংকেত কোড (Code) এর আকারে থাকে। এসব কোড হলো এ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং থাইমিনের মতো কিছু রাসায়নিক কমপাউণ্ডের সঠিক বিন্যাস।

সুতরাং কিভাবে আমাদের দেহের সিসটেম কাজ করে চলেছে সে সম্পর্কে আমাদের ধারাক্রমিক উপলব্ধির অগ্রগামী উন্নয়ন নবতর দিগন্তের বিকাশ প্রদর্শন করেছে এবং আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে উন্মুক্ত করেছে। এর ফলে উন্মুক্ত হয়েছে একটি অকল্পনীয় গঠন সত্তা এবং পরিকল্পনা। এ উপলব্ধি যে কোনো ব্যক্তিকে ভয়ে ও বিস্ময়ে মহান স্রষ্টার দিকে ফিরে আসতে বাধ্য করবে।

আল্লাহ্ পাক প্রত্যেকের জোড়া সৃষ্টি করেছেন

সূরা আশ শূরা-৪২ : ১১

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

The creator of the Heavens and the earth. He has made for you mates from yourselves and for the cattle (also) mates. By this means He creates you. There is nothing like Him and He is the All-hearer, the All-seer.

তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গবাদি পশুদের মধ্য থেকেও তাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সবকিছু শুনেন এবং দেখেন। (সূরা আশ-শূরা : ১১)

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ পাক। তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল তথা বিশাল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে তাঁর বিশালত্বের প্রমাণ চিহ্ন বিদ্যমান। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সূরা বাকারার ১১৭ নং আয়াতে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক গবাদি পশু ও মানব জাতির জোড়া সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে জীব জন্তু ও মানব জাতির জোড়া সৃষ্টি এবং জৈব পদ্ধতিতে তাদের বংশ বৃদ্ধির বিষয়টি আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বোঝার ক্ষেত্রে মানুষকে চিন্তাশীল করে তোলে। জীবের দুইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা আছে। এ দুইটি হলো পুষ্টি ও প্রজনন। পরিবেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক পুষ্টির যোগান দেন। বংশ বৃদ্ধি সম্ভব হয় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দুইটির পৃথক সত্তার কারণে। গবাদি পশু ও মানব জাতির মধ্যে এ বিপরীতধর্মী লিঙ্গের প্রভাব এতো প্রকট যে, সেই কারণে লিঙ্গ সম্পর্কে দুইটি উদাহরণ এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে পুরুষ ও স্ত্রী এ দুই লিঙ্গের উৎপত্তি প্রাণী

ও উদ্ভিদ জগতের মধ্যে একটি চিরন্তন দৃশ্য। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও কিছু ব্যতিক্রম আছে। এ ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি বা প্রজনন ঘটে অলিঙ্গীয় পন্থায়। অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া এ্যালজে (Algae) এবং লিভারঅর্টস (Liverworts) এর মতো নিম্নমানের উদ্ভিদের প্রজনন হয় অযৌন পন্থায়। প্রাণী জগতে এ্যামিবা ও হাইড্রার প্রজননও হয়ে থাকে অযৌন প্রক্রিয়ায়।

দুইটি পৃথক লিঙ্গের উপস্থিতি একা একা বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না। পিতা-মাতার Sperm এবং Ovum একত্রিত হয়ে জাইগোট সৃষ্টি করে। এ জাইগোট অবশেষে একটি মানব শিশুতে পরিণত হয়। দুইটি কারণে বংশ বৃদ্ধির এ প্রক্রিয়া অতিশয় জরুরী। (১) এ প্রক্রিয়ার স্বকীয় ধরনকে চিরকাল চালু রাখা যা এ আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেক করা হয়েছে। (২) পিতা-মাতার জিন বিন্যাসের মাধ্যমে সন্তানের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করা। এভাবে পরিবর্তন আনয়ন করা একটা কৌশল। যে কৌশলের সাহায্যে সন্তান ভিন্নধর্মী পরিবেশের সঙ্গে জন্ম সূত্রে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়।

অতএব, গবাদি পশু ও মানব জাতির জোড়া সৃষ্টির মধ্যে একটি সুগভীর তাৎপর্য নিহিত। এ তাৎপর্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের শক্তিশালী গুণের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

পিতা মাতা সন্তানের বেহেশত-দোযখ

সূরা আহকাফ-৪৬ : ১৫

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ
كُرْهًا وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ
اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ
عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ
ذُرِّيَّتِىْ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمُوْنَ.

We have commended to men to be dutiful and kind to his parents. His mother bears him with hardship and she bring him forth with hardship and the bearing of him and the weaning of him is thirty months till when he attains full strength and reaches forty years, He says : 'My Lord! Grant me the power and ability that I may be grateful for your favour which you have bestowed upon me and upon my parents and that I may do righteous good deeds, such as please you and make my offspring good. Truly, I have turned to you in repentance and truly, I am one of the muslims.'

আমরা মানুষকে আদেশ দিয়েছি পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন ও দয়া প্রদর্শনের। তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে বহন করেছে এবং কষ্টের সাথে প্রসব করেছে। মা তাকে লালন পালন ও স্তন দান করেছে ত্রিশ মাস ব্যাপি। যখন সে শক্তি-সামর্থ্যে উপনীত হয়েছে এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছেছে তখন সে বলেছে, "হে প্রভু! আমার শক্তি-সামর্থ্য কবুল করুন যাতে আপনার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা আপনি দান করেছেন আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে। আর যেনো আমি সৎ কাজ করতে পারি যে কাজে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মশীল করে আমাকে সুখি করুন। সত্যিকার অর্থেই

অনুতপ্ত হয়ে আমি আপনার নিকট ফিরে এসেছি এবং সত্যিই আমি মুসলমানদের একজন।” (সূরা আহকাফ : ১৫)

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন ও দয়া প্রদর্শনের জন্য কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। নবীজি (সা) এক হাদীসে বলেছেন পিতা-মাতা হলো সন্তানের জন্য বেহেশত-দোযখ। একথার তাৎপর্য এ যে পিতা-মাতা যদি সন্তানের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে ঐ সন্তানের জন্য বেহেশত অবধারিত। আর সন্তানের খারাপ আচরণের দরুন পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট হলে সে সন্তানের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত। এটা খুবই সত্য যে সন্তান প্রতিপালন করতে গিয়ে পিতা-মাতার কষ্টের শেষ থাকে না এবং তাঁরা সন্তানের কল্যাণে সবসময় নিজেদের উৎসর্গ করে দেন। ভালো কাপড়টা বেছে বেছে সন্তানকে কিনে দেন। ভালো খাবারটা তাদের খেতে দেন। ভালো এবং আরামদায়ক বিছানায় তাদের শুতে দেন। এরূপ কষ্টের ফসল সন্তান-সন্ততি বড় হয়ে যদি পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদেরকে কষ্ট দেয় তাহলে এর চেয়ে চরম অকৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে। পিতা-মাতার মনকষ্টের ফলে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে। আল্লাহ পাক অকৃতজ্ঞ ছেলে-মেয়েদের প্রতি অভিশম্পাত বর্ষণ করে থাকেন। তাই তাদের পার্থিব জীবন ও পরকালীন জীবন চরম অসুখের হবেই। উপরন্তু যারা পিতা-মাতাকে অসম্মান করে, অপমান করে এবং বৃদ্ধাবস্থায় তাদের সেবাযত্ন করে না প্রকারান্তরে তারাও যখন সন্তান-সন্ততির পিতা-মাতা হবে তখন তাদের সন্তান-সন্ততিও তাদের প্রতি অনুরূপ আচরণ করবে। প্রকৃতপক্ষে এটা বাস্তব সত্য।

এ আয়াতে মায়ের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়ার একটা কারণ দেখানো হয়েছে। মা অনেক অসুবিধা ও অনেক কষ্টের সঙ্গে সন্তানকে গর্ভে বহন করেন এবং অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে সন্তান প্রসব করেন। এরূপ যন্ত্রণাদায়ক প্রসব বেদনা উত্থিত হলে মায়ের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চাপের ফলে গর্ভ থেকে সন্তান বেরিয়ে আসে।

সন্তান বহন এবং দুধ পান করানোর মোট সময়কাল আড়াই বছর বা ত্রিশ মাস। সূরা বাকারায় আল্লাহ পাক বলেছেন, “মা তার সন্তানকে পূর্ণ দুই বছর পর্যন্ত স্তন দুগ্ধ পান করাবে।” সুতরাং দুই বছর থেকে যদি সময় কমানো হয় তাহলে বাকি ছয় মাস বা চব্বিশ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভধারণ সম্ভবপর হয়ে থাকে। The Developing Human (K. L. Moore and A. M. Azzindani) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্ভরযোগ্য ভ্রূণের বয়স কমপক্ষে ২২ সপ্তাহ এবং তার ওজন কমপক্ষে ৫০০ গ্রাম। কিন্তু এ ধরনের অপরিপক্ক ভ্রূণ বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর।

কাজেই ২৪ সপ্তাহ ২২ সপ্তাহ সময় অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশি হলেও ঐ সময়টুকু ভ্রূণ বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক।

স্বাভাবিক গর্ভধারণের সময়কাল হলো ৩৮ সপ্তাহ বা ২৬৬ দিন। অতএব একটি নির্ভরযোগ্য ভ্রূণের গর্ভে থাকার ব্যাপ্তি হলো ২২ থেকে ৩৮ সপ্তাহ।

এ আয়াতের মর্মমূলে অন্য আর একটি দিক নিহিত আছে। আরবি 'হামল' শব্দের অর্থ হলো ভারটানা বা ভার বহন করা এবং আরবী "কুরহা" এর অর্থ কষ্টকর বা যন্ত্রণাদায়ক। গর্ভবতী মা প্রথম ১২ সপ্তাহ বা ৩ মাস পর্যন্ত কোনো ভার বা ওজন অনুভব করে না এবং এ সময়ের গর্ভধারণ কাল মাকে কোনো কষ্ট বা যন্ত্রণা দেয় না। কারণ এ সময়ে ভ্রূণের আকার ও ওজন থাকে যথাক্রমে ৮৭ মিলিমিটার ও ৪৫ গ্রাম। সুতরাং যদি মোট গর্ভকাল থেকে ৩ মাস বাদ দেয়া হয় তাহলে ভ্রূণের ভার বহন করার অবস্থা থেকে ৩ মাস কমে যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, গর্ভাবস্থায় মোট সময় ৯ মাস (৬+৩)। এ সময়কে গর্ভাবস্থা বলা হয়। অতএব ৬ মাসের গর্ভাবস্থা বলতে গর্ভধারণের শেষ ৬ মাসকে বুঝায়।

ইসলামের ব্যাপক বিস্তার বীজ থেকে চারা গাছের মতো

সূরা আল ফাতহ-৪৮ : ২৯

...كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ.

... like a seed which stands forth its shoot then makes it stong, it then becomes thick and stands on its own stem filling the sowers with wonder and delight...

... যেমন বীজ থেকে চারা গজিয়ে উঠে। এরপর ঐ চারা শক্ত হয়ে মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থা দেখে গাছ রোপনকারীরা অন্তর বিস্ময় ও খুশিতে ভরে ওঠে...। (সূরা আল-ফাতহ : ২৯)

আল্লাহ পাক মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রশংসা করার প্রসঙ্গে চারা গাছের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বৃক্ষরাজির জীবনে যে বহুবিধ জৈবিক ঘটনাবলী দেখা যায় সেসব ঘটনাবলীর একটি হলো বীজ থেকে ছোট্ট অঙ্কুর বা ভ্রূণ-চারার উদ্ভব এবং শিশু চারাগাছের বড় গাছে রূপান্তর এবং কাণ্ডের উপর ভর দিয়ে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকা আমাদের কাছে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কৃষকেরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। পরিপক্ক বীজ থেকে অনুকূল পরিবেশের উপস্থিতিতে অঙ্কুরোধগম ঘটে। এ সময় তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে থাকে এবং যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা ও অক্সিজেন বিদ্যমান থাকে। একটি বীজের মধ্যে অঙ্কুর বিশ্রামরত অবস্থায় থাকে। পরে সক্রিয় হয়ে ওঠে। মাটির মধ্যে শিকড় ছড়িয়ে যায় এবং চারা উপরের দিকে উদ্গত হয়। এই চারা ধীরে ধীরে খাড়া হয়ে উপরে উঠে এবং কচি গাছে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে চারাগাছ তার জীবন রক্ষার প্রয়োজনে বীজের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত খাদ্য থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। প্রথম সবুজ পাতা ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হয় এবং চারাগাছ আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এখন তারা ফপেটাসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরী করতে সক্ষম। নব অংকুরিত চারাগাছ প্রথমে খুবই নরম থাকে এবং একে বলা হয় প্রাথমিক অঙ্কুরোধগম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে প্রাথমিক অঙ্কুরিত চারায় শাখা-প্রশাখা গজায় এবং পাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে অধিক ভার বহন করার জন্য

তাকে অধিক শক্ত মজবুত হতে হয়। শুধু তাই নয়। একে শক্ত হতে হয় এই কারণে যে, একে অন্যান্য কাজও করতে হয়। যেমন, মূল থেকে পাতায় পানি সঞ্চালন করা এবং গাছের এক অংশ থেকে অন্য অংশে খাদ্য বস্তু প্রেরণ করা। কাণ্ডের দৃঢ়তা যে প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পায় তাকে বলা হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃদ্ধি। এ দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃদ্ধির ফলে ধমনী শিরা উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত ধমনী শিরাগুলোর অধিকাংশ পুরু দেয়ালসম্পন্ন কোষের দ্বারা গঠিত। গাছের সারাজীবন ধরে এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কারণ এ প্রক্রিয়া গাছকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কৌশলগত শক্তি ও দৃঢ়তা দান করে।

একটি অতি ক্ষুদ্র বীজ থেকে পর্যায়ক্রমে সবল কাণ্ডসহ যে বিশাল বৃক্ষ বড় হয়ে উঠে সে বৃক্ষের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের তুলনা করা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত দুর্বল ছিলো। পরে ক্রমান্বয়ে তা শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত হয়ে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মহান জীবন ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

বিশাল মহাকাশ শামিয়ানাস্বরূপ

সূরা আত তূর-৫২ : ৫

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ.

By the canopy raised high.

শপথ সুউচ্চ শামিয়ানার। (সূরা আত-তূর : ৫)

এ ব্যাপারটি সকলে জ্ঞাত যে, দুইটি বিপরীত শক্তি মহাবিশ্বে কাজ করে চলেছে। একটি হলো বিগ ব্যাঙ-এর কারণে সম্প্রসারণ শক্তি এবং অপরটি মহাকর্ষ শক্তি। সম্প্রসারণ শক্তি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। কিন্তু মহাকর্ষ শক্তি সকল বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। মহাবিশ্বের যে কোনো দুইটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ প্রক্রিয়া সম্প্রসারিত বিশ্বজগতেও কার্যকর। ঐ দুটি বস্তু যত বেশি একে অপরের কাছাকাছি থাকে তারা ততো বেশি একে অপরকে আকর্ষণ করে। এটা প্রতীয়মান হয় যে, তারা একসঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে লেগে থাকতে চায়। এটা এ কারণে যে, প্রত্যেক বস্তু সম্প্রসারিত মহাবিশ্বর প্রভাব থেকে দূরে থাকতে চায়।

সম্প্রসারিত মহাবিশ্ব সৌরজগতের সদস্যগুলোকে একে অপর থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় না। কিংবা গ্যালাক্সিতে অবস্থিত নক্ষত্রগুলোকেও একে অপর থেকে পৃথক করতে চায় না। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রত্যেক গ্রুপের উপর সম্প্রসারণ গতি ক্রিয়া করে থাকে। আবার মহাকর্ষ শক্তিও তাদের উপর ক্রিয়াশীল। মহাকর্ষ শক্তির কারণে আকর্ষণ শক্তি যদি সম্প্রসারণ গতির চেয়ে জোরালো হয় তাহলে ঐ কথিত গ্রুপ একত্রে সন্নিবেশিত হয়ে গুচ্ছ সৃষ্টি করে। এভাবে তারকাগুচ্ছ, গ্যালাক্সিগুচ্ছ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। অপরপক্ষে যে গ্রুপগুলোর উপর সম্প্রসারণ গতির প্রভাব মহাকর্ষ বলের চেয়ে বেশি সে গ্রুপগুলো পশ্চাদগামী হয়ে দূরে সরে যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এমন কিছু গ্যালাক্সি রয়েছে যেগুলো পশ্চাতে সরে যাচ্ছে। এভাবে আমরা সাত স্তরের আকাশে গ্রুপের সাক্ষাৎ পায় যেগুলো সন্নিবেশিত অবস্থায় পেছনে সরে যাচ্ছে। আকাশের এ সাতটি স্তর হলো– (১) অন্তর্বর্তী গ্রহসমূহ যার কক্ষপথ উপগ্রহ ও সূর্যের মধ্যবর্তী সীমায় অবস্থিত, (২) সৌরজগৎ, (৩) সূর্যের নিকটবর্তী তারকা গ্রুপ, (৪) গ্যালাক্সিসমূহ, (৫) গ্যালাক্সিগুচ্ছ, (৬) সুপার গ্যালাক্সি, (৭) মহাবিশ্বের দূরবর্তী এলাকা।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শামিয়ানাস্বরূপ আকাশ পৃথিবী থেকে উপরের দিকে উত্থিত হয়ে সুপার গ্যালাক্সি এবং মহাজগৎ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

জলরাশির বিশাল আঁধার মহাসাগর

সূরা আত তূর-৫২ : ৬

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ.

By the Ocean filled with Swell.

শপথ উত্তাল তরঙ্গমালায় পূর্ণ মহাসাগরের। (সূরা আত-তূর : ৬)

মহাসাগর বা সাগর হলো জলরাশির বিশাল আঁধার। এ বিশাল পানি রাশি দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগের ৭১% অংশ আবৃত থাকে। এ বিশাল জলরাশির ব্যাপ্তি-অবয়বগুলো স্রোতের সুষম নিয়ম দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এসব স্রোত তাদের স্থানীয় এলাকায় কমবেশি স্থায়ীভাবে বিরাজমান। সাগর বক্ষে বাতাসের সংঘাত এবং সাগর বা মাহসাগরের পানির ঘনত্ব এবং তরঙ্গমালার তির্যক ও খাড়াইয়ের (Horizontal and vertical) উপর স্রোতের গতিবেগ নির্ভর করে। উষ্ণতা ও আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বাষ্পীভবন ইত্যাদির ফলে সাগর পানি উপরিভাগের ঘনত্বের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেহেতু মহাসাগরীয় পরিভ্রমণ গভীরভাবে জলবায়ু ও তার ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত সেহেতু মহাসাগরে স্রোত ঐভাবে স্থির বা অবিচল থাকতে পারে না যেভাবে আশা করা হয়। অধিকন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে মহাসাগরের স্রোত পরিচালিত ও প্রভাবিত হয়। এছাড়া তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে সাগর পানির স্রোত দারুণভাবে প্রভাবিত হয়।

সাগরের গড় গভীরতা হিসাব করে নির্ণয় করা হয়েছে প্রায় ৩৭৯০ মিটার, মহাসাগরের সর্বোচ্চ গভীরতা হলো ১০৮৫০ মিটার। এ গভীরতা মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে যায়। মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা হলো ৮৮৪৮ মিটার।

স্রোত যখন বিপুল গতিবেগে বিভিন্ন মহাসাগরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয় তখন সাগরের ঢেউগুলো আন্দোলিত হতে থাকে। এ আন্দোলন সৃষ্টি হয় সাগরের বুকে বহমান বাতাসের গতিবেগ দ্বারা। সাগরের বুকে যে ঢেউ উত্থিত হয় সে ঢেউগুলো বহু ধরনের হয়ে থাকে। এদের মধ্যে একটি হলো গ্র্যাভিটি ওয়েভস। জোয়ারবিহীন অবস্থায় যে ঢেউ প্রবাহমান থাকে সে ঢেউগুলোর মধ্য থেকে তিন ধরনের ঢেউকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা, বাতাস-ঢেউ যা স্ফীত হয়ে উঠে। তরঙ্গরাশি এবং সাগর ঢেউ যার উৎস ভূকম্পনের মধ্যে।

বাতাসের বেগ বাড়লে তার দ্বারা বাতাস-ঢেউয়ের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং এ উচ্চতার অবস্থানকাল বৃদ্ধি পেলে তখন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ বাতাসের গতি যদি প্রতি সেকেণ্ডে ৫ মিটার, ১৫ মিটার ২৫ মিটার হয় তাহলে ঐ গতি উল্লেখযোগ্য উচ্চতায় ঢেউকে তুলে আনতে পারে।

যখন বাতাসের গতিবেগ কমে যায় এবং ঢেউগুলো ঢেউ তৈরির এলাকা থেকে দূরে সরে যায় তখন তারা ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়ে স্ফীতরূপ ধারণ করে। এ স্ফীতরূপ সারফেস ঢেউয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সারফেস ঢেউ বহুক্ষণ ধরে সুষম অবস্থায় অবস্থান করে এবং এ ঢেউয়ের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও দীর্ঘ আকারের হয়ে থাকে। স্ফীতকায় ঢেউ বা জলোচ্ছ্বাস হাজার হাজার মাইল দূরত্ব পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে পারে। এ জলোচ্ছ্বাস স্রোত অসংখ্য ঢেউকে ধারণ করে রাখে। এ ধরনের ঢেউকে বিধ্বংসী বলা যেতে পারে এবং এ ঢেউ সাগর উপকূল আঘাত হেনে ফেনার সৃষ্টি করে।

সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক যে ঢেউয়ের শপথ করেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য এবং এ ব্যাপারে তিনিই সর্বোচ্চ জ্ঞাত।

কথা বলার শক্তি মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমত

সূরা আর রহমান-৫৫ : ৪

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

He taught him eloquent speech.

তিনি মানুষকে কথা বলার কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আর-রহমান : ৪)

পৃথিবীর বুকে মানুষই একমাত্র প্রাণী যাকে পরম হিতৈষী আল্লাহ্ পাক কথা বলার মতো উন্নত কৌশল দান করেছেন। মানুষের কথা বলার শক্তি না থাকলে মানব সভ্যতা গড়ে উঠতে পারতো না। সাহিত্য, সঙ্গীত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং এসবের অগ্রগতি সম্ভব হতো না। এমনকি মানুষের সমাজ অস্তিত্ব লাভ করতে পারতো না।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণজাত শব্দের বিচিত্র বিন্যাসে মানুষের কণ্ঠস্বর সমৃদ্ধ। গান গাওয়ার সময়ও কণ্ঠস্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ কণ্ঠস্বর বাণীকে সুরের সঙ্গে সমন্বিত করে শব্দগুলোকে গেয়ে যায়। এ উন্নতমানের কণ্ঠস্বরের সাহায্যে মানুষ তার ভাষা গড়ে তুলেছে। মানুষ ভাষার সাহায্যে তার চিন্তা-চেতনা ও কর্মকে অত্যন্ত সঠিক ও যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারে।

কণ্ঠের ভোকাল কর্ড (Vocal cords) হলো প্রধান শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র। দুইটি ক্ষুদ্র টিস্যু-ব্যাণ্ড বাকযন্ত্র (Voice box) পর্যন্ত বিস্তৃত। যখন আমরা নিঃশ্বাস নিই তখন আমরা ভোকাল কর্ডকে বিশ্রাম দিই এবং ঐগুলো তখন V-আকার (v-shape) তৈরি করে। যখন আমরা কথা বলি তখন সংযুক্ত পেশীগুলো ভোকাল কর্ডকে টান দেয় এবং উন্মুক্ত শ্বাসনালীকে নিচু করে দেয়। অতঃপর ফুসফুস থেকে বাতাস বাকযন্ত্রে প্রবেশ করে এবং এ বাতাসে হালকা ভোকাল পর্দা কাঁপতে থাকে। বাকযন্ত্রের মধ্যদিয়ে যে বাতাস অতিক্রম করে সেই বাতাসে কম্পন সৃষ্টি করে তার দ্বারা ঐ বাকযন্ত্র নিপুণভাবে শব্দ উৎপন্ন করে। ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস বাকযন্ত্র অতিক্রম করার সময় ভোকাল পর্দা দ্রুতগতিতে কাঁপতে থাকে এবং বাতাসের প্রবাহ পথকে ক্রমান্বয়ে একবার বন্ধ করে এবং একবার উন্মুক্ত করে। সৃষ্ট শব্দের মাত্রা নির্ভর করে কণ্ঠনালীর দৈর্ঘ্য, পুরুত্ব এবং ভোকাল কর্ডের

পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। বিভিন্ন মাত্রার শব্দ তৈরি করে পেশী তার কাজের মাধ্যমে ভোকাল কর্ডের চারপাশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। একজন মানুষ ঠোঁট, জিহ্বা এবং মুখ গহ্বরের সাহায্যে স্বরের পরিবর্তন ঘটিয়ে শব্দ উৎপন্ন করে থাকে।

কথা বলার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ভূমিকা সর্বাধিক বলে বিবেচনা করা হয়। আমরা যে প্রয়োজনীয় কথা তৈরি করি তা সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে স্নায়ুতন্ত্রর মাধ্যমে মস্তিষ্কের একটি কেন্দ্রে সংকেত প্রেরিত হয়। ঐ কেন্দ্রের নাম Speech centre। অধিকন্তু কথা বলার সাথে জড়িত অঙ্গসমূহের নড়াচড়াও মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সুতরাং পরম হিতৈষী মহামহিম আল্লাহ্ পাক একমাত্র মানুষকে কথা বলার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দান করেছেন। মানুষ জ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ভাষাকে ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে এগিয় নিতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের নিকট যথাযথ মর্যাদার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের উচিত নয় কী?

বৃক্ষরাজি আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত আইনের প্রতি অনুগত

সূরা আর-রহমান-৫৫ : ৬

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ.

And the herbs (or stars) and the trees both prostrate themselves (to Allah).

তৃণলতা (বা তারকারাজি) এবং বৃক্ষরাজি আল্লাহর প্রতি সেজদায় অবনত হয়ে আছে। (সূরা আর-রহমান : ৬)

আরবি নাজম্ শব্দটির অর্থ তারকারাজি। এ শব্দের আর একটি অর্থ হলো তৃণলতা বা ঘাস। যেহেতু নাজম শব্দটি আস্‌সাজার (বৃক্ষ) শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে তাই খুব যুক্তিসঙ্গতভাবে এটির অর্থ এখানে তৃণলতা বা লতাগুল্ম ধরা যায়। তৃণলতা এবং গাছপালা পৃথিবীর বুকে ব্যাপকভাবে বনের সৃষ্টি করে থাকে এবং একথা বলতে হয় যে, ঐসব বৃক্ষরাজি সমগ্র উদ্ভিদ জগতের প্রতিনিধিত্ব করে। আল্লাহ্ পাকের প্রতি অবনত হয়ে থাকার অর্থ হলো উদ্ভিদজগৎ মহান স্রষ্টার নির্ধারিত আইনের প্রতি সদাসর্বদা নিজেদের আত্মসমর্পণ করে রেখেছে। গাছপালা তাদের জীবনের আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রদর্শন করে থাকে। তারা নিয়মিতভাবে প্রকৃতির সকল নিয়ম মান্য করে চলে। বৃক্ষরাজি তাদের শিকড় দ্বারা মাটির মধ্যে তাদের বিচরণ করার চিত্র প্রদর্শন করে থাকে। তারা মাটির নিচে খাদ্য-পুষ্টি ও পানির অনুসন্ধান করে। চারাগাছের অঙ্কুর সবসময় মাটি ভেদ করে বেড়ে উঠে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং সূর্যের আলো অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। পাতার অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র গ্যাসের আগমন ও নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণ করে। কার্বন ডাই অক্সাইডকে কাজে লাগিয়ে গাছপালা তাদের খাদ্য উৎপাদন করে এবং অক্সিজেন অবমুক্ত করে দেয়। গাছপালা আরো প্রদর্শন করে থাকে যে, তারা বিভিন্ন মাত্রায় আলো রাসায়নিক বস্তু এবং দৈহিক আঘাতের প্রতি সংবেদনশীল। তারা এসব সংবেদনশীল বস্তু থেকে নিজেদের পাহারা দিয়ে রাখে অত্যন্ত সুকৌশলে। সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাছপালার অনুভূতি আছে এবং এরা নিজেদের বৃদ্ধি ও ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে

সহায়ক গান শুনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। বিভিন্ন প্রজাতির গাছে ফুল ধরে। এ ফুল একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে ধরে। ফুল তাদের পরাগ-মিলন ও গর্ভধারণের কাজ সমাধা করে। পরাগ-মিলন ও গর্ভধারণের ফলে বীজের মধ্যে ভ্রূণ চারা জন্মলাভ করে। আবার বাতাস, বৃষ্টি, পাখি, পানি ও অন্যান্য প্রাণীর দ্বারা ফলের বীজ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বনের সম্প্রসারণ ঘটে। সুতরাং মহান আল্লাহ পাকের নির্ধারিত আইনের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের অভিব্যক্তি এসব ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে একথাই বলতে হয় যে, বৃক্ষরাজি দেহগতভাবে মহান আল্লাহ তাআলার নিকট মাথা অবনত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যদি গাছ লতাপাতা এমনকি সমগ্র সৃষ্টি জগৎ আল্লাহ তা'আলার নিয়ম নীতির প্রতি আত্মসমর্পণ করে প্রতিনিয়ত তাঁকে সেজদা করে থাকে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতি যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অশেষ রহমত দ্বারা ধন্য করেছেন তাদের উচিত নয় কি আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নিয়মিত তাঁকে সেজদা করা?

মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্রসমূহে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা

সূরা আর-রহমান-৫৫ : ৭

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ.

And the Firmament has He raised high and He has set up the Balance.

আল্লাহ্ পাক আকাশকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছেন এবং সেখানে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। (সূরা আর-রহমান : ৭)

আকাশ বলতে সমস্ত আকাশি বস্তু (Heavenly bodies) মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় বিরাজমান। এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেছেন এগুলোকে আমি মহাশূন্যে তুলে ধরেছি এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছি।

প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মহাকাশে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে এবং এসব জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে আমাদের কাছে মনে হয় যেন আকাশ। আবার গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ তাদের নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরপাক খাই এবং তাদের ঘূর্ণন গতি দেখে মনে হয় যেন কেউ তাদের গতি প্রকৃতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য (Balance) প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। প্রত্যেক গ্রহ-নক্ষত্রের রয়েছে মহাকর্ষ শক্তি (Force of gravitation) এবং এ শক্তির টানে যেন একে অপরের কাছাকাছি আসতে না পারে তাই আল্লাহ্ পাক এর বিপরীতে সৃষ্টি করে দিয়েছেন সম্প্রসারণ গতি (Force of Expantion)। এভাবে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আকাশি বস্তুসমূহের মধ্যে। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কক্ষীয় গতি থেকে উত্থিত হয় কেন্দ্র বহির্মুখী শক্তি (Centrifugal force) এবং এদের আভ্যন্তরীণ মাধ্যাকর্ষণ বলের (Gravity) টান কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি। সুতরাং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও এর বিপরীত কেন্দ্র বহির্মুখী শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জ্যোতিষ্কের অভ্যন্তরে একটি সুষম ভারসাম্য তৈরি হয়।

এভাবে আমরা পৃথিবী গ্রহ নিয়ে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখব যে পৃথিবীকে একটি সুদৃঢ় ভারসাম্যের মধ্যে রাখা হয়েছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ সবকিছুকে ধারণ করে রেখেছে এবং কেন্দ্র বহির্মুখী বল এ ধারণ ব্যবস্থাকে ভারসাম্য অবস্থা দান করেছে। আবার পৃথিবী সূর্যকে যে সময়ে একবার

সম্পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করে সে সময়ের মধ্যেই পৃথিবী যদি তার নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করে তাহলে এ অবস্থায় পৃথিবীর একদিকটা স্থায়ীভাবে সূর্যের দিকে উন্মুক্ত থাকবে এবং অপরদিকটা স্থায়ীভাবে অন্ধকারে ডুবে থাকবে। এরূপ হলে পৃথিবীতে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়তো। পরম করুণাময় আল্লাহ পাক পৃথিবীর ঘূর্ণন গতিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন বলেই সবকিছু সঠিক অবস্থানে রয়েছে।

এরপর পৃথিবীর পরিবেশগত ভারসাম্যের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে প্রথমে বিবেচনা করতে হয় বাতাসকে। আমরা জানি বাতাসের মধ্যে আছে ৭৮% নাইট্রোজেন, ২১% অক্সিজেন, ০৩% কার্বন ডাই অক্সাইড এবং আরো অন্যান্য কয়েকটি উপাদান। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, বাতাসের উপাদানের অনুপাতগুলো খুব ভালোভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। কিছু সংখ্যক চক্রের মাধ্যমে আল্লাহ পাক এ ভারসাম্য রক্ষা করতে প্রকৃতিকে বাধ্য করেছেন। এ চক্রগুলোর নাম হলো কার্বন চক্র (Carbon cycle) এবং নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen cycle)। এ চক্রগুলো না হলে জীবন বিপন্ন হয়ে পড়তো। এ বিষয়ে আমাদের যত্নবান হওয়া প্রয়োজন যাতে মানুষ পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কাজ না করে।

সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে আকাশসহ সকল বস্তুকে আল্লাহ পাক এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন যার মধ্যে চরম ভারসাম্য বিদ্যমান।

নভোমণ্ডল পাড়ি দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব।

সূরা আর-রহমান-৫৫ : ৩৩

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لاَ تَنْفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطٰنٍ.

O assembly of jinn and men! If you have power to pass beyond the zones of the Heavens and the earth, then pass you! But you will never be able to pass except with authority.

হে জীন ও মানব সম্প্রদায়! যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এলাকা পাড়ি দেয়ার, তাহলে পাড়ি দাও। কিন্তু কর্তৃত্ব ব্যতীত তোমরা কখনো পাড়ি দিতে পারবে না। (সূরা আর-রহমান : ৩৩)

এ আয়াতের বক্তব্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক এ জন্য যে, ১৯৬৯ সনে মানুষ প্রথম চাঁদে অবতরণ করেছিলেন। অবতরণের প্রস্তুতি নেয়ার প্রাক্কালে কিছু লোক মনে করেছিলেন মানুষের চাঁদে যাওয়ার মিশন কিভাবে সফল হবে। মানুষ কিরূপে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করবে। এরূপ মন্তব্য করার কারণ এ ছিলো যে, তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐসব লোকের গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকলে জানতে সক্ষম হতেন যে, এ আয়াতে 'কর্তৃত্ব' বলে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার মর্মার্থ হলো 'প্রযুক্তি জ্ঞানের কর্তৃত্ব', চাঁদে যাওয়ার জন্য মহাশূন্যে স্যাটেলাইট স্থাপনের উদ্যোগ সফল হয়েছিল প্রযুক্তি জ্ঞান দ্বারা যা Escape velocity (7 miles/sec) অর্জন করেছিল। Escape velocity দ্বারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করা সম্ভব। রাইট ভ্রাতৃত্ব উড়ন্ত যান আবিষ্কারের আগে এটা অকল্পনীয় ব্যাপার ছিলো যে, মানুষ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কোনদিন অতিক্রম করতে পারবে এবং মহাশূন্যে অভিযান চালাতে পারবে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের যান্ত্রিক জ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতি হয়েছে ব্যাপকভাবে। কেবল মাত্র সিকি শতাব্দি আগে মানুষ অগাধ কারিগরি নৈপুণ্য হাসিল করেছেন। সেই নৈপুণ্যের জোরে বিজ্ঞানীরা মানুষসহ মহাশূন্য যান উৎক্ষিপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং ভূমণ্ডল ও আকাশের এলাকা অতিক্রম করেছেন। আয়াতের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়

যে, মানুষ ভূমণ্ডল অতিক্রম করে নভোমণ্ডলে অভিযান চালাতে চাইলে তা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে তখনই যখন মানুষ ব্যাপক প্রযুক্তি জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে।
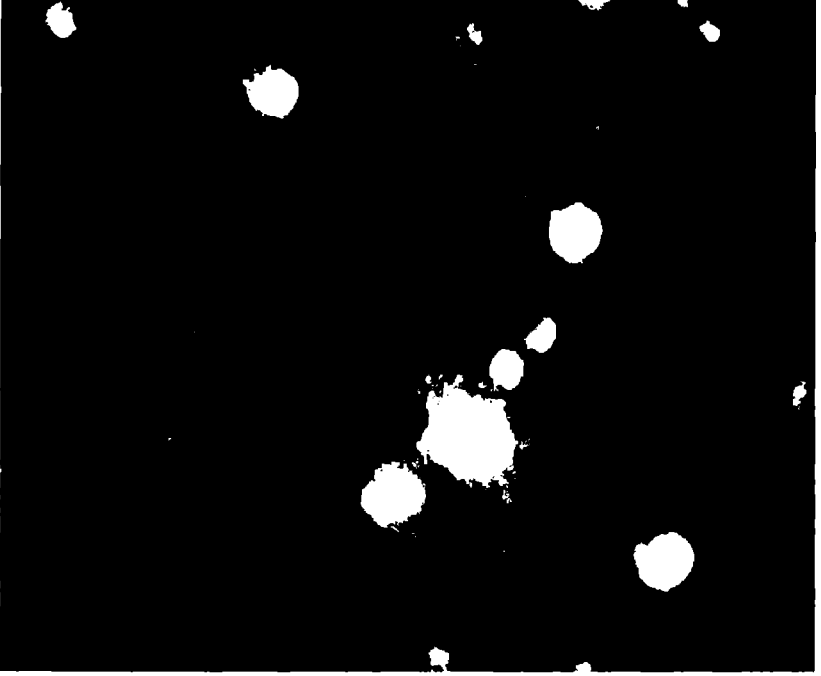
এখন এটা খুবই পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ পাক কেবলমাত্র তাদের উপর ঐ কর্তৃত্ব (প্রযুক্তি জ্ঞান) অর্পণ করেছেন যারা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সেই কর্তৃত্ব অর্জন করতে চেয়েছেন। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কর্তৃত্ব দান না করলে তারা কখনো নভোযানকে ভূমণ্ডল এলাকা অতিক্রম করাতে পারতেন না। যারা সত্যিকারভাবে জ্ঞানের কর্তৃত্ব অর্জন করতে চান তাদেরকেই তো আল্লাহ্ পাক তা দান করেন সে যেই ধর্মে অবস্থান করুক না কেন।

সপ্ত আকাশের মতো পৃথিবী সাত স্তরে বিভক্ত

সূরা তালাক-৬৫ : ১২

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

It is Allah Who has created seven Heavens and of the earth the like thereof. His command descends between them, that you may know that Allah has power over all things and that Allah surrounds all things in His knowledge.

আল্লাহ্ পাক সপ্ত আকাশ এবং সমসংখ্যক পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যদিয়ে তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। তোমরা জেনে থাকবে যে, সকল জিনিসের উপর তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত এবং সবকিছু তাঁর জ্ঞানসীমার মধ্যে আবদ্ধ। (সূরা তালাক : ১২)

সপ্ত আকাশের বিষয়টি সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ আয়াতে আর একটি বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, সাত আসমানের মতো পৃথিবীও সাত স্তরে বিভক্ত।

প্রথমে দেখা যায় পৃথিবী প্রধানত তিন স্তরে বিভক্ত। এগুলো হলো ভূত্বক (Crust), আবরণ পর্দা (Mantle) এবং অভ্যন্তর (Core)। আবহমণ্ডল হলো একটি গ্যাসীয় এনভেলপ্। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে এ গ্যাসীয় এনভেলপ্ পৃথিবীর সঙ্গে লেপ্টে আছে এবং পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। ম্যান্টল আবার তিনটি উপস্তরে বিভক্ত। এগুলো হলো, লিথোস্ফিয়ার, এস্থেনোস্ফিয়ার এবং মেসোস্ফিয়ার। কোরও দুইটি উপস্তরে বিভক্ত। এ দুইটি হলো আউটার কোর এবং ইনার কোর। অতএব দেখা যাচ্ছে পৃথিবী মোট সাত স্তরে বিভক্ত। যথা– (১) আবহমণ্ডল, (২) ভূত্বক, (৩) লিথোস্ফিয়ার, (৪) এসথেনোস্ফিয়ার, (৫) মেসোস্ফিয়ার, (৬) আউটার কোর, (৭) ইনার কোর।

১। আবহমণ্ডল (Atmosphere) : এটি হলো পৃথিবীর বহিস্থ স্তর। পৃথিবীর

উপরিভাগ থেকে এর বিস্তৃতি উচ্চতায় ৫০০ কি. মি.। এ উচ্চতার উর্ধ্বে আবহমণ্ডলের গঠন উপাদানগুলো শুষ্কতার কারণে একে অপর থেকে সংযোগ হারায়।

২। ভূত্বক (Crust) : পৃথিবীর উপরিভাগের কঠিন বহিরাবরণকে ভূ-ত্বক বলা হয়। পৃথিবীর সামগ্রিক দেহ গঠনে ভূত্বকের পরিমাণ ০.৬%। মহাসাগরের নিচে ৫ কি. মি. থেকে মহাদেশীয় উপরিভাগে এর পুরুত্ব ৩৫ কি. মি. এর মতো।

৩। লিথোস্ফিয়ার (Lithosphere) : ভূত্বকের তলদেশে ঠাণ্ডা ও কঠিন বস্তুর একটি স্তর রয়েছে। এ স্তর ১০০ কি. মি. পুরু। এ স্তরকে বলা হয় লিথোস্ফিয়ার। লিথোস্ফিয়ারের নিম্নদেশের গঠনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বিদ্যমান। এ গঠন বিচ্ছিন্ন সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত। এ সীমারেখাকে বলা হয় মোহো। এর নিচে মেন্টল-এর বাকি অংশটুকু অবস্থিত। এ অংশের গভীরতা ২৯০০ কি. মি.। এ অংশ সমগ্র পৃথিবীর দেহ-অবয়ব গঠনে ৮২% এরও বেশি গঠন করেছে।

৪। এ্যাসথেনোস্ফিয়ার (Aesthenosphere) : পৃথিবীর অভ্যন্তরে একটি এলাকা আছে যার ব্যাপ্তি হলো ১০০ কি. মি. থেকে ২৫০ কি. মি. এর মধ্যে। এ এলাকার উপরের আবরণ গরম। তুলনামূলকভাবে প্লাষ্টিকের মতো। এ স্তরকে বলা হয় এ্যাসথেনোস্ফিয়ার।

৫। মেসোস্ফিয়ার (Mesosphere) : উপর আবরণের বাকি অংশ প্রকৃতিগতভাবে পীচ এর মতো। পথে ঢালা পীচের মতো আবরণ অংশকে বলা হয় মেসোস্ফিয়ার।

৬। আউটার কোর (Outer Core) : আউটার কোরের পুরুত্ব ২১০০ কি. মি.। তরল লোহা দ্বারা এ অংশ গঠিত। এই লোহার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ সালফারও মিশ্রিত আছে।

৭। ইনার কোর (Inner Core) : পৃথিবীর কেন্দ্রে ইনার কোর এর ব্যাসার্ধ হলো ১৩৭০ কি. মি.। ইনার কোর সম্ভবত কঠিন। এতে লোহা ও অন্যান্য ভারী বস্তু আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ আয়াতে সপ্ত পৃথিবীর যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তা আধুনিক বিজ্ঞানকে দিক নির্দেশনা দান করেছে।

সূর্যের আলো দ্বারা চন্দ্র আলোকিত

| সূরা নূহ-৭১ : ১৬ |

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.

And has made the Moon a light theirin and made the Sun a Lamp.

তিনি চন্দ্রকে একটি আলো এবং সূর্যকে একটি বাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নূহ : ১৬)

আকাশের নক্ষত্রসমূহের মধ্যে চাঁদ ও সূর্য অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যেগুলোর আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়। এ দুইয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো এই যে, চন্দ্র একটি উপগ্রহ। এটি পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপগ্রহ যা সূর্যের আলোকের প্রতিফলন দ্বারা আলো দান করে। অপরপক্ষে সূর্য একটি নক্ষত্র যা স্বয়ং তার ভেতরের শক্তি দ্বারা আলো সৃষ্টি করে। এটি আলো ছড়ায় থার্মোনিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রক্রিয়ার ফলে সূর্যের কেন্দ্রে প্রোটন-প্রোটন-চেইন বিক্রিয়া কার্যকর হয়। এ বিক্রিয়া ঘটে সূর্যের কেন্দ্রীয় কোরে (Central Core) যার ব্যাস হলো প্রায় ৪০০০০০ কি. মি.। এর কেন্দ্রিয় কোরের বাইরে অপ্রকাশিত বস্তুর একটি এ্যানভেলপ্ রয়েছে। এ এ্যানভেলপের মধ্যদিয়ে শক্তির বিকিরণ ঘটে। এ শক্তি সূর্যের উপরিভাগে প্রায় ১০০০০০ কি. মি. এর মধ্যে বিস্তৃত হয়ে থাকে। সূর্যের উপরিভাবে শক্তি সঞ্চয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তির স্থানান্তর ঘটে। সূর্যের কেন্দ্র থেকে এর উপরিভাগ পর্যন্ত দূরত্বে তাপমাত্রা প্রায় ১৫,০০০,০০০°k থেকে ৬০০০°k তে নেমে আসে। সূর্যের উপরিভাগে যাকে ফটোস্ফিয়ার (Photosphere) বলে সে ফটোস্ফিয়ার কনভেকটিভ জোন এবং সৌর আবহমণ্ডলের মধ্যে একটি সীমারেখা তুলে ধরে। এ সীমারেখা একটি স্তর যা কয়েক শত কি. মি. পুরু। এ স্তরে থেকে সূর্যের যে শক্তি নির্গত হয় তা বিকিরিত হয় এবং এ বিকিরিত শক্তির একটি অংশ পৃথিবী গ্রহণ করে।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপগ্রহ চন্দ্রের ব্যাস হলো ৩৪৭৬ কি. মি.। চন্দ্রের অবস্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো ৩,৮৪,৪০০ কি. মি. এবং চন্দ্র পৃথিবীর কক্ষপথ পরিভ্রমণ করে ২৭.৩২২ সৌর দিনে। চন্দ্র সমকালীন আবর্তনের মধ্যে অবস্থান করে অর্থাৎ

এর অক্ষে আবর্তনের কৌণিক গতিবেগ পৃথিবীর চারপাশে আবর্তনের গতিবেগের সমান। পৃথিবী থেকে সূর্যকে একইভাবে সমপর্যায়ে দেখা যায়। কিন্তু চন্দ্র সম্পর্কে সবচেয়ে পরিষ্কার ঘটনা হলো এর উপরিভাগে উজ্জ্বল এবং দর্শনযোগ্য অংশ প্রতি রাত্রেই পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এ ঘটনা অর্থাৎ চন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায় দুইটি সাধারণ কারণে ঘটে থাকে। একটি হলো চন্দ্রের নিজের কোনো আলো নেই, সূর্যের আলো তার উপর প্রতিফলিত হলেই সে আলো দেয়। দ্বিতীয় কারণ হলো চন্দ্র পৃথিবীর চারপাশের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। সেহেতু সূর্য চন্দ্রের অর্ধেক অংশকে আলোকিত করে রাখে তাই ঐ অর্ধেক অংশের উপরিভাগ পৃথিবী থেকে পরিলক্ষিত হয়।

অতএব, এটা প্রতীয়মান হয় যে, সূর্য এবং চন্দ্র দুটি ভিন্ন ধরনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। সূর্য নিজেই নিজের মধ্যে আলো উৎপাদন করে বাতির মতো জ্বলে এবং চন্দ্র শুধুমাত্র সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে থাকে।

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুসম অনুপাত

সূরা আবাসা-৮০ : ১৮-২০

مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ.

From what thing did He create him? From *Nutfah* He created him and then set him in due proportion.

Then He makes the path easy for him.

আল্লাহ পাক তাকে কোন্ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? নুৎফা থেকে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং শেষে তিনি তার তাকদীর ঠিক করেছেন। অতঃপর তার জন্য চলার পথকে সুগম করেছেন। (সূরা আবাসা : ১৮-২০)

নুৎফা থেকে মানুষ সৃষ্টির বিষয়টি সূরা মুমিনুন-এর ১৩-১৪ নং আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক মানুষের শারীরিক গঠনে সুসম অনুপাত দান করেছেন। সে বিষয়টি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ অনুপাত নির্ধারণের মধ্যে স্পষ্টত সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্যতার অবদান রয়েছে। মানব দেহের বিভিন্ন অংশে গঠন অনুপাতের যে আশ্চর্যজনক ভারসাম্য রয়েছে তার দ্বারা পর্যায়ক্রমে এ সৌন্দর্য ও মিল পরিলক্ষিত হয়।

এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তার চলার পথকে সুগম করে দিয়েছেন। এ বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রসব বেদনা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত হতে পারে।

প্রথম অবস্থায় রিলেক্সিন (Relaxin) নামে কথিত হরমোন ডিম্বাশয় এবং প্লাসেন্টা (Placenta) কর্তৃক নির্গত হয়। এর ফলে ভূমিষ্ঠ পথের সংযোগ বন্ধনী আলগা হয়ে যায় এবং এর জরায়ু নরম হয়ে উঠে। এরপর জরায়ুর সংকোচন দেখা দেয়। যার দরুন গর্ভস্থ শিশুকে ধাক্কা দিয়ে জরায়ুর অপ্রশস্ত নিম্ন অংশে প্রেরণ করে। জরায়ুর প্রত্যেক সংকোচনে ঝিল্লিগুলো এ্যামনিউটিক (Amniotic) রস দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠে এবং এগুলো পানির ব্যাগের মতো ভ্রূণ শিশুকে বেষ্টন

করে রাখে। এভাবে জরায়ুকে বড় করে তোলে। ফলে পানির ঐ ব্যাগগুলো যখন ফেটে যায় তখন ঝিল্লিগুলো পিচ্ছিল মসৃণ পথ সৃষ্টি করে। এ পথ দিয়ে শিশু সহজেই ভূমিষ্ঠ হয়।

প্রসব বেদনার দ্বিতীয় পর্যায়ে ভ্রূণ শিশুর অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা পরিবর্তন দেখা যায়। এ পরিবর্তন ভ্রূণ শিশু প্রসব হওয়ার পথে সুবিধা দান করে। স্বাভাবিক প্রসব বেনদায় শিশুর মাথা আগে বের হয়ে আসে। তারপর আসে দেহ এবং অন্যান্য অঙ্গ। এ অবস্থার ব্যাপ্তিকাল প্রায় দুই ঘণ্টা স্থায়ী হয়। ঐ সময় মা নিজেই তার পেশীর সাহায্যে প্রসবের বেগ বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে। শিশুর মাথার আকার স্বাভাবিকের চেয়ে বড় হলে প্রসবের সময় মা বেশ কষ্ট অনুভব করে। কিন্তু মাথার আকার গড় মাপের হলে তেমন কষ্ট অনুভব হয় না। প্রসব বেদনার সময় চাপ সৃষ্টি করে শিশুর মাথা বের করার চেষ্ট করা হয়। এ সময় চাপ পেয়ে শিশুর মাথার আকার কিছুটা পরিবর্তন হয়। এ ঘটনা মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতে সম্ভবপর হয়। আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতের কারণে মা ও শিশুর কোনো ক্ষতি হয় না।

প্রসব বেদনার তৃতীয় পর্যায় হলো প্লাসেন্টা নির্গমন। এ নির্গমন কাজটি সম্পন্ন হয় শিশু প্রসবের প্রায় আধ ঘন্টার মধ্যে।

আকাশ পথে গ্রহসমূহের চলাচল

সূরা তাকভীর-৮১ : ১৫-১৬

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ.

So Verily, I call to withness the planets that recede, Go straight or hide.

প্রকৃতপক্ষে আমি আহ্বান করি সেই গ্রহগুলোকে দেখার জন্য যেগুলো পশ্চাদগামী হয়, সরাসরি চলে যায় অথবা অন্তর্হিত হয়ে পড়ে। (সূরা তাকভীর : ১৫-১৬)

আকাশের বুকে যেসব গ্রহ অনিয়মিত পথে চলাচল করে সেগুলোকে অবলোকন করার জন্য আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে আহ্বান করেছেন। কখনো কখনো একটি গ্রহকে পশ্চিম দিক থেকে পূব দিকে ধাবিত হতে দেখা যা। এ চলার গতিকে প্রত্যক্ষ গতি (Direct motion) বলা হয়। অন্য কোনো সময় এ গ্রহকে পশ্চাৎ দিকে অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে গমন করতে দেখা যায়। পুনরায় অন্য সময় এ গ্রহ গতিশীল অর্থাৎ স্থির অবস্থায় থাকে। কখনো কখনো একে অন্য গ্রহের আড়ালে ভালোভাবে দেখা যায় না। গ্রহের এ অবস্থাকে বলা হয় 'ভৌতিক অবস্থা' (Occultation)। পৃথিবীর সঙ্গে গ্রহের আপেক্ষিক গতির কারণে এসব দৃশ্যাবলী দেখা যায়।

বিজ্ঞানী কেপলারের দ্বিতীয় ল' অনুযায়ী সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহের গতিবেগ সূর্য থেকে দূরবর্তী গ্রহের গতিবেগের চেয়ে অনেক বেশি। যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহ অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য থেকে দূরে অবস্থিত সেহেতু সূর্যের চারদিকে এর গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম। তাদের চলমান অবস্থায় কখনো কখনো পৃথিবী এগিয়ে থাকে। আবার কখনো ঐ গ্রহ এগিয়ে থাকে। যখন এ অবস্থা হয় তখন পৃথিবী তার সর্বোচ্চ গতিবেগের সাহায্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহকে ধরার চেষ্টা করে। এ সময় শ্রেষ্ঠ গ্রহ কম গতিবেগ নিয়ে অগ্রসর হয়। এ দুই বস্তুর মধ্যকার দূরত্ব কমতে থাকে। বহিস্থ সর্ববৃহৎ গ্রহ তখনো পৃথিবী অপেক্ষা আগে এগিয়ে যায় অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে ধাবিত হয়। এ গতিই হলো সরাসরি গতি। ক্রমে ক্রমে পৃথিবী দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে ঐ গ্রহের নাগালের মধ্যে এসে পড়ে। এ সময় পৃথিবী ও গ্রহ উভয়েই সূর্যের সঙ্গে একই রেখায় অবস্থান করে। এ পর্যায়ে গ্রহকে স্থির অবস্থায়

আছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থার পরবর্তী পর্যায়ে পৃথিবী গ্রহের অগ্রে এগিয়ে যায়। এ সময় এ দুই বস্তুর দূরত্বের ব্যবধান বিপরীত দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমে। গ্রহকে যখন পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হয় তখন এর অর্থ দাঁড়ায় এ যে, গ্রহ পশ্চাদগামী হচ্ছে। এ গতিকে বলা হয় পশ্চাদগামী গতি। কখনো কখনো দুইটি গ্রহ দৃষ্টিপথের একই রেখায় এসে হাজির হয় এবং একটি অপরটিকে আড়াল করে ফেলে। এ দৃশ্যকে বলা হয় ভৌতিক দৃশ্য।

অতএব, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক গ্রহের গতিবেগের কারণে যেসব দৃশ্যাবলীর উদ্ভব ঘটে তারই কথা উল্লেখ করেছেন।

বিগ ক্রাঞ্চের পূর্বে মহাবিশ্বের অবস্থা

সূরা ইনফিতার-৮২ : ২-৩

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ.

When the stars are scattered. And when the seas are burst forth.

যখন তারকাপুঞ্জ ছড়িয়ে পড়বে। আর যখন সাগরগুলো ফুঁসে উঠবে। (সূরা ইনফিতার : ২-৩)

এটা সবাই অবগত আছেন যে, গোটা মহাবিশ্বে দুইটি শক্তি সক্রিয় হয়ে রয়েছে, একটি সম্প্রসারণ গতি এবং অপরটি মহাকর্ষ শক্তি। সম্প্রসারণ গতির কারণে গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের থেকে দূরে অবস্থান করে ঘুর-পাক খায়। মহাকর্ষ শক্তির কারণে গ্যালাক্সিগুচ্ছসমূহ একে অপরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এ ঘটনা প্রবল হয়ে উঠবে যখন সম্প্রসারিত মহাবিশ্বের সঙ্গে বিস্তৃত মহাকর্ষ শক্তির দ্বন্দ্ব বাধবে। যদি সম্প্রসারণ গতি বিজয়ী হয় তাহলে মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। আর যদি মহাকর্ষ শক্তি এ দ্বন্দ্বে বিজয়ী হয় তাহলে এ শক্তির টানে গ্যালাক্সিগুচ্ছের গতি শ্লথ হয়ে আসবে এবং এক পর্যায়ে ঐ গতিকে একেবারে থামিয়ে দেবে। মহাকর্ষ শক্তি তাদেরকে একত্রিত করার জন্য অবিরাম কাজ করবে। বিশ্বজগৎ সেই সময় পর্যন্ত সংকুচিত হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সকল বস্তু একত্রে মিলিত হয়ে বিস্ফোরিত হয়। এ সম্ভাব্য বিরাট বিস্ফোরণকে বলা হয় বিগ্ ক্রাঞ্চ (Big crunch)।

বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা এ অভিমত পোষন করেন যে, মহাবিশ্বের এ ধ্বংসযজ্ঞের সময়কাল হিসাব করা সম্ভব। বিগ্ ক্রাঞ্চের এক বিলিয়ন বছর পূর্বে ক্লাস্টার গ্যালাক্সিগুলো তাদের মধ্যকার শূন্যস্থান পূরণ করে একসঙ্গে একত্রিভূত হবে। একশত মিলিয়ন বছর পূর্বে একক গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যবর্তী শূন্যস্থান ভরাট হয়ে যাবে এবং সকল গ্যালাক্সি একীভূত হয়ে পড়বে। সমগ্র মহাবিশ্ব বিক্ষিপ্ত তারকায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিগ ক্রাঞ্চের প্রায় এক লক্ষ বছর পূর্বে তারকাসমূহ এতো কাছাকাছি এসে যাবে যে, তাদের দ্বারা সমস্ত আকাশ চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে এবং সেই সঙ্গে ভয়ঙ্করভাবে আকাশ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। চোখ ধাঁধানো আকাশের নিচে সাগরের পানি প্রচণ্ড তাপে টগবগ করে ফুটতে থাকবে এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে ফুঁসে উঠবে।

মানব দেহের সুসম আকার দান আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি নৈপুণ্যতার প্রমাণ

সূরা ইনফিতার-৮২ : ৭-৮

اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ.

Who created you, fashioned you perfectly and gave you due proportion. In whatever form He willed, He put you together.

কে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুসম, সুন্দর আকার দান করেছেন এবং যথাযথ অনুপাতে গড়ে তুলেছেন? তিনি যে কোনো আকারে তোমাদের তৈরি করতে ইচ্ছে করলে তা করতে পারতেন। (সূরা ইনফিতার : ৭-৮)

মানুষ সৃষ্টি এবং তাদের আকার দানের বিষয়টি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। আনুপাতিক পরিমাপ সম্পর্ক বলতে গেলে একথা বলতে হয় যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দেহের অন্যান্য অংশের মাপ ও আকার সাধারণভাবে এতো নিখুঁত যে, এর উপর আর কোনো উন্নয়ন চলে না। মানুষের উচ্চতা, মাথার আকার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আঙ্গুলসমূহ ইত্যাদি যথাযথভাবে পরিমাপ সম্বলিত। প্রথমে মানুষের দৈর্ঘ্য নিয়ে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখতে পাবো সাধারণভাবে মানুষের দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে ১ থেকে ২ মিটার। এ দৈর্ঘ্যের আকার পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে পদার্পণ করে তখন থেকে সে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে আয়ত্ত করে থাকে। কেউ হয়তো এটা চিন্তা করতে পারে যে, মানুষের বর্তমান দৈর্ঘ্যের চেয়ে যদি তার দৈর্ঘ্য ২-৩ গুণ বেশি হতো তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াতো? এ ক্ষেত্রে এটা দেখানো যায় যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে এক কদম হাঁটা খুবই সমস্যা হতো। যদি মানুষের দৈর্ঘ্য বর্তমান অপেক্ষা তিন গুণ হতো এবং দৈহিক অনুপাত একই রকম থাকতো তাহলে তার ওজন হতো ৩x৩x৩ = ২৭ গুণ বেশি। ২৭ গুণ ভারী হওয়ার কারণে মানুষ চলতে গিয়ে পড়ে যাবে এবং তিনবার আছাড় খাবে। তার দেহের হাড়গুলো ৯ গুণ শক্তিশালী হবে। যেহেতু হাড়গুলোর শক্তি নির্ভর করে ঐগুলোর সংযোগ এলাকার উপর। সুতরাং আছাড় খাওয়ার ফলে ক্ষতির পরিমাণও হবে ৯ গুণ। আবার বিপরীতভাবে প্রশ্ন

হতে পারে যেমন, বর্তমানে মানুষের যে দৈর্ঘ্য আছে তার চেয়ে যদি তার দৈর্ঘ্য কম হয় তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে? এক কথায় বলা যেতে পারে যে, মানুষ অগাধ অসুবিধার সম্মুখীন হবে। কারণ দেহ থেকে যে পরিমাণ তাপ শক্তি নষ্ট হয় তা নির্ভর করে দেহের উপরিভাগের এলাকার উপর যদি মানুষ অতি খর্বাকৃতির হতো তাহলে তার দেহের বাহ্য অংশ তার সমগ্র দেহ-অবয়বের তুলনায় অনেক বড় হতো। অতএব তার দেহ অধিক পরিমাণে তাপ শক্তি হারিয়ে শীতল হয়ে পড়তো। এ অবস্থায় তার শরীরকে গরম রাখার জন্য তাকে অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হতো। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের ঘটনা দেখা যায় মুষিক জাতীয় পতঙ্গভুক প্রাণীদের মধ্যে। এসব প্রাণী আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র। কিন্তু তাদের রক্ত বেশ উত্তপ্ত। ঐসব প্রাণী অধিক পরিমাণে আহার গ্রহণ করে নিজেদের দেহকে গরম রাখে। তারা যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে তা তাদের দেহের ওজনের চেয়ে বেশি। অতএব মানুষ যদি তার বর্তমান আকারের চেয়ে কয়েক গুণ ক্ষুদাকার হতো তাহলে কেবলমাত্র খাদ্য সমস্যাই দেখা দিত না উপরন্তু তাদের মগজের আকারও ভয়ঙ্করভাবে হ্রাস পেতো। এর ফলে মানুষ আল্লাহ পাকের সৃষ্ট অতিশয় বুদ্ধিমান জীব বলে গর্ব করতে পারতো না। এসব আলোচনা থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আল্লাহ পাক মানুষের যে দৈহিক আকারের পরিমাপ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা খুবই যথার্থ।

এখন মানব দেহের সংঘবদ্ধ সংযোগস্থলগুলোকে (Joints) নিয়ে আলোচনা করবো। আমাদের দেহের সংযোগগুলোকে কঙ্কালের মিলনস্থল বলা হয়। সংযোগগুলো দুই ধরনের। অনড় সংযোগ (Mined joint) এবং সনড় সংযোগ। (Moving joint)। অনড় সংযোগস্থলে মজ্জা বা আঁশ জাতীয় টিস্যু অস্থির ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে এবং ঐ অস্থিগুলোকে শক্তভাবে ধরে রাখে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্থির প্রান্ত বা কিনারাগুলো করাতের ন্যায় খাঁজকাটা। এ খাঁজকাটা অবস্থা Jigsaw system এর সাথে ভালোভাবে খাপ খায়। এসব অস্থির সংযোগ এলাকা খুব শক্ত এবং কোনো প্রকার দৈহিক আঘাত প্রাপ্তির দ্বারা ঐসব অস্থি ভেঙ্গে যায় না।

সনড় বা মুভিং অস্থি সংযোগের মধ্যে চার প্রকারের কাঠামো সম্পৃক্ত রয়েছে। দুই অস্থির শেষ প্রান্তে সংযোগ গড়ে ওঠে এবং অস্থির শেষ প্রান্তকে মজ্জার স্তর আবৃত করে ঐগুলোকে মসৃণ করে তোলে। আঁশ জাতীয় টিস্যুর খাপ যাকে ক্যাপসুল বলা

হয় সেই ক্যাপসুলে অস্থিগুলোকে একসঙ্গে ধরে রাখে। ক্যাপসুলের পাশ দিয়ে একটি ঝিল্লি পর্দা তৈরি করে তরল চটচটে পদার্থ সৃষ্টি করে। এ পদার্থ সংযোগস্থলের অস্থিগুলোকে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। এভাবে দেখা যায় গোটা মানব দেহ জোড়া সংযোগের মাধ্যমে সুসম অনুপাত গড়ে ওঠেছে।

সুতরাং সুমহান আল্লাহ পাক মানব দেহের গঠন উপাদানগুলোকে খুব সুন্দরভাবে একটার সাথে আর একটা সম্পর্কযুক্ত করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর আকার, কার্যকলাপ ও দেহাংশের বুঝা-পড়া ও মিল খুবই বিস্ময়কর। পবিত্র কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে মানুষের আকার ও পরিমাপ সম্পর্কে যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গবেষণার বিষয়।

পূর্ণিমার চাঁদ সর্বোচ্চ আলোকিত

সূরা ইনশিকাক-৮২ : ১৮

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ.

And by the moon when it is at the full ness.

আর শপথ চন্দ্রের, যখন ইহা পূর্ণতা লাভ করে। (সূরা ইনশিকাক : ১৮)

এ আয়াতে পূর্ণিমার চাঁদের কথা বলা হয়েছে। চাঁদ পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপগ্রহ। একে আমরা দেখতে পাই তখনই যখন সূর্যের আলো এর উপর প্রতিফলিত হয়। এ উপগ্রহ নিজ কক্ষপথে পৃথিবীকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে ২৭.৩২২ দিনে। পৃথিবীর চারপাশে আবর্তনের ক্ষেত্রে এটা সমসাময়িক। অর্থাৎ এর নিজ অক্ষের চারপাশের আবর্তনের কৌণিক গতিবেগ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার গতিবেগের সমান। এর ফলে চন্দ্র পৃথিবীর দিকে তার একই অংশকে তুলে ধরে রাখে। যখন পৃথিবী পরিবেষ্টিত কক্ষপথে চাঁদ চলা শুরু করে তখন সূর্য চাঁদের উপরিভাগের অর্ধাংশকে আলোকিত করে। সূর্য তার এ কাজটি সমাধা করে বিভিন্ন অবস্থান থেকে এবং আমরা চাঁদের আলোকিত অর্ধাংশের বিভিন্ন অংশকে দেখতে পাই। দৃশ্যমান আলোকিত অংশকে চাঁদের একটি পর্যায় হিসেবে অভিহিত করা হয়। চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে তখন আমাদের দিকে চাঁদের মুখ আলোকিত থাকে না এবং আমরা চাঁদকে মোটেও দেখতে পাই না। একে বলা হয় কনজাঙ্কশন এবং এ পর্যায়কে বলা হয় নতুন চাঁদের পর্যায়। চাঁদ যখন তার কক্ষপথে যাত্রা করে তখন তার একটি অতি সরু অংশ আলোকোজ্জ্বল দেখায়। এ সময় আমরা বাঁকা কাস্তের ন্যায় চাঁদকে আকাশে দেখতে পাই।

পরবর্তী রাতগুলোতে চাঁদের অধিকতর আলোকিত বড় অংশকে দেখা যায় এবং চাঁদের পর্যায় অবিরতভাবে বদলাতে থাকে যতক্ষণ না চন্দ্র পৃথিবীর বিপরীতে যায় অর্থাৎ যতক্ষণ না পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়। একে বলা হয় বিপরীত পর্যায়। এ অবস্থায় পৃথিবী থেকে চাঁদের আলোকিত অর্ধাংশকে ভালোভাবে দেখা যায় এবং চন্দ্রও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। সুতরাং চাঁদ সর্বোচ্চ অধিক মাত্রায় আলো লাভ করে তার পূর্ণিমা পর্যায়ে।

রাতে আগমনকারী চোখ ধাঁধানো নক্ষত্র

সূরা তারিক-৮৬ : ১-৩

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ.

By the Sky and the *Night-comer* and what will make you to know what the *Night-comer* is? (It is) the star of piercing brightness.

শপথ আকাশের এবং রাতে আগমনকারীর। আপনি কি জানেন রাতে আগমনকারী কে? সে– এক চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল নক্ষত্র। (সূরা তারিক : ১-৩)

সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, নক্ষত্র গ্যালাক্সি ও নেবুলাকে নিয়ে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী গঠিত। দিনের বেলা আমরা কেবলমাত্র সূর্যকে দেখে থাকি। সূর্যের তীব্র আলোর কারণে আমরা অন্যান্য জ্যোতিষ্ককে অবলোকন করতে পারি না। রাত্রিবেলা যখন সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায় তখন অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এ আয়াতে রাতে আগমনকারী হিসেবে যাকে নির্দেশ করা হয়েছে তা হলো আলোকিত চন্দ্র। রাতের আকাশে একমাত্র চন্দ্রকে অতি উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু এর উজ্জ্বলতা মোলায়েম ও ঠাণ্ডা। রাতের বেলা চাঁদের দিকে তাকালে এর আলো চোখে কোনো পীড়া দেয় না। অন্যান্য গ্রহের মতো শুক্র গ্রহও সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে কিরণ দান করে। নক্ষত্র এবং অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা পৃথিবী থেকে রাত্রিকালে একে বেশি উজ্জ্বল দেখায়। এর কারণ হলো শুক্র গ্রহ পৃথিবীর কাছে অবস্থিত এবং এটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আলো প্রতিফলনকারী মেঘ দ্বারা আবৃত। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণ ১২.৭ মেগনিসিউড। চন্দ্রের পরে যে গ্রহটি অধিক উজ্জ্বল সেটি হলো শুক্র গ্রহ। এর ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণ ৪.৪ মেগনিসিউড। কখনো কখনো এই গ্রহকে আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় প্রজ্জ্বলিত টর্চের মতো দেখায়। কখনো কখনো শুক্র গ্রহ এতো বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠে যে, একে দিনের বেলায়ও দেখা যায়।

শুক্র গ্রহ একটি অগৌণ গ্রহ। কারণ এর কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের মধ্যে অবস্থিত। এ গ্রহ চন্দ্রের মতো বিভিন্ন পর্যায় প্রদর্শন করে থাকে। এটা সূর্যের সবসময় অতি নিকটবর্তী। ভোরের আকাশে যখন একে দেখা যায় তখন তাকে

বলা হয় শুকতারা (Morning star)। আর যখন একে সন্ধ্যাকালীন আকাশে দেখা যায় তখন তাকে বলে সন্ধ্যাতারা (Evening star)। সূর্য থেকে এর সর্বোচ্চ কৌণিক দূরত্ব হলো ৪৭°। এ কৌণিক দূরত্বে আসতে তার সময় লাগে ৭২ দিন। শুক্র গ্রহ যখন ৩৯° কৌণিক দূরত্বে অবস্থান করে তখন এর ঔজ্জ্বল্য সর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রা লাভ করে। এটা সূর্যের চারপাশে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে আসে ২২৫ দিনে। এটি তার কক্ষপথে সম্পূর্ণরূপে একবার পাক খায় ২৪৩ দিনে।

উটের গঠনশৈলী লক্ষ্য করার আহ্বান

সূরা গাশিয়া-৮৮ : ১৭

اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.

Do they not look at the Camels, how they are created?

তারা কি লক্ষ্য করে দেখে না কিভাবে উটকে সৃষ্টি করা হয়েছে? (সূরা গাশিয়া : ১৭)

এ আয়াতে উট সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আহ্বান করা হয়েছে। উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। কিন্তু উটকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন তার মর্মার্থ মাত্র সেদিন আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। উটকে নিয়ে যে গবেষণা চালানো হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, উটের নাসারন্ধ্রে আর্দ্রতা শোষণকারী এক ধরনের ঝিল্লি আছে। উট যখন নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন ঐ ঝিল্লি আর্দ্র জলকণা বের হতে দেয় না। অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে এ ধরনের ঝিল্লি থাকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। উটের নাসারন্ধ্রে এ ধরনের ঝিল্লি থাকার কারণে সে ৬৮% ভাগ জলীয় বাষ্প সঞ্চয় করে রাখতে পারে। যা অন্য প্রাণীরা নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় বের করে দিতে বাধ্য হয়।

গবেষকরা উটের নাসারন্ধ্রকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছেন যে, নাসারন্ধ্রের মধ্যে একমুখী পথ সম্বলিত একটি ঝিল্লি রয়েছে যার পরিমাপ ১০০০ বর্গ সেন্টিমিটার (৪০০ বর্গ ইঞ্চি)। একজন মানুষের মিউকাস ঝিল্লির পরিমাণ মাত্র ১২ বর্গ সেন্টিমিটার।

উট তার মাংসপিণ্ডে চর্বি সঞ্চয় করে রাখে যাতে মরুভূমিতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার সময় খাদ্যাভাব মিটানো যায়। মানুষের সারা শরীরে ওভারকোটের মতো চর্বি আবৃত থাকে। কিন্তু উট শরীরের এক জায়গায় চর্বি ধরে রাখে এ কারণে যে, প্রচণ্ড তাপদাহে যাতে সে আর্দ্রতাশূন্য না হয়ে পড়ে।

এটা খুবই চিত্তাকর্ষক বিষয় যে, ১৪০০ বছর পূর্বে আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে উটের দৈহিক গঠন সম্পর্কে যে প্রশংসা বাণী ব্যক্ত করেছেন সে বাণীর তাৎপর্য বৈজ্ঞানিকদের প্রাণান্তকর গবেষণার মাধ্যমে প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে।

অপূর্ব কৌশলে সৃষ্টি মানুষের চোখ, জিহ্বা ও ঠোঁট

সূরা আল-বালাদ-৯০ : ৮-৯

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ.

Have We not made for him two eyes, And a tongue and two lips?

আমরা কি তার (মানুষের) জন্য দুইটি নয়ন, একটি জিহ্বা এবং দুইটি ঠোঁট তৈরি করে দেইনি? (সূরা আল-বালাদ : ৮-৯)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ অনুগ্রহের আনুকূল্যেই মানব জাতি এক জোড়া চোখ, একটি জিহ্বা ও এক জোড়া ঠোঁট লাভ করেছে।

চোখ মানুষের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর সাহায্যে মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে জ্ঞান অর্জন করে থাকে। এ জ্ঞান আসে দর্শন জাত ছবি থেকে। বহুবিধ জটিল কৌশলের মাধ্যমে এ ছবি বা চিত্র গঠন লাভ করে। মানুষের মস্তিষ্ক অন্যান্য প্রাণীদের মস্তিষ্কের চেয়ে বহুগুণ উন্নত। তাই তার মস্তিষ্কের পারস্পরিক কার্যক্রম এবং ব্যাখ্যার প্রকৃতি উন্নতমানের যা অন্য শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না। মহান আল্লাহ্ পাক আমাদের এক জোড়া চোখ দান করেছেন। এ চোখদ্বয়ের সাহায্যে আমরা দর্শনযোগ্য সকল বস্তুর দৃশ্যাবলী দেখতে পাই।

জিহ্বা দুই অংশে গঠিত। এর সম্মুখের অংশের পরিমাণ দুই-তৃতীয়াংশ এবং পশ্চাদবর্তী অংশ বা অন্ন নালীর অংশের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ। এ দুই অংশ একটি ভি (V) আকারের মিলনস্থল গড়ে তোলেছে। এ মিলনস্থলে জিহ্বা সাত থেকে বার উঁচু সমতল অংশে গঠিত। জিহ্বার দুই পার্শ্বে স্বাদ গ্রহণকারী বহু সংখ্যক উন্মুক্ত পুষ্প কুঁড়ির মতো কোষ (Cell) রয়েছে। মৌলিকভাবে চার প্রকারের স্বাদ জিহ্বা গ্রহণ করে। যেমন, মিষ্টি স্বাদ, লবণাক্ত স্বাদ, তিক্ত স্বাদ এবং টক জাতীয় স্বাদ। জিহ্বার কয়েক ধরনের আস্বাদন স্তর থাকার কারণে স্বাদের বিভিন্নতা সে পরখ করতে পারে। তাই জিহ্বার ব্যবহারের মধ্যে আমরা দেখি, সে খাদ্যের স্বাদ উপভোগ করে। খাদ্যকে চর্বন করার জন্য দুই পাশের দাঁতের মধ্যে ঠেলে দেয়। চর্বিত খাদ্যকে দলা করে তা গলাধকরণে সহায়তা করে। জিহ্বার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শব্দ তৈরি করা। কথা বলার ক্ষমতা একটি অদ্ভুদ

গুণ যা জিহ্বার সহায়তায় মানুষ করে থাকে। স্বরের দ্রুত পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় কথার উদ্ভব ঘটে। তালু, জিহ্বা ও ঠোঁটের অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বর সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সুতরাং এ আয়াতে ঠোঁট সম্পর্কে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন বাগযন্ত্র থেকে স্বর সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র তখনই বাণীর উদ্ভব ঘটে। স্বর বহুভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে কথা বা সঙ্গীত সৃষ্টি করে মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

শান্তি ও ঐতিহ্যের প্রতীক ডুমুর ও জলপাই

সূরা আত-তীন-৯৫ : ১

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ.

By the Fig and the Olive.

শপথ ডুমুর ও জলপাই-এর। (সূরা আত-তীন : ১)

ডুমুর (Ficus carica) ফলটি সম্ভবত পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে উৎপন্ন হতো। এখান থেকে এ ফল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। ভোজ্যফল হিসেবে এখানে কমপক্ষে ৫০০০ বছর আগে থেকে ডুমুরের চাষ হয়ে আসছে। ডুমুরের মধ্যে খুব বেশি শর্করা রয়েছে। এছাড়া ক্যালসিয়াম, লৌহ ও কপারের উপস্থিতি বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিরাজমান। ফলের মধ্যে ডুমুর একটি স্বাদযুক্ত স্বাস্থ্যকর খাদ্য একে কাঁচা অবস্থায় তরকারী হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়। এছাড়া ডুমুর থেকে চোলাই মদ তৈরি হয় কিংবা ডুমুরকে টিনজাত করা যায়। ডুমুর থেকে শিরাপ তৈরি করা হয়। এ শিরাপ রেচক ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইসলামের প্রারম্ভিককালে আরব দেশের লোকেরা ডুমুরকে খাদ্য ও ঔষধ উভয় হিসেবে ব্যবহার করতো। মানুষের হাতের সঙ্গে ডুমুর পাতার গঠনের বেশ মিল আছে। সেই কারণে প্রাচীনকালে খৃষ্টানদের চিত্রশিল্পে ডুমুর পাতা প্রায়ই আঁকা হতো। বাইবেলে কয়েকবার ডুমুর গাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কোরআনে ডুমুর গাছের কথা মাত্র একবার উল্লেখ করা হয়েছে। এ উল্লেখের মাধ্যমে শপথ বাক্য সুদৃঢ় করা হয়েছে। যেসব বস্তুর নাম উল্লেখ করে শপথ বাক্য পূর্ণ করা হয় সে বস্তুগুলো জলপাই, সিনাই পর্বত এবং পবিত্র নগরী মক্কা। ভূমধ্যসাগর ও নিকট প্রাচ্য এলাকায় জলপাইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মানব সভ্যতার উন্নয়ন ও মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে জলপাই বৃক্ষ ও জলপাই ফল নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের কাছে জলপাই সমৃদ্ধি স্বর্গীয় শান্তি, সৌন্দর্য সজীবতা ও শক্তির প্রতীক। অতি প্রাচীনকাল থেকে এ পর্যন্ত জলপাই তেল বিভিন্ন কাজে মূল্য পেয়ে আসছে।

প্রথম ওহীতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অন্বেষণ করার আহ্বান

সূরা আলাক-৯৬ : ১-৫

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اِقْرَاْوَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

Read! In the name of your Lord Who has created. He has created man from a clot (*Alaq*). Read! And your Lord is the Most Generous. Who has taught (the writting) by the pen. He has taught man that Which he knew not.

পড়ুন (হে মুহাম্মদ সা)! আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি আলাক (জমাট রক্ত) থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পাঠ করুন! আর আপনার প্রভু অতিশয় মহিমান্বিত, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন (লিখা) কলম দ্বারা। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না। (সূরা আলাক : ১-৫)

এ পাঁচটি আয়াত হলো পবিত্র কোরআনের প্রথম ওহী। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন হেরা পর্বত গুহায় ধ্যান মগ্ন ছিলেন তখন আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাইল (আ) এ পাঁটি আয়াত নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হন এবং পড়তে বলেন। এটা বেশ আকৃষ্টকারী ব্যাপার যে, প্রথম ঐশী বাণী দ্বারা শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে এ আয়াতের অর্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ মুসলিম বিশ্বে এখনো দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ পড়তেও পারে না, লিখতেও জানে না। এ আয়াতসমূহ আরো একটি কারণে হৃদয়গ্রাহী যে, মানব সৃষ্টির ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের তথ্য এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরবি 'আলাক' শব্দের অর্থ হলো জোঁক সদৃশ বস্তু (Leech-like substance) বা রক্তপিণ্ড। মাতৃগর্ভে তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে উন্নয়নশীল ভ্রূণ জোঁকের মতো আকার ধারণ করে। ভ্রূণ যখন পুষ্টির জন্য তার মাতৃ রক্তের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন আলাক বাচ্চা থলির দেয়ালে ঝুলন্ত দেহ বস্তুর মতো ঝুলে থাকে। তাই আলাক শব্দের তিনটি অর্থ বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য। যেমন, জমাট রক্ত পিণ্ড, জোঁক সদৃশ বস্তু এবং ঝুলন্ত দেহবস্তু। সুতরাং Sperm দ্বারা Ovum নিষিক্ত হলে যে ভ্রূণকোষ (Zygote) গঠিত হয় তার প্রাথমিক অবস্থানের নাম আলাক।

আল্লাহ পাকের প্রথম ওহীতে আলাক থেকে মানুষ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ পাক কলমের সাহায্যে মানুষকে শিক্ষা দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কারণ প্রাণীদের মধ্যে মানুষই একমাত্র কলম ব্যবহার করে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করতে পারে। এ শিক্ষার মধ্যে সন্নিবেশিত থাকে তার অসংখ্য সৃজনশীল চিন্তার অভিব্যক্তি। মানুষের এ বিশেষ গুণের কারণে সে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক। মানুষ কলম চালিয়ে তার অভিজ্ঞতার দলিল তৈরি করতে পারে। এ দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে তার আবিষ্কার, অভিজ্ঞতা এবং সৃজনশীল চিন্তাধারা। এসব লিখনির দ্বারা তার নিজের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনেক উপকার সাধিত হয়।

লেখা (Writing) কাজটি খুবই কঠিন এবং অবস্তুতান্ত্রিক। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও সৃজনশীল চিন্তার দ্বারা লেখার কৌশল আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। আর এ আবিষ্কারের পথে সর্বাত্মক অবদান আল্লাহ পাকের। মানুষ প্রায় ৫০০০ বছর আগে ছবির সাহায্যে লেখার প্রচলন করেছিল। যেহেতু তারা লেখার মাধ্যমে বাস্তব চিন্তা ও ধারণাকে একটি স্থায়ী আকারে নিয়ে আসতে পেরেছিল তাই লেখার কৌশল তাদের যোগ্যতায় একটি নতুন গতির যোজনা করেছে। অতপর সময়ের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে লেখা-শৈলীর যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এখন লিখিত শব্দাবলী শুধু যোগাযোগের শক্তিশালী বাহনই নয় উপরন্তু সেগুলো জ্ঞান ও চিন্তা সংরক্ষণের কার্যকর মাধ্যম। লেখার মাধ্যমে জ্ঞান যুগ যুগ ধরে মজুদ হয়ে থাকে পরবর্তী পজন্মের শিক্ষার জন্য। রেডিও, টেলিভিশন, পাক্ষিক পত্রিকা, বই পুস্তক এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সমাজের মঙ্গল সাধন করা যায়।

সুতরাং আল্লাহ পাকের কাছ থেকে যে উপকার মানুষ লাভ করছে সেই উপকারের দ্বারা তার জ্ঞান প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

সময় একটি আপেক্ষিক বিষয়

সূরা আসর-১০৩ : ১

وَالْعَصْرِ.

By the Time.

সময়ের শপথ। (সূরা আসর : ১)

সময় এমন একটি বিষয় যা বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও কৌতূহলী করে তোলে। মহান আল্লাহ পাক এখানে সময়ের শপথ নিয়েছেন এ জন্য যে, সময় কেরল যুগ যুগান্তর গড়ে তোলে।

সাধারণ লোকেরা সাধারণত পরম সময়ে (absolute time) বিশ্বাস করে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি দুইটি ঘটনার মধ্যকার সময়ের ব্যবধানকে পরিমাপ করতে পারে এবং যে কেউ এই পরিমাপ করুক না কেন সময়ের দৈর্ঘ্য একই থাকবে অবশ্য সময় পরিমাপকের ঘড়ি যদি সঠিক থাকে। স্পেস (Space) থেকে সময় সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বাধীন।

মহাবিজ্ঞানী আইন স্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of relativity) অনুযায়ী সময়ের চরম ও পরম কোনো অস্তিত্ব নেই। Time is relative In respect of duration. প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে সময় সম্পর্কে তার নিজস্ব পরিমাপ আছে। এ নিজস্ব পরিমাপ নির্ভর করে ঐ স্থানের উপর যে স্থানে তার অবস্থান বিদ্যমান এবং কিভাবে সে চলাফেরা করছে তার উপর। স্থান ও কাল হলো গতিশীল পরিমাণ। যখন কোনো দেহবস্তু চলাফেরা করে এবং একটি শক্তি ক্রিয়াশীল হয় তখন তা আপেক্ষিকভাবে বর্ণনাযোগ্য স্থান কালের বক্রতাকে আক্রান্ত করে। পরবর্তী সময়ে স্থান-কালের গঠন ঐ পথকে আক্রান্ত করে যে পথে দেহবস্তু চলাফেরা করে। স্থান-কালের ধারণা ব্যতীত কেউ এ বিশ্বের মধ্যে কোনো ঘটনা গ্রহণ করতে পারে না। অতএব সাধারণভাবে আপেক্ষিক তত্ত্বের আলোকে বিশ্বের বাইরে স্থান-কাল সম্পর্কে বর্ণনা করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। গ্যালাক্সিগুলো একে অপর থেকে পশ্চাদগামী হয়ে সরে যাচ্ছে এবং সুদূর অতীতের কোনো সময়ে প্রতিবেশী গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যকার দূরত্ব অবশ্যই শূন্য ছিলো। Big Bang-এর সময় যখন T=O ছিলো তখন মহাবিশ্বের ঘনত্ব এবং স্থান-কালের বক্রতা অসীম হতে

পারতো। এ বিষয়টি আপেক্ষিক তত্ত্বের স্বয়ং একটি ভগ্নদশার দৃষ্টান্ত। তাই এটা Singularity নামে অভিহিত। প্রকৃতপক্ষে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব Singularity -তে এসে ভগ্নদশা লাভ করে। এর অর্থ এই যে, এমনকি Big Bang-এর পূর্বেও বহু ঘটনা ঘটেছিল। ঐসব ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না যে, Big Bang-এর সময় চরমভাবে কি ঘটেছিল। কারণ ঐ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ কথন Big Bang-এর সাথে ভগ্নদশা লাভ করেছিল। Big Bang-এর পরে কি ঘটেছে আমরা শুধু তা-ই জানতে পারি। এর আগে কি ঘটেছে কেউ তা নির্ধারণ করতে পারে না। অতএব আমরা একথা বলতে পারি যে, Big Bang-এর সময় থেকে কালের যাত্রা শুরু হয়েছে।

অতএব সময় বা কাল একটি জটিল এবং দুর্বোধ্য বিষয়। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, "মানুষ কালকে (সময়কে) গালমন্দ করে অথচ আমি কাল।" কাল হিসেবে আল্লাহ পাক নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন এজন্য যে, তাঁর কাছে ভবিষ্যৎ কিংবা অতীত কালের অস্তিত্ব নেই। সবসময় বর্তমান কালের ব্যাপ্তিতে তিনি বিরাজমান। অর্থাৎ সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একটি মাত্র কাল। তা হলো বর্তমান কাল। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক কালের শপথ নিয়ে মানুষের পরিণতি তুলে ধরেছেন।

সৃষ্টির অন্তর্নিহিত তথ্যে আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বের প্রমাণ

সূরা ইখলাস-১১২ : ৩

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ۔

He begets not, Nor is He begotten.

তিনি (আল্লাহ্ পাক) কাউকে জন্মদান করেননি এবং কারো কাছ থেকে জন্মগ্রহণও করেননি। (সূরা ইখলাস : ৩)

সাধারণ জ্ঞান দ্বারা এ আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি করা সহজ ব্যাপার নয়। এ মর্মার্থ দাবি করে যে, যারা জন্মলাভ করেছে তাদের জন্মদাতার অস্তিত্ব কোথা থেকে এসেছে। একটি অবুঝ শিশুর প্রশ্ন, "আমি কোথা থেকে এসেছি।" তার এই প্রশ্নের জবাব তাকে তখনই সান্ত্বনা দেবে যখন সে মানব জন্মের ধারাবাহিকতা (Chain of human reproduction) সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি লাভ করবে। সকলেই আশ্চর্যবোধ করে একথা ভেবে যে, জন্মের ধারাবাহিকতা ধরে যদি পেছনের দিকে যেতে হয় তাহলে জন্ম রহস্য কোথায় গিয়ে শেষ হবে। আমরা মানুষের জন্মের শুরু হযরত আদম (আ) থেকে ধরে থাকি। পবিত্র কোরআনে একথা উল্লেখ আছে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা কাদামাটি থেকে হযরত আদম (আ) কে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির পর তাঁর মধ্যে রূহ বা আত্মা সংযোজন করেছেন। এ সংযোজনের ফলে হযরত আদম (আ) একটি পরিপূর্ণ মানবরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। আর একজন নাস্তিকের প্রশ্ন হলো, "আল্লাহ্ পাককে কে সৃষ্টি করেছেন?" এ প্রশ্ন অত্যন্ত সমস্যাসংকুল। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্টভাবে দিয়েছেন। তা হলো আল্লাহ্ পাক কাউকে জন্মদান করেননি এবং তিনিও কারো কাছ থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। এ জবাবটিও সাধারণভাবে খুবই রহস্যজনক এবং দুর্বোধ্য। তবে এর মর্মার্থ আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নয়নের মধ্যে নিহিত আছে।

কণা পদার্থ বিজ্ঞানের (Particle physcis) উন্নয়ন থেকে আমরা জানতে পারি যে, বড় কণাগুলো ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত এবং ক্ষুদ্র কণাগুলো আরো অধিকতর ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। এভাবে বস্তুজগতে আমরা ক্ষুদ্রত্বের বহুমাত্রা লক্ষ্য করে থাকি। যেমন, অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউক্লী, নিউট্রন ও কোয়ার্কস। উপাদানগত কণিকার অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কোয়ার্ক ও লেপটনের

সন্ধান পান। কোয়ার্ক ও লেপটনই বিশ্বজগতে বস্তুর গঠন উপাদানের সর্বশেষ গঠন উপাদান বলে বর্তমানে স্বীকৃত। কোয়ার্ক পরীক্ষা করে এখনো দেখা সম্ভব হয়নি। পরীক্ষার মাধ্যমে বহু তথ্য জানা গেছে যেগুলোকে কেবলমাত্র তখনই ব্যাখ্যা করা যাবে যখন আমরা ধরে নেব যে হেডরন গঠিত হয়েছে আংশিকভাবে চার্জপ্রাপ্ত বিভিন্ন কোয়ার্কের সমন্বয়ে। কোয়ার্ক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যেমন আপ-কোয়ার্ক ডাইন-কোয়ার্ক, স্টেঞ্জ-কোয়ার্ক, চার্মড-কোয়ার্ক, টপ-কোয়ার্ক এবং বটম্-কোয়ার্ক। কোয়ার্কের আঙ্গিকে হেডরনীয় বস্তুর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। কোয়ার্ক আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। তাকে কখনো দেখা যায় না। যদি মনে করা হয় যে, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তির অভিক্ষেপণ (Projectiles) দ্বারা আঘাত করে হেডরনকে মুক্ত করা গেলে তা গোচরীভূত হতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ যে, এ প্রক্রিয়ায় অসংখ্য নিউক্লিয়াসের ধ্বংস ঘটায় এবং পরিণামে কোয়ার্ক দেখা সম্ভব হয় না। এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, কোয়ার্ক (Quark) কোনো দিনই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে না তবুও কোয়ার্ক আছে বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করে থাকেন। যদিও কোয়ার্ক দেখা যায় না তবুও তার গঠন গুণাবলী সম্পর্কে জানা যায়। কোয়ার্কের অদৃশ্যতা সাধারণ মানুষের যুক্তিকে এভাবে প্রভাবিত করে যে, A যদি B দ্বার গঠিত হয় তাহলে A-কে ভাঙলে কেন B পাওয়া যাবে না। আমাদের সাধারণ জগতে এ যুক্তি-তর্কের অর্থ আছে কিন্তু সাব এ্যাটমিক কণিকার (Sub Atomic particles) জগতে এ যুক্তি-তর্ক অর্থহীন। অতএব বস্তুজগতে বিজ্ঞানীরা মৌলিক কণিকার অস্তিত্ব আছে বলে মেনে নিতে প্রস্তুত। এ সময়ে ঐ মৌলিক কণিকা কোন্ বস্তু থেকে উৎপন্ন তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাই না। এ নিয়ে যখন মাথা ঘামাই না তখন আমরা কেন সর্বোত্তম মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব মেনে নেব না? স্রষ্টার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে সৃষ্টির অস্তিত্ব ভাবা ক সম্ভব? এ বিষয়ে আমাদের যা জানা প্রয়োজন তা হলো মহান স্রষ্টার সিফাত। তাঁর সিফাতের বৈশিষ্ট্য কোয়ার্কের মধ্যে বিদ্যমান বলে বিশ্বাস করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলার সিফাতের কথা পবিত্র কোরআনের প্রায় প্রত্যেকটি সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত তুলনামূলক আলোচনা এ আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে আমাদের সহায়তা দান করে।

এখন আমরা দেখবো আল্লাহ পাকের ধারণা সম্পর্কে উৎপাদনকারীর (Generator) ভূমিকা কিভাবে সাহায্য করে। প্রথমে আমরা পরীক্ষা করে দেখবো যে উৎপাদনকারীর যান্ত্রিক কলাকৌশল মৌলিক কণিকার গবেষণায় কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে।

অধুনা যদিও পদার্থ বিজ্ঞানীরা কোয়ার্কের অস্তিত্ব নিয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে করেন

যে, হেডরনীয় বস্তুর শেষ গঠন উপাদান হলো কোয়ার্ক। এটা মনে করা হয় যে, কোয়ার্কের আভ্যন্তরীণ গঠন কাঠামো আছে। অর্থাৎ কোয়ার্কের অধীনস্থ আরো গঠন একক রয়েছে, তাহলে পদার্থের গঠন উপাদানের ধারাবাহিকতার শেষ কোথায়। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে এ প্রশ্নটি খুবই বিভ্রান্তিকর। গ্রীকদের সময় থেকে শুরু করে অদ্যাবধি মানুষ বস্তু উৎপাদনকারীর ধারা আবিষ্কার করেছে। মিশ্রণ সকল বস্তুর উৎপাদক বলে বিবেচিত। মিশ্রণের উপাদান, অণুর উপাদান, এ্যাটমের উপাদান, এ্যাটমের নিউক্লী ও ইলেকট্রন, নিউক্লিয়ার কোয়ার্ক এবং ভবিষ্যতে কোয়ার্কের আভ্যন্তরীণ নিজস্ব গঠন উপাদানের আবিষ্কারের চেষ্টা কিছুটা শেষ উৎপাদনকারীর সন্ধানে পিঁয়াজ সদৃশ বিশ্বজগতের খোসা ছাড়ানোর মতো অবস্থা। পিঁয়াজের উপরের খোসা ছাড়াবার পর পরবর্তী খোসার সাক্ষাৎ। পরবর্তী খোসার ছাড়াবার পর আরো একটি খোসার সাক্ষাৎ এবংএভাবে খোসা ছাড়ানোর অগ্রযাত্রা অন্তহীন। ঘটনাক্রমে আমরা ঐসব কণিকার কথা উল্লেখ করেছি যেগুলোর স্থায়িত্ব অবিচল। এছাড়া বহুসংখ্যক কণিকা রয়েছে যারা খুবই ক্ষণস্থায়ী। বস্তুর উৎপাদনের আঙ্গিকে উপাদান কণিকার সংখ্যা এতো বেশি যে, এ সমস্ত কণিকার সমষ্টির যেন কোন অর্থই হয় না। অকারণে যেন এ সংখ্যাধিক্য।

'Generated' এবং 'Generator' শব্দ দুইটি সম্পর্কে যদি প্রশ্ন তোলা হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং মহান আল্লাহ পাক ঐশী বাণীতে যা বলেছেন, 'তিনি কাউকে জন্মদান করেননি এবং কারো দ্বারা তিনি জন্মাননি' তা আমাদেরকে কোনভাবে বিভ্রান্ত করে না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নয়ন সীমিত। এ জ্ঞান অসীমের সন্ধান দিতে পারে না। তবে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আবেদন অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু তা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্মগত অস্তিত্ব ও শক্তির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে না।

সর্বোত্তম মহান আল্লাহ পাকের প্রকৃতি সম্পর্কে যে চূড়ান্ত সত্য নিহিত সেই সত্য পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়। আমরা মহাবিশ্বের স্থান-কাল গঠন অবয়বের মধ্যে বসবাস করি। এ গঠন অবয়ব সম্পর্কে আমাদের দেহগত এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পদ্ধতিগত অবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে স্থান-কাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। আমরা মহান আল্লাহর ব্যাপক সিফাত দ্বারা তাঁকে অনুভব করতে পারি।

মহামহিম আল্লাহ্ পাক উষার উন্মেষ ঘটান

সূরা ফালাক-১১৩ : ১

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.

Say : I seek refuge with (Allah), the Lord of the Day-break.

বলুন (হে মুহাম্মদ সা.), আমি আশ্রয় খুঁজি প্রভাত সৃষ্টিকারী প্রভুর কাছে। (সূরা ফালাক : ১)

মহান আল্লাহ্ পাক অন্ধকারের বুক চিরে উষার সূচনা করেন। হাসিন উষার স্নিগ্ধ আলোতে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট পৃথিবী ভাস্বর হয়ে উঠে।

পৃথিবী আবর্তনের ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের একটি জায়গা দিগন্ত রেখার এমন নিচে এসে পড়ে যেখানে সূর্যের কিরণ সরাসরি পৌঁছাতে পারে না। সেখানকার আকাশ-আলোকিত হয়ে উঠে যখন মেঘ বা ধূলার বুকে সূর্য কিরণ প্রতিফলিত হয়। এভাবে প্রতিফলিত সূর্য কিরণের আলোককে প্রভাত বলা হয়। এ প্রভাত ততক্ষণ দেখা যায় না যতক্ষণ ষষ্ঠ ম্যাগনিচিউডের নক্ষত্রগুলোকে মধ্যগগনে দেখা যায়। ষষ্ঠ ম্যাগনিচিউডের নক্ষত্রগুলো খুব অনুজ্জ্বল হলেও তাদের খোলা চোখে দেখা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে, সূর্য যখন দিগন্তের ১৮° কিংবা তার চেয়ে বেশি নিচে থাকে তখন ঐ নক্ষত্রগুলোকে দেখা যায়। সুতরাং সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে থাকলে উষাকাল শুরু হয়।

প্রকৃতির সঙ্গে যারা সংস্পর্শ রক্ষা করে চলেন তারা উষাকালের সুন্দর কার্যকারিতা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন। পূর্বকালে প্রথমে হাজির হয় মৌল চূড়ার বরফের মত শুভ্রতা। তারপর আঁধারী এলাকার অনুপ্রবেশ। অতঃপর অন্ধকার থেকে মুক্তার মত শুভ্রতা নিয়ে হেসে উঠে হাসিন উষা। দিবসের সূচনা হওয়ার সাথে সাথে নিবিড় নিরবতা ভেঙ্গে যায়। আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ অনুসন্ধানের জন্য তথ্য জীবন জীবিকার সন্ধান লাভ করার জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়ে মানব জাতি ও অন্যান্য প্রাণী। মানুষের মধ্যে কেউ চাকরিতে, কেউ ব্যবসায়, কেউ কলকারখানায় উৎপাদনে আর কেউ বা কৃষি কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। আবার অন্যান্য প্রাণীরা আল্লাহ্ তা'আলার ছড়িয়ে থাকা রিজিক সন্ধান করে মাঠে-ময়দানে, বনে-জঙ্গলে

এবং পাহাড়-পর্বতে। প্রত্যেক প্রাণীর জন্য আল্লাহ পাক রিজিকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, কেউ রিজিক ব্যতিরেকে অনাহারে থাকে না। তাই দেখা যায় পশু পাখিরা ভোরের সূচনা হলে বেরিয়ে পড়ে এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে বাসায় ফেরে।

প্রভাতকাল কতক্ষণ স্থায়ী হবে তার হিসাব করা হয় সূর্য কতক্ষণে দিগন্তের ১৮° উপরে উঠতে থাকে সে সময়ের পরিমাপ দ্বারা। এটা নির্ভর করে স্থানের অক্ষাংশের উপর এবং সূর্যের অস্তায়নের উপর। অর্থাৎ পৃথিবীর উপরের কোনো স্থানের অবস্থানের উপর। নিরক্ষরেখার উপর ঊষাকাল সবচেয়ে ছোট হয় এজন্য যে, সূর্যের দিনের পথ দিগন্ত রেখার সাথে পরস্পর সমকোণে ছেদ করে। বিষুব রেখার উপর নিরক্ষীয় দিনগুলোতে ঊষার অবস্থিতিকাল হলো ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট। অর্থাৎ সকাল আরম্ভ হয় সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট পূর্বে। মার্চ মাসে ৩০° উত্তর অক্ষাংশে ঊষাকাল স্থায়ী হয় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট এবং জুন মাসে ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট।

অতএব সকল অনিষ্ট কর্মকাণ্ড থেকে আত্মরক্ষার্থে প্রভাত সৃষ্টিকারী মহান প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য এ আয়াতে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে তার সপ্রশংস মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা দেখি যে, আল্লাহ পাক দয়া করে যদি দিবসের সূচনা না করতেন তাহলে আমরা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকতাম। এর ফলে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ অন্বেষণের কাজ ব্যাহত হতো। মানুষ আবিষ্কারের পথে এগিয়ে যেতে পারতো না পৃথিবী হিম-শীতল রূপ ধারণ করে থাকতো। এর ফলে জীবন ধারণ কিছুতেই সম্ভব হতো না। পরম হিতৈষী করুণাময় আল্লাহ্ পাক তাঁর নির্ধারিত নিয়ম-কানুন অনুসারে প্রভাত সৃষ্টি (day break) করে থাকেন এবং তাঁর মহান সৃষ্টি নকশা অনুযায়ী সৃষ্টিকুলের পক্ষে সহায়ক বিধান বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই সৃষ্টি জুড়ে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় না।

পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের প্রতি লাখো কোটি সজুদ।

সরোয়ারে কায়েনাত জনাবে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি লক্ষ কোটি দরুদ ॥

"আঁধার ঘেরা পৃথিবীতে আলোর ঝলক"

বিশাল মহাবিশ্বের এক এবং একক স্রষ্টা মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তাঁর সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক সুন্দর পূত-পবিত্র সৃষ্টি মহানবী মুহাম্মদ (সা)। নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ মানব জাতির জন্য প্রশ্নাতিতভাবে গ্রহণযোগ্য আদর্শ মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা লাভ করেছিলেন বলেই জীবন ব্যাপী এতটুকু ভুল-ত্রুটি করেননি।

আল্লাহ পাক নবীজি (সা) কে সৃষ্টি করে সৃষ্টিকে পরিপূর্ণ করেছেন। আল্লাহর

আকাশের নিচে জমিনের উপরে তিনিই সর্বাধিক সম্মানিত, অতিশয় প্রশংসিত এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। একথা খুবই প্রণিধানযোগ্য যে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন, "আমি আপনার আলোচনার দিগন্তকে প্রসারিত করেছি। (সূরা ইনশিরাহ ঃ ৪)। মহাকবি মিলটন নবীজী (সা) সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য করেছেন– "Beyondless, boundless and bottomless sea." নবীজি (সা)-এর জীবন আদর্শ এক বিশাল ও বিস্তৃত মহাসাগর। অর্থাৎ এমন এক প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ নবী আমরা লাভ করেছি যাঁর আলোচনা কেয়ামত পর্যন্ত চলবে তবুও শেষ হবে না। আল্লাহ পাক অনাবিল সুন্দর আদর্শ তাঁর মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন। তাই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি (আম্বিয়া : ১০৭)। এ আয়াতের তাৎপর্য হলো নবীজি (সা)-এর প্রতিটি বাণী, প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি অনুমোদন আমাদের জন্য রহমতস্বরূপ। তাঁকে অনুরসণ করেই যদি আমরা কথা বলি, কাজ করি, আচার-আচরণ প্রদর্শন করি তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে রহমত দ্বারা ধন্য করবেন। তাঁর জীবন আদর্শ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন। অসংকোচ অনাড়ষ্ট স্পষ্ট অর্থ পূর্ণ কথা। এটা সবাই জ্ঞাত যে, সহিষ্ণুতা, চরম ধৈর্য ও ক্ষমাসুন্দর গুণ তাঁর মধ্যে ব্যাপকভাবে ছিলো। সাধারণত ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণুতার অধিকারী মানুষের মধ্যে কোনো না কোনো ত্রুটি প্রতিভাত হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো মহানবী (সা)-এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তার অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমন উন্নত সুন্দর ছিলো যে, তার বিরুদ্ধে শত্রুদের চক্রান্ত আয়োজন নির্যাতন যতো বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁর ধৈর্যের মাত্রাও ততো বেড়েছে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, প্রিয় নবী (সা) কে দুইটি কাজের মধ্যে একটি বেছে নিতে বললে তিনি সরল কাজটিই বেছে নিতেন। জটিলতা এড়িয়ে চলতেন। পাপের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্ম থেকে বহু দূরে অবস্থান করতেন।

এমন রহমতের নবী আল্লাহ পাক আমাদের দান করেছেন যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়ে যেতো। তিনি প্রাণের শত্রুকেও কখনো বদদোয়া করতেন না। সবাইকে সমানভাবে দোয়া করতেন। তিনি যখন ছোট্ট বালক ছিলেন মক্কায় অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কোরায়েশ বংশের লোকেরা বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে আবু তালেবের (নবীজির চাচা) নিকট উপস্থিত হলেন। আবু তালেব বালক মুহাম্মদ (সা)কে সঙ্গে নিয়ে কাবা ঘরের সামনে পৌছলেন। বালকটিকে দেখে মেঘে ঢাকা সূর্য মনে হচ্ছিলো। বালকের পবিত্র পিঠ কাবা ঘরের দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়া হলো। বালক আবু তালেবের হাতের

উপর আঙ্গুল রাখলেন। তখন আকাশে এক টুকরা মেঘও ছিলো না। অমনি মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। শহর প্রান্তর সজীব উর্বর হয়ে উঠলো।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবীজি (সা)-এর দরবারে আরজ করলেন, "হুযূর আমি আপনার কাছে আসার কারণে আমার আম্মা আমাকে মার-ধর করেছে। নবীজি বললেন, তোমার মা তোমাকে মেরেছে আমি তো কিছুই করতে পারি না। হযরত আবু হুরাইরা বললেন, হুযূর আমার মায়ের জন্য একটু দোয়া করুন। নবী পাক (সা) হাত তুলে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ আবু হুরাইরার মাকে হেদায়ত দান করুন।" (আবু হুরাইরার (রা) মা তখন মুশরিকা ছিলেন।) নবীজি দোয়া করতেছেন আর আবু হুরাইরা সমানে দৌড়াচ্ছেন। দৌড়ে বাড়ি পৌঁছে মায়ের কোমল কণ্ঠ শুনলেন। মা বললেন, বাবা আবু হুরাইরা আমি জীবনের ভুল বুঝতে পেরেছি। আমাকে মুহাম্মদ (সা)-এর দরবারে নিয়ে চলো। আমি ইসলাম কবুল করবো। সুতরাং নবীজি (সা)-এর দোয়া এতো দ্রুত কবুল হয়ে গেল।

মুহাম্মদ (সা)-এর দানশীলতা পরিমাপ করা অসম্ভব ছিলো। দারিদ্র্যের আশংকা থেকে মুক্ত মানসিকতা নিয়ে তিনি দান করতেন। তাঁর দানশীলতা রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে অধিক বেড়ে যেতো। রমযান মাসে প্রতি রাতে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কোরআন পাঠ করে শোনাতেন। তিনি কল্যাণ ও দানশীলতায় পরিপূর্ণ বাতাসের চেয়েও অগ্রণী ছিলেন।

বীরত্ব বাহাদুরির ক্ষেত্রে প্রিয় নবী (সা) ছিলেন সবার আগে। ইতিহাসে তিনি সবচেয়ে সফল শ্রেষ্ঠ একজন বীর। কঠিন পরিস্থিতিতে বিশিষ্ট বীর পুরুষগণ ইতঃস্তত করলেও নবীজি এ সময়েও অটল দৃঢ়তায় টিকে থাকতেন। প্রতিকূল সময়েও পশ্চাদপসারণ না করে সামনে এগিয়ে যেতেন। তাঁর দৃঢ়তায় এতটুকু বিচলিত ভাব আসতো না। হযরত আলী (রা) বলেন, যে সময় যুদ্ধের আশংকা দেখা দিতো এবং কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হতো সে সময় আমরা নবীজির (সা) ছত্র ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতাম। তাঁর চেয়ে এতো বেশি দৃঢ়তা নিয়ে কেউ শত্রুর মোকাবেলা করার সাহস করতো না।

মহানবী (সা) ছিলেন সর্বাধিক লাজুক প্রকৃতির। তিনি সাধারণত মাটির দিকে দৃষ্টি রাখতেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী পাক (সা) পর্দানসীন কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। লজ্জাশীলতা এবং আত্মসম্মানবোধ এতো প্রবল ছিলো যে, কারো মুখের উপর সরাসরি অপ্রিয় কথা বলতেন না। কাউকে কখনো লজ্জা দিতেন না। বিব্রত করতেন না।

মহানবী (সা) ছিলেন সবচেয়ে বেশি ন্যায়পরায়ণ। পাক-পবিত্র, একনিষ্ঠ সত্যবাদী এবং বিশিষ্ট আমানত সংরক্ষণকারী। বন্ধু শত্রু সকলেই এটা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেন। নবুওয়াত লাভের আগেই তাঁকে আল-আমিন উপাধি দেয়া হয়েছিল এবং তাঁর অপর উপাধি ছিলো আস-সাদেক।

নবীজি (সা) ছিলেন অতি বিনয়ী, নিরহঙ্কার। রাজা-বাদশাহদের সম্মানে তাদের সেবকেরা যেভাবে অবনত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে রাসূলে পাক (সা) তাঁর সম্মানে সাহাবাদের সেভাবে দাঁড়াতে নিষেধ করতেন। তিনি মিসকীন গরীবদের সাহায্য করতেন। সাহাবাদের খবরাখবর নিতেন। তাদের কুশল জিজ্ঞেস করতেন। ভাল জিনিসের, ভাল কাজের প্রশংসা করতেন। সব বিষয়ে মধ্যমপন্থা পছন্দ করতেন। ইয়াতীমদের ভালবাসতেন। বিধবাদের আশ্রয় দিতেন। ক্রীতদাসদেরও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন। যারা মানব সেবায় নিয়োজিত হতো তাঁদের খুব পছন্দ করতেন। অর্থাৎ তাঁর কাছে পরোপকারী মানব সেবকেরাই ছিলো সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী।

মহানবী (সা) অঙ্গীকার পালনে ছিলেন বিশেষ যত্নবান। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর প্রতি অধিক মাত্রায় খেয়াল রাখতেন। খাদেমের প্রতি কখনো বিরক্তি প্রকাশ করতেননা। বরং খাদেমকে কাজে সহায়তা করতেন। দরিদ্র মিসকীনদের বেশি ভালোবাসতেন। তাদের সাথে আন্তরিকতা নিয়ে মেলামেশা করতেন এবং তাদের জানাযায় হাজির হতেন, সম্মিলিত কোনো কাজে নিজেও অংশগ্রহণ করতেন। একবার সাহাবাদের সাথে তিনি সফরে ছিলেন। এ সময় একটি বকরী যবাই করার সিদ্ধান্ত হয়। একজন বললেন, যবাই করার দায়িত্ব আমার। অন্যজন বললেন, চামড়া ছাড়ানোর দায়িত্ব আমার। আর একজন বললেন, রান্না করার দায়িত্ব আমি পালন করব। এরপর বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা) বললেন, কাঠ সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমি পালন করবো। সাহাবারা বললেন, হুযূর আপনার কাজ আমরা করে দেব। নবীজি রাজি হলেন না।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে আল্লাহ পাক অসংখ্য মুজিযা দান করেছেন। তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মুজিযা হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন। আর একটি অন্যতম মুজিযা হলো আল্লাহ পাক মুহাম্মাদ (সা) কে এক বিশেষ আলো দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তা না হলে তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Grarity) অতিক্রম করে মেরাজ রজনীতে আরশে আজিম পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হতেন না। সেখানে আল্লাহ পাকের মুখোমুখী পর্দাবিহীন অবস্থায় কথা বলতে পারতেন না। হযরত মূসা (আ) তূর পর্বতে আল্লাহ পাকের সাথে দিদার করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর একটুখানি আলোর

ঝলকে বেহুঁশ বেতাব হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তা'আলাকে দর্শন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আলোর সৃষ্টি বলেই মুহাম্মদ (সা)-এর বেলায় তা ঘটেনি। আল্লাহ পাকের সাথে মুহাম্মাদ (সা)-এর কথা বলার প্রমাণ মে'রাজের হাদীসে রয়েছে। তাছাড়া আলোর তৈরি ফেরেশতাকেও তিনি প্রকৃত অবয়য়ে দেখেছেন। দুইবার এরূপ দেখা হয়েছিল। পত্রি কোরআনের সূরা নজমে আল্লাহ পাক সেকথা উল্লেখ করেছেন। তাই পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ পাক মুহাম্মদ (সা) কে আলো (নূর) বলে ঘোষণা দিয়েছেন। (হে মানব জাতি,) আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে একটি আলো এবং একখানা স্পষ্ট কিতাব। (সূরা আল-মায়েদা : ১৫)

সুতরাং যারা মহানবী (সা)-এর আদর্শ অনুসরণ করেন, তাঁর সুন্নতকে ধারণ করে জীবন যাপন করেন প্রকৃতপক্ষেই তাঁরাই নবীজির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁকে মর্যাদা দেন এবং তাঁকে ভালোবাসেন। রাসূলে পাক (সা) এক হাদীসে বলেছেন, মান আহাব্বা সুন্নাতি...) যারা আমার সুন্নতকে ভালোবাসে প্রকৃতপক্ষে তারা আমাকেই ভালোবাসে...)

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যারা নবীজির সুন্নতের পরোয়া না করে তাঁর আদর্শ অনুকরণ-অনুসরণ না করে শুধু জশনে জুলুছ ও ওরশের নামে পশু যবাই করে তা অন্তরসারশূন্য, লোক দেখানো মাত্র। কারণ জশনে জুলুছ এবং ওরশ নবী পাকের সুন্নত নয়, নফল নয় ওয়াজিবও নয়। এগুলো করেই সাধারণ লোক মনে করে আমরা বিরাট ধর্মীয় কাজ করেছি। মোটেই না। তবে নবী পাকের আদর্শ ধারণ করে তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হলেই কেবল নবীজির প্রতি সম্মান ভালোবাসা প্রকাশ পাবে। এরপরেই জশনে জুলুছের সার্থকতা।

অতএব, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, নবীজির প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য তাঁর পবিত্র সুন্নত ও জীবনাদর্শ নিজেকে অনুসরণ করতে হবে এবং চারপাশের লোকজনকে অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। আর এটা খুবই সত্য যে, আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দারা নবীজির জীবনাদর্শ হুবহু অনুসরণ করে পার্থিব জীবনে সফলকাম হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার মকবুল বান্দায় পরিণত হয়েছেন।

সূত্র : আর রাহীকুল মাখতূম, আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, অনুবাদ- খাদিজা আখতার রেজায়ী।

আল্লাহ্ পাক ও ফেরেশতাগণ নবীজি (সা)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন

সূরা আহ্যাব-৩৩ : ৫৬

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

Allah and his Angels sendblessings on the Prophet : Oyauthat believe! send you blessings on him and salute With all respect.

আল্লাহ্ পাক এবং তার ফেরেশতাগণ নবীজি (সা)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরাও তাঁর প্রতি যথাযথভাবে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো। (সূরা আহ্যাব : ৫৬)

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী পাক (সা)-এর প্রতি নিয়মিত রহমত ও শান্তি প্রেরণ করে থাকেন। আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য ফেরেশতারও নবীজি (সা)-এর প্রতি অবিরত দরূদ পাঠ করেন। এ আয়াতে ঈমানদার লোকদের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, যারা নিয়মিত প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করে থাকেন।

এটা খুবই সত্য যে, আল্লাহ্ পাকের পরে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হলেন মুহাম্মদ (সা)। তাঁর সম্মানকে এতো বেশি সমুন্নত করা হয়েছে যে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, আমার নবীর সামনে তোমরা কেউ তাঁর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলবে না। যদি বল তাহলে তোমাদের যাবতীয় আমল নষ্ট করে দেয়া হবে। যার সম্মানে পবিত্র কোরআনের এ আয়াত তিনি কী ধরনের ব্যক্তিত্ব হতে পারেন? যেহেতু তিনি হায়াতুন নবী তাই হাজীরা যখন তাঁর রওজা মোবারক জেয়ারত করতে যান তখন কেউ সেখানে উচ্চ গ্রামে কথা বলেন না। সবাই কোমল কণ্ঠে সালাম পেশ করেন। নবীজি (সা) রওজা শরীফ থেকে সালামের জওয়াব দিয়ে থাকেন। এ তথ্য হাদীসে রয়েছে। জীবনে একবার নবীজির প্রতি দরূদ পড়া ফরয। নবীজি (সা)-এর নাম উচ্চারিত হওয়ার সাথে

সাথে দরুদ পড়া ওয়াজিব। নামাযের মধ্যে শেষ বৈঠকে নবী পাক (সা) ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইত-এর উপর দরুদ পড়া বাধ্যতামূলক। এমনকি জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপরও দরুদ পাঠ করতে হয়।

নবীজি (সা)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করা এতো বেশি ফজিলত যে, আমি পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে তা জেনে অভিভূত হয়েছি। নবী পাক (সা)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করে যদি আল্লাহ তাআলার দরবারে মুনাজাত করা হয় তাহলে সেই মুনাজাত আল্লাহ পাক কবুল করে নেন। তাই আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে নবীজির শানে দুই ধরনের দরুদ লিখে এ বইয়ে সংযোজন করেছি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ তা পাঠ করে নবীজি (সা)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে এবং আল্লাহ পাকের রহমত আমাদের সকলের প্রতি অবারিত হয়ে যাবে।

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ
ওয়ালা আলি সায়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ।

* প্রতীক্ষিত সুবহে সাদেক কে এলো এই ভুবনে
মা আমিনা মহিয়সী পূর্ণিমার চাঁদ দোলনে ॥
* সৃষ্টি জুড়ে উঠলো ধ্বনি লাখো সালাম আলাইকা
আল্লাহ তা'আলা জানাই সালাম পড়ে দরুদ মালাইকা ॥
* খোদার হাবীব আমার একা আকুল যথা আল-হেরা
দাওগো খোদা দাওগো খোদা জপে সদা সাহারা ॥
* গ্রহ-রবী চন্দ্র-তারা ঝলকে উঠে আকাশে
সপ্ত আকাশ ঝুঁকে পড়ে প্রিয় নবীর সকাশে ॥
* কুহে-তুরে খোঁজে বেড়ায় বনের হরিণ, পাপিয়া
ঊর্মিমুখর আরব সাগর নবীর তরে জাগিয়া ॥
* অবশেষে ছুটে এলেন মা-জননী হালিমা,
বুকে ধরে নিয়ে গেলেন জান্নাতের সেই মহিমা ॥

* মা হালিমা চলতে পথে কিযে রহমত দৃশ্যমান
চলো চলো প্রাণের দুলাল আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবান ॥
* আমার নবী চলতে পথে ফেরেশতা দেয় পাহারা
শির উপরে মেঘের ছায়া আল্লাহ তা'আলার ইশারা ॥
* আমার নবী হেটে চলেন আরব ভূমি কাননে
বৃক্ষরাজি লুটিয়ে পড়ে প্রিয় নবীর সম্মানে ॥
* আমার নবীর পেশানীতে চমকে আলো একটানা
হাসলে তিনি জোছনা ঝরে প্রেমিক দরবেশ দেওয়ানা ॥
* ওরে চাকোর এখন কেন জ্যোস্না রাতে জাগোনা
চাঁদের আলোয় মুগ্ধ নয়ন এখন কি আর ভরে না ॥
* আসল চাঁদের সুধা নিতে যাবে কি ভাই মদিনা
আমার হৃদয় মদিনাতে দেওয়ানা মন দেওয়ানা ॥
* আমার নবীর মদিনাতে বর্ষে সদা করুণা
আল্লাহ্ তুমি দয়া করো নসিব করো মদিনা ॥
* আজিমুশ শান আমার নবী প্রশংসিত মুহাম্মাদ
কি মহিমা দিলে খোদা নিখিল সৃষ্টি প্রেমাস্পদ ॥
* দ্বীনের হাদি আমার নবী দো-জাহানের বাদশাহ
তাঁহার প্রিয় দশ সাহাবা আশারা মোবাশ্শারা ॥
* রাসূলে আকরাম আমার নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন
ধন্য হলো নিখিল সৃষ্টি লওহে কলম ও জমিন ॥
* আল কোরআনের ছবি তিনি দ্বীনের নকীব মুহাম্মাদ
পথহারা জিন ও ইনসান পেল দ্বীনের সরল পথ ॥
* কতো নবী কাঁদেন খোদা নবী কেন বানালে
মুহাম্মাদের উম্মত হলে জুড়াতো প্রাণ আড়ালে ॥
* হযরত ঈসা তাঁহার ধ্যানে নিশিথে রয় মশগুল
নবুয়তের বিনিময়ে হলো মুনাজাত কবুল ॥
* রোজ হাশরের কঠিন দিনে হবে না কেউ দিশারী

আমার নবী প্রিয় হযরত শাফাআতের কাণ্ডারী ॥
ইয়া নবী সালাম আলাইকা
ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা
সালাওয়া তুল্লাহ আলাইকা

রজনী নিবিড় গরিমা
ফেরেশতা গাহে মহিমা
করুণা বহে কাননে
নবীজি এলেন ভূবনে ॥

আকাশে আকুল সেতারা
বিরহে ব্যাকুল সাহারা
খুশিতে মশগুল আলহেরা
নবীজির রাহে পিয়ারা ॥

পাপিয়ার গানে মুহাম্মাদ
নিখিলের ধ্যানে মুহাম্মাদ
এই নামে গাহি অবিরল
দো-নয়ন জলে টলমল্ ॥

হৃদয়ে আমার মুহাম্মাদ
নয়নে আমার মুহাম্মাদ
কি মধু নামের আছরে
আলোড়ন জাগে অন্তরে ॥

জান্নাতের নিশান মদিনা
আরশের যিলাল মদিনা
হে-খোদা নসিব করো না

পৌঁছে-দাও সোনার মদিনা
আরবে নবীজির মাকাম
রহমত বর্ষে অবিরাম
নবীজি খোদার রহমত
করুণার ছবি প্রেমাস্পদ ॥

রহমতে আলম নবীজি
সরওয়ারে জাহান নবীজি
দুনিয়ায় তিনি আখেরী
আঁধারে আলোর দিশারী ॥

ফুটিয়া গোলাপ কাননে
নবীজির রাঙা কদমে
লুটিয়ে পড়ে রায়হানা
তবুও হৃদয় জুড়াই না ॥

নবীজি হাঁটেন নিশিথে
পেশানী চমকে আলোতে
জোছনা ঝরে একটানা
বিরহী চকোর দিওয়ানা ॥

নবীজি আমার মদিনা
থাকিতে ঘরে পারি না
দেওয়ানা দিলে রে-সাকি
টলমল্ জলে দো-আখি ॥

শেষ কথা ও মুনাজাত

আমি মহান আল্লাহ্ পাকের প্রতি লাখো কোটি সজুদ পেশ করছি। যিনি বিশাল মহাবিশ্বকে তাঁর রহমত দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ব্যতিরেকে সৃষ্টিজগতের কোনো কিছু এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারবে না। এটা চিরন্তন সত্য।

সরওয়ারে কায়েনাত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি লক্ষ কোটি দরুদ। যাঁকে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ পাক তাঁর সৃষ্টিকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করেছেন।

পবিত্র কোরআন একটি বিস্ময়। একটি আশ্চর্যজনক গ্রন্থ। সৃষ্টি জগতের এমন কোনো বিষয় বা বস্তু নেই যা এ কিতাবে সন্নিবেশিত হয়নি। "সাইন্স ফ্রম আল কোরআন" গ্রন্থে যেসব আয়াত বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, প্রতিটি আয়াতের গভীরে অসীম ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে। কারণ এর আয়াতগুলো মানব মনে যে ধারণা সৃষ্টি করতে চায় তা হলো সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে দেখ, তুমি আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে। বস্তু জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু মহান স্রষ্টার একক অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। এমনকি মানুষ যদি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাতেও দেখা যাবে যে, আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর নিদর্শন এতে বিদ্যমান। সৃষ্টি জগতের নিয়ম-নীতি, দিন-রাত্রির পরিবর্তন, সকাল-সন্ধ্যার আগমন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সবকিছুই মানুষকে সৃষ্টির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানায়। সর্বময় শক্তিমান আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর নিদর্শন, হিকমাত, তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যতা, তাঁর কলা-কৌশলের অপূর্ব মাহাত্ম্য, তাঁর অনন্ত অসীম দনা, তাঁর অদ্বিতীয় কীতিসমূহ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চিন্তাকে আন্দোলিত করে। যিনি সত্য সন্ধানী, যিনি কল্যাণকামী, তিনি অবশ্যই মহাবিশ্বের অপূর্ব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে একক আল্লাহ্ পাকের প্রতি সজুদ পেশ করে বারে বারে।

অতএব, এ গ্রন্থে বিজ্ঞানের ইঙ্গিতবাহী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে তত্ত্বগত ত্রুটি এবং ব্যাখ্যাগত বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে সম্মানিত পাঠকগণ তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি। আর আমার মানবীয় দুর্বলতার জন্য মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করি। গ্রন্থটি রচনায় যারা আন্তরিকতার সাথে আমাকে সহযোগিতা করেছেন যারা এর সফলতা কামনা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ এবং তাদের সকলের জন্য আল্লাহ্ পাকের অবারিত রহমত

কামনা করছি এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অবনত চিত্তে কোমল কণ্ঠে মুনাজাত করছি।

হে মহামহিম আল্লাহ পাক

আমি এক নগণ্য ভিক্ষুক

তোমার শাহী দরবারে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করেছি

তোমার রহমতের ভাণ্ডার থেকে ভিক্ষা কামনা করছি

কঠিন হিসাব দিবসে আমাকে আমার পিতা-মাতাকে আর মুমিন ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দিও

আমার এ গ্রন্থখানা পরকালীন নাজাতের উছিলা করে দিও

হাশরের ময়দানে আমার আমলনামা আমাকে ডান হাতে দিও

নবীজির শাফাআত নসীব করে দিও

জীবনের কঠিন মুছিবতে তোমার উপর ভরসা করার ধৈর্য দিও

পার্থিব জীবনে তোমার পরিচালনা আর তত্ত্বাবধান দান করো

আমাকে নামায কায়েমকারী হিসেবে কবুল করো

আমার সন্তান-সন্ততিকে কোরআন ও সুন্নাহর অগাধ জ্ঞান দান কর;

আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি সৎ পথ, সংযম, সচ্ছলতা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকার

আমি প্রার্থনা করছি সুস্বাস্থ্য, পবিত্রতা আমানতদারী, উত্তম চরিত্র এবং তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার

হে আল্লাহ পাক, তোমার নিকট আশ্রয় চাই শ্রবণ শক্তির অপকারিতা থেকে, দৃষ্টি শক্তির অনিষ্ট থেকে; জিহ্বার অমঙ্গল থেকে, অন্তরের অকল্যাণ থেকে

তোমার নিকট আশ্রয় চাই অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, বার্ধক্য ও কার্পণ্য থেকে

তোমার নিকট আশ্রয় চাই এমন ইলম থেকে যা কোনো উপকারে আসে না

এমন হৃদয় থেকে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না;

এমন নাফস থেকে যার পেট ভরে না।

হে প্রভু, আমার নাফসকে তাকওয়া দান করো এবং পরিশুদ্ধ করো, তুমি সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী।

তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান চাই, কবুল হবার মতো আমল চাই, পবিত্র হালাল রিযিক চাই; জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ চাই।

আমিন; ছুম্মা আমিন। ■

Reference :

1. Scientific Indications in the Holy Qur'an. 2nd Edition, Islamic Foundation, Bangladesh.
2. Text Books on Science for Colleges.
3. Ma'areful Quran : Mufti Mohd Shafi (RA).
4. Text Books on physics for Colleges.
5. Science Encyclopedia, Vol-1 & 11, Bangla Academy, Dhaka.
6. Text Books on Botany for colleges.
7. Science Encyclopedia Vol-11 : Bangla Academy Dhaka.
8. Text Books on Biological Science for Universities.
9. The Bible, The Quran and Science : Dr. Maurice Bucaille.
10. National Geography : June, 1983.
11. The Birds Time Life International, Nederland : R.T. Peterson.
12. The meaning of the Glorius Qur'an. Text, Translation & Commentry : Abdulla Yusuf Ali
13. Earth Science; 5th Edn. Tarbuck & Lutgens.
14. কমপিউটার ও আল্ কোরআন : ডা. খন্দকার আবদুল মান্নান।
15. Scientific articles in dailies.
16. How Time is Measured : Peler Hood.
17. Science Encyclopedia Vol- V : Bangla Academy, Dhaka.
18. Scientific Articles in Dailies and science periodicals.
19. Biological Science : D. E. Megeo and R. Buchanan.
20. The Ultimate fate of the Universe : Jamal N. Nazrul Islam. Published 1983.

লেখক পরিচিতি

মুহাম্মদ আবু তালেব

পিতা : মরহুম খলিলুর রহমান

মাতা : মরহুমা রওশন আরা বেগম

অফিসিয়াল ঠিকানা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

আন্দরকিল্লা শাখা, চট্টগ্রাম।

আবাসিক ঠিকানা : রওশন আরা ম্যানসন

বরফকল রোড, ঈদগাহ, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৩৬৭৪১০২, ০১৮১৭৭১৫৪২৪

লেখকের অন্যান্য বই

১. বিজ্ঞানময় কোরআন

(Al Quran is All Science)

২. আকর্ষণ

RAQS Publications Series-12